আমন্ত্রিত কুন্তলীন

সংকলন ও সম্পাদনা
বারিদবরণ ঘোষ

সাহিত্যলোক
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

ড. শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত

ড. শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

চিরশ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচিপত্র

১৩৩৪

মৃত্যুবাণ	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৭
স্বয়ম্বরা	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬
গোধূলি-লগ্নে	নরেন্দ্র দেব	৪৮
আঁধারের ঘোরে	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	৫৩
"আলো—কোথায় ওরে আলো—"	রাধারাণী দত্ত	৬৩
'মধুরেণ সমাপয়েৎ'	হেমেন্দ্রকুমার রায়	৭২
বাইজি	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৭৮
অসতী	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	৮৮
বিরহ	এস ওয়াজেদ আলি	৯৪
মেশের বাসায়	অনুরূপা দেবী	৯৬

১৩৩৫

স্বখাত সলিলে	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৫
শাড়ী ও শেমিজ	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১১৩
পুরুষোত্তম	নরেন্দ্র দেব	১২৮
জিত্‌লে কে	তমাললতা বসু	১৩৭
গিরিকা	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪২
প্রিয়তমার পত্র	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৪
বাপকা বেটী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৬৪
পাদবিকের পাদুকা	হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৭৬

১৩৩৬

বাইজি	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৫
উপসর্গ	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৯৩
দৈবাৎ	নরেন্দ্র দেব	২০৭
সাথী	পূর্ণশশী দেবী	২১৮
টোপ্	শিবসুন্দর শর্ম্মা	২২৩
বিশ্বাসের জোর	তমাললতা বসু	২৩৪

বুড়ো-বুড়ী	মণীন্দ্রলাল বসু	২৩৮
তার পর	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২৪৬
এক আনার ডাক টিকিট	সজনীকান্ত দাস	২৫৫

১৩৩৭

হনুমানের স্বপ্ন	পরশুরাম	২৬৯
বসন্তের বানপ্রস্থ	নরেন্দ্র দেব	২৭৮
বিদ্যুৎ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২৮৫
ভূমিকম্প	মণীন্দ্রলাল বসু	২৯৮
শ্যাক্	প্রবোধকুমার সান্যাল	৩০৬
ভয়ঙ্কর	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩১৪
পুরুষস্য ভাগ্যম্	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৩১
পরিশিষ্ট		৩৪৭

সম্পাদকের নিবেদন

অবশেষে কুন্তলীন পুরস্কারের শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হল। প্রথম নির্বাচিত খণ্ডটি 'কুন্তলীন গল্প শতক' নামে এবং তার পরিপূরক খণ্ডটি 'আরও কুন্তলীন' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটি খণ্ডে শুধুমাত্র পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাগুলি (গল্প, কবিতা এবং রূপকথা) মুদ্রিত হয়েছিল। ১৩০৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত—মাঝে কয়েক বছরের জন্যে বন্ধ থাকলেও—এই পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলি খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছিল। এবিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংকলিত খণ্ড দুটিতে প্রদত্ত হয়েছে।

১৩২৪ অবধি 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রকাশিত হলেও এরপর এটির প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই পুরস্কার প্রবর্তনের আগে ১৩০১ সালের বিজ্ঞাপনে একটি নতুন বিষয়ের উল্লেখ ছিল, 'এইরূপ পুরস্কার পূজার পূর্বে একবার এবং বর্ষশেষে একবার, এই দুইবারে, একশত টাকা হিসাবে দুইশত টাকা দেওয়া হইবে।' এই 'ষান্মাসিক পুরস্কার' প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও বছরে একবারই পুরস্কার দেবার নীতি প্রবর্তিত হয়। আবার ১৩২৪ সনের 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ আরও আশা করা হয়েছিল—'আশা করি আগামী বর্ষে অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট গল্প প্রেরিত হইবে।' কিন্তু কেন জানি না, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ১৩২৫ সনের 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রকাশিত হয়নি। অনুমান করি, বহু গল্প দপ্তরে এসে পৌঁচেছিল (১৩২৩ সনে 'সহস্রাধিক গল্প প্রতিযোগিতায় প্রেরিত' হয়েছিল)। সেগুলির ভাগ্যে কি ঘটেছিল—তাও আমরা জানি না। শুধু ১৩২৫ সন নয়, ১৩৩৩ সন অবধি 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর আর কোনও খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।

মাঝে দশ বছর বাদ দিয়ে আবার আমরা 'কুন্তলীন পুরস্কার' পেলাম ১৩৩৪ সনে। পর পর চার বছর দুর্গাপুজোর সময়ে এর চারটি বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৭ সালে শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এতে মুদ্রিত গল্পগুলি পুরস্কৃত ছিল না এবং পুরস্কার ঘোষণা করে গল্প প্রার্থনাও করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে নামটি পূর্ববৎ 'কুন্তলীন পুরস্কার' থাকলেও (মাঝে মাঝে সচিত্র কুন্তলীন পুরস্কার) এই চারখণ্ডের কোনও গল্পই 'প্রাপ্ত' ছিল না, 'আহূত' ছিল। এবিষয়ে প্রকাশক তাঁর নিবেদনে (১৩৩৪) জানিয়েছিলেন—'এ বৎসর কোনরূপ প্রতিযোগিতা ছিল না এবং সেই জন্য এবারের উপহারের নামটি অর্থশূন্য হইয়াছে। বরাবরের নামটি এবারও রাখিয়াছি বলিয়া আশা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না।' আমরা এই চারখণ্ড একত্রে একখণ্ডে প্রকাশ কালে সেকারণে নামটিকে একটু বদলে নেবার

অবকাশ নিয়েছি—নাম দিয়েছি 'আমন্ত্রিত কুন্তলীন'। কারণ গল্পগুলি সবই 'আমন্ত্রিত' ছিল এবং পুরস্কৃত গল্পগুলি থেকে এইভাবে পৃথকনামে চিহ্নিত করা গেল। গল্প চাওয়ার প্রসঙ্গ 'এক আনার ডাক টিকিট' গল্পেও উল্লিখিত হয়েছে—'শ্রদ্ধেয় হিতেনদা বলিয়াছেন অন্তত এক ফর্মা লেখা দিতে হইবে...।'

এই চারখণ্ডে প্রকাশিত মোট গল্পের সংখ্যা ৩৪ (১০+৮+৯+৭)। এই চৌত্রিশটি গল্প লিখেছেন ২২ জন লেখক মিলে। এঁদের নাম বলছি (বন্ধনীর মধ্যে রচিত গল্পের সংখ্যা)। পাঠক নিশ্চয়ই স্বীকার করে নেবেন—একসময়ে এই সব লেখকেরাই বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল অধ্যায়ের রচয়িতা ছিলেন। উল্লেখ করার বিষয়—এসব গল্পের অনেকগুলি 'কুন্তলীন পুরস্কারের' বাইরে অদ্যাবধি অন্যত্র সংকলিত হয়নি। সেদিক থেকে আমবা একটা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করে একালের পাঠকদের কাছে দিতে পারলাম—একথা সগৌরবে বলতে পারি। লেখকেরা ছিলেন—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (৪), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২), নরেন্দ্র দেব (৪), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১), হেমেন্দ্রকুমার রায় (২), খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১), এস ওয়াজেদ আলি (১), অনুরূপা দেবী (১), তমাললতা বসু (২), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (২), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১), পূর্ণশশী দেবী (১), শিবসুন্দর শর্মা (১), মণীন্দ্রলাল বসু (২), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (২), সজনীকান্ত দাস (১), পরশুরাম (১), প্রবোধকুমার সান্যাল (১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১)। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র দেব শেষ চার বছর প্রতিটি সংখ্যাতেই লিখেছেন। এদের মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহন-প্রভাতকুমারের লেখক জীবনের সূত্রপাতই ঘটেছিল এই পুরস্কার প্রাপ্তি দিয়েই। শিবসুন্দর শর্মা সম্ভবত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। তা যদি হয় তবে লেখকসংখ্যা কমে দাঁড়াবে ২১-এ।

এই সংখ্যা চতুষ্টয়ের মধ্যে ১৩৩৬ ছাড়া প্রতিটি খণ্ডই সচিত্র। ১৩৩৪-এর ছ'টি, ১৩৩৫-এর ন'টি ছবিই এঁকেছেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। কথা ছিল তিনি ১৩৩৬ সংখ্যাটিকেও চিত্রিত করবেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি আঁকতে পারেন নি। প্রকাশক হিতেন্দ্রমোহন তাঁর শিষ্য ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল থাকতে পারে। তাঁর সব ছবি আমরা দিতে পারলাম না। নমুনা হিসেবে ১৩৩৫ সালের একটি ছবি আমরা এখানে পাঠকদের উপহার দিলাম। শিল্পী সম্পর্কে একালের পাঠকদের কাছে কিছু পরিচয় নিবেদন করলাম। হালিসহর কোনা-নিবাসী কালীনাথ ঘোষের মেজ ছেলে পূর্ণচন্দ্রের বাল্যকাল মোগলসরাই এবং গাজিপুরেও কেটেছিল। গাজিপুরের ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের ছাত্র পূর্ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর কলকাতা এসে পড়াশোনা শুরু করেন। ছোট থেকেই ছবি আঁকায় আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউশন ছেড়ে গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টে ভর্তি হন। পার্সি-ব্রাউন ও অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র কিন্তু শেষ অবধি অবনীন্দ্রনাথের নব্যশিল্প ধারাকে অনুসরণ করেননি। কর্মজীবনে পুস্তকের প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কণে এক নতুন যুগ সৃষ্টি করে কমার্শিয়াল আর্টকে উন্নত করেন। এক সময়ে তিনি এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান প্রেসে কাজ করেন। এখানে ক্রোমোলিথো পদ্ধতির ছবিতে তিনি পারদর্শী হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি পেয়েও বিদেশে যেতে পারেন নি। পরে স্টেটসম্যান পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকেন। বিজ্ঞাপন চিত্রে রেখাঙ্কনে তিনি নতুন পথ দেখান। একই সঙ্গে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজেও

অধ্যাপনা করেন। 'রেখাঙ্কন' নামে ছবি আঁকা শেখার দু খণ্ডে পুস্তিকা বের করেন। একসময়ে ডি. জে. কেইমার এণ্ড কোং-তে চাকরি করেন।

পি. ঘোষ (১৮৮৫-১৯৪৯) নামে পরিচিত এই শিল্পী তৈলচিত্রেও দক্ষতা অর্জন করেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত বহু বইয়ের ছবি তিনি এঁকেছেন। তাঁর আঁকা মাইকেল মধুসূদনের একটি ছবি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ আছে। প্যাস্টেল, টেম্পেরা এবং জলরঙের ছবিতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি'র ছবিগুলি তাঁরই আঁকা। শকুন্তলা, বনলক্ষ্মী, ফুলওয়ালি, সীতা ও সরমা, ফুলের মেলা, বাঁদরওয়ালা, বিরহিনী সীতা প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত ছবি।

তাঁর আঁকা 'কুন্তলীন' তেলের একটি বিজ্ঞাপনের ছবি এই সঙ্গে ছাপা হল। এতে ছবির মধ্যে কেশ বিরলতা এবং ছবির বাইরে ভদ্রলোকের চুলসমেত মাথা কুন্তলীনের দৌলতেই ঘটেছে—এমন কথা বোঝানো হয়েছে।

১৩৩৭ সালে প্রকাশিত পরশুরামের গল্পটি প্রসঙ্গে প্রকাশক জানিয়েছেন যে এটি তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কুন্তলীন দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন (দ্র. পরিশিষ্ট, ১৩৩৭ সালের প্রকাশকের নিবেদন)। তাঁর 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পটিকে চিত্রিত করেছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। গল্পের সূচনায় তার উল্লেখ আছে। এই চিত্রকর্ম খুবই সুপরিচিত বলে এখানে মুদ্রিত হল না।

আরও একটি কথা,—বাংলা বানানে আধুনিকতার সূত্রপাত হলেও আমরা কুন্তলীন পুরস্কারের মূল বানানকে যথাযথ ভাবেই অনুসরণ করেছি। কারণ কেউ যদি বাংলা বানানের ইতিহাস কখনও লেখেন—এ থেকে সাহায্য পেতে পারবেন। শেষ চারখণ্ডে (প্রকৃতপক্ষে ১৩২৩ এবং ১৩২৪ সংখ্যা দুটি থেকেই) কুন্তলীন-এর আকারেও পরিবর্তন ঘটে। ছোট আকারের পরিবর্তে তা ডিমাই সাইজে ছাপানো হতে শুরু করে। কেবল ১৩৩৬ সংখ্যাটি পুরনো চেহারা পায় (দ্রষ্টব্য আখ্যাপত্রের ছবি)।

এই চারখণ্ডের প্রকাশক হিতেন্দ্রমোহন বসু সম্পর্কে 'কুন্তলীন গল্প শতকে'র ভূমিকায় যথাপ্রয়োজন তথ্য নিবেদন করেছি। শেষ চারখণ্ড প্রকাশে তাঁকে সর্বপ্রকার সহায়তা করেছিলেন প্রখ্যাত প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার এবং লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পিতা হেমেন্দ্রমোহনের সময় কুন্তলীন প্রেস স্থাপিত হয়েছিল ১৩/৫ শিবনারায়ণ দাস লেনে। তিনের দশকে এটি বন্ধ হবার কিছুকাল আগে স্থানের পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে ৪৮ বৌবাজার স্ট্রিট ও পরে ৬৫/২ বিডন স্ট্রিটে উঠে আসে। প্রথম দিকে মুদ্রক হিসেবে ছাপা হত পূর্ণচন্দ্র দাসের নাম। কিন্তু ১৩৩৪-এ মুদ্রাকরের নাম পরিবর্তিত হয়ে চন্দ্রমাধব বিশ্বাস-এর নাম মুদ্রিত হয়েছে।

বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি বই আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে কুন্তলীন পুরস্কারের গল্পাবলীর যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে তা কোনও বইতেই আলোচিত হয়নি। এর বড় কারণ ছিল, আমার মনে হয়, কুন্তলীন পুরস্কারের খণ্ডগুলির দুষ্প্রাপ্যতা। খুব কম গ্রন্থাগারেই এর খণ্ডগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি খণ্ডও নেই। এবং পৃথিবীর কোনও গ্রন্থাগারেই এর সমস্ত খণ্ডগুলি নেই। এগুলিকে বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বহু আয়াসে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ফলে এগুলি সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা খুবই অসুবিধা জনক ছিল। অথচ প্রায় ৩৫

বছর ধরে দুশোর বেশি গল্প যে সংকলনগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল, তার উল্লেখ ব্যতিরেকে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্ব তমসাবৃত থেকে যায়।

একথা খুব উৎসাহভরে বলা যাবে না যে প্রথম দিকে যে সব গল্প প্রকাশিত হয়েছে তারা খুব উচ্চমার্গের গল্প হয়ে উঠতে পেরেছিল। বস্তুতপক্ষে এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখের গল্পাবলি ব্যতীত (মনে রাখতে হবে এই দুজনেরই গল্প কুন্তলীন পুরস্কারের মুদ্রিত হয়েছিল এবং শরৎচন্দ্র প্রমুখের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবই তো 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র হাত ধরেই) খুব একটা ভাল গল্প কমই রচিত হয়েছে। তবুও এর স্বাস্থ্যকর সূতিকাগার বহু ভালো গল্পের জন্ম দিয়েছে, বহু স্বাস্থ্যবান লেখকের আবির্ভাবকে সম্ভব করেছে। প্রথম ডিটেকটিভধর্মী গল্প, প্রথম রূপকথার সংকলন যেমন এখানেই সম্ভব হয়েছিল তেমনি মহিলা লেখিকাদের আবিষ্কার করে তাঁদেরকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবর্তনা দান এবং বঙ্গদেশের বাইরে অন্যান্য প্রদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের কাছে সাহিত্যের বিস্তৃত আঙিনাকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই পুরস্কারের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

শেষ পর্বে যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই যে সমকালীন বাংলা গল্পগুলির তুলনায় সেরা গল্প ছিল—সে বিষয়ে পাঠক অবশ্যই একমত হবেন। আগের গল্পগুলিতে কুন্তলীন-দেলখোসের প্রসঙ্গ উল্লেখ আবশ্যিক ছিল। কিন্তু আমন্ত্রিত কুন্তলীনে সে বাধ্যবাধকতা ছিল না। সে কারণেই গল্পগুলির উৎকর্ষ ঘটেছে—এমন মনে করা উচিত হবে না। কারণ এখানে মুদ্রিত দু'-একটি গল্পেও (যেমন 'স্বয়ম্বরা' গল্পে দেলখোসের, বা 'এক আনার টিকিট' গল্পে কুন্তলীনের উল্লেখ আছে) তাদের উল্লেখ আছে। আসলে বাংলা গল্প ধীরে ধীরে বয়স্ক হয়ে উঠছিল নিরন্তর চর্চা এবং জীবনধারায় পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য আসার ফলে। স্বদেশী ভাবনা এসময়ে বাঙালিকে গ্রাস করছিল। তাই 'স্বয়ম্বরা' গল্পে গান্ধীজির প্রসঙ্গ এসেছে—দেশপ্রেম যে ক্ষুদ্র আত্মপ্রেমের চেয়ে বড়ো—একথা অনিবার্যভাবে এ গল্পে প্রতিপাদিত হয়ে গেছে।

'বাইজি' গল্পের নির্মমতা (এ যেন এক নতুন উত্তীয়-শ্যামার প্রেমে মত্ত!), এবং 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের ব্যঙ্গধর্মিতা—একেবারে আধুনিক কালের লক্ষণাক্রান্ত। বস্তুতপক্ষে এ সময় থেকেই বাংলাগল্প আধুনিক মর্জি প্রকাশ করতে থাকে। কাহিনী-রস নয়, মনস্তাত্ত্বিকপ্রাধান্য এ যুগের গল্পের বড় পরিচয় হয়ে উঠেছিল। কখনও সংলাপে, কখনও মনোলগধর্মী আত্ম-বিশ্লেষণে (মণীন্দ্রলাল বসুর 'বুড়োবুড়ি') এই আধুনিক মনস্তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। আমার তো মনে হয়েছে এই সংকলনে গৃহীত প্রবোধকুমার সান্যাল রচিত 'শ্যাক্' গল্পটি একটি সেরা আধুনিক গল্প (এ বিষয়ে প্রবোধকুমারের সঙ্গে বর্তমান সম্পাদকের দীর্ঘ আলোচনা ও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল। অধিকন্তু জানতে পেরেছিলাম এই গল্প লিখে তিনি ১৫্ টাকা পেয়েছিলেন, সম্ভবত সব লেখককেই এই হারে সম্মানদক্ষিণা দেওয়া হত। রাধারাণী দেবীও আমাকে এই একই তথ্য জানিয়েছিলেন)। খুব উল্লেখ করার বিষয় একটিও ভূতের গল্প আমরা এই সংকলনে পাইনি।

এই গল্পগুলির মধ্যে আরও একটা পরীক্ষা অন্তত অসচেতন ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ছোটগল্প প্রথমযুগে সাধুভাষাকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই কালপর্বেই তাকে চলতিভাষার কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছিল। এই সংকলনে বিধৃত কয়েকটি গল্প পড়তে পড়তে পাঠক লক্ষ্য করবেন যে চলতি ভাষার

প্রয়োগ এবং সাবালকত্ব—দুটিই এই পর্বে সংঘটিত হয়ে গেছে। ভাষার ইতিহাসে এটিও একটি উল্লেখনীয় বিষয়। আশা করবো বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের ইতিহাস অতঃপর যাঁরা রচনা করবেন—তাঁরা কুন্তলীন পুরস্কারের প্রকাশিত গল্পগুলিকেও তাঁদের আলোচনার পরিধিভুক্ত করবেন।

কুন্তলীন পুরস্কারের গল্পাবলির প্রকাশ সমাপ্ত হল—সম্পূর্ণ হল একথা এখনও বলতে পারছি না। ১৩১০ সালে কুন্তলীনের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'কর্মফল' গল্পটি নিয়ে। এটি সচিত্র ছিল। রঙিন এবং অন্যান্য ছবিগুলি এঁকে দিয়েছিলেন বরাবরের মতই পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ এই খণ্ডের 'গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছিলেন 'আমার রচিত এই ক্ষুদ্র গল্পটি গ্রহণ করিয়া কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' এই গল্পের প্রকাশ বিষয়ে কুন্তলীনের পরম ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (পৃ. ৮২) গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন—'কুন্তলীনের এইচ্ বোস...হেমেন্দ্রমোহন বসুকে এ-গ্রন্থখানি বিক্রয় করেন তিনশো টাকা মূল্যে। হেমেন্দ্রবাবু এখানি তাঁর কুন্তলীন প্রেসে মনোজ্ঞভাবে ছেপে বিক্রয় করেন—বইয়ের দাম ছিল আট আনা।'

এ থেকে অনুমান করতে বাধা নেই যে গল্পটির কপিরাইট রবীন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রমোহনকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা থেকেও সেটা স্পষ্টত প্রমাণিত হয়। টাকার পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেও কোন সদুত্তর পাইনি। কপিরাইট-সংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে যেতে চাইনি বলে—পাঠকদের ঐ সংখ্যাটির হুবহু পুনর্মুদ্রণ উপহার দেবার ইচ্ছে সত্ত্বেও দিতে পারলাম না। এ ছাড়া অদ্যাবধি ২য় বর্ষ কুন্তলীনের সন্ধান পেলাম না। এ আক্ষেপও রয়ে গেল। নমুনা হিসেবে কেবল 'গল্পশতক'-এ দ্বিতীয়বর্ষের প্রথম পুরস্কারটি উল্লেখ করতে পেরেছি 'কুন্তলীনের দ্বাদশ প্রথম' থেকে তার সন্ধান পেয়ে।

তবুও যা পেয়েছি তুলনা তার নাই—বলতে ইচ্ছে করে। এ বিষয়ে পাঠকেরা আমাকে ও প্রকাশককে যথেষ্ট আনুকূল্য দেখিয়েছেন। না হলে এই প্রায় হারিয়ে যাওয়া গল্পনিচয়, একালের পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যেতো না। তাঁদের আগ্রহকে আমি অভিবাদন করি।

আনন্দ পাবলিশার্স-এর কর্তৃপক্ষ যদি এই কর্মে আমাকে সহযোগিতা না করতেন তবে এই কাজ আলো দেখতো না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ এগুলি প্রকাশের জন্য যে দূরদর্শিতা প্রয়োজন—তা বঙ্গদেশের ক'জন প্রকাশকের আছে এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আমাকে বহু মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে নানা সময়ে নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ন্যুব্জ হয়ে আছে। এই শেষ পর্বেও শ্রীশোভন বসু, শ্রীরঞ্জন সরকার, শ্রীদেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত সাউ আমাকে নানা সহায়তা দান করেছেন—সেকথাও সবিনয়ে স্মরণ করি।

রোজভিলা, বর্ধমান **বারিদবরণ ঘোষ**
কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৬

১৩৩৬ সালের

কুন্তলীন

পুরস্কার

এইচ বসু

৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

‘কুন্তলীন পুরস্কার’ গ্রন্থের নামপত্র (১৩৩৬ সাল)
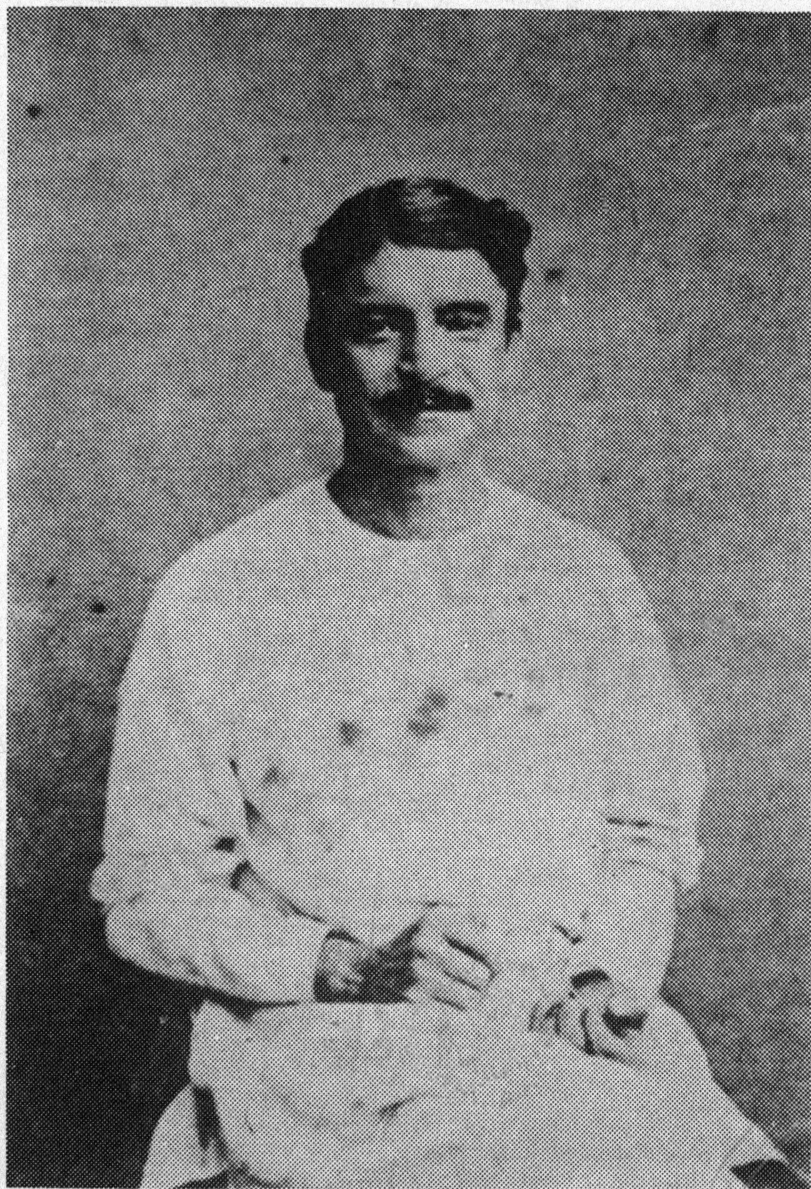
হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ্ বসু)

সে বল্‌লে—এসেছিস ? দেখি তোর হাত...হাঁ, হয়েছে...আচ্ছা, আর একবার বেশ করে কাপড়ে মুছেনে...

(স্বখাত সলিলে : চারু বন্দ্যোপাধ্যায়)

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ-অঙ্কিত বিজ্ঞাপন-চিত্র : কুন্তলীন

১৩৩৪ সনের

॥ কুন্তলীন পুরস্কার ॥

মৃত্যুবাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কবিরাজী ঔষধ

দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত কালী-মন্দিরের একটু উত্তরে এবং শিবতলা ফেরি-ঘাটের ঈষৎ দক্ষিণে গঙ্গার ধারে পাশাপাশি দুখানি বাড়ী। জল পথের যাত্রীরা বাড়ী দু'খানি দেখিয়া তারিফ করে। এই বাড়ীর একখানির মালিক দোলগোবিন্দ চাটুয্যে, আলিপুরের ফৌজদারী আদালতে এককালে তাঁর অসাধারণ পশার প্রতিপত্তি ছিল। তার জেরার তীক্ষ্ণ বাণে অতি যত্নে গাঁথা পাকা মর্কদ্দমাও একেবারে টুকরা-টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। চার বছর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে জ্বালাতন হইয়া বিস্তর ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইয়া আলমোরা নৈনীতাল হইতে সুরু করিয়া রাঁচি, মধুপুর ঘুরিয়া চন্দননগরে বাসা বাঁধিয়াও যখন শরীরে যুৎ পাইলেন না, তখন এই দক্ষিণেশ্বরের পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া তিনি আশ্রয় লইলেন। সে আজ এক বছরের কথা। সম্প্রতি আগড়পাড়ার কাছে এক কবিরাজ পাওয়া গেছে, তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয় ব্যাকরণতীর্থ কবিভূষণ। কবিরাজ মহাশয় জাতে বৈদ্য ; মেডিকেল কলেজে দুই বৎসর পড়িয়া বিলাতী চিকিৎসা-বিদ্যায় আধিক অগ্রসর হওয়ার সুযোগ না পাইয়া পূর্ব্বপুরুষের বটীকা-তৈল ও চূর্ণাদি লইয়া ব্যবসা সুরু করিয়াছেন ; এবং নিরুপায় দোলগোবিন্দ সম্প্রতি আরোগ্য-লাভের আশায় মেডিকেল কলেজে-পড়া এই বৈদ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

পাশের বাড়ীতে থাকেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—বেঙ্গল পুলিশে চাকুরি করিয়া নানা ঘাটের জল খাইয়া, এ্যাসিষ্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের দুর্লভ পদে কয়মাস এ্যাক্‌টিনি করিয়া চাকরি হইতে অবসর লইয়াছেন এবং জীবনের বাকী দিনগুলি পৈত্রিক ভিটায় কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া জীর্ণ গৃহের সংস্কারবর্দ্ধন প্রভৃতির দ্বারা তাকে হাল-ফ্যাসানের অনুরূপ গড়িয়া সেইখানে বাসা বাঁধিয়াছেন।

শৈশবে এক স্কুলে পড়াশুনা, একই মাঠে খেলাধূলা, একই ঘাটে স্নান,—তারপর কয় বৎসরের দীর্ঘ বিচ্ছেদ...দুই বন্ধু পরিণত বয়সে আবার আসিয়া পাশাপাশি মিলিয়াছেন। এ কয় বৎসরে দু' জনের জীবনে বসন্তের হাওয়ার পরশও যেমন লাগিয়াছে, বৈশাখী ঝঞ্ঝারও তেমনি অন্ত ছিল না !...কবে সেই কৈশোরে জীবনের পথে ছাড়াছাড়ি ! তার পর বিভিন্ন পথে এতকাল চলিয়া আবার দেখা...আচারে ব্যবহারের অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে ! বার্লি পান করিয়াও দোলগোবিন্দ জোয়ানের বড়ি খোঁজেন ; আর ত্রৈলোক্যনাথ একটা পাঁটার মুড়ি আরো পাঁচটা ব্যঞ্জনের সহিত ভোজন করিয়াও অনায়াসে তাহা পরিপাক করেন। দোলগোবিন্দ সকালে লেবুর রস পান করেন ; আর ত্রৈলোক্যনাথ পান করেন গরম চা দু'

পেয়ালা। দোলগোবিন্দ গোলমাল সহ্য করিতে পারেন না ; আর গোলমাল পাইলে ত্রৈলোক্যনাথের রোখ চাপিয়া যায়। দোলগোবিন্দর গোয়ালে গরু, খাঁচায় পাখী, পায়ের কাছে আইরিশ টেরিয়ার—ত্রৈলোক্যনাথ এই সব পশু-পক্ষী দু' চক্ষে দেখিতে পারেন না—ঘর নোংরা করিবার তারা একখানি ! ত্রৈলোক্যনাথ সৌখীন, ফুল-ফলের গাছের সখ তাঁর প্রচণ্ড। ফৌজদারী উকীল হইলেও দোলগোবিন্দর মেজাজ এখন শান্ত, তবে গোঁ ভীষণ ; আর ত্রৈলোক্যনাথ পাকা পুলিশ অফিসার ছিলেন, মেজাজ এখনো তেমনি আছে। তা থাক ! দুই বন্ধু আবার বহু কালের বিচ্ছেদের পর পরস্পরকে পরম আরামে গ্রহণ করিলেন। ...

সেদিন দোলগোবিন্দর গৃহে বসিয়া দোলগোবিন্দ ও ত্রৈলোক্যনাথ নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা করিতেছেন। দোলগোবিন্দর হাতে ছিল কাগজের মোড়কে কয়েকটী বটীকা ; আর ত্রৈলোক্যনাথের হাতে আইরীশ্ শসার বীজ।

দোলগোবিন্দ কহিলেন—কবিরাজ মশায় বললেন, এ ঔষধটি তিনি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জিনিসের সারাংশ মিশিয়ে তৈরী করেচেন...বলেচেন, অগ্নিমান্দ্যের পক্ষে এ অমোঘ...নাম, হরপিঙ্গলজটা-ভাইটা-বটীকা...অর্থাৎ এতে ভিটামিন আছে প্রচুর...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—বটে !

দোলগোবিন্দ কহিলেন—হাঁ, কবিরাজ মশায় বললেন, সব কটা ভাইটামিনই এতে আছে, শুধু ভাইটামিন এল্ ছাড়া...

একটু বিস্ময় ও আগ্রহের সহিত ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—ভাইটামিন এল্ নাই ? তাই তো !

ভাইটামিন দ্রব্যটা কি,—সে সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথের কোনো জ্ঞানই ছিল না ! আজকালকার মাসিকপত্র তো তিনি পড়েন না ! ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়োর কোড ও পেনাল কোড—দু' খানি কোড়-বহির সমস্ত ধারা তিনি গড়গড় করিয়া আজো মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন,...তার মধ্যে ভাইটামিন বলিয়া তো কোনো দ্রব্য কোথাও নাই ! তবু...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তা সব জিনিষই তো পাওয়া যায় না জগতে...একটি বড়ী সকালে, আর একটি রাত্রে শুতে যাবার সময়...এক মাসে আশ্চর্য ফল পাবো। অনুপান এক চামচ মধু আর আধ চামচ বাই-কার্ব্বোনেট অফ সোডা...আর এই ওষুধ খাবার পর এক পেয়ালা করে ছাগল দুধ। তবে ছাগলটি নীরোগ হওয়া চাই।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—ছাগল-দুধ কোথায় পাবে ?

দোলগোবিন্দ কহিলেন—তার জোগাড়ও হয়েচে...আমার মুহুরি ঐ অবিনাশ...শেয়ালদা থেকে একটি নীরোগ ছাগল কিনে আনচে...ওর সন্ধানে ছিল একটি...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—কিন্তু ছাগল রাখবে কোথায় ? ত্রৈলোক্যনাথ ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিলেন ; তারপর কহিলেন,—ভারী নোংরা জানোয়ার...তা ছাড়া তোমার ঐ যে শাকসব্জী লাগিয়েচো, ও-সব মুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে। ...

দোলগোবিন্দ কহিলেন—ঐ বাগানের কোণে একটি ঘর করে দেবো...খাসা থাকবে। এ তো কলকাতা সহর নয় যে শোবার ঘরের পাশে বারান্দায় ছাড়া জায়গা মিলবে না...

শেষের কথাগুলা ত্রৈলোক্যনাথের কানেও গেল না। তিনি কহিলেন,—কোন্ খানে রাখবে ?

দোলগোবিন্দ কহিলেন—উত্তর ধারে ঐ যে বড় জামগাছটা আছে, ওরি তলায়...খোলা

জায়গা আছে খানিকটা...রোদ আসবে, আর হাওয়াও পাবে...

উত্তর ধারে জামগাছের কাছে ! ত্রৈলোক্যনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। সর্ব্বনাশ ! একেই তো বন্ধুর এই কুকুর আর গোরুর জ্বালায় তিনি তটস্থ ! গোরুটা একবার বোর্ণিও হইতে আনা তাঁর সখের কলাগাছ খাইয়া ফেলিয়াছিল,...তার উপর ছাগল দোসর জুটিতেছে। তিনি কহিলেন—ওই আমার বেড়ার ধারে ?...কিন্তু বেড়ার ধারেই যে আমার সীজন্ ফ্লাওয়ারের সব বীজ ছড়িয়েচি, তার পর ওখানটায় কাশ্মীরী চন্দ্রমল্লিকা লাগিয়েচি ! কি খরচ করেই জমি বানিয়েচি...আমার অত সাধের ফুলগাছ যে একটিও রাখবে না হে !...

হাসিয়া দোলগোবিন্দ কহিলেন,—মাঝখানে তো বেড়া আছে !

—না, না, না, না...ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—তা হবে না। তুমি দক্ষিণ দিকে রাখো তোমার ছাগল...

দোলগোবিন্দ কহিলেন—তা হয় না। দক্ষিণ দিকে গোয়াল, মুলতানী গোরু...তা ছাড়া ওদিকে তোমার দেওয়া সেই গোপালে-ধোপা আমের চারাটা লাগিয়েচি...

বটে ! নিজের গাছগুলিকে সাবধানে বাঁচাইয়া রাখিয়া পরের গাছের দিকে ছাগল লেলাইয়া দিবে ! ত্রৈলোক্যনাথের মনের মধ্যে দুরন্ত পুলিশ-অফিসার পুরা ইউনিফর্ম্ম আঁটিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। এতকাল ধরিয়া তিনি স্থলে-জলে দোর্দ্দণ্ড শাসন ফলাইয়া আসিয়াছেন...যাকে যা হুকুম করিয়াছেন, তাই তামিল হইয়াছে, আর...নাঃ,—তার উপর তাঁর চোখের সামনে নানা রঙের ফুলে রঙীন বাগানখানি বিপুল শোভায় ভরিয়া জাগিয়া উঠিল, বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা, ব্ল্যাকপ্রিন্স,...সে সব গাছ একটা দুরন্ত ছাগলে যেন মুড়াইয়া খাইতেছে ! শিহরিয়া তিনি কহিলেন,—তা হবে না। আমার ধারে তোমার ছাগল রাখা হতেই পারে না।

ফৌজদারী উকিলের গোঁ দোলগোবিন্দর মনেও ফোঁশ করিয়া উঠিল। কত বড় বড় পুলিশ অফিসারকে জেরায় জর্জ্জরিত বিপর্য্যস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন ! পুলিশের সাহেব ডেপুটী কমিশনার অবধি তাঁর জেরায় প্রচণ্ড পৌষের শীতেও ঘামিয়া একশা হইয়া গিয়াছে, আর এ তো বেঙ্গল-পুলিশের একটা এ্যাক্‌টিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট...তা ছাড়া হক্—'রাইট'। বড় বড় আইনের কেতাবগুলা বার-লাইব্রেরীর আলমারির কোণ হইতে তাঁর মাথার মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। দোলগোবিন্দ আত্মসম্মান-রক্ষায় আর জুলুম-জবরদস্তির প্রতিকারে প্রয়াসী চিরদিন।

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আমার জমির যেখানে খুশী আমি ছাগল রাখবো, গণ্ডার রাখবো, বাঘ রাখবো, ভাল্লুক রাখবো, তাতে কার কি আপত্তি থাকাতে পারে !

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—পেনাল কোডের ২৮৯ ধারাটি ভুলে যাচ্ছো ভাই...বলিয়া তিনি আবৃত্তি করিয়া কহিলেন,—

Whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger of grievous hurt from such animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

হাসিয়া দোলগোবিন্দ কহিলেন,—কিন্তু এ নিরীহ ছাগল। human life কে endanger

করবে কি করে ?

ত্রৈলোক্যনাথ ঝাঁজিয়া উঠিলেন। এ ধারার জন্য...তাইতো, গাছপালার কোন উল্লেখ নাই ! mischief-এর নামগন্ধও নাই এ ধারায়। তিনি কহিলেন,—ছাগলের তো শিং আছে—গুঁতুতে পারে...যদি গুঁতোয়... ?

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—যদি গুঁতোয় ! যদি ! 22 Calcutta খানা খুলে দ্যাখো গে...বলিয়া তিনি কৌতুকে ভরা দৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের পানে চাহিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ কি ভাবিতেছিলেন ; হঠাৎ বলিলেন,—২৬৮ ধারা Public nuisance...সেটা মনে আছে ? দুর্গন্ধ, ছাগলের গায়ে বোট্‌কা গন্ধ...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—খুব মনে আছে। এ বোকা ছাগল নয়। বোকা ছাগল হলে তার দুর্গন্ধ...তা'ও 12 Bombay দেখো...বাইরামজীর কেশ্‌ রিপোর্টেড্‌ আছে। তাতে স্পষ্ট বলেচে—সেটা public nuisance হবে না, private nuisance. এবং therefore not one falling within the purview of the criminal law. কিন্তু তা'ও প্রমাণ সাপেক্ষ, matter of evidence. দোলগোবিন্দ হাসিলেন ; হাসিয়া কহিলেন,—ও সব আইনের ভয় দেখিয়ো না। অনেক হাকিমকে আমি আইন শিখিয়ে এসেচি...তুমি তো তুচ্ছ বেঙ্গল পুলিশের একজন এ্যাক্‌টিনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলে হে...বলে, কত আইনে সৃষ্টি করে এলুম...

আইনের তর্কে ত্রৈলোক্যনাথ টিকিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন,—তুমি তাহলে তোমার বাগানের দক্ষিণে ছাগল রাখবে না ?...একটা লক্ষ্মীছাড়া ছাগল...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—না। লক্ষ্মীছাড়া ছাগল নয়...আমি মোটা দাম দিয়ে কিনচি...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—আমার গাছাপালা নষ্ট করে দেবে ? অত দামী ফুল-ফলের গাছ ?...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—মাঝখানে বেড়া আছে...তা ছাড়া আমার ছাগল বাঁধা থাকবে।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—দড়ি ছিঁড়তে পারে না ?...তখন ?...জলপাইগুড়িতে দুটো ছাগলের কেশ্‌ করে এসেচি...

দোলগোবিন্দ কহিলেন—জলপাইগুড়ির ছাগল দড়ি ছিঁড়েচে বলে দক্ষিণেশ্বরের ছাগলও দড়ি ছিঁড়বে, এমন কোনো কথা নেই !...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—তবু সে ছাগল !...মানুষ নয়...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—ছাগল ছাগলই হয়। ছাগল মানুষের মত হবে, এ কোন দিনও কেউ আশাও করে না। কোথায় কার ফুলগাছ আছে, যদি খায়, এর জন্যে পড়শীরা ছাগল পুষবে না, এ কেমন কথা !

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—বেশ তো, ছাগল তুমি পোষো—ছাগল-দুধ খাও—তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। আমার আপত্তি শুধু উত্তর দিকের ঐ কোণ নিয়ে। আমার ফুলগাছগুলো, তা ছাড়া আমার দক্ষিণের হাওয়াটুকু দুর্গন্ধে ভরে উঠবে...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আমি মুর্দ্দফরাস নাই। ছাগল পুষচি বলে সত্যি সত্যি কিছু আর ও জায়গাটুকুকে নরককুণ্ড করে রাখবো না...আমিও এই ভিটায় বাস করি। তোমার যেমন হাওয়ার দরকার, আমারো তেমনি...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—বেশ। আমি বাঘ পুষবো। আর সে বাঘকে ঐ চন্দ্রমল্লিকার

ঝাড়ের কাছে রাখবো...দেখি, তোমার ছাগলের ঘাড়ে মাথা ক'দিন থাকে !

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তুমি বাঘ পোষো, খোক্কোশ পোষো, আর তাদের তোমার বাগানে রাখো, ঘরে রাখো—আমি কোনো কথা তুলতে যাবো না। তারা যখন আমার কোনো ক্ষতি করবে, তখন আইন আছে, আদালত আছে,...তেমনি আমি ছাগল পুষচি, সে ছাগল তোমার কোনো ক্ষতি করে তো আদালতে গিয়ে আইনের সাহায্য নিয়ো...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—এই কথা ! উত্তর দিকেই ছাগল রাখচো তুমি ?

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আলবৎ ! এই কথা। চোখ রাঙিয়ে আমায় ভয়ে হঠাবে, তা হতে পারে না।

ত্রৈলোক্যনাথ উঠিলেন ; কহিলেন,—বেশ !

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—উত্তম !

ত্রৈলোক্যনাথ চলিয়া গেলেন। দোলগোবিন্দ হাঁকিলেন,—বটা--

ভৃত্যের নাম বটা। বটা আসিলে দোলগোবিন্দ তাকে কহিলেন,—এই বড়ী নে—বাড়ীর মধ্যে পিসিমার কাছে দিগে যা। আমি যাচ্ছি খপরের কাগজখানা দেখে। বলবি, আমি গিয়ে অনুপান বলে দিলে তবে খলে বড়ী মেড়ে দেবে।

বটার হাতে কাগজের মোড়ক দিয়া দোলগোবিন্দ কহিলেন,—যা—

বটা চলিয়া চাইতেছিল ; দোলগোবিন্দ আবার ডাকিলেন—ওরে, শুনে যা...

ভৃত্য ফিরিল। দোলগোবিন্দ কহিলেন—ঘরামি এসেচে ?

ভৃত্য কহিল এসেচে। এসে পয়সা নিয়ে বাঁশ দড়ি আর খোলা কিনতে গেছে।

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—ভালো। তাকে জায়গা দেখিয়ে দিচিস্... ? জামগাছের গা ঘেঁষে হবে...বুঝলি ? আর ছোলা আনিয়ে রাখ্। মালীকে বল্, ঘাস জড়ো করে রাখবে। অবিনাশবাবু বেলা দশটা-এগারোটার সময় ছাগল নিয়ে আসবে। যা...

ভৃত্য চলিয়া গেল। দোলগোবিন্দ আকাশের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, আমায় আইন দেখায়—হুঁ ! পাগল !...বলিয়া তিনি খপরের কাগজ খুলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নায়ক-নায়িকা

রাগে গস্‌গস্ করিতে করিতে ত্রৈলোক্যনাথ গৃহে ফিরিলেন ; ফিরিয়া গঙ্গার ধারের বারান্দায় আসিয়া ডাকিলেন,—পঞ্চা...

ভৃত্য পঞ্চা আসিলে তিনি কহিলেন,—চটী জুতো...

ত্রৈলোক্যনাথ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মনিবকে এই সকালেই এতখানি উষ্ণ দেখিয়া পঞ্চা ভয়ে সরিয়া পড়িল। ত্রৈলোক্যনাথ মনে মনে কহিলেন, উনি কত বড় উকিল, দেখে নেবো...

এক কিশোরী আসিয়া ডাকিল,—বাবা...

কিশোরীর হাতে চায়ের পেয়ালা। ত্রৈলোক্যনাথ কিশোরীর পানে চাহিলেন, কহিলেন, কি ? চা... ? খাবো না...

কিশোরীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকালে উঠিয়া এক পেয়ালা ও বেড়াইয়া ফিরিয়া মাত্র আর এক পেয়ালা...এটা যে দৈনিক বরাদ্দ ! না পাইলে...

কিশোরী কহিল—চা খাবে না ! কেন, বাবা ?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—ইচ্ছা নেই...

মেজাজ যে ভালো নয়, এটুকু কিশোরী চেহারা দেখিয়াই বুঝিয়াছে। এ মেজাজ যে সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিয়া আসিতেছে ! কিন্তু পেন্সন লইবার পর এমন মেজাজ তো সহসা দেখা যায় না। কি হইল... ?

ত্রৈলোক্যনাথ মেয়েকে সব খুলিয়া বলিলেন ; আরো বলিলেন, পাশেই ছাগল থাকিলে দুর্গন্ধে এ গৃহে বাস করা যাইবে না...জীবনের বাকী দিনগুলা যদি আরামে না কাটানো গেল তো বাঁচিয়া ফল !

কিশোরীর নাম তারাসুন্দরী। তারা কহিল,—কিন্তু বাবা, এ এক-গাদা ছাগল তো নয়, মোটে একটি...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—হোক একটি, তবু ছাগল তো ! আমার এত সাধের ফুলগাছ...কথায় বলে, ছাগলে কি না খায় ! ও কি তার একটিও রাখবে ? জানিস্ তো আমার ফুলগাছের কত সখ !

তারা তা জানে। নার্শারির ক্যাটালগে একটা টেবিল একেবারে বোঝাই। তা ছাড়া পেন্সন লইয়া অবধি হাতে কাজ না থাকায় নিজের হাতে মাটী ঘাঁটিয়া গাছ পোঁতা, জঙ্গল সাফ করা...কতদিন সে অভিমান করিয়া বলিয়াছে,—আমার চেয়ে বাবা ঐ গাছগুলোকে তুমি বেশী ভালোবাসো। আজো তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতেছে। তা নহিলে...সে কহিল,—কার খুশী কে ছাগল রাখচে, তার উপর রাগ করে তুমি চা খাবে না ? আমি নিজে তৈরী করেচি যে চা...

মেয়ের আর্দ্র স্বরে বাপের মন নরম হইল। ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—দে মা চা...দুঃখ করিস্ নে।

ত্রৈলোক্যনাথ চা পান করিলেন। তারা কহিল,—পুকুরধারে তোমার সেই নিউ-গিনির পেঁপে গাছে ফুল ধরেচে, দেখেচো বাবা ?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—কাল বিকেলে দেখেচি...ত্রৈলোক্যনাথ হাসিলেন ; খুশীর হাসি ! হাসিয়া কহিলেন,—হবে না ? সেই ফজনু মাল্লাকে বলে নিউ গিনির মাটীও দেড় সের আনিয়ে ওখানে দিছি, তার সঙ্গে ক্যালসিয়াম্ সালফেট্ পাঁচ পাউন্ড...পেঁপে যা হবে, দেখিস্। ...এবারে আর একটি জিনিষ আসচে...

তারা কহিল,—কি বাবা ?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—খাস বেলুচিস্তানের নাশপাতি। আমার এক বন্ধু কোয়েট্টায় গেছেন, তাঁকে অনেক করে বলে দিছি...

তারা কহিল,—কিন্তু নাশপাতির গাছ কি এ মাটীতে হবে, বাবা ?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—আড়াই সের বেলুচি মাটীও সেই সঙ্গে পাঠাতে বলেচি। কেন হবে না ? নিউ গিনির পেঁপে ফল্‌তে পারে, আর বেলুচিস্তানের নাশপাতি ফল্‌বে না ? ভারতবর্ষের মাটীতে সোনা ফলে মা, আবার ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা মাটী হলো বাংলা দেশের মাটী ! ও নাশপাতি এখানে না ফলিয়ে আমি ছাড়বো না !...

অত-বড় জবরদস্ত পুলিস-অফিসার...মেয়ের কাছে ঠিক যেন সরল শিশু ! অপত্যস্নেহ

এমনি জিনিষ !

তারা কহিল,—আমি আসি। আজ তোমার ঐ বীরভূমের গাছের আমলকির আচার তৈরী কর্‌চি...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—যা ! তবে যাবার আগে আমায় একবার বড় পেনাল কোড বইখানা দিয়ে যা মা...

তারা কহিল,—আইনের বই কি হবে বাবা ?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—একটু দেখে রাখি। চর্চ্চার অভাবে ভুলে যাই পাছে !

তারা কহিল,—ও ছাই-পাঁশ ভুলেই যাও বাবা। আইনের বই, না, জঞ্জাল ! ওতে মানুষের কি ফল হয় ! জীবন ভারী হয়ে ওঠে। ছেড়ে দিয়ে বেঁচেছো। আবার কেন ? তার চেয়ে দ্যাখো দিকিন্ কেমন হাওয়া বইছে ! সামনে গঙ্গা,—বসে বসে গঙ্গা দ্যাখো।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—না রে পাগলী, দিয়ে যা,—আইনের রাজ্যে বাস করে আইন ছেড়ে কি থাকা যায় !

মস্ত ভারী বই বহিয়া আনিয়া পিতার হাতে দিয়া তারা চলিয়া গেল।

ছাদের ঘরের সামনে বড় বড় থালায় একরাশ আমলকি। সেগুলায় তারা কি মশলা মাখাইতেছিল, এমন সময় কে আসিয়া তার চোখ টিপিয়া ধরিল। তারা বলিল,—পোড়ারমুখী বীরী ! ছাড় বলচি, আমার আচার নষ্ট হয়ে যাবে।

যে চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিল, সে হাত সরাইলে তারা চাহিয়া দেখে, এ বীরী নয়, শ্যামলাল।

শ্যামলাল তরুণ যুবা—দোলগোবিন্দের একমাত্র পুত্র। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে একনমিক্সে এম-এ পড়িতেছে,—বয়স বাইশ বৎসর। দেখিতে বেশ সুশ্রী।

তারা কহিল,—আচারটা কর্‌তে দাও, ভাই—সত্যি ! নাহলে খারাপ হয়ে যাবে।

শ্যামলাল কহিল,—একটা খপর দিতে এলুম।

তারা কহিল,—কি ?

শ্যামলাল কহিল—কর্ত্তাদের মধ্যে ভারী ঝগড়া হয়ে গেছে।

তারা কহিল,—হ্যাঁ, শুনেচি।...ছাগল নিয়ে।

শ্যামললাল কহিল,—তুমি কার কাছে শুনলে ?

তারা কহিল,—বাবার মুখে, এইমাত্র।

শ্যামলাল কহিল,—কি ছেলেমান্‌সী, বল দিকিন্ ! বুড়ো বয়সে একটা তুচ্ছ ছাগল নিয়ে,—সত্যি বলচি, বাবারো যেমন ! কে কবিরাজ ওঁকে বলেচে, ছাগল দুধ, আর এক অদ্ভুত ওষুধ—

তারা কহিল,—কিন্তু তাঁর অসুখ যদি সারে ?

শ্যামলাল কহিল,—ওষুধে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারে কখনো ? হুঁ ! এত তো ওষুধ খেলেন ! আমি বরাবর বল্‌চি যে, বাবা, কষে বেড়ান দিকি গঙ্গার ধারে। কত বলি যে, দু' বেলা হাওয়া খেয়ে বেড়ান ঐ ফেরি ষ্টীমারে...দু' ঘন্টা করে। ব্যস ! আর রীতিমত খাওয়া। তা তো বাবা শুনবেন না ! কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ খাবেন শুধু ! ওষুধ খেতে চান্, খান—তার ওপর বেড়াতে কি দোষ !...এখন আবার ছাগল-দুধের বরাদ্দ হলো। খাওয়া কমালে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারে কখনো ! বিশেষ এই বয়সে !...

তারা কহিল,—এই ছাগল-নিয়েই ত যত গোল ! বাবা বলেছিল, তোমাদের বাগানের

ওধারে ছাগল রাখতে, কাকাবাবু বলেচেন—না, এই দিকে রাখবেন,—এইতে বাবা আগুন হয়ে উঠেচে। বাবার ফুলগাছ খেয়ে দেবে ছাগলে, দুর্গন্ধে আমাদের দক্ষিণের হাওয়া ভরে উঠবে ! বাবারও আশ্চর্য্য ভয় ! ছাগলে গাছ খায় কি না, দ্যাখো আগে...তা না ! আর, একটা ছাগল রাখলে হাওয়া একেবারে দুর্গন্ধে মাটী হবে কি করে, তাও তো বুঝতে পারি না !

শ্যামলাল কহিল,—আমার বাবাও তেমনি ! ওঁকে যদি জ্যাঠামশায় অনুরোধ করে বলতেন যে, ওহে, এদিকটায় না রেখে ওদিকটায় ছাগল রেখো, তাহলে গোল হতো না ! জ্যাঠামশায় অনুরোধ করে বল্‌লে বাবাও শুনতেন্। তা না, জ্যাঠামশায় একেবারে আইনের কথা তুললেন। আর বাবাকে জানো না তো ! আইন ওঁর গীতা, আইন ওঁর ধর্ম্ম ! আইন দেখালে উনি জ্বলে ওঠেন—ব্যস্, দু'জনে বেধে গেল। আমি পাশের ঘরে বসে কলেজের নোট লিখছিলুম—সব কথাই শুনেচি। কি ছেলেমান্‌সীই যে করলেন দু' জনে,—আর কিছু না হোক, মাঝে থেকে আমরা দুজনে মলুম।

তারা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শ্যামলালের পানে চাহিল। শ্যামলাল কহিল,—নয় ? এই আষাঢ় মাসে আমাদের দুটী হাত এক হবার কথা হচ্ছিল...

লজ্জায় তারা মাথা নত করিল। শ্যামলাল কহিল,—বাবা ছাগল ছাড়চেন না, আর ঐ উত্তর দিকেই তাকে রাখবেন।

তারা কহিল,—আর বাবারো ধনুর্ভঙ্গ পণ, ঐ ছাগলকে—

শ্যামলাল কহিল,—দেখি, ছাগলকে বজায় রেখে ওঁদের মিল করানো যায় কি না ! ওঁদের জন্য তত দরকার না থাকুক, আমাদের জন্য তো বটে !

বাইরে জুতার শব্দ শুনা গেল। তারা কহিল,—বাবা আসচে।

শ্যামলাল ছাদে আসিয়া আলিশার উপর উঠিল। আলিশার পাশে একটা জাম গাছ। শ্যামলাল সেই গাছের ডাল ধরিয়া বাগানে নামিয়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুপুরবেলায় মুহুরি অবিনাশ ছাগল লইয়া আসিল। প্রকাণ্ড ছাগল দেখিয়া দোলগোবিন্দ খুশী হইলেন, যেমন দেহ, তেমনি প্রকাণ্ড শিং। তিনি কহিলেন,—এখন ছায়ায় ছায়ায় কোনো গাছে বেঁধে রাখো। ওর ঘর তৈরি হচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই হয়ে যাবে'খন। —ছোলা আনানো আছে, ঘাস আছে। ...ওরে বটা—

বটা আসিল। দোলগোবিন্দ কহিলেন, তোর ওপর ভার, এর খাওয়া-দাওয়ার যেন কোন গোল না হয়, দেখবি। যে কটা দিন বাঁচবো, এখন এরই ভরসায়, এরই উপর নির্ভর করে—বুঝলি তো !

শ্যামলালও যেখানে উপস্থিত ছিল। পাশে ত্রৈলোক্যনাথের গৃহের দিকে সহসা তার নজর পড়িল। সে দেখিল, ত্রৈলোক্যনাথ চিলকোঠার ছোট জানলা খুলিয়া চোরের মত সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ছাগল দেখিতেছেন, নিশ্চয় ! তারা ?...না, সে ওখানে নেই !

সন্ধ্যার সময় চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া ত্রৈলোক্যনাথ মেয়েকে বলিলেন,—বাড়ী ছাড়তে হলো এবার।

তারা কহিল,—কেন বাবা ?

—ওঁদের ছাগল এসেচে। ত্রৈলোক্যনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

হাসিয়া তারা কহিল,—আসুক না, বাবা। আমাদের কি ! এই যে ছাগল এসেচে, তা

আমরা তো জানতেও পাচ্ছি না।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—জানবে, দুদিন-বাদে জানবে। সবুর কর।...এর চেয়ে চাটুয্যে যদি ওর কবিরাজী ওষুধের জন্য মধু চাই বলে একরাশ মৌচাক লাগাতো গাছে তো কোন ক্ষতি ছিল না!

তারা কহিল,—বল কি, বাবা! মৌমাছির কামড়ে যে অস্থির হতে হতো, তা হলে! সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত!

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—মৌমাছি...মৌমাছি বড় শান্ত জীব রে,...চাক ছেড়ে পরের বাগানে যায় না।

তারা কহিল—না, যায় না! বাবার যেমন কথা!

ওদিকে শ্যামলালও তার পিতাকে বুঝাইতেছিল,—বাবা, গরুর গোয়াল আর ছাগলের ঘর ঐ এক ধারে হলেই ভালো হতো...গোয়ালা দুইতো...তা ছাড়া বেণী গরুকে জাব দেয়, সে ছাগলকেও খাওয়াবে...সেইটেই সুবিধে হতো না?

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তা হতো...

—তবে?

দোলগোবিন্দ কহিলেন—কিন্তু না, অসুবিধা হলেও ছাগল এইদিকে থাকবে! মুখুয্যে আমায় শাসায়, আইন দেখায়, হুঁ। যা হোক, আজ বেলা তিনটেয় এক পেয়ালা দুধ খেয়েচি—ফল পাচ্ছি তার। পেটটা...না, কৈ, ফাঁপেনি তো! ওষুধটা ভালো রে। কবিরাজটি বিচক্ষণ....পথ্যও বেশ!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছাগ বিভ্রাট

ছাগল রহিয়া গেল। যে ঘর সে পাইল তাহাতে তার অতৃপ্তি নাই। তবে মাঝে মাঝে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবার আশায় লুব্ধ নেত্রে সে চারিদিকে তাকায়। ঐ সবুজ শ্যামল পত্রপল্লব, তৃণের গুচ্ছ...তা ছাড়া মুক্ত আকাশ! বন্ধ কে চায়? মানুষও মুক্তিপিয়াসী! এ তো ছাগল—অবোলা জীব! তায় মুক্তির মাঝেই এত দিন লালিত হইয়াছে! তা ছাড়া দুর্লভকে পাইবার জন্য মানুষেরো যে আকাঙ্ক্ষার সীমা থাকে না! তবে?...

পূর্ণ আহার সত্ত্বেও ছাগলের দেহ তাই দিন-দিন শীর্ণ হইতে লাগিল; দুধ কমিল। যারা ছাগল বেচে, তাদের হাতের কারসাজি অল্প নয়। দোলগোবিন্দ তা বুঝিলেন না। পরের মামলা-মর্কদ্দমাই করিয়াছেন চিরদিন, ছাগল কখনো পূর্ব্বে কেনেন নাই! এই প্রথম! কাজেই বটাকে বকিলেন, কহিলেন,—ওরে, দিবারাত্তির ঘরেই ওকে আটকে রেখেছিস্...বাত ধরবে যে।

বটা কহিল—দাদাবাবু বলেচেন, ছাড়া পেলে যদি কারো গাছপালা খেয়ে দেয় তো থানা-পুলিশ হতে পারে...

দোলগোবিন্দ কহিলেন—থানা-পুলিশের খপর আমার চেয়ে বেশী সে জানে, না? দাদাবাবু বলেচে! দাদাবাবু তোর ভারী আইনজ্ঞ!...খবর্দ্দার! তবে একেবারে ছেড়ে রাখিস নে—আমার ঐ গোপালেধোপা আমগাছগুলো আছে—তা ছাড়া বেগুণ-ক্ষেত...আর ঐ

শাকগুলো—ব্রাহ্মী, বিশল্যকরণী—সেগুলো হুঁশিয়ার ! জামগাছে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবি ।

তাহাই হইল । ছাগ ভাবিল, 'মাথার উপর মুক্ত আকাশ তো মিলিল...কিন্তু তবু এই রজ্জুপাশ...এ হইতে মুক্তি...

দীর্ঘ দড়ি । ছাগল যত চলে, ততই গাছটাকে কেন্দ্র করিয়া জ্যামিতির গোলক রচনা করে মাত্র...বেচারী ছাগ, ভূগোল পড়ে নাই । পড়িলে বুঝিত, এমনি চক্রাকারে ঘোরা শেষ করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পৃথিবী গোল ! ঘোরা তুচ্ছ বস্তু নয় ! ঘুরিয়া ঘুরিয়াই নব্য উকিল 'টাউট' সংগ্রহ করে, উমেদার চাকুরীর জোগাড় করিয়া লয় ! মূর্খ ছাগ ঘোরার মূল্য কি বুঝিবে ! তা ছাড়া ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে নিত্য সেই একই দৃশ্য দেখা...নেহাৎ একঘেয়ে, মামুলি ঠেকিল ! কাজেই দু-দিন পরে তার মন বিষণ্ন হইল ; এবং চতুর্থ দিনে চুপ করিয়া কি যেন সে ভাবিতে লাগিল ।

কথায় বলে, চিন্তাই উপায়-নির্দ্ধারণের হেতু । বুদ্ধদেব চিন্তা করিয়াছিলেন, আর সে চিন্তার ফলে লাভ করেন, প্রার্থিত নির্ব্বাণ । কালিদাস চিন্তা করিয়াছিলেন, তার ফলে লাভ করিলেন, কাব্য ও নাটকের বিচিত্র পরিকল্পনা—আর তার ব্যঞ্জনা । এমনি ভাবেই দুনিয়ার সমস্ত বড় ব্যাপারের মূলে দেখি এই চিন্তা...ফরাসী জাতি বন্ধন ছেদন করে, এই চিন্তারই ফলে । ছাগী এ সব খপর রাখিত না, তবু সেও চিন্তা করিতে লাগিল এবং চিন্তাদেবী আশু তাহাকে কৃপা করিলেন । সে কৃপার ফলে সে একদিন দড়ি ছিঁড়িয়া মুক্তির আনন্দ লাভ করিল ; এবং এই আনন্দের প্রথম বেগ গিয়া লাগিল সামনের ঐ কঞ্চির বেড়ায়...যে বেড়া দোলগোবিন্দ ও ত্রৈলোক্যনাথের বাগান দু'টীর মাঝখানে স্বতন্ত্র সীমারেখা রচিয়া দিয়াছিল । আনন্দের প্রথম বেগ প্রায়ই প্রবল হয় ! ছাগীর আনন্দের বেগও প্রবল ছিল, তার ফলে বেড়ার বাঁধন খসিয়া গেল এবং ছাগী সম্মুখে দেখিল, সবুজ তৃণের রাশি, অথচ বাধা নাই ! অতএব সেই তৃণগুচ্ছ, নবীন পুষ্পপল্লব সে পরমানন্দে বিশ্ব ভুলিয়া, স্বার্থপরায়ণ বিশ্বের নির্ম্মমতার কথা ভুলিয়া অবাধে চর্ব্বণ করিতে লাগিল ।...একটু অসুবিধা ঘটাইতেছিল চারাগাছের সঙ্গে কঞ্চিতে আটা ছোট ছোট টীনের কয়টা টুকরা । এই টীন চারাগাছগুলির কণ্ঠে দুলিতেছিল ; পরিচয়লিপি—না, রক্ষা-কবচ !—পুলিশ অফিসার মহাশয় স্বহস্তে সে কবচগুলি আঁটিয়া দিয়াছিলেন । আর এখন...হায়, দৈব !

কাল অপরাহ্ন । ত্রৈলোক্যনাথ নিত্যকার মত বাগানে বেড়াইয়া কোথায় কি কাঠি-কুটি পড়িয়া জঞ্জালের সৃষ্টি করিল, দেখিয়া তাহাই বাছিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন । সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়িল সীজন্ ফুলের চিহ্নিত অংশের দিকে !

ছাগল ?...সর্ব্বনাশ ! তিনি পাগলের মত হাঁকিলেন,—পঞ্চা...হাঁকিয়াই ছুটিয়া আসিলেন,—সরল ছাগ ! সে জানে, এ তৃণ-পল্লবে তার জন্মগত অধিকার—কিন্তু দুর্বৃত্ত মানুষ যে সকলকে সর্ব্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায়, এ বার্ত্তা সে জানিত না ! তাই সে ত্রৈলোক্যনাথের মোটা লাঠীর আঘাত পাইয়া বিশ্ব-ফাটা প্রচণ্ড আর্ত্তরব তুলিয়া লাফাইয়া উঠিল । লাফাইবামাত্র পাশের সদ্যোজাগ্রত চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলার উপর তার পা পড়িল...সে তো চারা নয় ! ত্রৈলোক্যনাথের পাঁজরার হাড় ! কাজেই নির্ব্বিচারে তার সর্ব্বাঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের লাঠির পর লাঠির ঘা পড়িল ! ছাগের প্রচণ্ড আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও ছুটিয়া সেখানে আসিল, আর আসিল পঞ্চা...

তারা ব্যাপার বুঝিয়া পিতার হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইল, কহিল,—এ কি করচো

বাবা ! অবোলা পশু...মরে যাবে যে...

ত্রৈলোক্যনাথ গর্জ্জন করিলেন,—যাক্ মরে...

ও দিকে দোলগোবিন্দ আসিয়া হাজির...সঙ্গে শ্যামলাল। দোলগোবিন্দ চকিত নেত্রে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—ব্যাপার কি, মুকুয্যে ?

মুকুয্যে কহিলেন—দেখে যাও...তখন বলেছিলুম, গ্রাহ্য করোনি—তোমার ছাগল এসে সেই আমার সব গাছ নষ্ট করে দিলে...কত টাকার জিনিষ, জানো ? এ সব সীজন ফুল...কাশ্মীরের নিশৎ বাগ থেকে আনানো...কত যত্নে...রাগে দুঃখে ত্রৈলোক্যনাথের দুই চোখে জল আসিল। স্ত্রীর অন্তিম শয্যার পাশে বসিয়া যে-চোখে অশ্রু ঝরে নাই...সেই চোখে !...

দোলগোবিন্দ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন,—মাপ করো মুকুয্যে...তোমার যা ক্ষতি হলো, তার খেসারৎ দেবো...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—না, খেসারৎ চাই না...বলিয়া তিনি পঞ্চার দিকে চাহিলেন, ডাকিলেন,—পঞ্চা...

পঞ্চা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—একটা দড়ি আন্। বাঁধ ছাগল—বেঁধে নিয়ে যা থানায়। এখন তো কাজী হাউসে যাক...তারপর আইন আছে, আদালত আছে...

আইন আর আদালতের নাম শুনিবামাত্র দোলগোবিন্দর অপ্রতিভ ভাব কাটিয়া গেল। তিনি রাগিয়া উঠিলেন...উত্তেজনা ? হাঁ, উত্তেজনাই ! রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ যেমন উত্তেজনায় মাতিয়া ওঠে, তেমনি !...দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আইন-আদালত ! কুছ পরোয়া নেই ! বেশ, চলো আদালতে...আইনটা কি, কখনো শেখনি তো—বে-আইন নিয়েই চিরকাল কাটিয়েচো। আইন কি, তা শিখবে চল।...ছাগলের গায়ে এই চোট্ আর জখম !

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—কথার আওয়াজ নয়। যত টাকা খরচ হয়, এ মকর্দ্দমা করতে...বাড়ী বেচতে হয়, বেচবো, কলকাতা থেকে নর্টন সাহেবকে আনাবো। পঞ্চা, নিয়ে যা থানায়...ট্রেসপাশ...মিশচিফ !...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আনো নর্টন সাহেবকে। কদিন ছাগল দুধ খেয়ে আমার পেটটা ভালো আছে...আমারো লড়ার কায়দাটা দেখো নিয়ো...No negligence—তোমার বেড়া ঠিক রাখোনি কেন ?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—আমার খুশী...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তাহলে ছাগলেরও খুশী...

ত্রৈলোক্যনাথ রাগে কাঁপিতেছিলেন, কহিলেন,—বেশ।

দোলগোবিন্দও কাঁপিতেছিলেন, কহিলেন,—উত্তম !

তারা আসিয়া বাপের দুই হাত চাপিয়া ধরিল, ডাকিল,—বাবা...তার দুই চোখে জল ! স্বর বাষ্পরুদ্ধ...

শ্যামলাল দোলগোবিন্দকে ডাকিল—বাবা...তার চোখে জল নাই ! বিশুষ্ক মূর্ত্তি !

ত্রৈলোক্যনাথ মেয়ের পানে চাহিলেন। বুকের কোথায় যেন ঘা লাগিল, বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ডাকিলেন,—পঞ্চা...

পঞ্চা ছাগলকে বাঁধিতেছিল, ত্রৈলোক্যনাথের পানে ফিরিয়া চাহিল। ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—আচ্ছা, এবারকার মত ছেড়ে দে। বেড়া পার করে ও বাগানে ঠেলে দে। আর হুঁশিয়ার...বেড়া মেরামত করে নে...কিন্তু যদি ফের ছাগল ঢোকে, তাহলে ছাগলের যা করবার, তা তো করবোই...তা ছাড়া তোর জরিমানা হবে, বুঝলি...

দোলগোবিন্দ ডাকিলেন,—মুকুয্যে...ত্রৈলোক্যনাথ ফিরিয়া চাহিলেন ; দোলগোবিন্দ কহিলেন,—মাপ কর ভাই...

ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন,—না। এক পয়সা খেসারৎ নয়...আমি তো পয়সা রোজগারের কল বানাইনি...তবে বলে রাখচি, ছাগল বেঁধে রাখবে। ফের যদি ছাগল এ বাগানে আসে তো গুলি করে মারবো। শীকারে আমার হাত পাকা—

দোলগোবিন্দ বলিলেন—বটে ! ছাগল আমি বাঁধবো না...দেখি, তুমি কি কর !

ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন,—বেশ ! বলিয়াই মেয়ের হাত ধরিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার পর ঘাটের ধারে নায়ক বসিয়াছিল,—শ্যামলাল। বিমর্ষ মুখ, মনে চিন্তার বোঝা। সমস্ত ব্যাপারের নিদারুণ লজ্জা তাকে একেবারে কাতর কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

তারা আসিয়া তার পাশে বসিল, কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিল,—কি হবে ?

শ্যামলাল একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া তারার পানে চাহিল ; কহিল,—তাই ভাবচি, তারা...

তারা কহিল,—বাবা বন্দুকের বাক্স খুলে বন্দুক বার করেচে, নিজের হাতে সাফ করচে। তারা কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্যামলাল কহিল—আর আমি দেখে এসেচি, বাবা এমনি মোটা মোটা পাঁচখানা আইনের বই বার করে মন দিয়ে তাই পড়চেন।

তারা কহিল—যদি বাবা ছাগলকে গুলি করে ?

তারার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া শ্যামলাল কহিল—ছাগল যেন আমাদের মৃত্যুবাণ হয়ে উঠেচে ! ছাগলকে সরাতে পারি, তারা। কিন্তু বাবার শরীর...আজকাল তিনি একটু ভালোও আছেন...

তারা কহিল,—তবে ?

শ্যামলাল কহিল,—তবে সে ও কি ছাগল দুধের গুণে ? কখনো না। মনের বিশ্বাস—

তারা কহিল,—বিশ্বাসেরও তো একটা দাম আছে।

শ্যামলাল কহিল,—তাই ভাবছিলুম...

সাগ্রহে তারা কহিল,—কি ?

শ্যামলাল কহিল,—ঐ কবিরাজকে গোরুর দুধের ব্যবস্থা দিতে বলবো...তাকে টাকা দেবো...

তারা কহিল,—তাতে যদি কাকাবাবুর শরীর আবার খারাপ হয় ?

শ্যামলাল কহিল,—আমি ডাক্তারকে বলেচি—ডাক্তার বলেচে, ও কিছু নয়। তোমার বাবাকে নিয়ে দুবেলা ষ্টিমারে বেড়াও দিকিন,—ছাগল-দুধের দরকারও হবে না। তা ছাড়া যদি কেউ বাবাকে এখন বলে, মোষ পুষুন, আর সেই মোষের পাশে দু' ঘণ্টা করে রোজ বসে থাকুন, শরীর ভালো হবে,—তাহলে ওঁর মনের যা বিশ্বাস, উনি তাতেও রাজী হবেন, আর ভালোই থাকবেন।

তারা কহিল,—কিন্তু...এ কি শুধুই বিশ্বাস ?

শ্যামলাল কহিল,—অনেকটা তাই। চিরদিন পরিশ্রম করেচেন, এখন চুপচাপ বসে থাকা...কাজেই অসুখ ! তাছাড়া একটা ফন্দী খেলেচি, তারা। আজ দুপুর বেলায় আমি এক মস্ত কাজ করেচি...একটা প্রবন্ধ লিখেচি—বাঙলায়। প্রবন্ধটার নাম দিছি, 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়া'। বাবার কাছে ডাক্তারী বই ঢের আছে, ডিস্‌পেপসিয়া সম্বন্ধে তাতে বেড়ানোর কথা সবাই বলেচে। কলকাতার কজন ডাক্তারের সঙ্গে কথাও হয়েছিল আমার—তাঁরা বাবাকেও দেখেচেন। তাঁরা বলেন, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া—রোগের শতকরা নব্বইটার মূলে মনের অস্বাচ্ছন্দ্য। ওইটেই রোগের মূল...অস্বাচ্ছন্দ্য আর মনঃকষ্ট। এবং তার ওষুধ হলো, খুব ভোরে আর সন্ধ্যায় বেড়ানো, আর সময়ে আহার। আমার প্রবন্ধে আমি সেই কথাই লিখেচি। তা ছাড়া লিখেচি, অনেকের ধারণা, এ রোগে ছাগল-দুধ ভালো পথ্য—সেটা ভুল। আমি লিখেচি, প্রথমটা ছাগল-দুধ ধরলে ভালো বোধ হওয়া বিচিত্র নয়—কিন্তু ছাগল-দুধ ক্রমাগত খেলে আমাদের পরিপাকের যন্ত্র দুর্ব্বল হয়, আর রক্তও ক্রমে তরল হয়ে আসে। ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে মাঝে মাঝে ছাগল-দুধ ভালো—কিন্তু বয়স্ক পুরুষের পক্ষে ছাগল-দুধ বিষ, মৃত্যুবাণ ! কাবণ, ছাগল-দুধের জান অল্প, খেলে রক্তের জোর কমে যায়। আর জোর কমলে বাত হয়, থাইসিস্ হয়, নিউমোনিয়া হয়, ডেঙ্গু হয়—শেষে মূত্রকৃচ্ছ্র, পরে রক্তের দৌর্ব্বল্য হেতু পক্ষাঘাত হবারও নিশ্চিত সম্ভাবনা। অর্থাৎ ছাগল-দুধে ভাইটামিন্ এল্ নাই। আর এই ভাইটামিন এল্‌ই হলো, প্রাণের আসল শক্তি ! তা ছাড়া ছাগলের রোঁয়া যত রোগের ব্যাসিলির পক্ষে যেন একটি ফোর্ট...এখানে তাদের জীবনী-শক্তি যেমন বাড়তে পায়, এমন আর কোথাও নয় ! এই প্রবন্ধ আমি ভারতবর্ষে ছাপতে পাঠাবো। লেখকের নাম দেবো, শ্রীতারকানাথ সেন কবিরত্ন কবিভূষণ।

তারা একান্ত মনোযোগ শ্যামলালের কথা শুনিতেছিল। সে কহিল,—কিন্তু তারা ছাপবে কেন ?

শ্যামলাল কহিল,—কেন ছাপবে না ? তারা তো আর জানে না, তারকানাথ কে ?

—তারকানাথই বা কি রকম নাম ? তারকনাথই তো নাম হয়, জানি।

শ্যামলাল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তুমি তো তারা...তারার অন্য নাম কি ? নক্ষত্র, তারকা...তাই থেকে,...অর্থাৎ তোমার...

—যাও,—বলিয়া তারা শ্যামলালকে একটা ঠেলা দিল।

শ্যামলাল কহিল—তা ছাড়া দ্বারকানাথ কবিরাজ ছিলেন না ? মস্ত কবিরাজ ! লোকে বলে, দ্বারিক কবিরাজ...সেই দ্বারকার সঙ্গে মিল খায় তারকা...তাই দু মানেই হয় বলে নাম দিচ্ছি...

তারা কহিল—ওঁর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবে না তো ?...দেখো—

শ্যামলাল কহিল,—না, না। এতে আমি লিখেচি, গঙ্গার হাওয়া সব চেয়ে ভালো ওষুধ—আর সে ওষুধ সব ওষুধের সেরা। ষ্টীমারে দু' বেলা ঘণ্টা কয়েক বেড়াতে যদি কেউ পারে, তাহলে তার কখনো ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হতে পারে না।—বুঝলে...বাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকলে খিদে বা হজম হবে কি করে, বল তো ?

তারা কহিল,—দেখো, শেষে যেন...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চোর-পুলিশ

একমাস কোন উপদ্রব নাই। পঞ্চা আবার শক্ত করিয়া বেড়া বাঁধিয়াছে—ছাগলও ওদিকে নির্ব্বিবাদে ছাড়া থাকে। তবে দোলগোবিন্দর বাগানেও গোপালে ধোপা আমগাছ ; আর মানকচু, ব্রাহ্মী, বিশল্যকরণী প্রভৃতির চারা...সেগুলারও চতুর্দ্দিকে উঁচু করিয়া শক্ত বেড়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সে দিন সকালে উঠিয়া শ্যামলাল জানলায় দাঁড়াইয়াছিল—হঠাৎ দেখে, জামগাছের ধারে বেড়ার ঠিক পরেই ত্রৈলোক্যনাথের বাগানের যে অংশে সীজন্ ফুলের চারা জন্মিয়াছে, সেই জায়গাটায় ত্রৈলোক্যনাথ দাঁড়াইয়া তদ্বির করিয়া মজুরদের দিয়া মস্ত খানা খুঁড়াইতেছেন। এমন করিয়া খানা খোঁড়াইবার প্রয়োজন ? আবার ত্রৈলোক্যনাথ মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীর দিকেও চাহিয়া দেখিতেছেন...কেন ?...

সহসা বিদ্যুতের মত একটা কথা মনে হইল। তাই কি ?...অন্তরাল হইতে শ্যামলাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

খানা খোঁড়া হইল। ত্রৈলোক্যনাথ তার উপর কয়েকটা কঞ্চি বিছাইলেন, তারপর লোকগুলোকে কি আদেশ করিলেন, তারা অমনি বড় বড় কয়খানা কলাপাতা আনিয়া কঞ্চির উপর বিছাইল, এবং বিছাইয়া ঘাস-পাতা ও তার উপর শুকনো পাতা লতার জঞ্জাল আনিয়া ফেলিল। সেগুলার উপর আবার সবুজ ঘাস পাতা। সে কাজ শেষ করিয়া বেড়ার বাঁধন কাটিয়া তিনি দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তারপর লোকজন লইয়া চলিয়া গেলেন।

মস্ত অভিসন্ধি ! এবং এ দুরভিসন্ধিই। ঠিক ! শ্যামলাল বুঝিল,...এই খানার নাম ফাঁদপাতা। ত্রৈলোক্যনাথের মুখে সে কতদিন শুনিয়াছে, শীকারীরা বনের দুর্দ্দান্ত পশু ধরিবার জন্য এমনিভাবেই ফাঁদ পাতে—পশু আসিয়া এই ফাঁদে পা দিলেই গড়াইয়া একেবারে অতল গহ্বরে তলাইয়া যায় ; আর অমনি শীকারীর দলও...ঠিক, এ তাই !

তার হাসি পাইল। লজ্জাও হইল। একটা তুচ্ছ ছাগলকে জব্দ করিবার জন্য এ কি ছেলেমান্‌সী ? স্কুলের কোনো বদ ছেলে এ কাজ করিলে মাষ্টার মহাশয় তার কাণ মলিয়া দিতেন। আর একজন প্রবীণ ভদ্র লোক, শিক্ষিত...ছি।

সে সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিল। এ ব্যাপার তারা দেখে নাই তো ? না। ভাগ্যে দেখে নাই। দেখিলে সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইত।

একটা ফন্দী আঁচিয়া শ্যামলাল মুখহাত ধুইয়া ত্রৈলোক্যনাথের গৃহে গেল, গিয়া ডাকিল,—জ্যাঠামশায়...

—কে ? শ্যামলাল। এসো বাবা !... তা, চা খাবে তো ?

—খাবো, জ্যাঠামশায়...

চা আসিল। তারা আনিয়া দিল। পেয়ালা হাতে করিয়া শ্যামলাল কহিল—একটা কথা আছে, জ্যাঠামশায়...

—কি ?

—আপনি আজকের কাগজ দেখেছেন ? আলিপুরে ফ্লাওয়ার শো হচ্ছে...আপনার

ঘরের ওধারে যে আসল চীনে জবা ফুটিয়েচেন...ও তো প্রকাণ্ড একখানি বগী থালার মত...ওই ফুল শো' তে দিন না...

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—না বাবা, ও-সবে আমি নেই। প্রাইজ পাবো ? মেডেল ? না। এ...বাগানে ফুল ফোটে, বাগানের শোভা হয়, দেখে নিজে খুশী হই। গাছ থেকে সে ফুল পেড়ে গাছের শোভা আমি নষ্ট কর্‌তে চাই না। কেউ দেখতে চায়, এখানে এসে গাছের ফুল গাছে দেখে যাক্...

শ্যামলাল ভাবিল, এত মমতা...একটা গাছের ফুলের উপর এত দরদ...পাছে গাছের শোভা নষ্ট হয় বলিয়া গাছের ফুল ছেঁড়েন না ! অথচ একটা ছাগল ! অবোলা প্রাণী...মানুষ এমনি অদ্ভুত জীব বটে ! আর এই মানুষের মন...সে আরো কত বেশী অদ্ভুত !...

চা পান করিয়া শ্যামলাল উঠিল। তারা কহিল,—কোথায় যাচ্ছ ?

শ্যামলাল কহিল,—একটু বেড়িয়ে আসি। একবার কলকাতায় যাবো।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—তোমাদের ছাগলের খপর কি, শ্যামলাল ?

—ভালোই। বলিয়া শ্যামলাল চলিয়া আসিল।

সন্ধ্যা হয়-হয়। ত্রৈলোক্যনাথের অস্বস্তি ধরিতেছিল...ছাগলটা ভাঙ্গা বেড়া দেখিয়াও তাঁর বাগানে আসিল না ? এ কারসাজি ! চাটুয্যে ফন্দী করিয়া তাকে এ ধারে আজ ঘেঁসিতে দেয় নাই ! এ ফাঁদ তবে মিছা পাতা হইল ?...না...ঐ যে...

ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ ! ত্রৈলোক্যনাথ ধীরে ধীরে উঠিলেন, চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—ওরে পঞ্চা...

—বাবু...

—খুব চুপি চুপি আয়...তোর দিদিমণি না জানতে পারে ! আয়, আয়...

শীকার পড়েচে...

পঞ্চাকে লইয়া তিনি বাগানে আসিলেন। ঠিক...এই যে ! এবার কোথায় যাবে, চাঁদ...

পেন্সন লইলে কি হয়, ত্রৈলোক্যনাথের গায়ে এখনো যা জোর আছে...পঞ্চা ও ত্রৈলোক্যনাথ দু' জনে ধরিয়া ছাগলকে তুলিলেন,—তার মুখে একখানা কাপড় বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া তাকে আনিয়া একটা নৌকায় ফেলিলেন। ঘাটের একটু দূরে ছোট নৌকা বাঁধা ছিল। জেলেদের ইলিশমাছ ধরিবার নৌকা। কাদায় কাপড় ভরিয়া গেল। তা যাক...তার পর পঞ্চা সেটাকে ধরিয়া রহিল...আর মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। ...চুপি চুপি...খুব হুঁশিয়ার। ...

আধ ঘণ্টা ! ছাগলকে গঙ্গার ওপারে ছাড়িয়া আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ ওপারের দিকে চাহিলেন, খুশী মনে কহিলেন,—খা, কত গাছ খাবি, ফুল খাবি, কোশে খা...

তারপর ঘাট হইতে উপরে উঠিবামাত্র...এ কে ?...সম্মুখে শ্যামলাল ! তাঁর গা ছমছম করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—কে ? শ্যামলাল...

শ্যামলাল কহিল—এত কাদা মেখে কোত্থেকে আসচেন, জ্যাঠামশায় ? মাছ ধরতে গেছলেন নাকি ?

ত্রৈলোক্যনাথ মুখ না তুলিয়াই কহিলেন,—না, না—এই ওধারে একটু বেড়াতে গেছলুম। অর্থাৎ এই ওপারে...বেলুড় মঠে...তা তুমি যে এ সময়ে ! তারা ঘরে নেই ?

শ্যামলাল কহিল,—আপনার কাছেই দরকারে এসেচি, জ্যাঠামশায়...

আমার কাছে ! তার বুকটা একবার ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—কি

দরকার ?

—আমাদের ছাগলটা—

এই রে ! শ্যামলালের মনে হইল, বুকটাকে ফাটাইয়া তাঁর প্রাণ বুঝি এবার বাহির হইয়া যাইবে ! ছাগল ! চোখের সামনে ছাগলটা ছায়া-মূর্ত্তিতে উদয় হইয়া যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল ! পাগলের মত কিছু না ভাবিয়াই তিনি বলিলেন—কি ছাগল ! কাদের ছাগল !—ছাগল কেন !

শ্যামলাল সব দেখিয়াছে। সে অতি-কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিল—আমাদের ছাগল...মানে, যে-ছাগলটা আপনার ফুলগাছ খেয়েছিল...

কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—হ্যাঁ, তা, সে ছাগল কি করেচে ?

শ্যামলাল কহিল,—সে ছাগলকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা বাড়ী নেই...তিনি এসে মহারাগারাগি করবেন...তা ভয়ে বটা গিয়ে থানায় ডায়েরি করে এসেচে। পুলিশ এখন এসেচে তার তদারক করতে...মালী বলেচে, আপনার ভাঙ্গা বেড়া গোলে ছাগলকে সে এ বাগানে আসতে দেখেচে...তারপর...

আবার তারপর...। হাজত-ঘরের কড়িকাঠগুলা ত্রৈলোক্যনাথের চোখের সামনে পুতুল-নাচের ঝুলন্ত পুতুলগুলার মতই নৃত্য করিতে লাগিল ! তিনি কহিলেন,—সে ছাগল তো আমি দেখিনি, বাবা...

শ্যামলাল কহিল,—পুলিশ দেখে গিয়েছে, বেড়ার ধারে খানার ফাঁদ...ছাগল বেড়া গোলে এসে খানাতেই পড়েচে...সে খানা থেকে ওঠা তার সাধ্যের বাইরে...তাহলে গেল কোথায় ?...তার উপর মালী বলছিল,...

ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়া উঠিলেন,—বলছিল কি ? আমায় চোর ধরতে এসেচো... ? আমি চোর ? তোমার বাবার ছাগল চুরি করেচি ? তাঁর মনে হইল, পুলিশের তদারক যেন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং মালীর এজাহার লইয়া পুলিশ তাঁকেই চোর সাব্যস্ত করিয়া তাঁকে এবার সদরে চালান দিবে ! উপায় ?

শ্যামলাল অত্যন্ত কুণ্ঠিত-ভাব দেখাইয়া কহিল,—মালী বলেচে, গদাইয়ের নৌকোয় গদাইকে ছাগল নিয়ে ওপারে সে যেতে দেখেচে...নৌকোয় আরো দু'জন লোক ছিল—তাদের একজনকে আবার দেখতে নাকি ঠিক...

নাঃ, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই ! আকাশের গায়ে ওগুলা কি ? নক্ষত্র ! না। ত্রৈলোক্যনাথের মনে হইল, ওগুলা নিশ্চয় সরিষার ফুল ! সারা পৃথিবীরই রঙ যেন নিমেষে বদলাইয়া গিয়াছে। হলুদ্-রঙের ছোপ্ চারিধারে ! অপমানে লজ্জায় ত্রৈলোক্যনাথ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন ; ডাকিলেন,—বাবা শ্যামলাল...

শ্যামলাল কহিল—এ কি বিভ্রাট বাধালে বটা পুলিশে খপর দিয়ে, দেখুন তো...জ্যাঠামশায়। পুলিশকে এখন বিদায় করি কি বলে ! বাবা বাড়ী নেই, আমি আইন-টাইন জানি না...তাই আপনার কাছে এসেচি...

শ্যামলালের দুই হাত ধরিয়া ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—আমায় রক্ষা কর, বাবা। সে ছাগল আমিই ওপারে ছেড়ে দিয়ে এসেচি। গদাইয়ের কোনো দোষ নেই। বেচারা ! আমি বুঝি নি, না বুঝে ছেলে মান্‌সী করেচি। তুমি টাকা নাও বাবা, অন্য ছাগল কিনে আনো। আমি আর কিছু বলবো না...অবোলা প্রাণী, কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলুম ! মনে ভারী আপশোষ্ হচ্ছে...ঝোঁকের মাথায় কিছু বুঝলুম না...শেষে কশাইয়ের হাতেই যদি

পড়ে...কি পাপ করলুম। এ যে কি অস্বাচ্ছন্দ্য...

তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শ্যামলাল কহিল—আপনি !...তা...তাইতো, জ্যাঠামশায় !...তা যাক্...আপনিই যখন করেচেন —তা যাক—কোনোমতে চাপা দিতে হবে এখন ! পুলিশকে গিয়ে বলি, যে, ছাগল পাওয়া যাচ্ছে না...তা পর আর একটা ছাগল কিনে আনলেই হবে। আপনি ভাববেন না...আপনি আসতে পারবেন না তাহলে ? আমি পুলিশকে এই বেলা বিদায় করে দি—বাবা বাড়ী ফেরার আগে...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—তাই কর, বাবা ! তবে ঐ মালীটা...তাইতো ! তা তোমার বাবা কোথায় গেছেন ?

শ্যামলাল কহিল—ন' কাকা এসেছিলেন তার মেয়ের বিয়ে দেবেন। এসে পাত্র দেখবার জন্য বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন...কলকাতায় নারকেলডাঙ্গায়...

শ্যামলাল চলিয়া যাইতেছিল, ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—তাহলে কি করবে বল দিকি, বাবা ?

শ্যামলাল কহিল,—পুলিশকে বিদায় করি গিয়ে কোনমতে—

—তাই কর, তাই কর, বাবা... ত্রৈলোক্যনাথের স্বরে কি সে কাকুতি !

শ্যামলাল কহিল,—তবে আমার একটি অনুরোধ আছে, জ্যাঠামশায়—

—কি বাবা !

—বাবার সঙ্গে এই তুচ্ছ ছাগল নিয়ে আর মনান্তর রাখবেন না। এতে আমাদের কি কষ্ট যে হচ্ছে—

—এই ! বোঝো তো সব। আচ্ছা, দ্যাখো দিকিনি তোমার বাবার কি এ ছেলেমান্সী...

শ্যামলাল হাসিল ; মনে মনে কহিল আপনারই কি কম ! প্রকাশ্যে কহিল—বাবার গোঁ ভারী দুর্জ্জয় ! অথচ ভালো কথায় তিনি এমন বশ হন যে, যে যা বলবে, তাতে না বলেন না—তবে কেউ একটু জেদ দেখালে...

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—ঠিক তাই ! দ্যাখো তো—এ দেড় মাস আমি কি অশান্তি ভোগ করচি ! একটা কথা কইতে পাই না কারো সঙ্গে...

শ্যামলাল কহিল,—ছাগলের সখ বাবারো মিটে আসচে...আবার তাঁর সেই পেট ভার, অক্ষিধে...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মায়ার খেলা

দোলগোবিন্দ গৃহে ফিরিলেন, রাত্রি তখন ন'টা বাজে। তাঁর হাতে এ-মাসের একখানি ভারতবর্ষ। শ্যামলালকে দেখিয়া কহিলেন—তোর ভারতবর্ষ আজ এসেচে, নিয়েই বেরিয়েছিলুম...এতটা পথ মোটরে যাওয়া ! তা ছাড়া খুলতেই দেখি, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বলে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েচে, তাই...

অত্যন্ত আগ্রহ-ভরে শ্যামলাল কহিল,—দেখি...

ভারতবর্ষ হাতে করিয়া শ্যামলাল দেখে, তারকানাথ কবিরত্ন কবিভূষণের লেখা সেই

প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে ! সে কহিল—কি লিখচে এতে ?

দোলগোবিন্দ কহিলেন—ঐ পুরানো কথা। তবে একটা নতুন কথাও আছে। এতে বলচে, ছাগলের দুধে নাকি নানা রোগ হতে পারে, বাত, যক্ষ্মা, এমন কি পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত...

এ্যাঁ ! শ্যামলাল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল—তাহলে তো...

তার কথায় বাধা দিয়া দোলগোবিন্দ কহিলেন,—সত্যিই হয় কি না, জানি না। তবে এই যেখানে পাত্র দেখতে গেছলুম, সেখানেও একজন ভদ্রলোক কথায় কথায় বলছিলেন যে, ছাগলের রোঁয়া জিনিষটা নাকি যক্ষ্মা রোগের ব্যাসিলি বহন করে...তা থেকে যক্ষ্মা হওয়া বিচিত্র নয় ! কোন্ বাড়ীতে এমনি একটা রোগ নাকি হয়েও ছিল...

শ্যামলাল কহিল,—তাহলে ছাগল-দুধ বন্ধ করে দি বাবা—

নিরুপায়ভাবে দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তাই ভাবতে ভাবতে আসচি সারা পথ...কিন্তু আমার খিদেটা ওদিকে বেশ হচ্ছিল, মধ্যে কমলেও আবার আজ যা খিদে পেয়েচে...

শ্যামলাল কহিল—আজ হবে না ? ঘুরেচেন !...তার উপর এই যে ভারতবর্ষে লিখচে—গঙ্গার হাওয়ার কথা। একবার পরখ করে দেখুন দিকিন...এতে কিছু আয়োজন করতে হবে না তো।

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—অগত্যা...রোঁয়ার সম্বন্ধে আজ ঐ কথাটা...বিশেষ, ভারতবর্ষের এই প্রবন্ধ, আর নারকেলডাঙ্গার সেই কথা—দু কথা যখন এত মিলচে...

শ্যামলাল কহিল—তখন ছাগল-দুধ একবিন্দু আর আপনাকে খেতে দিচ্ছি না...

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—সেই সঙ্গে আরো ভাবছিলুম, বাল্যবন্ধুর সঙ্গে এই বিচ্ছেদ...আমার তারা-মাকেও কতদিন দেখিনি...তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

শ্যামলাল প্রকৃতিস্থ হইল। এই নিশ্বাসের সঙ্গে কতকালের সঞ্চিত কত বিদ্বেষ আর রাগ, মনের কত জঞ্জাল যে সাফ হইয়া যায়, এ বয়সে নিজেও সে তার বহু পরিচয় পাইয়াছে তো !

সকালে দোলগোবিন্দ গিয়া ডাকিলেন,—মুকুয্যে...

ত্রৈলোক্যনাথ বন্ধুকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকে টানিয়া কহিলেন,—আমায় মাপ কর, চাটুয্যে...পুলিশে ক' বছর চাকরি করে শিষ্টাচার পর্য্যন্ত ভুলে গেছি, আমি।

দোলগোবিন্দর গৃহে আবার কাছে শ্যামলাল তখন ছাগলের কথা আগাগোড়া খুলিয়া বলিতেছিল...সালে গর্ত্ত খোঁড়া হইতে সরু করিয়া সন্ধ্যায় ছাগল চুরি করা অবধি সমস্ত ঘটনা ! ত্রৈলোক্যনাথের সে কি আতঙ্ক ! আর কি গোয়েন্দাগিরিই সে করিয়াছে...

তারা কহিল—কিন্তু ঐ তো ছাগল রয়েচে দেখচি !

শ্যামলাল কহিল,—থাকবেই তো ! কেন থাকবে না ?

তারা কহিল,—তবে যে বললে, বাবা তাকে ওপারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেচে... ?

শ্যামলাল কহিল—সে আর একটা ফোক্‌রে ছাগল। সেটা কিনে এনে নিজেই তাকে তাড়া দিয়ে বেড়া পার করে গর্ত্তয় ফেলে দিয়েছিলুম...ভাবলুম, দেখি, জ্যাঠামশায় কি করেন ! অর্থাৎ চুরি গেছে যেটা, সেটা সেই জাল ছাগল ! আদি ও অকৃত্রিম ছাগল, যার জন্য এত হুলস্থূল,—সে অক্ষত দেহে ঐ রয়েছে !

শুনিয়া তারা সবিস্ময়ে কহিল—বাবা ! এত বুদ্ধিও তোমার মাথায় খেলে ! তা, কাকাবাবু ছাগল-দুধ তো ছাড়চেন, এখন ছাগল...

শ্যামলাল কহিল—বেচারী, অবোলা পশু...কোনো দোষ করেনি ! তাই ভাবছিলুম, ওর গতি কি করবো...

তারা কহিল—বাবা কাল রাত্রে বলছিল,—অন্যায় রাগ আমার—চাটুয্যে তার বাড়ী ছাগল রাখবে, তাতে আমার কেন রাগ...এ যে ভারী ছেলেমান্‌সী... ! বাবা বলছিল, তোমাদের ছাগল যখন হারিয়ে গেছে, তখন বাবার কোন্ বন্ধুকে লিখে কাশ্মীর থেকে একটা ভালো ছাগল আনিয়ে দেবে...তা...

শ্যামলাল কহিল—কি, তা ?

তারা কহিল—এ ছাগল দেখে বাবা যদি বলে, কোথা থেকে এলো ? তাহলে বাবাকে কি বলবে ?

শ্যামলাল কহিল—বলবো, ওপার থেকে খুঁজে এনেচি, আজ ভোরে গিয়ে...তা ছাড়া কাল রাত্রে বাবা বলেচেন, ছাগলটাকে পুষেচি যখন, তখন পথে ছেড়ে দিতেও পারি না ! চাকর-বাকরেরা যদি কেউ চায় তো দিয়ে দে ! তা মালীর খুব লোভ আছে ওর উপর। তায় নিজের হাতে খাইয়েচে-দাইয়েচে...বাবাকে বলে ওটা মালীকেই দিয়ে দেওয়াবো। তবে বাবার কড়া হুকুম,—বাড়ীতে ছাগল রাখা হবে না...

বাহিরে কথাবার্ত্তা শুনা গেল। তারা কহিল,—ঐ ওঁরা আসচেন,—কাকাবাবু আর বাবা...পালাই...

শ্যামলাল কহিল,—কেন ? পালাবে কেন ?

তারা কহিল,—আমার ভারী লজ্জা করে...

—কেন ? লজ্জা কিসের !

তারা কহিল,—না, লজ্জা করবে না ! বলে, দুদিন বাদে—ছি,...সত্যি, এখন ভারী লজ্জা করে, ওঁদের সামনে তোমার আছে আসতে, কি, থাকতে ! ঐ এসে পড়লেন ওঁরা...

শ্যামলাল তারার আঁচল ধরিল—তারা সবলে আঁচল ছড়াইয়া পলাইয়া ছুটিয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে দোলগোবিন্দ আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, ঢুকিয়াই কহিলেন,—কৈ, আমার তারা-মা কোথায় গেল ? মাকে দেখতে ও-বাড়ী গেলুম, গিয়ে শুনলুম, মা আমার আমাকে দেখতে এখানে এসেচেন। মা না হলে এত মায়া কারো হয় ? না, মা ছাড়া আর কেউ ছেলেকে এমন ভালো বাসতে পারে !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্বয়ম্বরা

জ্ঞান-বাবুর কল্‌কাতার বাড়ীর সামনে গেটের দু-পাশে কলার গাছ রোপণ করা হয়েছে ; এক কলা-গাছ থেকে আর-এক কলা-গাছ পর্য্যন্ত আম্রপল্লবের মালার মাঝে সোলার রঙীন ফুল দুল্‌ছে ; কলা-গাছের গোড়ায় পূর্ণঘটের মুখে শীষ-ওয়ালা ডাব স্থাপিত হয়েছে ; মঙ্গল-ঘটের গায়ে সিঁদুরের স্বস্তিক আঁকা ও গলায় ফুলের মালা। গেটের মাথায় বাঁশ দিয়ে নহবৎ বাজাবার মঞ্চ করা হয়েছে ; বাঁশের গায়ে নানান রঙের কাগজ জড়ানো ; রৌশন-চৌকীর ঘরের ফুকোরে ফুকোরে কাগজ সোলা অভ্রের ঝালর ঝুল্‌ছে ; কিন্তু সেই রৌশন-চৌকীর ঘরে নহবৎ বাজছে না। বাড়ীর বাহ্যিক বেশটা উৎসবের, কিন্তু উৎসবের উল্লাসের পরিচয় কোথাও প্রকাশ পাচ্ছে না ; সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ, লোকের ব্যস্ততা নেই। এ যেনো উৎসব-শেষের অবসন্ন অবস্থা। অথচ গৃহের তোরণ-সজ্জায় সদ্য সমাপ্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট ; গৃহসজ্জা ও উৎসব-প্রসাধন বাসী হয়ে ম্লান হয়ে যায়নি।

জ্ঞান-বাবু বৈঠকখানা ঘরে একাকী গম্ভীর স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছেন ; তাঁর সামনে একখানা খবরের কাগজ মেলা রয়েছে ; তিনি যে কিছু পড়ছেন এমন মনে হয় না।

জ্ঞান-বাবুর পত্নী তপতী ম্লান-মুখে মন্থর পদে বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলেন।

জ্ঞান-বাবু পত্নীর আগমন সত্ত্বেও যেমন ব'সে ছিলেন তেমনি ব'সে রইলেন।

তপতী স্বামীর কাছে এসে ব্যথিত স্বরে বললেন—যে বিয়েতে এতো চোখের জল পড়ছে, এতো বাধা পড়ছে সে বিয়ে কি কখনো সুখের হবে ?

জ্ঞান-বাবু স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—বিয়ে যদি হয় তা হলে নিশ্চয় সুখের হবে।

তপতী অবিশ্বাস ও হতাশার স্বরে বললেন—আর সুখের হবে ! যার বিয়ে তার চোখের জল শুখোচ্ছে না !...

জ্ঞান-বাবু এবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসির আভাসের সঙ্গে বল্‌লেন—যেমন মা তেম্‌নি ছাঁ হবে তো ? মেয়ের মা বিয়ের পরে কেঁদে কেটে কী কাণ্ডটাই না বাধিয়েছিলো !...

তপতী নিজের বিবাহিত জীবনের অতীত স্মৃতিতে সুখী ও লজ্জিতা হয়ে বল্‌লেন—তুমি সেই কবেকার কথার খোঁটা দেওয়া এখনো ছাড়লে না। কিন্তু আমার তখন বয়েস কি ? আমার মাত্র বারো বচ্ছর বয়েসের বেলা একটা ধেড়ে মিন্‌সের সঙ্গে বিয়ে হলো, তাকে কখনো দেখিনি চিনিনি,...ভয় করে না ?

জ্ঞান-বাবু পূর্ব্বস্মৃতির সুখাবেশে কণ্ঠস্বর মধু-সিক্ত ক'রে বল্‌লেন—তার পর ঠিক উল্টো ব্যাপার ! বরকে ছেড়ে বাপের বাড়ী যাবার সময় কেঁদে কেটে অস্থির। যাবার মুহূর্ত্তে বেঁকে

বস্‌তে—'আমি তোমাকে ছেড়ে বাপের বাড়ী যেতে চাইনে ; তুমি যখন যাবে তখন যাবো, এখন একা গিয়ে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না !' সে-সব কথা কি ভুলে গেছো ?

তপতী স্বামী-প্রেমের সুখ-স্মৃতিতে পূর্ণ হয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লেন—সে কথা কি ভোল্‌বার ! যখন জান্‌লাম চিন্‌লাম স্বামী কি বস্তু, তখন যে তাকে পৃথিবীর সকলের চেয়ে বেশী ভালো বাস্‌লাম। তখন বুঝতে পার্‌লাম আগেকার মেয়েরা কেমন ক'রে সহমরণে যেতে পার্‌তো !

জ্ঞান-বাবু এবার গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—তেম্‌নি তোমার মেয়েও যখন স্বামীকে ভালো ক'রে চিন্‌বে তখন সেও সহমরণে যেতে প্রস্তুত হবে।

তপতী কণ্ঠস্বরে ঈষৎ আনন্দ ও ঈষৎ বিরক্তি ও আশঙ্কা মিশিয়ে বল্‌লেন—ষাট্‌ ! ষাট্‌ ! বিয়ের আগে কী যে অলক্ষুণে কথা বলো ! চারি দিকেই তো অলক্ষণ ! রসুনচৌকী বাঁধা হয়েছে, অথচ হিঁদু-মোছলমানের দাঙ্গায় নহবৎ জোগাড় হলো না ; গায়ে হলুদের দিন গায়ে হলুদ হলো না ; আজ গোধুলি লগ্নে বিয়ে, আজ এখনো বর এসে পৌঁছলো না...

তপতী কন্যার বিবাহের এইসব অঙ্গহানির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে জ্ঞান-বাবুর মনটাও অশুভের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লো, কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন ক'রে পত্নীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বল্‌লেন—এসব বাধা তো আকস্মিক আর সাময়িক...

—কিন্তু মেয়ের চোখের জল ? সেটা তো আকস্মিক নয়। যবে থেকে বীরেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য জেদ ধরেছো তবে থেকেই তো...

—বীরেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা তো আজ নতুন হয় নি ? ছ বচ্ছর আগে থেকে কথা পাকা হয়ে আছে। আগে তো মেয়ের আপত্তির কথা শোনা যায় নি ? বীরেশ্বরকে এতো কাল কথা দিয়ে রেখে এখন কি ব'লে মেয়ে সম্প্রদান করতে অস্বীকার করি বলো তো ?

—মেয়ের মত নেই ব'লে ?

—মেয়ের এমন খামখেয়ালি মত-পরিবর্ত্তনের একটা কারণ দেখাতে হবে তো ? বীরেশ্বর বিলেত গেলো, তখন মত ছিল ; বীরেশ্বর বিলেতে থাক্‌তে তোমার মেয়ে তাকে চিঠি পত্র পর্য্যন্ত লিখেছে ; আর সে বিলেত থেকে পাস-টাস ক'রে সেই দেশে ফিরে এলো, অম্‌নি মেয়ের সুর হঠাৎ বদ্‌লে গেলো !

—বদ্‌লাবে না ? বীরেশ্বরও যে হঠাৎ বদ্‌লে গেলো ! পাস্‌ ক'রে এলো, গভর্মেন্টের অমন বড়ো চাক্‌রীটা পেলে ; কিন্তু হঠাৎ সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে গান্ধীর চেলা ব'নে গেলো... খদ্দর প'রে গাঁয়ে গাঁয়ে চরকা চালাতে মেতে উঠ্‌লো ! এমন সন্ন্যাসীর গলায় মালা দিতে কোন্‌ সেয়ানা মেয়ে চাইবে বলো ? কচি-খুকীটি হতো, তবে যার হাতে সঁপে দিতে তাকেই সে বড়ো হয়ে ভবিতব্য ব'লে মেনে নিতো। কিন্তু যে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছো, বেশী বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখেছো, তার মত আর রুচি মেনে চল্‌তে আমরা বাধ্য।

—মেয়ের কিসে কল্যাণ হবে তা বাপ-মায়ে যতোটা বুঝ্‌তে পারে, মেয়ে হাজার শিক্ষিতা হলেও কি ততোটা বুঝতে পারে ? আর সংসারের অভিজ্ঞতা কতোটুকু ? অল্প বয়সের ধর্ম্ম হচ্ছে হৃদয়াবেগ আর চিত্তবৃত্তির মোহের ঘোরে চালিত হওয়া, বিচার বিবেচনা করবার ইচ্ছা বা শক্তি তখন থাকে না। তাই সমস্ত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যে বিবাহের উপর নির্ভর করে সেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করার ভার পিতা-মাতারই নেওয়া উচিত।

—কিন্তু বিনো যাকে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতে চায় সেই স্নিগ্ধকুমার তো অপাত্র নয়। দেখ্‌তে যেনো কার্ত্তিকটি ! লেখা-পড়াতেও চমৎকার ! ধনবান্ কুটুম্বের ছেলে...

জ্ঞান-বাবু একটু অবজ্ঞা আর বিদ্রূপের স্বরে ব'লে উঠলেন—ওটার যেমন নাম তেম্‌নি ঢং ! ওকে দেখ্‌লে গা জ্ব'লে যায়। সন্দেহ হয়, ওটা পুরুষ না মেয়ে ! লম্বা চুল, মাঝখানে সিঁথি কেটে কপালের উপর পেটে পাড়া !... হাঁটু পর্য্যন্ত ঝোলা সিল্কের ঘাঘ্‌রা পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদরের আঁচল চল্‌তে মাটিতে লুটিয়ে যায়, হাতে সোনার চুড়িতে হাত-ঘড়ী, চোখে নাকচিম্‌টোনো সোনার চশ্‌মা, পায়ে লাল চামড়ার উপর জরীর কাজ-করা সেলিমী জুতো !... এ কি পুরুষের পোশাক ! এমন বেশ-বিন্যাস যার, সে কি জগতের কোনো কাজে লাগ্‌তে পারে ? ঐ অকর্ম্মণ্য মেয়ে-মুখোটাকে যে তোমার মেয়ের কেমন ক'রে পছন্দ হলো আমি তাই ভাবি। তার সঙ্গে বীরেশ্বরের তুলনা ! সে একটা আস্ত পুরুষ-মানুষ... মূর্ত্তিমান্ পৌরুষ !

তপতী স্বামীর উক্তির সত্যতা অন্তরে উপলব্ধি ক'রেও মুখে প্রতিবাদের বিরক্তি জানিয়ে বল্‌লেন—তোমার সঙ্গে কথায় কে পার্‌বে বলো ? আর এখন তর্ক ক'রেই বা লাভ কি ? এখন সুভালাভালি দু হাত এক হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হই। তার পর মেয়ের কপালে যা আছে তা হবে...

ব্যথিত অন্তরে উৎকণ্ঠা ভ'রে নিয়ে তপতী সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

জ্ঞান-বাবু একটা নির্গত-প্রায় দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ফেলে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন, এবং যে দিক্ থেকে বর আস্‌বার কথা সেই দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

* * *

গোধূলি লগ্নে বিবাহ। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। এখনো বরের আস্‌বার সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধান জান্‌তে লোক পাঠানো হয়েছে, তারাও এখনো ফিরে আসে নি। বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নি চাকর দাসী সবাই দুশ্চিন্তায় থম্‌থম করছে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আর খুন-জখমের ভয়ে কোনো আত্মীয় স্বজন বিয়ে-বাড়ীতে আসে নি। বাড়ীতেও বেশী লোক নেই...কর্ত্তা গিন্নি মেয়ে আর একজন চাকর একজন দাসী, মোট পাঁচটি লোক। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ।

রাস্তার ধারের একটা ঘরে জান্‌লার ধারে বিয়ের ক'নে বিনতা লাল চেলী প'রে চণ্ডীর পুঁথি কোলে নিয়ে আল্‌পনা-দেওয়া পিঁড়ির উপর ব'সে আছে। বিনতার কপালে ক'নে-চন্দনের বিন্দুর মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে ; বিনতার চোখের পাতায় জল, তার মুখখানি ম্লান বিশুষ্ক।

বৈশাখ মাস। রাস্তার ফুট্‌পাথের উপরের একটা গুল্‌-মোহর ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে ; হলদে-হৃদয় লাল রঙের পুষ্প-স্তবকে সমাচ্ছন্ন হয়ে সেই গাছটাও বিয়ের ক'নের মতন সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে ; তার পাশের একটা বকুল-গাছ থেকে ফুলের মদির সুরভি বৈশাখী সন্ধ্যার স্নিগ্ধ-বাতাসে ভেসে আস্‌ছে ; আর সেই সঙ্গে এক এক বার ঘরে এসে ঢুক্‌ছে চিংড়ি-মাছের পচা খোলার আর ইঁদুর পচার গন্ধ। খুন-জখমের ভয়ে মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার ধাঙড়েরা দিন সাতেক পথে ঝাড়ু পাড়ে নি ; পথের ধারের আবর্জ্জনাকুণ্ড ছাপিয়ে এক এক জায়গায় আবর্জ্জনার স্তূপ জ'মেছে ; কালবৈশাখীর ঝড়-ঝাপ্‌টায় সেইসব আবর্জ্জনা পথময় ছড়িয়ে গেছে ; পথময় ছেঁড়া সালপাতার ঠোঙা আর কাগজ উড়ে বেড়াচ্ছে ; সমস্ত আবর্জ্জনা থেকে একটা ভেপ্‌সা পচা গন্ধ উঠ্‌ছে।

বিনতা লাল চেলী প'রে আল্পনা-দেওয়া পিঁড়ির উপরে ব'সে এই-সব দেখ্ছে, আর ভাব্ছে—যেমন আমার বিয়ের ছিরি, তেম্নি তার সমারোহ!

তপতী সেই ঘরে এসে ঢুক্তে ঢুকতে বল্লেন—ওমা! অন্ধকারে ব'সে রয়েছিস, কেউ আলোটাও জ্বেলে দিয়ে যায় নি?

বিনতা মাতার দিকে মুখ না ফিরিয়েই মৃদু করুণ স্বরে বল্লে—আর বাইরে আলো জ্বেলে কি হবে মা? তোমরা জীবনের আলো তো নিবিয়ে দিলে? একটুখানি বাহিরের অন্ধকারে থেকে অভ্যাস ক'রে নি।

তপতী কন্যার এই তিরস্কারের কোনো উত্তর দিতে না পেরে কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লেন। এবং বিদ্যুৎ-আলোর সুইচ্‌টা টিপে দিলেন। উজ্জ্বল আলোকে ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্লো, এবং সেই আলোক তপতীর চোখের জলে প'ড়ে চক্‌চক্ কর্‌তে লাগ্লো। তপতী অমঙ্গল অশ্রু কন্যার কাছ থেকে গোপন করবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে চোখ মুছে ফেল্লেন এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে বল্লেন—ভুবনের মাকে ব'লে গেলাম যে একটু বিনোর কাছে বোস্ ভো; তা সে বিনোকে এক্‌লা ফেলে গেলো কোন্ চুলোয়!

বিনতা মায়ের দিকে মুখ না ফিরিয়েই বল্লে—তাকে আমিই পাঠিয়ে দিয়েছি। একজন পাহারাওয়ালা বসিয়ে রাখ্লে কেবলই মনে হয় যে আমি বলির পশু, পাছে পালিয়ে যাই তাই পাহারা বসেছে!

তপতী কন্যার তিরস্কারে একেবারে পরাস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে প্রস্থান কর্‌লেন, এবং বাইরে গিয়ে চোখ মুছে মুছেও চোখের জল আর থামাতে পার্‌লেন না।

বিনতা একাকিনী ব'সে আছে। গোধূলি লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়-যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আস্ছে। পথের গ্যাসের আলো আজ জ্বালা হয় নি। পথ জনমানব-শূন্য, গাড়ীও চল্ছে না। সমস্ত শহরটা রাক্ষসের হানা পুরীর মতন নিস্তব্ধ থম্‌থম কর্‌ছে।

হঠাৎ বিনতা শুন্‌তে পেলে ঘরে-আস্‌বার দরজার ওপার থেকে রমণী-কণ্ঠের রঙ্গ-ভরা সম্ভাষণ—কী লো ঠাকুরঝি! একলা ব'সে বরের ধ্যান কর্‌ছিস্! উলু উলু মাদারের ফুল, বর আস্ছে কতেক দূর?

বিনতা কণ্ঠস্বর শুনেই চিন্‌তে পার্‌লে তার পিস্‌তুতো দাদার বৌ আদরিণী এসেছে। তারা যে পথের বিপদের আশঙ্কা উপেক্ষা ক'রে তার বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে এসেছে, এই মমতার পরিচয়ে বিনতার মর্ম্মবেদনা অন্তর উপ্‌চে ছাপিয়ে উঠ্লো—তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়াতে লাগ্লো। সে যেমন ব'সে ছিলো তেম্নি ব'সে রইলো, আদরিণীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখ্লে না।

আদরিণী বিনতার কাছে আস্‌তে আস্‌তে বল্লে—ওলো গরবিণী, এখনও তো তোমার মুখের অবসর বর কেড়ে নেয় নি, এরই মধ্যে বাক্‌রোধ?

বিনতা তখনও মুখ ফেরালে না দেখে আদরিণী বিনতার পাশে ব'সে হাত দিয়ে বিনতার চিবুক ধ'রে মুখ ফেরাতে ফেরাতে বল্লে—দেখি লো চাঁদবদনী...এ কি ভাই ঠাকুরঝি, তোর চোখে জল!... নে ভাই, তোর নভেলী ঢং রাখ্!... বিয়ে হচ্ছে, এইটেই আনন্দের, কার সঙ্গে হচ্ছে সেটা আজ্‌কে ভাব্‌বার বিষয় নয়। জগতে কারো সঙ্গে ষোলো আনা মনের মিল হয় না...যেখানে মিল হবে সেখানে আনন্দ, যেখানে গরমিল সেখানে ঝগ্‌ড়া, এই তো সকলকার জীবনের একই কাহিনী। তবে আর দুঃখ কি ভাই? আর নিজের

সুখকে এতো ছোটো ক'রে দেখিস কেনো ? সুখকে পর-নির্ভর পর-প্রত্যাশী কর্‌লে যে নিজের অগৌরব ! তোর সুখ তো তোর নিজের কাছে !

আদরিণীর কণ্ঠস্বর সান্ত্বনা ও সমবেদনায় কোমল আর্দ্র হয়ে উঠ্‌লো। সে নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিনতার চোখ মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

কিন্তু আদরিণীর মমতার স্পর্শে বিনতার অশ্রু-প্রবাহ হু হু ক'রে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো, আদরিণী আর মুছিয়ে শেষ কর্‌তে পারে না !

ক্ষণকাল পরে বিনতা চেষ্টা ক'রে আত্মসম্বরণ কর্‌লে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে পাশাপাশি ব'সে রইলো।

একটু পরে আদরিণী দীর্ঘনিশ্বাস চেপে সঙ্গে-আনা তোয়ালে-বাঁধা একখানা থালার আবরণ উন্মোচন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—ভাই ঠাকুরঝি, তোর গরিব বৌদিদি তোর বিয়েতে বেশী কিছু যৌতুক দিতে পার্‌লে না ; নিজের হাতে আমি কিছু ফুলের গহনা তৈরি ক'রে এনেছি, আয় তোকে পরিয়ে দি !

বিনতা ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—বৌদি, বড়ো সাধের বিয়ে তার আবার দু পায়ে আল্‌তা !

—বালাই এমন অলক্ষুণে কথা বল্‌তে নেই। দুদিন পরে আজ এইসব কথা বলার জন্যে তুই নিজেই লজ্জা পাবি, নিজেকে অপরাধী মনে হবে...

এই ব'লে আদরিণী ফুলের গহনা ও ফুলের মালাগুলি তুলে তুলে বিনতাকে পরিয়ে দিতে লাগ্‌লো। বিনতা আর আপত্তিও কর্‌লে না, বাধাও দিলে না।

পুষ্প-ভূষণে সজ্জিত ক'রে আদরিণী বিনতার চিবুকে হাত দিয়ে সেই হাত চুম্বন ক'রে বল্‌লে—দেখ্ দেখি, ঠিক যেনো রতির মতন দেখাচ্ছে !...তুই বোস্, আমি একবার মামীমাকে ডেকে নিয়ে আসি...

আদরিণী ঘর থেকে বাহির হয়ে চ'লে গেলো।

বিনতা কিছুক্ষণ একলাটি ঘরে ব'সে আছে। হঠাৎ ঘরের বাতাসটা 'দেলখোস' এসেন্সের ঘন গন্ধে উচ্চকিত হয়ে উঠ্‌লো। এই গন্ধটি বিনতার অতিশয় পরিচিত ও প্রিয়। কিন্তু আজ প্রায় ছয় মাস যে গন্ধের বিচ্ছেদ তাকে ম্রিয়মাণা ক'রে রেখেছে, সেই গন্ধ আজ অকস্মাৎ তাকে আবেষ্টন ক'রে ধ'রে চমৎকৃত পুলকিত বিস্মিত ক'রে তুল্‌লো। এ কা'র অঙ্গসৌরভ তা অনুভব করতে পার্‌লেও সে স্থির নিশ্চয় কর্‌বার জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে তার অনুমান সত্য...দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে স্নিগ্ধকুমার...কুমারের মতন সুরূপ সুবেশ !

স্নিগ্ধকুমারের শরীর পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে, বর্ণ গৌর, মুখের ভাবে মেয়েলি কোমলতা মাখানো, বেশ-ভূষায় বিলাসিতা ও বাবুয়ানি জাজ্বল্যমান।

তার দিকে বিনতা ফিরে তাকাতেই স্নিগ্ধকুমার নাটকের নায়কের ভঙ্গীতে কম্পিত কণ্ঠে সুর টেনে ব'লে উঠ্‌লো—আজ পাঁচ মাস ছাব্বিশ দিন পরে আমার নিরন্তর ধ্যানের দেবীমূর্ত্তির দর্শন পেলাম একেবারে চিরবিচ্ছেদের মুহূর্ত্তে...

স্নিগ্ধকুমারের কথা শুনেই বিনতার মুখ আরক্ত হয়ে উঠ্‌লো, তার চোখ দিয়ে আবার অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

স্নিগ্ধকুমার ঘরের মধ্যে বিনতার কাছে এসে বল্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু একটু ক্ষীণ আশার রশ্মি আমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবনের উপর এসে পড়েছে...

বিনতা অশ্রুজালের ভিতর দিয়ে উৎসুক আগ্রহান্বিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি স্নিগ্ধকুমারের মুখের

দিকে প্রেরণ কর্‌লে।

স্নিগ্ধকুমার বল্‌তে লাগ্‌লো—বিধাতা হয় তো আমাদের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়েছেন...

অজ্ঞাত আশায় বিনতার হৃদয় উৎফুল্ল, মুখ উজ্জ্বল বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

স্নিগ্ধকুমার বল্‌তে লাগ্‌লো—আমি তোমাকে ভালোবাসি, আর তুমি আমাকে বীরেশ্বর গুণ্ডার চেয়ে বরণীয় মনে করো জেনে তোমার বাবা আমাকে তোমাদের বাড়ীতে আসতে, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বারণ ক'রে বলেছিলেন—বিনতার বিয়ের দিনের সন্ধ্যাবেলার আগে তুমি আমাদের বাড়ীতে আর এসো না। এ অপমানের পর আমি আর এ বাড়ীতে পদার্পণ কর্‌তাম না, কিন্তু তোমাকে একবার দেখ্‌তে পাবার প্রলোভনে সকল অপমান ভুলে গিয়ে আজ এখানে আস্‌বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় ভয়ানক গোলমাল ক'রে হাজার খানেক মুসলমান মেছোবাজার পাড়াটায় চড়াও হয়েছে শুন্‌তে পেলাম...আর শুন্‌লাম বীরেশ্বর বরের চেলী মালকোঁচা মেরে চেলীর চাদর কোমরে বেঁধে একাই এক লাঠি নিয়ে সেই হাজার খুন-চড়া লোকের মহড়া নিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।...

বিনতার চোখের অশ্রু শুষ্ক হয়ে গেলো, বিস্ময়ে ব্যগ্রতায় তার চক্ষু বিস্ফারিত ও মুখ বিশুষ্ক হ'য়ে উঠ্‌লো।

স্নিগ্ধকুমার বল্‌তে লাগ্‌লো—এইবার বাছাধন মজাটি টের পাবেন, গুণ্ডামি আর বীরত্ব এইবার বেরিয়ে যাবে, মেছোবাজারের হাজার দু' হাজার খুন-চাপা কসাইয়ের সাম্‌নে সে একা কতোক্ষণ টিক্‌বে ?...

বিনতা ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তা হ'লে 'তুমি' এলে কেমন ক'রে ?

স্নিগ্ধকুমার উৎসাহিত হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—যেই শুন্‌লাম যে বীরেশ্বর মুসলমানদের আট্‌কেছে, আমি অমনি গলির অন্য মুখ দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে বোঁ ক'রে চ'লে এলাম ! কিন্তু গলির সে মুখ দিয়েও মুসলমান দৌড়চ্ছে দেখে এসেছি...বীরেশ্বর এবার বেড়াজালে ঘেরা পড়েছে, আর উদ্ধার পেতে হচ্ছে না !...

বিনতা উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—মুসলমানেরা তো পাড়ার লোকের বাড়ীর ভিতর ঢুকে উপদ্রব কর্‌তে পারে ? মেয়েদের অপমান কর্‌তে পারে ?...

স্নিগ্ধকুমার উৎসাহিত স্বরে বল্‌লে,—পারে কি ? কর্‌ছে। সেই জন্যেই তো বীরেশ্বর কারো মানা না শুনে...

বিনতা তখন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তবে তুমি যে তোমার বাড়ী ছেড়ে চ'লে এলে ?

স্নিগ্ধকুমার বল্‌লে,—বাড়ীতে আমার ছোট ভাই আছে, দারোয়ান আছে...আর নাই বা যদি কেউ থাক্‌তো তবু আমি আস্‌তাম, তোমার কাছে বিশ্বসংসারের আর যতো কিছু সব তুচ্ছ !

আজ স্নিগ্ধকুমারের কবিত্ব বিনতার কাছে বেশ রুচিকর মনে হলো না, কেমন যেনো খাপছাড়া বেতালা মনে হ'লো। তাই সে বল্‌লে—কিন্তু তুমি থাক্‌লে তো পাড়ার লোকদের কিছু না কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌তে ?

—সাহায্য ! সাহায্য কর্‌তে যাওয়া মানে সাক্ষাৎ যমের মুখে যাওয়া ! কে যেচে যমের মুখে যাবে বলো ?

স্নিগ্ধকুমারের এই কথা শুনে বিনতা আর কোনো কথা বল্‌লে না ; সে রাস্তার দিকে

তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

বিনতাকে চুপ ক'রে যেতে দেখে স্নিগ্ধকুমার বল্‌লে—যাই, দেখে আসি, আর কোনো খবর পাওয়া গেলো কি না।...

স্নিগ্ধকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

বিনতা তার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লে না। স্নিগ্ধকুমার যে নিজের পরিজনদের বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাদের ফেলে চ'লে এসেছে, এতে বিনতা সুখী হবে কি দুঃখী হবে তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিলো না। সে কেবলই এর সঙ্গে বীরেশ্বরের তুলনা কর্‌ছে...বীরেশ্বর তাকে বিবাহ করতে আস্‌বে ব'লে সজ্জিত হয়েছিলো, তথাপি সে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে, তার ভাবী বধূকে উপেক্ষা ক'রে অত্যাচারের প্রতিরোধ কর্‌তে দাঁড়িয়েছে ; আর স্নিগ্ধকুমার সকল কিছুকে উপেক্ষা ক'রে তার কাছে ছুটে এসেছে ; এই দুইজনের আচরণের মধ্যে কোন্‌টি তার ভালো লাগা উচিত তা সে নির্ণয় ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। বিনতার একবার মনে হচ্ছে বীরেশ্বর তাকে উপেক্ষা কর্‌তে পেরেছে, তার সঙ্গে মিলনের চেয়ে অন্য কর্ত্তব্য বীরেশ্বরের কাছে প্রধান হয়েছে ; স্নিগ্ধকুমার কিন্তু তাকেই সকলের চেয়ে লভনীয় মনে ক'রে বিপদের মধ্যে ছুটে এসেছে ; আবার তার মনে হচ্ছে যে স্নিগ্ধকুমারের স্বার্থপর ভীরু কাপুরুষতার চেয়ে বীরেশ্বরের স্বার্থত্যাগ ও পৌরুষ ঢের বেশী প্রশংসনীয়।

বিনতা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছে। একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র তার চোখের সাম্‌নে তার মুখের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে জ্বলজ্বল কর্‌ছে। বিনতার বৌদিদি আদরিণী ঘরে এসে অমঙ্গলের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌লে—কি হলো ভাই ঠাকুরঝি ? তোর বর নাকি মোছলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা কর্‌তে লেগে গেছে, স্নিগ্ধ ঠাকুর-পো এসে বল্‌লে। মামীমা তো শুনেই কাঁদ্‌তে ব'সে গেছেন। মামা-বাবু গম্ভীর হয়ে বারান্দায় পায়চারি কর্‌ছেন। তুই যে চোখের জল ফেলছিস্‌, এতে কি কখনো শুভ হয় ? তোর চোখের জলে হয় তো বা একটা মহাপ্রাণ ভেসে যায় !

আদরিণীর এই তিরস্কার বিনতার মর্ম্মে গিয়ে বাজলো। তার মন বীরেশ্বরের কুশল-সংবাদ জান্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। বিনতা বীরেশ্বরে অমঙ্গলের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে কর্‌তে লাগ্‌লো, তার মনের মধ্যে আদরিণীর কথা গুঞ্জরণ ক'রে ফির্‌তে লাগ্‌লো—তোর চোখের জলে হয় তো বা একটা মহাপ্রাণ ভেসে যায়।

আদরিণী বিনতাকে মৌন বিমর্ষ দেখে সেখান থেকে চ'লে গেলো।

একটু পরেই আবার স্নিগ্ধকুমার এসে সেই ঘরে ঢুক্‌লো, তার চলন চঞ্চল, মুখ প্রফুল্ল। সে ঘরে এসেই ব'লে উঠ্‌লো—বিনতা, তোমার বাবা বীরেশ্বরের খবর নিতে লোক পাঠিয়েছিলেন ; তারা ফিরে এসেছে, যেতে পারে নি...চারিদিকে ফৌজ...গুলি চল্‌ছে...চারিদিকে ধরপাকড় গেরেপ্তার লেগে গেছে...

বিনতার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো—গুলি ! এই লক্ষ্যশূন্য গুলি গিয়ে তো বীরেশ্বরের শরীরে বিদ্ধ হতে পারে !... ধরপাকড় ! বীরেশ্বর দাঙ্গায় লিপ্ত ছিলো ব'লে সেও তো গেরেপ্তার হ'তে পারে !...এ ছাড়া হাজার হাজার ক্রোধোন্মত্ত মুসলমানের লাঠি ছোরা প্রভৃতি তো আছেই...

স্নিগ্ধকুমার উৎফুল্ল মুখে উৎসাহিত স্বরে ব'লেই চল্‌লো—বীরেশ্বরের আস্‌বার আর কোনো সম্ভাবনা নেই...মোছলমানের হাতে রেহাই পাওয়াই দুষ্কর, তার উপরে আবার

ফৌজের গুলি ছুটেছে !... প্রাণে বাঁচ্‌লেও বাছাধনকে জখম হতে হয়েছে...বরাত-জোরে বেঁচে গেলেও গেরেপ্তার হ'য়ে হাজতে যেতে হবে...

পরের বিপদে স্নিগ্ধকুমারের উল্লাস বিনতার ভালো লাগ্‌লো না। হোক না বীরেশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু সে তো মায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, দেশের স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী সেবক ? বীরেশ্বর তাদের স্পৃহণীয় না হলেও অপর অনেকের কাছে তো তার প্রাণের মূল্য আছে ? স্নিগ্ধকুমার অকস্মাৎ বিনতার কাছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে পড়্‌লো।

বিনতার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে স্নিগ্ধকুমার বল্‌লে—গোধূলি-লগ্ন তো পার হয়ে গেলো। রাত বারোটার পরে আর একটা লগ্ন আছে...সেটা পার হলেই আজকের ফাঁড়া কেটে যায়। তার আর ভয় নেই... আমাদের দুজনের ঐকান্তিক ইচ্ছা আর ভালোবাসার জোরে এ ফাঁড়া উৎরে যাবেই যাবে...খুন-খ্যাপা মোছলমানের হাতেই ওর দফা রফা হবে...

বিনতার মনের মধ্যে স্নিগ্ধকুমারের এই আকাঙ্ক্ষা সায় পেলে না। বিনতার বিবিধ বিরুদ্ধ চিন্তার ঘূর্ণীপাকের মধ্যে প'ড়ে স্নিগ্ধকুমারের মনের আশা একবার তলিয়ে যেতে লাগ্‌লো আবার ক্ষণেকের জন্য উপরে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

বিনতার নীরবতার কারণ ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে স্নিগ্ধকুমার মনে কর্‌লে সমস্ত দিনের উপবাসে ও উদ্বেগে বিনতার চিত্ত অবসন্ন হয়ে আছে, তাই সে এই আনন্দ-সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। সে বিনতাকে প্রফুল্ল ক'রে তোল্‌বার জন্য বল্‌লে—ভগবানের ইচ্ছায় যদি রাতের লগ্নেও বর এসে না পৌঁছায়, তবে লগ্নভ্রষ্টা হয়ে যাবার ভয়ে উপস্থিত কোনো পাত্রের হাতেই কন্যাকে সম্প্রদান কর্‌তে হতে পারে...

এই সম্ভাবনা বিনতার মনের সম্মুখে উপস্থাপিত হবামাত্র তার বুক অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় কেঁপে উঠ্‌লো, তার মুখ শুকিয়ে গেলো। সে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলো।

স্নিগ্ধকুমার বিনতার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিলো না, সে বিনতার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিলো। সে এখনও বিনতাকে নীরব থাক্‌তে দেখে মনে কর্‌লে বিনতা আনন্দে বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দ গোপন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। এই মনে ক'রে সে ঘর থেকে চঞ্চল চরণে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

খানিক পরে আদরিণী এসে বিনতার ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্‌লে—আহা ! সেই কখন থেকে ঠায় এক জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থেকে মাজা পিঠ ধ'রে উঠ্‌লো। বরের তো কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। মামীমা তো কেবল ঢিপঢিপ ক'রে মাথা খুঁড়ছে আর হাউহাউ ক'রে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে ! ...একটু সর্‌বৎ ক'রে এনে দেবো ? গলাটা একটু ভিজোবি ?

বিনতা কম্পিত আর্দ্র স্বরে বল্‌লে—না বৌদি, কিছুর দর্‌কার নেই। ... পুলিসের কাছে একবার খবর নিলে হয় তো জান্‌তে পারা যেতো মেছোবাজারে কি হচ্ছে...

মেছোবাজারের সংবাদ জান্‌বার আগ্রহ বিনতার মুখে প্রকাশ হতে শুনে আদরিণী সুখীও হলো, চিন্তিতও হলো ; সে বল্‌লে—মামীমাকে ব'লে মামাবাবুকে মনে করিয়ে দেওয়াই গে...তিনি তো ব্যাকুল হয়ে বারান্দায় কেবল পায়চারি ক'রে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছেন...

আদরিণী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

বিনতা একাকিনী ঘরে ব'সে আছে। রাত্রি অগ্রসর হয়ে হয়ে ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। পথ একেবারে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, জনমানবের সঞ্চার-শূন্য। বিশাল কলিকাতা-পুরী

একেবারে নিস্তব্ধ থম্‌থম্‌ করছে। পাশের ঘরের ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে এগারটা বেজে গেলো। আর ঘণ্টা-খানেক পরে বিবাহের লগ্ন। কিন্তু এখনও তো বরের দেখা নেই, কোনো খবর পর্য্যন্ত নেই !...

বিনতার মন বীরেশ্বরের কুশল-সংবাদ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ছিলো, এখন বীরেশ্বর বর-বেশে এসে উপস্থিত হলেও সে যেনো সুখী হয়।

টং ক'রে সাড়ে এগারোটা বেজে গেলো।

স্নিগ্ধকুমার দ্রুতপদে ঘরে এসেই বল্‌লে—বিনতা, বিনতা, যা আশা করেছিলাম তাই হয়েছে...

এইটুকু কথা শুনেই বিনতার মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো, বুকটা ধড়াস ক'রে উঠ্‌লো, মুখ শুকিয়ে গেলো, তার আশঙ্কা হলো তবে বুঝি বীরেশ্বরের মৃত্যুসংবাদ এসেছে...স্নিগ্ধকুমার তো এই সম্ভাবনাই কামনা কর্‌ছিলো! স্নিগ্ধকুমারের কথার শেষটুকু শোন্‌বার জন্য বিনতার সমস্ত চেতনা শ্রবণশক্তিতে এসে সম্মিলিত হলো, সে উৎকর্ণ হয়ে রইলো।

স্নিগ্ধকুমার বল্‌তে লাগ্‌লো—তোমার বাবা আমাকে ডেকে বল্‌লেন...“স্নিগ্ধ, বীরেশ্বর যদি ১২টার মধ্যে এসে না পৌঁছায়...”

বিনতা নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে স্নিগ্ধকুমারের কথা শুন্‌ছিলো। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লো...তা হলে বীরেশ্বরের মঙ্গল-সংবাদ না পেলেও কোনো অমঙ্গল-সংবাদও পাওয়া যায় নি।

স্নিগ্ধকুমার তার বাক্য সমাপ্ত কর্‌লে—“তা হলে তোমারই সঙ্গে বিনতার বিয়ে দিতে হবে...মেয়েকে তো লগ্নভ্রষ্টা হতে দিতে পার্‌বো না।”... তোমার বাবার এই কথা শুনে আমি ছুটে তোমাকে সুখবর দিতে এসেছি।

বিনতার মনের মধ্যে বীরেশ্বর আর স্নিগ্ধকুমারের ছবি একসঙ্গে পাশাপাশি ফুটে উঠ্‌লো। আজ স্নিগ্ধকুমারকে কিছুতেই তার ভালো লাগ্‌ছিলো না...স্বার্থপরতার ক্ষুদ্রতায় স্নিগ্ধকুমার ম্লান হয়ে বীরেশ্বরের মহত্ত্ব-মণ্ডিত উজ্জ্বল চিত্রের প্রভায় আচ্ছন্ন হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিনতার মানস-দৃষ্টির সাম্‌নে থেকে অবলুপ্ত হয়ে যেতে লাগ্‌লো।

বিনতার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বা তার শরীরের স্পন্দন মাত্রও না দেখে স্নিগ্ধকুমার নিজের হাতঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে—আর পনেরো মিনিট আছে বারোটা বাজ্‌তে যাই দেখিগে...

স্নিগ্ধকুমার ঘর থেকে বোঁ ক'রে বেরিয়ে গেলো।

নিস্তব্ধ নিঃশব্দ বাড়ী ; নিশুতি নগর। বিনতা যে ঘরে ব'সে আছে সেই ঘরের পাশের ঘর থেকে একটা ঘড়ীর দোলন দোলার টক টক টক টক শব্দ বিনতার কানে মহাকালের পদক্ষেপের ভয়াবহ শব্দের মতন এসে প্রবেশ কর্‌ছে। সেই শব্দের তালে তালে তার হৃৎপিণ্ডও আশঙ্কায় উদ্বেগে আগ্রহে ব্যগ্রতায় ধক ধক ধক ধক ক'রে রক্ত নিয়ে ফেলাছড়া কর্‌ছে।

বিনতার হঠাৎ মনে হলো সকল অশুভ দূর কর্‌বার জন্য হিন্দু ক'নের কোলে চণ্ডীর পুঁথি দেওয়া হয় ; দুর্গতিহারিণী দুর্গার স্তব ক'রে দেবতাদের দৈত্য-বিপদ কেটে গিয়েছিলো। এই কথা মনে হতেই সে চণ্ডীর পুঁথিখানি খুলে ফেল্‌লে এবং লেখার উপর দৃষ্টিপাত কর্‌বা মাত্র এই পংক্তিটি তার চোখে পড়্‌লো—

করোতু সা নঃ শুভহেতুর্-ঈশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ।

প্রথমেই এই পংক্তিটির প্রতি নেত্রপাত হওয়া বিনতা শুভ-সূচক মনে ক'রে আশান্বিতা হয়ে উঠ্‌লো। সে ভক্তিপূর্ণ কাতর অন্তরে একমনে শক্তির নিকট দেবতাদের স্তুতি পাঠ কর্‌তে লাগ্‌লো—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

অকস্মাৎ দূর থেকে একটা কোলাহলের শব্দ নৈশ বাতাসে ভেসে এসে বিনতার কানে প্রবেশ কর্‌লো। তার বুক আবার কেঁপে উঠ্‌লো, তার ভয় হলো বুঝি বা মুসলমানেরা তাদের পাড়ার দিকে অত্যাচার কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে।

বিনতা ভীতিবিহ্বল পাংশু মুখে জান্‌লার দিকে ঝুঁকে জান্‌লার ফাঁকে মুখ রেখে এক দৃষ্টে ঐ দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলো।

হঠাৎ সেই কোলাহলটা সুস্পষ্ট হয়ে বিনতার কানে এলো—বন্দেমাতরম্‌!...

মাতৃবন্দনার অভয়-মন্ত্রে বিনতার অন্তরের শঙ্কা দূর হয়ে গেলো—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শুন্‌তে পেলে সহস্র কণ্ঠের জয়োল্লাস—জয় বীরেশ্বর-কী জয়!

বিনতার চিত্ত চকিতে একেবারে প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো—যাক্‌, তা হলে বীরেশ্বর সকল বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে বিবাহ কর্‌তে আস্‌ছে!

বিনতার মনে এই কথা উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার কানে এসে প্রবেশ কর্‌লো শত শত শঙ্খের মঙ্গল-ধ্বনি ও শত শত কণ্ঠের উলু উলু রব!

বিনতার মনে আবার হর্ষবিষাদের দ্বন্দ্ব চল্‌তে শুরু হলো—বীরেশ্বর বিপদ জয় ক'রে বীরের বরমাল্য পাবার জন্য তার কাছে প্রার্থী হয়ে আস্‌ছে, এতে তার এখন অল্প অল্প আনন্দও হতে লাগ্‌লো, আবার স্নিগ্ধকুমারের সঙ্গে মিলন-সম্ভাবনা একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে বীরেশ্বর আস্‌ছে এতে তার মনটা ব্যথাও অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লো। যতোক্ষণ বীরেশ্বরের বিপদের—এমন কি প্রাণ-নাশের আশঙ্কা মনে ছিলো, ততোক্ষণ বিনতার মনে হচ্ছিলো বীরেশ্বর বরবেশে এসে উপস্থিত হলেও সে স্বস্তি অনুভব কর্‌বে; কিন্তু এখন তাকে প্রকৃতই আস্‌তে দেখে তার মনের বিরাগ আবার তার হৃদয় অধিকার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু সেই বিরাগের উগ্রতা এখন অনেকখানি হ্রস্ব হয়ে এসেছিলো—কতকটা বীরেশ্বরের বিজয়-গৌরবে আর কতকটা স্নিগ্ধকুমারের স্বার্থকুটিল ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন হয়ে।

দূরের কোলাহল ক্রমশঃ নিকট হয়ে আস্‌ছিলো; অস্ফুট শব্দ স্পষ্টতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিলো। পর্য্যায় ক্রমে বন্দে-মাতরম্‌! বীরেশ্বর-কী জয়! শঙ্খধ্বনি ও উলু-উলু রব নৈশ অন্ধকার বিমথিত ক'রে নগরের স্তব্ধতাকে উচ্চকিত ক'রে তুল্‌তে লাগলো।

স্নিগ্ধকুমার বোঁ ক'রে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই থিয়েটারী ঢঙে করুণ হতাশ স্বরে ব'লে উঠ্‌লো—বিনতা, আমাদের সব আশা উন্মূলিত হয়ে গেলো! বীরেশ্বরটা মরে নি!...লগ্নটা উত্তীর্ণ হয়ে যেতেও দিলে না!...আর অল্পক্ষণের মধ্যে তুমি বীরেশ্বরের স্ত্রী হয়ে যাবে...আমি বুক-ভাঙা ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে যাবো তোমাকেই মনোমন্দিরে বসিয়ে চির জীবন তোমারই নাম জপ কর্‌তে...

স্নিগ্ধকুমার ঘরের বাহিরে কা'র পদশব্দ শুনে প্রণয়োচ্ছ্বাস প্রকাশে বাধা পেয়ে ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

আকাশ প্রতিধ্বনিত ক'রে শত শত শঙ্খধ্বনি ও উলু-রবের মধ্যে সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত

হলো—বন্দে মাতরম্ ! জয় বীরেশ্বর-কী জয় !

বিনতার মাতা তপতী আনন্দ-বিহ্বল হয়ে ঘরে এসে ঢুক্‌লেন এবং একেবারে কন্যার পাশে ব'সে বাঁ হাতে তাকে বেষ্টন ক'রে ধর্‌লেন ও ডান হাতে বার বার বিনতার চিবুক স্পর্শ ক'রে ক'রে অঙ্গুলি চুম্বন্ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌তে লাগ্‌লেন—ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন মা, বর এসে পড়েছে...তোর এয়োতের জোরেই বীরেশ্বর যম-বিজয়ী হয়ে আস্‌তে পেরেছে।...

তপতীর দুই চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো।

বিনতা স্তব্ধ নির্বাক্ নিস্পন্দ। আদরিণী ক্ষিপ্রপদে ঘরে এসে বল্‌লে—মামী-মা, মামা-বাবু বল্‌ছেন লগ্নের সময় আর বেশী নেই, বর বরণ ক'রে নেবার জন্যে দরজার কাছে আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাক্‌তে হবে...

তপতী পুনরায় কন্যাকে চুম্বন ক'রে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বল্‌লেন—চল্ মা চল্...শুভ কর্ম্মের আর বিলম্ব যেনো না হয়...

তপতী ও আদরিণী চ'লে গেলেন।

বিনতা ব'সে ব'সে শুন্‌তে লাগলো মুহুর্মুহু সহস্র লোকের বিপুল জনতার বিচিত্র মিশ্র জয়োল্লাস। সে দেখ্‌তে লাগ্‌লো এই বরযাত্রায় খাস-গেলাস বা গ্যাসের আলোর সজ্জা নেই ; হাজার হাজার মশালের আলোতে বৈশাখের মেঘ্‌লা রাতের জমাট কালীর অন্ধকার আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। বর চতুর্দ্দোলে চ'ড়ে আস্‌ছে ; সেই চতুর্দ্দোলের সকল ফুকোর ফুলের ঝালরে পল্লবের অলঙ্কারে ঢেকে গেছে, তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি ভেদ ক'রে বরকে দেখতে পাওয়া সুদুষ্কর। বিনতার মনে হলো—এমন যুদ্ধ-জয়ী বীর বর কোন্ বাঙালীর মেয়ের ভাগ্যে জোটে ! রমণীর যে সৌভাগ্যের কথা রাজপুতানার ইতিহাসে সে পড়েছে, সেই সৌভাগ্য আজ তার দ্বারের প্রান্তে এসে তাকে যাচ্ঞা কর্‌ছে ! এই স্বার্থত্যাগী মহাবীর বীরেশ্বরের পাশে স্বার্থকলুষিত স্নিগ্ধকুমার একেবারে অতিতুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলো। এবার সৌভাগ্যের গর্ব্বে ও আনন্দে বিনতার চোখ ছলছল কর্‌তে লাগ্‌লো।

হাজার হাজার কণ্ঠের বন্দে মাতরম্ ও জয় বীরেশ্বর-কী জয় ধ্বনিতে সমস্ত বাড়ীটা ভরাট হয়ে গম্‌গম্ কর্‌তে লাগ্‌লো...শত শত শঙ্খ বেজে উঠ্‌লো...শত শত কণ্ঠে হুলুধ্বনি উত্থিত হলো।

বিনতার আবার মনে হলো—এমন সমারোহ এমন বিজয়োল্লাস এতো বরযাত্রীর সমাগম কোন্ বাঙালী মেয়ের বিয়েতে হয়েছে ! পিতা যে পাত্র নির্ব্বাচন করেছিলেন সে কি কখনো খারাপ হয় !

বিনতার চিত্ত আনন্দে ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, পিতাকে প্রণাম ক'রে নিজের অতীত অকৃতজ্ঞতার জন্য ক্ষমা চাইতে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌লো।

অকস্মাৎ অজস্র জনতার কোলাহল ছাপিয়ে বিনতার কানে এসে প্রবেশ কর্‌লো তার মায়ের শোক-কাতর কান্না—ওরে বাবা রে ! এ কী বেশে তুই এসেছিস রে !...

বিনতার হৃৎপিণ্ড থেকে এক ঝলক রক্ত চল্‌কে এসে বুকের কপাটে আছ্‌ড়ে পড়্‌লো—তার বুকটা ধড়াস ক'রে উঠ্‌লো—ব্যাপার কী ? কি হলো ?...

পরক্ষণেই বিনতার মনে আশঙ্কা উদিত হলো—তবে কি উনি আহত হয়ে এসেছেন !... আসুন না কেনো, আমি তাঁকে শুশ্রূষা ক'রে সুস্থ ক'রে তুল্‌বো...নিরন্তর সেবা ও সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে আমার শ্রদ্ধাকে আমি প্রেমে পরিণত ক'রে তুল্‌বো...

বোঁ ক'রে ঘরের মধ্যে ছুটে এসেই হাসিভরা মুখে স্নিগ্ধকুমার বল্‌লে—ভয় নেই বিনতা, মা ভৈঃ ! বীরেশ্বরটা ম'রে গেছে ! শ্মশানে শব নিয়ে যাবার পথে লোকেরা এখানে একবার দেখাতে নিয়ে এসেছে !...এইবার আমাদের মিলন আর কে আটকায় ?... দেখি, যাই, তাগাদা করি গে, লগ্নের সময় ব'য়ে যাচ্ছে...

স্নিগ্ধকুমার আবার ঘূর্ণী হাওয়ায় উড়িয়ে আনা খড়ের কুটোর মতন চট্‌ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো ।

ঠিক পরমুহূর্ত্তেই বিনতা আল্‌পনা-দেওয়া পিঁড়ির উপর উঠে দাঁড়ালো । এক মুহূর্ত্ত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো এবং অল্পক্ষণ পরে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ঝর্‌ণা-ধারার মতন সিঁড়ির ধাপে ধাপে লঘু ক্ষিপ্র পা ফেলে ফেলে তরতর ক'রে নীচে নেমে চ'লে গেলো । বৌ-আল্‌পনা-দেওয়া পিঁড়ি শূন্য প'ড়ে রইলো, আর প'ড়ে রইলো পিঁড়ির কোলে চণ্ডীর পুঁথি !

বিনতা লাল চেলীর কাপড় গায়ে জড়িয়ে ছুটে যখন সদর দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছালো তখন তাকে দেখেই জনতা কোলাহল ক'রে উঠ্‌লো—বন্দে মাতরম্‌ !...জয় বীরেশ্বর-কী জয় !

সঙ্গে সঙ্গে শত শত শঙ্খধ্বনি ও উলুরব উত্থিত হলো ।

বহু লোক একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—তফাৎ তফাৎ ! বীরেশ্বর-বাবুর ক'নে তাঁকে দেখ্‌তে আস্‌ছেন !...

জনতা দ্বিধা ভিন্ন হয়ে দুদিকে স'রে মাঝখানে পথ ক'রে দিলে । দু পাশে নরপ্রাচীরের মাঝখান দিয়ে বিনতা দৃঢ় পদে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে গিয়ে বীরেশ্বরের চতুর্দ্দোলের সম্মুখে দাঁড়ালো । সে হাজার মশালের আলোকে দেখ্‌লে—বীরেশ্বর প্রশান্ত-মুখে ফুলশয্যায় শুয়ে আছে, তার কপালে শ্বেত চন্দনের পত্রলেখা স্থানে স্থানে রক্তরঞ্জিত হয়ে গেছে !

বিনতা এক মুহূর্ত্ত স্থির অপলক দৃষ্টিতে এই গৌরব-মণ্ডিত মৃত্যুর মহাশোভা দেখে ধীরে ধীরে নিজের গলা থেকে আদরিণীর দেওয়া ফুলের মালা খুলে নিলে এবং সাম্‌নে আনত হয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বীরেশ্বরের গলায় পরিয়ে দিলে ।

সহস্র কণ্ঠের উল্লাস উদ্ঘোষিত হলো—বন্দে মাতরম্‌ । জয় বীরেশ্বর-কী জয় ! ...জয় জয় সতীর জয় !

শত শত শঙ্খরব ও হুলুধ্বনির মধ্যে বিনতা ধীরে ধীরে বীরেশ্বরের পায়ের কাছে ব'সে পড়্‌লো ও নত হয়ে বীরেশ্বরের পায়ের উপর মাথা রেখে প্রণাম কর্‌লে ।

আবার সহস্র স্বরে বিঘোষিত হলে—জয় জয় সতীর জয় !

এক মুহূর্ত্ত বীরেশ্বরের পায়ের উপর মাথা রেখে বিনতা যখন মাথা তুল্‌লে তখন সকলে দেখলে বিনতার কপালে ও সিঁথিতে বীরেশ্বরের পায়ের রক্ত সিন্দূর-প্রলেপের মতন লেগে গেছে ! আবার জনতা জয়ধ্বনি কর্‌লো—জয় জয় মহাসতীর জয় ! সেই কোলাহল মঙ্গল-শঙ্খের গভীর নিনাদে ডুবে গেলো ।

বিনতা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো এবং আপনার অঙ্গের লাল চেলীর আবরণ খুলে ফেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে । সকলে বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে দেখ্‌লে বিনতা সাদা থান প'রে তার উপরে লাল চেলী জড়িয়ে এসেছিলো !

সহস্র স্বরে আবার জয় ঘোষণা কর্‌লে—জয় জয় মহাসতীর জয় !

বিনতা শান্ত অবিচলিত ভাবে নিজের অঙ্গ থেকে লাল চেলী উন্মোচন ক'রে বীরেশ্বরের শরীরের উপর ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে দিলে। এবং সে বিধবার শুভ্র বেশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। জনতার অসংখ্য কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো—বন্দে মাতরম্ ! জয় বীরেশ্বর-কী জয় ! জয় মহাসতীর জয় !

শত শত শঙ্খরব ও হুলুধ্বনিতে আকাশ মুহুর্মুহু বিমথিত হতে লাগ্‌লো।

ঠিক সেই সময় বিনতার পিতা কন্যার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে নীরবে তার মাথায় হাত রাখ্‌লেন।

স্নিগ্ধকুমার চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে আপন মনে ব'লে উঠ্‌লো—এ আবার কী হলো ! এ-সব কী থিয়েটারী ঢং।...

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলি-লগ্নে

—ও গো ! চল্‌লুম তবে। আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও। গাঁটছড়ায় বেঁধে তুমিই একদিন এ-বাড়ীতে আমায় এনেছিলে, তাই যাবার আগে তোমায় একবার বলে যাওয়া উচিত ভেবে ডেকে পাঠিয়েছি—কিছু মনে কোরো না যেন— !

আসন্ন-মৃত্যু-পত্নীর শয্যাপার্শ্বে পরেশ অপরাধীর মতো নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

নলিনী তার রোগ-শীর্ণ শুষ্ক-পাণ্ডুর অধরে একটু বাসি ফুলের মালার মতো ম্লান হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রে বল্‌তে লাগল—আমি যে তোমার মনের মতো হ'তে পারিনি সে আমার অপরাধ নয়, আমাকে বিবাহ ক'রে এনে তুমি যে একদিনও সুখী হ'তে পারলে না ; সেও আমার দোষ নয়, এ জানি আমি ; তবুও যাবার আগে তোমার কাছে আমার সকল অন্যায়ের জন্য আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি ! আমায় তুমি আজ সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রো—

পরেশ যেন একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল ! বললে—তোমাকে আমিই এনেছিলুম বটে, সে

কথা ঠিক, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই সে জন্যে দায়ী ক'রতে পারো, কিন্তু দোষ যে সম্পূর্ণ আমার একার নয় এটাও তোমার অজানা নেই ! কেবল পিতৃ-আদেশ প্রতিপালনের জন্যই তোমাকে আনতে বাধ্য হয়েছিলুম, কিন্তু অন্তরে কোনও দিনই গ্রহণ ক'রতে পারিনি ! কেন যে পারিনি তাও তো তোমার অবিদিত নেই, তাই আশা করি তুমি আমাকে সে জন্যে অপরাধী করবে না !

—না না—তোমার অপরাধ কি ? তুমি যেমন আমাকে অগ্নি সাক্ষী ক'রে মন্ত্র পড়ে বিবাহ ক'রে এনেছিলে, তেমনি তোমার গৃহে গৃহিণীর পদেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছো। স্বামীর কর্ত্তব্যস্বরূপ তুমি আমাকে সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করোনি। নারী জন্মের সার্থকতাটুকু তুমি আমাকে অযাচিত দান ক'রে ধন্য ক'রেছো, তবুও যে আমি তোমার মনের মতো হ'তে পারিনি সে জন্য আমার সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাই দায়ী। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার আমার কিছুই নেই !

—তোমার কথা শুনে তোমার প্রতি আজ আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হচ্ছে।

—তোমাকে ধন্যবাদ। মরণপথের নিঃসম্বল যাত্রিণীর পক্ষে এ অতি দুর্লভ পাথেয়।... কিন্তু, বড় বিলম্ব হ'য়ে গেছে আমার ! আজ এই পূর্ণ দু' বৎসর চুপ ক'রে আছি, তোমার সঙ্গে একটি কথাও কইনি, কিন্তু আজ না ব'লে গেলে, স্বর্গে গিয়েও আমি শান্তি পাবো না এবং নরকে আমার যন্ত্রণা আরও দ্বিগুণ মনে হবে ! তাই তোমাকে একবার ডেকে পাঠালুম—

এই কথা ক'টি বলেই নলিনী একটু শ্রান্ত হ'য়ে পড়ল। পরেশ সেটা লক্ষ্য ক'রে বললে—ডাক্তার বাবু তোমাকে এ অবস্থায় বেশী কথা বল্‌তে নিষেধ ক'রে গেছেন।

নলিনীর মুখে আবার যেন একটু ওপারের আলোর মত অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল। বললে—তোমার কথা শুনে এই মরণের শিয়রে বসেও আমার হাসি আসছে ! চিরকালের মতো যার কথা বলা বন্ধ হ'তে চলেছে—ও গো !—সে আজ যাবার আগে প্রাণ খুলে দু'টো কথা ব'লে যাবে না ? দু'-ব-ছ-র ?—দীর্ঘ-দু'-ব-ছ-র যে তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রেখেছিলুম—সে কথা কি ভুলে গেছ ?

— সে জন্য আমি তোমার কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ !

—ও-মা-গো ! আর যে পারিনি ! আবার আমার হাসি আস্‌ছে ! কিন্তু হাসতে বড় কষ্ট হ'চ্ছে যে !...হ্যাঁ, তুমি তোমার সে কৃতজ্ঞতার ঋণ যদি পরিশোধ করতে চাও, তা হলে আজ আমার এই নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু বাতাসে মিশিয়ে যাবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে একটু কথা কইতে দাও !... তুমি অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? আর একটু কাছে সরে এসো না ! এই ডাক্তার বাবুর চেয়ারখানায় একটু বোস না !...আমার এ রোগ তো ছোঁয়াচে নয় ; ভয় কি ?...স্ত্রীকে পছন্দ হয়নি, মনে ধরেনি, তাই ব'লে কি—তার মরবার সময়ও একটু কাছে এসে বসতে নেই ?...

পরেশ ধীরে ধীরে অপ্রতিভের মতো নলিনীর শয্যাপার্শ্বে আরও এগিয়ে গেল, এবং ডাক্তারবাবুর জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়ল।

নলিনী তার ক্ষীণদেহের দুর্ব্বলকণ্ঠে ডাক্‌লে—ঝি— ! ও ঝি— ! খোকাকে একবার এখানে নিয়ে এসো—

ঝি মণিকে ভিতরে নিয়ে এল। নলিনী বল্‌লে—ওকে বাবুর কাছে দিয়ে তুমি যাও—

দেখ, আমার অপরাধে তুমি আর নিজের ছেলের উপর অন্যায় কোরো না ! জন্মাবধি

বাছার আমার তোমার কোলে উঠবার সৌভাগ্য বোধ হয় খুব বেশী হয়নি ! বাপের আদর কাকে ব'লে, ছেলে আমার আজও তা জানে না ! আমি গেলে কে ওকে দেখবে ? তোমাকেই ওর সব ভার এবার নিতে হবে ! তোমারই জিনিষ ও, আমি শুধু গর্ভে ধরেছি বইত নয় ! এতদিন আমার কাছে গচ্ছিত ছিল, আজ তোমার ধন তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি অ-ঋণী হ'য়ে মরতে চাই !

—মরণটাকে এমন নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নিচ্ছ কেন ? ডাক্তার তো তেমন কিছু ভয়ের কারণ আছে ব'লে আমাকে জানান-নি !

—ওগো, ওর চেয়ে নিশ্চিত ক'রে ধরা যায়, এমন তো এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই ? কিন্তু সে কথা যাক্—আমার মৃত্যুটা কি সত্যই তোমার ভয়ের কারণ ? ওগো ! বলো ! সত্য বলো—আমি মরে যাবো শুন্‌লে—তুমি কি যথার্থই ভয় পাও নাকি ?

—না বল্‌লে মিথ্যা বলা হবে ! সদ্ভাবেই হোক্, আর অসদ্ভাবেই হোক্ একসঙ্গে এক বাড়ীতে থেকে এই যুক্ত-জীবনের বি-জোড় অবস্থাটাই কেমন যেন অভ্যাস হয়ে পড়েছে ! বাড়ীতে তুমি আছো এ একটা ভরসা ছিল খুব। আজ একলা পড়ে থাকতে হবে—এ কথা ভাবলে একটু ভয় হয় বই কি !

—তোমার কথা শুনে জীবনে আজ এই সর্ব্বপ্রথম আমি বড় পরিতৃপ্ত হলুম ! আমার আনন্দ আর ধ'রছে না ! আমার বাঁচবার সাধ হ'চ্ছে !...কিন্তু,...না,...আমি বেঁচে থেকে আর তোমার সাধে বাদ সাধাতে চাই-নি !

—তোমার এ কথাটা একটু কঠোর হ'ল না কি ?

—তাতে আশ্চর্য্য হোয়ো না প্রিয়তম ; মরণের সামনে এসে দাঁড়ালে—মানুষ একটু নির্ম্মম হ'য়ে ওঠে বৈ কি ? একি তুমি জান না ?—

—না, কেমন ক'রে জান্‌বো বলো ? মৃত্যুকে-তো তোমার মতো সাধনা ক'রে আমি কখনও ডেকে আনি-নি !

—এইবার তুমি একটু অকৃতজ্ঞ হ'য়ে পড়ছ কিন্তু !

—মানে !

—এর মানে কি বুঝিয়ে ব'ল্‌বো ? তাহ'লে আরও একটু আমার কাছে সরে এসো।

পরেশ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে পত্নীর আরও নিকটে স'রে আসতেই নলিনী তার শীর্ণ দুর্ব্বল হাল্কা-হাত দু'খানি বাড়িয়ে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে অধরপ্রান্তের উদ্যত চুম্বনটি কোনও রকমে সামলে পতির ক্রোড়স্থ শিশুকেই দিয়ে ফেলে বল্‌লে—

—ওগো, তোমাকে মুক্তি দেবার জন্যই, তোমাকে সুখী করবার জন্যই—যে আমি আজ মরণকে বরণ ক'রে এনেছি !—আমায় তুমি আশীর্ব্বাদ করো গো—আশীর্ব্বাদ করো !

পরেশ একেবারে সর্পদষ্টের মতো চম্‌কে উঠে বললে—

—সর্ব্বনাশ ! স্ত্রী-হত্যার এতবড় গুরু দণ্ড তুমি আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে চাও ?...না না—সে কিছুতেই হবে না নলিনী, এত নিষ্ঠুর শাস্তি আমি নিতে পারবো না—তোমাকে বাঁচতেই হবে—

—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি ; লক্ষ্মিটি, তুমি আর আমায় হাসিও না !... হ্যাঁগো, বাঁচাটা কি মানুষের ইচ্ছাধীন ?...তবু মনে হয় ; —হয়ত' আমি বাঁচতে পারতুম,—যদি তোমার মনের কোণে কোথাও একপাশে এতটুকু একটু স্থান পেতুম। তোমার বুকে ঠাঁই না পেয়েই নিরাশ্রয় হ'য়ে আমি আজ অকালে মরতে বসেছি...

নলিনীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে এল। কিন্তু অধরপ্রান্তে হাসিটুকু তখনও লেগে ছিল!

—তুমি তো সেখানে আশ্রয় নেবার কোনো চেষ্টাও করোনি নলিন? যেখানে তোমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল সবারই চেয়ে বেশী, সে আসন তো কই তুমি দাবী ক'রে দাঁড়ালে না একদিনও?

—কেন দাঁড়াবো? যে ডেকে নিয়ে এসে অতিথিকে অভ্যর্থনা করে না, তার কাছে অতিথিসৎকারের দাবী নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো কি আত্মাভিমানের বিরোধী নয়?

এ কথার উত্তরে একান্ত আক্ষেপের সুরেই পরেশ বল্‌তে লাগ্‌ল—

—কিন্তু, আজ আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি যদি এতকাল আমার সঙ্গে এমন কঠোর অসহযোগ অবলম্বন না ক'রে আমাকে জয় ক'রে নেবার একটু চেষ্টা করতে তাহ'লে হয়ত' আমাকে আজ তোমার পদানতই দেখতে পেতে—

—তা যদিও আমি দেখতে চাইনি, তোমরা হচ্ছ আমাদের মাথার মণি, পদানত হ'লে আমাদেরই অকল্যাণ হবে। কিন্তু, মশাই, অসহযোগটা কে প্রথম আরম্ভ করেছিল শুনি? সেই জন্যই ত তোমার উপর আমার একটা আন্তরিক বিরাগ এসেছিল তখন! তোমাকে পাবার আর আমার কণামাত্রও লোভ ছিল না! তোমার চিত্ত তখন জয় করবার যোগ্য বলেই আর আমার মনে হয় নি! তাই আমি সে জন্য কোনও চেষ্টাও করিনি!...তবে একথা ঠিক,—খোকাকে যদি না কোলে পেতুম তাহ'লে যে কি করতুম বলতে পারিনি!...কিন্তু, সে কথা যাক্! আজ আর সে তুচ্ছ সুখ দুঃখের সাংসারিক কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে এই জীবন্মৃত্যুর সূক্ষ্ম সেতুর শেষ প্রান্তটিতে এসে দাঁড়িয়ে ঝগ্‌ড়া করতে চাইনি। তোমার হাসিমুখ দেখেই যেতে চাই!

—এ যে তোমাদের একটু অসম্ভব রকম চাওয়া নলিন্? আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও, কিন্তু যত অনুগত স্বামীই হ'ক স্ত্রীর অন্তিম অনুরোধ রাখতেও তার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ক'জনে হাসতে পারে বল'তো?

—এই যে ক'জন তোমার মতো তাদের স্ত্রীদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না!

—এটা কি তুমি পরিহাস ক'রে বল্‌ছ নলিন্?—না সত্যই তোমার এই অভিযোগ যে, আমি তোমায় কখন দু'চক্ষে দেখতে পারিনি—এবং অহরহ তোমার মৃত্যু কামনাই করেছি?

—হ্যাঁগা—তুমি কি আজও তেমনি একটুতেই চটে যাও? আচ্ছা তোমার কি মাথাটা এখনও ঠিক হয়নি?

—বেঠিক কি কোনও দিন ছিল।

—নিশ্চয়! নইলে আমাকে তুমি কেন চিনতে পারলে না?...মনে আছে কি তুমি সেই ফুলশয্যার রাত্রেই এই বিয়ের ক'ণেকে ডেকে বলেছিলে যে, সে যেন তোমার কাছে কখনও প্রেমের প্রত্যাশা না ক'রে? মনে পড়ে?

—হুঁ!

—আমি তোমার সে আদেশ এতদিন নিঃসাড়ে পালন ক'রে এসেছি। গুরু-মন-বেদনায় অন্তর বিক্ষত হ'য়েছে, বজ্রকীটের দংশন-জ্বালা বুকের ভিতর অনুভব করেছি—কিন্তু তবু কখনও কোনও দিন ভুলেও সে যাতনা আমি মুখে প্রকাশ করিনি! ...আজ যাবার বেলা আর পারলুম না! রোগের প্রকোপ আমার মনের বল যেন একেবারে শিথিল ক'রে দিয়েছে। পারলুম না আর চুপ ক'রে থাকতে—তাই ডেকে পাঠালুম

তোমায় ! নির্লজ্জার মতো সমস্ত মান অপমান অভিমান আত্মম্ভরিতা ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে তোমার কাছে আজ আমি আত্মসমর্পণ করছি !...

এইখানে নলিনী আবার একটু যেন শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌ল। অল্পক্ষণের জন্যে থেমে আবার বলতে লাগ্‌ল—

—তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে কিন্তু বড় ভয় হ'য়েছিল আমার ; যদি তুমি না এসো ? তোমার আসতে তাই যতই দেরী হ'চ্ছিল ততই আমার ভয় বাড়ছিল, একটা আতঙ্ক হচ্ছিল—হয়ত তুমি এলে না !... উঃ ! না যদি আসতে ! সেই হ'তো আমার চরম দুর্দ্দশা একেবারে !... কিন্তু এলে তুমি !... আমি জান্‌তুম তুমি এলেও আসতে পারো—তাই ত ডাক দিতে সাহস হ'য়েছিল !—ওগো আমি তোমায় একটু চিনেছি গো চিনেছি—তাই এই জীবনব্যাপী অবহেলার বিনিময়েও আমি শুধু তোমাকে এতদিন ভালই বেসে এসেছি !...

নলিনী হঠাৎ নিঃস্তব্ধ হ'য়ে পড়ল ! পরেশ তাড়াতাড়ি উঠে নিজের কোল থেকে ঘুমন্ত খোকাকে তার মায়ের শয্যায় শুইয়ে দিয়ে নলিনীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলে সে নিমীলিতনেত্রে অস্পষ্টস্বরে যেন আরও কি বলবার চেষ্টা করছে—পরেশ নিশ্বাস রোধ ক'রে নিঃশব্দে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে—নলিনী বলছে :— খোকাকে—হাতে—তুলে—দিলুম— ! —নিশ্চিন্ত—হলুম— আজ থেকে—তুমি—ওর—বাপ—তুমি—ওর—মা— আমি—

আর কিছুই শোনা গেল না—একেবারে—নিস্পন্দ—অসাড় !

পরেশ একেবারে হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল ! পাগলের মতো মৃত পত্নীর মুখ চুম্বন করে, তার হিমশীতল বক্ষের উপর মাথা লুটিয়ে বলতে লাগ্‌ল—

—কেন তুমি চলে গেলে নলিন্ ? আমিও যে তোমায় ভালবাসি !...ফিরে এসো—ওগো, ফিরে এসো !

শ্রী নরেন্দ্র দেব

আঁধারের ঘোরে

আপিস থেকে বাড়ী ফিরে দীনেশ স্ত্রীর নাম ধরে ডাক দিলে—নিরু—ও নিরু।

নিরুপমা ওরফে নিরু হচ্ছে দত্ত বাড়ীর সেজ-বৌ। বছর তিনেক হোল তার বিয়ে হয়েছে বটে কিন্তু শাশুড়ীর বিধান অনুসারে এখনো সে স্বামীর সঙ্গে চেঁচিয়ে বাক্যালাপ করবার অধিকার পায়-নি। দীনেশ কিন্তু বাড়ীর এ-সব বিধান মোটেই পছন্দ করত না, তাই সময়ে অসময়ে নিজের দরকার পড়লেই চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ডাক দিত। নিরু দু-একবার ভুল কোরে স্বামীর ডাকে চেঁচিয়ে সাড়াও দিয়েছে কিন্তু সম্প্রতি শাশুড়ীর কাছ থেকে ধমক খেয়ে এ বিষয়ে সে বিশেষ সাবধান হোয়ে গিয়েছে।

দীনেশরা কলকাতার নামজাদা ধনী। ক্লাইভ ষ্ট্রীটে তাদের মস্ত কারবার তিন পুরুষ ধরে চলেছে। বিয়ের আগে থেকেই সে তার দাদাদের সঙ্গে চাপকান পরে আপিসে বেরুতে আরম্ভ করলেও এখনো সে মনে-প্রাণে কারবারী হোয়ে উঠতে পারে-নি।

দীনেশ আবার ডাক দিলে—নিরু—ওগো—

নিরুপমার বড় জা তাকে একটা তরকারী রাঁধবার ভার দিয়ে কি কাজে গিয়েছিল। সে উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে ডিম দিয়ে কি কোরে ইলিশ মাছ ভাজতে হয় ঠাকুরকে তাই বোঝাচ্ছে এমন সময় দীনেশের ডাক তার কানে গেল।

শাশুড়ী কাছেই বসেছিলেন। নিরু চঞ্চল হোয়ে উঠল কিন্তু কোনো সাড়া দিলে না।

স্ত্রী আস্‌চে না দেখে দীনেশ আবার ডাক দিলে—কোথায় গো গিন্নি—

দীনেশ জান্‌ত যে গিন্নি ডাকটা নিরুপমা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই যখনি সে হাঁক-ডাক কোরে স্ত্রীর সাড়া না পেত তখুনি এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কর্‌ত।

এবারেও ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হোলো না। দুড়-দাড় কোরে নিরু ঘরের মধ্যে এসে চাপা অথচ জোর গলায় স্বামীকে বল্লে—কি হয়েছে! এত চেঁচামেচি লাগিয়েছ কেন?

দীনেশ কোনো জবাব দিলে না। নিরুপমা আবার বল্লে—তোমায় কতবার বলেছি অমন কোরে চেঁচিয়ে আমায় ডেকো না, আমার লজ্জা করে। তবুও তুমি—

দীনেশ তাকে রাগাবার জন্য বল্লে—সেই জন্যই তো গিন্নি বলে—

নিরু এবার গলাটা একটু ছেড়ে বল্লে—ফের্ যদি আমায় গিন্নি বলে ডাক তো আমি সত্যি বল্‌ছি বিষ খেয়ে মর্‌ব।

আঁচলের খোঁট্‌টা তুলে নিয়ে নিরু চোখে চেপে ধরলে। দীনেশ একবার হতাশভাবে রুদ্যমানা স্ত্রীর দিকে চেয়ে চাপকানের বোতামগুলো খুলতে লাগ্‌ল।

নিরু চোখ থেকে আঁচলটা নামিয়ে বল্লে—কালই বড়দি আর মেজদি তোমার ঐ গিন্নি বলা নিয়ে আমাকে জ্বালাতন করছিল।

দীনেশ এবারেও স্ত্রীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে পোষাক খুলতে লাগ্‌ল। নিরু স্বামীকে একটা জোর রকমের খোঁচা দেবার জন্য বল্লে—এমন বরাত আমার—

দীনেশ পোষাক বদলিয়ে ইজিচেয়ারের ওপর লম্বা হোয়ে শুয়ে বল্লে—আর আমার বরাতটাই বা এমন কি সুপ্রসন্ন দেখ্‌লে ?

কান্নাটা নিরুর চোখে এসেই ফিরে গিয়েছিল। এবার সে ঝেড়ে ফুঁড়ে বলে উঠল—কেন তোমার বরাতে কি হয়েছে শুনি ?

—যাক্, সে কথা আর বলে কি হবে।

—না না কি হয়েছে শুনিই না ?

দীনেশ গলাটা যতদূর সম্ভব করুণ কোরে বলতে লাগল—আপিসে সমস্ত দিন খেটে-খুটে বাড়ীতে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে যাকে স্ত্রীর মুখ-ঝাঁম্‌টা খেতে হয়, তার বরাত যে খুব ভাল এ কথা কি কোরে স্বীকার করি।

নিরুপমা বল্লে—ওঃ আপিসে তো খেটে আর কিছু রাখ না। এই সেদিন বড়ঠাকুর বড়দিকে বলেছেন যে, তুমি কিচ্ছু কর না, সারা দিন ফিরিঙ্গি মেয়েগুলোর সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে কাটাও।

কথাটা শুনে দীনেশ তড়াক কোরে চেয়ার থেকে উঠে বল্লে—কি ! কে বলেছে এ কথা ! বড়দা !

নিরু বল্লে হ্যাঁ, তিনি তো প্রায়ই বলেন। তিন চার দিন শোনবার পরে তবে বড়দি আমাকে বলেছে।

দীনেশ উত্তেজিত হোয়ে বল্লে—ওঃ, আর বড়দা কি করে আপিসে ! দাঁড়াও না বড়-বৌদিকে আমি ডেকে বল্‌ছি।

দীনেশ তার বড়-বৌদিকে ডাকবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, নিরু বাধা দিয়ে বল্লে—থাক্, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই।

সে ফিরে এসে ধপাস কোরে চেয়ারখানায় বসে পড়ে বল্লে—আচ্ছা আজই আমি বড়-বৌদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব।

নিরুপমা দু-পা এগিয়ে এসে স্বামীকে শাসিয়ে বল্লে—না তুমি কিচ্ছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারবে না।

দীনেশ এবার হেসে বল্লে—তবে বুঝেছি—তোমার সব মিছে কথা।

—কি মিছে কথা ?

—এই বড়দা বৌদিকে যা বলেছে বল্লে।

নিরু এবার একটু হেসে বল্লে—হ্যাঁ ওটা মিছে কথা কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি তো ?

—সে সত্য আর মিথ্যায় জড়ান।

নিরুপমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—সেটা কি রকম শুনি ?

দীনেশ বল্লে—সেটা হচ্ছে এই যে, আমি তাদের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করি কিন্তু তারা আমোল দেয় না।

নিরু এবার একটু ঝাঁজের সঙ্গে বল্লে—কি বল্লে ?

প্রশ্নের ধরণ দেখেই দীনেশ কথাটা বদলে ফেল্লে। সে বল্লে—তারা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার কত চেষ্টা করে কিন্তু আমি কি সেই ছেলে—

নিরু বল্লে—তুমি যে কি ছেলে তা আর আমি জানি না !

দীনেশ বল্লে—যাক্, সন্ধ্যেবেলায় এ সব আলোচনা কোরে কোনো লাভ নেই। এখন এক কাজ কর তো। চট্ কোরে এক কাপ চা নিয়ে এস, তোমার সঙ্গে বিশেষ একটা পরামর্শ আছে।

স্ত্রীকে খুশী করবার ইচ্ছা হোলেই দীনেশ তার সঙ্গে পরামর্শ করবার কথা পাড়ত। নিরুপমা জান্‌ত যে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করবার সৌভাগ্য—তা যে কোনো বিষয় নিয়েই হোক না কেন—এ বাড়ীর আর কোনো বৌয়ের কপালেই ঘটে না। এ জন্য তার নিজের মনে অহঙ্কার, জা-মহলে নাম আর শাশুড়ী-মহলে একটু বদনাম ছিল।

দীনেশের দাদারাও একালেরই ছেলে। কিন্তু 'একালের ছেলে' এ উপাধিটা গুরুজনেরা একবাক্যে দীনেশকেই দিয়েছিলেন। দীনেশ একালের ছেলের মতন স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করত বটে কিন্তু আসল কাজের বেলায় একাল ওকাল, সর্ব্বকালের ছেলের মতনই নিজের মত অনুসারে চল্‌ত।

পরামর্শের কথা শুনে নিরুপমা বল্লে—কি পরামর্শটা শুনি ?

—আগে চা নিয়ে এস তার পরে ধীরে-সুস্থে বল্‌ব'খন। তাড়াতাড়ি কিসের ?

অগত্যা নিরুপমাকেই তাড়াতাড়ি চা আনতে ছুটতে হোলো।

চা-পান শেষ কোরে গুটি দুয়েক পান এক সঙ্গে মুখে ঠেসে দিয়ে দীনেশ বল্লে—দেখ সাংঘাতিক বিপদে পড়া গেছে।

—সে আবার কি ?

—সেই জন্যই তো তোমাকে পরামর্শ করতে ডেকেছি।

স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য নিরুপমা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল কিন্তু দীনেশের বল্‌বার ধরণ শুনে সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—যাও যাও, যা তা কি সব বল্‌বার জন্য সন্ধ্যেবেলা আমাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে ! আমার ঢের কাজ আছে, চল্লুম।

দীনেশ ঝপ্ কোরে তার আঁচলটা ধরে ফেলে বল্লে—আরে যেও না। এটাও সংসারেব কোনো কাজের চেয়ে কম গুরুতর কথা নয়।

নিরু আবার বসতে-বসতে বল্লে—কি বল্‌বে বল তাড়াতাড়ি। তোমার ও সব চালাকীর কথা আমি শুনতে চাই না।

দীনেশ অভিমানের সুরে বলতে লাগ্‌ল—শুনতে চাই না বল্লেই হোলো ! তোমার স্বামীর বিপদ আর তুমি তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে না ? শেষকালে কিন্তু কিছু বলতে পাবে না বলে দিচ্ছি !

নিরুপমা এবার সত্যি রেগে বল্লে—দেখ আজ আপিস থেকে এসেই কি আরম্ভ করেছ বল দিকিন ? হয় খুলে বল, না হয় আমায় যেতে দাও, ঢের কাজ আছে।

দীনেশ বল্লে—তবে শোনো বলি। আর একটু এগিয়ে এস।

নিরু আরও একটু এগিয়ে বস্‌লে। দীনেশ বল্‌তে লাগ্‌ল—দেখ আমাদের আপিসের সেই মিস ইভান্সের কথা তোমায় বলেছি না ?

—হ্যাঁ, সে কি কর্‌লে ?

—এই তার কথাই বলছিলুম আর কি ! সে রোজই বলে, তোমাদের মোটরে একদিন আমাকে বেড়াতে নিয়ে চল। কোনো দিন বা বলে, চল আজ রাত্রে হোটেলে যাই।

—তা একদিন বাড়ীতে তাকে নেমন্তন্ন কোরে, খাওয়াও না।

—দূর্ সে তা আসতে চায় না। সে বলে এমন জায়গায় চল যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ থাক্‌বে না। তোমাকে আমার গোটা কতক প্রাণের কথা বল্‌ব।

নিরু এবার একটু দুষ্টু হাসি হেসে বল্লে—তা যাও না একদিন, কি প্রাণের কথা বল্‌তে চায় শুনে এস ; আর তোমারও প্রাণের কথাগুলো শুনিয়ে দিও।

দীনেশ বল্লে—তার প্রাণের কথাগুলো আজ আমায় শুনিয়ে দিয়েছে কিনা—তাইতে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

—কথাটা কি শুনি ?

আজ আমি তাকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখাচ্ছিলুম। কাজ শেষ হোয়ে গেলে সে কি বল্লে জান ? বল্লে যে, মিঃ দত্ত আর জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার খুব প্রিয় ছিলে। এ জন্মে তোমার বিয়ে হোয়ে গেছে, তা না হোলে নিশ্চয় তোমাকেই বিয়ে করতুম।

কথাটা শুনে চম্‌কে উঠে নিরু বল্লে—এ্যাঁ ! বল কি গো ? আচ্ছা বেহায়া তো !

দীনেশ বলতে লাগল—আরও কত কি যে বল্লে তার ঠিকানা নেই। সব কথা মনেও নেই।

নিরুপমা রেগে বল্লে—দাঁড়াও না, আমি তার বিয়ে করা বের করছি।

দীনেশ জিজ্ঞাসা করলে—কি করবে ?

—আমি মেজদিকে এখুনি এই মেয়েটার কথা বলে দেব। তিনি তোমার মেজদাকে বলে কালই তাকে আপিস থেকে দূর কোরে দেবেন।

দীনেশ বল্লে—আরে না না ছিঃ ! বেচারা গরীব, চাকরী গেলে খেতে পাবে না। শেষকালে আমায় অভিসম্পাৎ দেবে, হয়ত মরেই যাবে।

—তবে তুমিই ওকে তাড়িয়ে দাও।

—কেন ?

—বা, তাড়িয়ে দেবে না ?

দীনেশ বল্লে—আচ্ছা একটা লোক যদি তোমার রূপের ও গুণের খুব প্রশংসা করে তা হোলে কি তুমি তার ওপরে চটে যাও—বিশেষ সে দেখতে যদি খুব সুন্দর হয় ?

নিরু এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ কোরে বসে রইল। তার পরে বল্লে—আচ্ছা সে কি খুব সুন্দরী ?

—সুন্দরী তো বটেই তা ছাড়া কি মিষ্টি কথা তার। তুমি শুনলে তুমিও তার প্রেমে পড়ে যাবে।

—তা হোলে তুমি তার প্রেমে পড়েছ বল ?

দীনেশ বল্লে—দেখ তুমি আমার স্ত্রী, তোমার কাছে মিথ্যে কথা বল্লে পাপ হবে। তার সঙ্গে প্রেমে না পড়বার এত চেষ্টা করছি কিন্তু আর বুঝি পেরে উঠি না।

নিরুর চোখে আগেই জল এসে গিয়েছিল। দীনেশের এই শেষ কথাগুলো শুনে সে টপ কোরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দীনেশ বল্লে—যাচ্ছ কোথায় ! এখনো যে আসল কথাটাই হয় নি।

নিরু কোনো দিকে না চেয়ে দুড় দুড় কোরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। দীনেশ উঠে এদিক ওদিক খুঁজে কোথাও নিরুকে দেখতে না পেয়ে মানভঞ্জনের পালাটা আপাততঃ মুলতুবী রেখে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে উঠে নিরু একেবারে ছাতের একা কোণে গিয়ে বসে পড়ল। এতক্ষণ সে

কোনো রকমে কান্না চেপে রেখেছিল কিন্তু এই নির্জ্জন জায়গায় এসে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না। প্রথমে সে একচোট খুব কেঁদে নিলে। তারপর কান্নার বেগ থেমে গেলে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল—শেষকালে তার অদৃষ্টে এই ছিল ! তাদের স্বামী স্ত্রীর ভাব দেখে বাড়ীর লোক তো দূরের কথা প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত কত ঠাট্টা করেছে, আর সেই স্বামী শেষকালে কিনা একটা ফিরিঙ্গি মেয়ের প্রেমে পড়ল ! নিরুর একবার মনে হোলো, এর চেয়ে বিষ খেয়ে মরে যাব। সে মরলে তবে তার স্বামীর পাপের ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। তার অগাধ ভালবাসাকে তুচ্ছ কোরে স্বামী যে তার প্রতি কতখানি অন্যায় করেছে তখন তা বুঝতে পারবে। কিন্তু তখুনি তার মনে হোলো, না না আত্মহত্যা মহাপাপ। হয়ত সেই পাপের জন্য মৃত্যুর পরেও স্বামীর সঙ্গে সে মিলতে পারবে না ! তার চেয়ে সে এখান থেকে বাপের বাড়ী চলে যাবে। স্বামী যাই করুক, সে কথা তার কানেও পৌঁছবে না, দেখতেও পাবে না। স্বামীর প্রতি অভিমানে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিতে লাগল। সে আবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে।

মুখে কাপড় দিয়ে নিরু কাঁদছে এমন সময় সে শুনতে পেলে—কি রে নিরু অন্ধকারে একলা বসে কি কচ্চিস-রে ?

নিরু মুখ তুলে দেখলে তার মেজ জা নলিনী কখন এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

—এখানে কি কচ্চিস রে ? বলে নলিনী তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে—কাঁদছিলি ! কেন রে !

নিরুর কান্নার বেগ তখনো থামেনি ! সে নলিনীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইল।

নলিনী আবার জিজ্ঞাসা করলে—কি রে বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি ? সে জন্য আবাব কান্না কিসের—আবার রাতেই ভাব হোয়ে যাবে 'খন। বোকা মেয়ে কোথার !

নিরু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লে—সে আর হবে না মেজদি—

নলিনী স্নেহে নিরুকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—হবে না আবার কি রে ! ঝগড়া কি আর কারুর হয় না নাকি ? প্রথম প্রথম যখন ঝগড়া হয় তখন ঐ রকমই মনে হয়। নে আর পাগলামী করে না—চল নীচে।

নলিনীর কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়ে নিরুর বুকের মধ্যে এতক্ষণ ধরে যে অভিমান সঞ্চিত হয়েছিল তা বেরিয়ে পড়তে চাইছিল ! কিন্তু সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে চল্‌ল। নীচে নামতে নামতে অন্ধকার ছাতের সিঁড়িতে নিরু নলিনীর গলা জড়িয়ে আস্তে আস্তে বল্লে—মেজদি ভাই, কারুকে বোলো না।

নলিনী বল্লে—না না কারুকে বল্‌ব না।

নিরু নীচে চলে এল। কিন্তু কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তা হাসি ঠাট্টা সব সময়েই দিনেশের সেই কথাগুলো তার মনের মধ্যে কাঁটার মতন খচ্ খচ্ করতে লাগল।

দিনেশের বাড়ী ফিরতে রাত্রি হোতো বলে নিরু আগেই খেয়ে নিত। কিন্তু সেদিন সে না খেয়ে ঘরে গিয়ে মেজেতে আঁচল পেতে শুয়ে রইল।

রাত্রি এগারটার সময় আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে মেজেতে শুয়ে থাকতে দেখেই দীনেশ বুঝতে পারলে—'আজিকে গতিক মন্দ'। তবুও ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এই রকম ভাব দেখিয়ে সে বল্লে—কৈ নিরু খেতে দাও বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

নিরু চুপ কোরে পড়ে রইল দেখে দীনেশ তাকে নাড়া দিয়ে বল্লে—খেতে দাও না, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

নিরু এবার দীনেশের হাতখানা ঠেলে দিয়ে বল্লে—আমার গায়ে হাত দিও না।

দীনেশ অনেক রকম চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুতেই তার মান ভাঙল না দেখে সে আহত হোয়ে বল্লে—না, ভবিষ্যতে আর যদি কখনো তোমার সঙ্গে পরামর্শ করি! একটা বিপদে পড়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলুম তা'র এই ফল হোল!

নিরু এবার ভূমিশয্যা থেকে উঠে বল্লে—পরামর্শ করার দরকার হোলে তোমার মিস্ ইভান্সের কাছে যেও।

দীনেশ হতাশভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—এবার থেকে তাই হবে।

নিরুর আর সহ্য হোলো না। সে বল্লে—তুমি যদি ফের্ তার সঙ্গে কথা বল তা হোলে আমি নিশ্চয় মেজদিকে বলে দেব।

দীনেশ বল্লে—মেজদাকে বলে না হয় তাকে তাড়ালে, তার পর!

—তারপর আবার কি!

তারপর রাস্তায় একদিন আমাকে দেখে যদি পুলিশ ডেকে বলে দেয়—এই লোকটা আমায় বিরক্ত করছে—তখন উপায়! প্রথমে তো রাস্তায় লোকেরা ধরে এক চোট প্রহার দেবে, শেষে জেল পর্য্যন্ত হোয়ে যেতে পারে।

নিরু শিউরে উঠে বল্লে—তা হোলে উপায়!

—উপায় এক আছে।

—কি!

দীনেশ বল্লে—যদি সে কোনো মেয়েকে আমার সঙ্গে ঘুরতে দেখে তাহলে আপনিই সরে যাবে। অন্ততঃ আমাকে আর ও-সব কথা বল্লে বলবে না এটা নিশ্চয়।

—নিরু খুশী হয়ে বল্লে—কাল যখন তোমাকে আনবার জন্য মোটর যাবে আমিও যাব।

দীনেশ বল্লে—রামঃ! তোমাকে দেখলে তার উৎসাহ বরং বেড়েই যাবে।

নিরুর উৎসাহটা দপ্ কোরে নিবে গেল। সে বল্লে—কেন!

দীনেশ বল্লে—বাঙালী মেয়েদের তারা মেয়ে বলেই গ্রাহ্য করে না।

এ অকূল সমুদ্রে নিরু আর কূল খুঁজে পেলে না। সে চুপ কোরে বসে রইল। দুজনে অনেক ক্ষণ চুপচাপ থাকার পর দীনেশ বল্লে—দেখ, এখন খেয়ে দেয়ে নেওয়া থাক্, পরে দুজনে পরামর্শ কোরে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে।

খাওয়া দাওয়া হোয়ে যাবার পর দীনেশ বল্লে—ওগো একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

—কি প্ল্যান!

—প্ল্যানটা হচ্ছে এই পরশু শনিবার সন্ধ্যের সময় তোমাকে মেম সাজিয়ে মোটরে নিয়ে লেডি বাগিচার ধারে বেড়াতে যাব। মিস্ ইভান্স্ রোজ সেখানে বেড়াতে যায়। আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলেই সে আপিসে জিজ্ঞাসা করবে—কে ও! আমি বলব—ও মেয়েটি আমায় ভালবাসে। তা হোলেই আমার সঙ্গে প্রেম করা তো দূরের কথা আর বেড়াতেও যেতে চাইবে না।

নিরু বল্লে—সেই হাঁটু অবধি তোলা এক ফ্রক পড়তে হবে!

—হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে! তোমাকে বেশ মানাবে কিন্তু।

—দূর সে আমি পারব না, লজ্জা করবে।

—কেন তোমরা তো ফ্রক পরে স্কুলে যেতে!

—সে যখন যেতুম তখন যেতুম, এখন আর—

দীনেশ হতাশভাবে বল্লে—তা হোলে তো আর উপায় দেখছি না।

নিরু কোনো কথা না বলে নিজে কোনো একটা উপায় আবিষ্কার করতে পারে কি না তাই ভাবতে লাগল। কিন্তু আকাশ-পাতাল চিন্তা কোরো কোনো উপায়ই তার মাথায় জোগাল না। সে ভাবতে লাগল—কোথা থেকে কি বিপদই তাদের মাথায় এসে পড়ল। কি কোরে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়! মনশ্চক্ষে সে দেখতে লাগল—দীনেশ নিজের মনে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে এমন সময় একটা ফিরিঙ্গি মেয়ে তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর মেয়েটা একজন সার্জ্জেন্টকে গিয়ে বল্লে—এই নেটিভটা আমায় অপমান করেছে। সার্জ্জেন্টটা দীনেশকে ধরে মারতে মারতে থানায় নিয়ে চলল। রাস্তার যত লোক তাদের পেছনে মজা দেখতে দেখতে চলল।

নিরু জেগে জেগেই চমকে উঠল। ঘরের আলো নেবান ছিল, সে তার স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলে—ওগো!

—কি!

—আচ্ছা, পোষাক কোথায় পাওয়া যায়!

—পোষাক অনেক জায়গায় পাওয়া যায়! একটা পছন্দ মত কিনে আনতে হবে।

—আর যদি তাতেও সে মেয়েটা তোমাকে না ছাড়ে!

—তখন একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

—তা হোলে কালই পোষাক নিয়ে এস, বুঝলে?

দীনেশ 'আচ্ছা' বলে স্ত্রীকে কোনো রকমে নিশ্চিন্ত কোরে তখনকার মত ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন বাড়ীর সবাই ঘুমুলে দীনেশ ও নিরু প্যাকেট খুলে পোষাক বার করলে। নিরুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুপুষ্ট দেহে সেই পোষা মানালও মন্দ নয়। তারা পরামর্শ কোরে ঠিক করলে যে, কাল বিকেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথমে তারা আপিসে যাবে তারপরে সেখানে পোষাক বদলিয়ে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে গিয়ে একটু বেড়িয়ে গাড়ীতেই পোষাক বদলে বাড়ী চলে আসবে। মিস্ ইভান্স শনিবারে নিশ্চয় সেখানে যাবে, তার চোখ এড়াবে না।

নিরু এবার উৎসাহিত হোয়ে বল্লে—এ যে দেখছি দস্তুর মতন এ্যাডভেঞ্চার! বেশ মজা হবে কিন্তু—

দীনেশ বল্লে—কাল ইভান্সের সঙ্গে দেখা না হোলে আবার আস্‌চে শনিবার বেরুতে হবে।

* * *

শনিবার। দীনেশ তাড়াতাড়ি আফিস থেকে থেকে বাড়ী ফিরে নিরুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মোটরে বসে নিরু বল্লে—আমার ভারি লজ্জা করছে কিন্তু—

দীনেশ বল্লে—লজ্জা কি! জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটু বৈচিত্র আনা চাই। তা না হোলে রোজ থোড়-বড়ি-খাড়া কি আর ভাল লাগে। সে গুণ গুণ কোরে গান ধরলে—

এক স্ত্রী হোলে কারবার
ঝালিয়ে নিতে হয় দু-চারবার।

আপিসের দরজায় গাড়ি থামিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দীনেশ স্ত্রীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে দিন শনিবার থাকায় আপিসের বাবুরা তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে গেছে ; দারোয়ান ও চাকররা ছাড়া সেখানে কেউ নেই। দীনেশ নিরুকে নিয়ে মেয়ে টাইপিস্টদের বিশ্রাম করবার ঘরে গেল। সেখানে দেওয়ালে বড় একটা আয়না টাঙান ছিল। দীনেশ জিজ্ঞাসা করলে—পাউডার ইত্যাদি এনেছ, না আনিয়ে দেব ?

নিরু বল্লে—আমার ব্যাগের মধ্যে সমস্ত জিনিষ আছে !

—তা হোলে আর দেরী নয়, তুমি প্রসাধনে লেগে যাও।

নিরু বল্লে—আধ ঘণ্টার জন্য তুমি অন্য ঘরে গিয়ে বস।

দীনেশকে তাড়িয়ে দরজা বন্ধ কোরে নিরু প্রসাধনে মন দিলে ! নিরু ছিল সুন্দরী। আর প্রত্যেক সুন্দরী মেয়ের মতনই মনে মনে তার রূপের গর্ব্বও ছিল। এই তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-পারাবারে স্বামীর মন নামক সদা পলায়মান ও পরিবর্তনশীল অদৃশ্য বস্তুটী যে তার রূপের নোঙরে চিরকাল অচল হোয়ে আটকে থাকবে, ছেলেবেলা থেকে এ কথা শুনে শুনে এ সম্বন্ধে তার একটা সংস্কার হোয়ে গিয়েছিল। সেই স্বামী অন্য একটা মেয়ের রূপে আকৃষ্ট হয়েছে শুনে নারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে তার সহজাত রূপগর্ব্বেও কম আঘাত লাগে নি। তাই ইভান্স যে কত খানি সুন্দরী এবং তার চেয়ে সে কতগুণে দেখতে ভাল তাই পরীক্ষা করবার জন্যই আজ সে স্বামীর সঙ্গে বেরুতে রাজি হয়েছে।

নিরুর প্রসাধন আর শেষ হয় না। ঠোঁটের রং যে কতবার বেশী লাল হোয়ে গেল, কতবার যে মনের মত হোলো না তার আর ঠিকানা নেই। দীনেশ এসে দরজা ঠেলে বল্লে—নিরু এত দেরী করলে চলবে না। একটু তাড়াতাড়ি কোরে নাও।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নিরু দরজা খুল্লে। দীনেশ ঘরের মধ্যে এসে বল্লে—তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে নিরু কি বলব। বিয়ের রাতেও এত সুন্দর দেখায় নি। আমার কি ইচ্ছে করছে জান ?

নিরু বাধা দিয়ে বল্লে—যা ইচ্ছে করছে তা এখন হবে না। অনেক কষ্টে পাউডার লাগিয়েছি মুখে, এখুনি নষ্ট হোয়ে যাবে।

দীনেশ নিরুর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে লোভীর মতন স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। স্বামীর মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে নিরু লজ্জায় লাল হোয়ে উঠতে লাগল। দীনেশের সেই লোলুপ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে—একি ! তুমি এখনো চাপকান ছাড়নি ? নাও তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নাও।

দীনেশ বল্লে—না এখানে পোষা পড়তে গেলে এখন দেরী হোয়ে যাবে, চাকরবাকরগুলো কি মনে করছে কে জানে। চল বাগানে গিয়ে তুমি এক জায়গায় বসবে আমি চট করে একটু আড়ালে গিয়ে টাইটা পরে নেব আর চাপকানটা খুলে এর ওপরে এই কোটটা চড়িয়ে নেব।

দীনেশ ও নিরু তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া কোরে বাগানের ধারে এসে নামল। দীনেশ নিরুকে প্যাগোডার ধারে একখানা বেঞ্চিতে বসিয়ে বল্লে—তুমি এখানে বোসো আমি ঐ ঝোপের মধ্যে গিয়ে টাইটা বেঁধে, কোটটা গায়ে দিয়ে এখুনি আসছি।

নিরু বল্লে—আচ্ছা, দেরী কোরো না।

তখন সন্ধ্যার ঘোর লেগে গেছে। শীতের সন্ধ্যা। রাজ্যের ধোঁয়া বাগানের মধ্যে এসে জড়ো হয়েছে। নিরু সেই আধা অন্ধকার ও আধা আলোকের মধ্যে বসে বসে ইভান্সের কথা ভাবছিল। প্যাগোডার পাশের রাস্তা দিয়ে মচ মচ কোরে কে একজন চলে যাচ্ছিল নিরু সেদিকে ফিরে তাকালে কিন্তু অন্ধকারে তার মুখটা দেখা গেল না। একলা বসে থাকতে থাকতে তার কি রকম ভয় করতে লাগল। সে একবার বেঞ্চি থেকে উঠে চারদিকে তাকিয়ে আবার বসে পড়ল। এমন সময় দীনেশের মত কার গলা শুনতে পেয়ে নিরু আবার উঠে দাঁড়াল। নিরু দেখলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোট-প্যান্ট-পরা দীনেশ তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বল্লে—বাবাঃ! এত দেরী করলে! আমার একলা বসে থাকতে এত ভয় করছিল—

লোকটা কোন কথা না বলে মাথাব টুপিটা মুখের উপরে চাপা দিলে। নিরু বল্লে—আহা! মুখের উপর টুপি চাপা দেওয়া হচ্ছে কেন? লজ্জা হচ্ছে বুঝি?

এবারেও কোনো উত্তর না পেয়ে নিরু চুপ কোরে তার সঙ্গে এগিয়ে চলল।

তারা একটা অন্ধকার সরু রাস্তা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। সামনে দিয়েই একখানা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, নিরু বল্লে—এই যে ট্যাক্সি, ডাক না।

লোকটা ডাকলে—এই ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি দাঁড়াতেই তারা দুজনে উঠে পড়ল।

এদিকে দীনেশ সেজে গুজে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে দেখে যে, নিরু নেই!!! প্যাগোডার ধারে এসে এদিক ওদিক চেয়ে কোথাও না পেয়ে সে ডাক দিলে—নিরু!

কোনো উত্তর নেই!

দীনেশ মনে করলে এ্যাডভেঞ্চারটা আরও একটু ঘোরালো রকমের কোরে তোলবার জন্য নিরু বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। সে আবার হাক দিলে—নিরু-গিন্নি!

কারুর সাড়া শব্দ নেই!

তাইত গেল কোথায়! দীনেশের ধাঁ কোরে মনে হোলো কোনো বিপদে পড়ল না তো! না তা হোলে নিশ্চয় চীৎকার করত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নিরু গেল কোথায়?

দীনেশ চারিদিকে তাকাতে লাগল। দূরে নিরুর মতনই একটি মেয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে সে হন হন কোরে সেদিনে পা চালিয়ে দিলে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই সে বুঝতে পারলে, ঐ তো নিরু। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া না গেলেও ফ্রক ও টুপির ধরণ দেখে দীনেশ বুঝলে এ নিরু ছাড়া অন্য কেউ নয়। কিন্তু নিরুর সঙ্গে ঐ লোকটা আবার কে? সে জোরে পা হাঁকিয়ে দিলে। কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছবার আগেই তারা বাগান থেকে বেরিয়ে গেল। দীনেশ এবার ছুটে তাদের মধ্যেকার ব্যবধানটুকু পার হোয়ে রাস্তায় এসে দেখলে যে, নিরু ও সেই লোকটা একখানা ট্যাক্সিতে চড়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপার কি এ!! দীনেশের তখন মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সে একবার হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে নিলে। তার পরে পাগলের মতন সেই চল্‌তি ট্যাক্সির পেছনে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ কোরে দিলে।

ঠিক সেই সময় উল্টো দিক থেকে একখানা খালি ট্যাক্সি আসছিল দীনেশ সেটাকে থামিয়ে বল্লে—ঐ ট্যাক্সিখানাকে ধরতে পারবে? বকশিস্ দেব।

ট্যাক্সি চালক বল্লে—খুব পারব সাহেব, আপনি উঠে পড়ুন।

দীনেশ কাঁপতে-কাঁপতে গাড়ীতে ওঠা মাত্র গাড়ী ছুটল। নিরুদের গাড়ীখানা তেমন জোরে যাচ্ছি না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দীনেশের গাড়ী তাদের পেছনে গিয়ে উপস্থিত হোলো। দীনেশ গাড়ী থেকেই ডাক দিলে—নিরু!

নিরু চমকে একবার পেছনে তাকিয়ে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত স্থির হোয়ে থেকেই তাদের চালককে বল্লে—এই থামো।

দীনেশের গাড়ীও ততক্ষণে তাদের গাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নিরু তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়তেই গাড়ীর লোকটা চালককে ধমকে উঠল—চালাও—

গাড়ীখানা যেমনি হঠাৎ থেমেছিল তেমনি হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল।

* * *

গাড়ী চলতে আরম্ভ করবার পর দীনেশ ও নিরু হতভম্বের মতন এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে দীনেশ বল্লে—লোকটা কে?

নিরু বল্লে—আমি মনে করেছিলুম বুঝি তুমি! তুমি বলে দিয়েছিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শীষ দেবে, মনে আছে?

দীনেশ কিছু বল্লে না। নিরু বলতে লাগল—ঐ লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শীষ দিতেই আমি উঠে ওর সঙ্গে চলে এলুম। তুমি এখন ডাকবার আগে আমার সন্দেহও হয়নি যে, ও তুমি নয়।

দীনেশ বল্লে—তার চেয়ে সত্যি কথা বল না। স্কুলে পড়বার সময় ঐ লোকটার সঙ্গে প্রেম ছিল, তার পরে অনেকদিন বাদে দেখা হওয়ায় পুরোনো পরিচয়টা একবার—

নিরু কোনো কথা না বলে দীনেশের পিঠে গুম্ করে এক কীল বসিয়ে দিলে।

দীনেশ বল্লে—এই যে পোষাকের গুণ আছে দেখছি। পরতে না পরতে বিদ্যে বেরুচ্ছে।

কোনো রকমে কান্না চেপে নিরু জিজ্ঞাসা করলে—কি গুণ দেখলে?

দীনেশ বল্লে—প্রথমতঃ অন্য একজনের সঙ্গে পালানো হচ্ছিল। ধরা পড়ে বেশ একটা গল্প তৈরি কোরে ফেল্লে। দ্বিতীয় স্বামীকে মারধর শুরু করেছ—

নিরু কোনো উত্তর না দিয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে।

দীনেশ বলে উঠল—এই মুস্কিল করেছে রে! নিরু মুখ তোলো—লক্ষ্মীটি—এই দেখ রাস্তার লোকে হাঁ করে দেখছে—

নিরু তাড়াতাড়ি রুমালে মুখ মুছে ফেল্লে। ঠোঁটের রং চোখের জলে ভিজে খানিকটা গালের ওপর গিয়ে পড়ায় দীনেশ হেসে উঠল নিরু সেটা বুঝতে না পেরে রেগে বল্লে—আবার হাসা হচ্ছে! লোকটাকে কিছু বল্লে না।

দীনেশ বল্লে—বা লোকটার দোষ কি? বরং ওর পছন্দর প্রশংসা করছি। আর কি জান?

—কি?

—তুমি তো না ডাকতেই ওর কাছে গিয়েছিলে। ও তো আর—

নিরু বল্লে—দেখ ওরকম কোরো যদি জ্বালাও তা হোলে আমি সব কথা বাড়ীতে গিয়ে বলে দেব।

দীনেশ বল্লে—আচ্ছা এস তা হলে একটা আপোষ করা যাক। তুমি আমার কথা

কারুকে বোলো না আমি সব কথা বাড়ীতে গিয়ে বলে দেব।

দীনেশ বল্লে—আচ্ছা এস তা হলে একটা আপোষ করা যাক। তুমি আমার কথা কারুকে বোলো না আমিও তোমার কথা কারুকে বলব না।

নিরু আর একটা কীল মারবার জন্য হাত তুলেই হাতখানা নামিয়ে নিলে।

দীনেশ নিরুর উদ্যত হাতখানাকে চেপে ধরে তাকে সাজা দিতে যাচ্ছিল এমন সময় মোটর চালক জিজ্ঞাসা করলে—কিধার যায়েগা সাহেব!

দীনেশ চমকে উঠে বল্লে—হ্যাঁ! ও আচ্ছা—দরিয়া কিনার চলো।

শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

"আলো—কোথায় ওরে আলো—"

এক

কাকীমার কক্ষ হইতে শিশুকণ্ঠের কাতর কান্না শুনিয়া অমলা ত্রস্ত ব্যস্তভাবে সেইদিকে অগ্রসর হইল। দালানের দক্ষিণ দিকে পৌষ-প্রাতে'র সুমিষ্ট তপ্ত রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। কাকীমা শিশুপুত্র বাব্‌লু'র কচি হাত দু'খানি শক্ত মুঠায় ধরিয়া, চাপাগলায় তর্জ্জন কবিয়া বলিতেছেন—হ্যাঁ তোকে সোয়েটার প'রতেই হবে! নইলে খুন ক'রে ফেলব।

দস্যু শিশু বাব্‌লু উচ্চ ক্রন্দনের সঙ্গে মা-এর হাত হইতে প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করিবাব চেষ্টা কবিতে কবিতে, মাথা নাড়িয়া সোয়েটার পরিধানে তার তার একান্ত আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছিল। ধৈর্য্যচ্যুতা মা অবাধ্য পুত্রের গালে সজোরে ঘা'কতক চড় কসাইয়া দিলেন। প্রহৃত-শিশু দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

অমলা ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিয়া কাকীমা'র হাত হইতে বাব্‌লুকে কাড়িয়া কোলে লইতে লইতে করুণ অনুযোগপূর্ণ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—আহা! সকালবেলা উঠতে না উঠতেই ছেলেটাকে এমন নির্ম্মম করে' মারছো কেন কাকিমা?

—ওর সঙ্গে আর পারিনে আমি! এত বড় একগুঁয়ে দস্যি ছেলে, সেই যে জেদ্

ধরেছে—সোয়েটার পরবো না—এ' পর্য্যন্ত কোনও মতেই পরাতে পারলুম না।

—তা' হোক্‌গে। ছোট ছেলে ওর জ্ঞান নেই! তুমি কি ব'লে বাচ্চাটাকে এমন ক'রে মারলে? দেখ দেখি গালটা রাঙা হয়ে উঠলো!!

অমলা'র ভর্ৎসনায় ব্যথা ও ক্ষোভ ঝরিয়া পড়িল। কাকীমা হাসিয়া বলিলেন—ওরে আমিও বিয়ের আগে তোর মতন,—যা'রা ছেলে মারে তাদের উপরে রাগ ক'রতুম অম্‌নি! নিজের পেটে হ'লে বুঝতে পারবি তখন! হাড়-মাস ভাজা করে দেয় ঐ একরত্তি মানুষগুলি!—বজ্জাতীতে ওরা দশটা বুড়ো-মানুষকে হারিয়ে দিতে পারে!

অমলা তখন ভাইকে বুকে লইয়া নানা প্রবোধবাক্যে ভুলাইতেছিল। কাকীমা'র দিকে অভিমান-পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বলিল—তা' বলে তুমি যেমন করে' এদের মারো,—আমি হ'লে জীবনেও পারতুম না!

কাকীমার মুখ চোখে কৌতুকরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাস্যতরলকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছারে আচ্ছা দেখা যাবে! আমিও ছেলেবেলায় ঠিক অমনিই ভাবতুম। রোস্‌না—বিয়ে হোক্‌—ছেলে হোক্‌—তখন আবার বদলে যাবি!

অমলা বিদ্রোহী বাব্‌লুকে আদরে ও সস্নেহবাক্যে বশ করিয়া রাঙা সোয়েটারটি পরাইতে পরাইতে সলজ্জ স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল—আচ্ছা দেখে নিও। আমি কখনও ছেলেদের কোনও রকম কষ্ট দেব না।

ঘরের এক কোণের মশারী-ঢাকা খাটের ভিতর হইতে হাস্যতরল-কণ্ঠে ডাক আসিল—অমল!

অমলা ত্রস্তে কাকীমার দিকে তাকাইয়া লজ্জারক্তমুখে মৃদুস্বরে বলিল—কাকাবাবু ঘরে রয়েছেন? তুমি আমায় বলোনি কাকীমা?

কাকীমা অমলার চেয়ে বছর চার-পাঁচের বড়—উভয়ের মধ্যে সখ্য ভাবটাই অধিক। কাকাকে সম্ভ্রম করিয়া চলিলেও সখী-প্রতিম কাকীমাকে সে মোটেই লজ্জা করিত না।

অমলের কাকাবাবু লেপে'র ভিতর হইতে বলিলেন—অমল! তোর ছেলে হ'লে তাদের কত যত্ন ক'রবি, আমায় একটু নমুনা দিয়ে যা। বেজায় মাথা ধরে' রয়েছে।

মাথা ধরা'র অছিলায় কাকা, শীতের শীতল-প্রাতে তপ্ত-কোমল শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই।

কাকীমা সকৌতুক-হাস্যে অমলা'র দিকে চাহিলেন।

—তুমি কাকা'র মাথা টিপে দাওগে' কাকীমা! আমি বাব্‌লুকে নিয়ে চললুম। বলিয়া অমলা সেখান হইতে অন্তর্হিতা হইল।

দুই

পাঁচ বৎসর পরের কথা। অমলা'র বয়স এখন উনিশ। অনেকদিন হইল তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ফুলের মত সুন্দর-সুন্দর ছেলে মেয়েও তার গুটি দুই তিন হইয়াছিল, কিন্তু সবাই অকালে ঝরিয়া গিয়াছে—! এখন শুধু একটিমাত্র এক বৎসরের কন্যা আছে। তাহারও শরীর মোটেই ভাল নয়, আজন্ম-পীড়িতা! সম্প্রতি তার অসুখ আরও বাড়িয়াছে।

স্বামী হেমেন্দ্রনাথ পশ্চিমে মোরাদাবাদ শহরের বড় ডাক্তার, হাসপাতালে'র প্রধান

কর্তা। পশার এবং আয় ভালই। দেখিতে সুপুরুষ এবং একান্ত পত্নী-প্রেমিক।

অমলারা থাকে শহরের অল্প তফাতে কুশী নদীর ধারে একখানি সুন্দর সাহেবী বাংলোয়। সামনে ঘন-সবুজ টেনিস গ্রাউন্ড। আশে-পাশে বিলাতী লতা, তার ঘন-কুসুমিত সবুজ বল্লরী বিস্তারে বাংলোর সম্মুখস্থ প্রাচীন ও উপরে রক্তবর্ণ টালি'র ঢালু-ছাদটির অর্দ্ধাংশে আবৃত করিয়াছে।

কাল সারারাত্রি ভীষণ ঝড়বৃষ্টির পর আজ ভোরের প্রকৃতি যেন নৃত্যক্লান্তা-নটীর মত অবসন্না হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। সিক্ত সবুজ-বনানীর উপরে প্রভাত-রশ্মির স্নিগ্ধ-সম্পাত যেন কোন্ অশ্রুমুখী তরুণী'র অধরপ্রান্তে সহসা জেগে ওঠা ক্ষীণ-হাসি'র মত চিত্তস্পর্শী।

অমলা সেই দুর্যোগ-ঘন নিশীথের কোনও প্রহরেই কাল একবারও চক্ষু মুদিতে পারে নাই। রুগ্না কন্যার জ্বরতপ্ত ক্ষীণ তনুখানি বুকে লইয়া সমস্ত রাত্রি ভয়ে ভাবনায় আশঙ্কায় কাটাইয়াছে। শেষ-রাত্রি হইতে টেম্পারেচার কমিয়া আসা'র সঙ্গে সঙ্গে, ছটফট করাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া ভোরের বেলায় খুকি শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জাগরণ-ক্লান্তা অমলা'রও চ'খের পাতা দু'খানি ভারী হইয়া জড়াইয়া আসিতেছিল, খুকি'র ছোট্ট বিছানাটির পাশে বাহুতে মাথা রাখিয়া সে'ও ভোরের বেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

দাইয়ের ডাকাডাকিতে যখন অমলার ঘুম ভাঙিল তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া উত্তপ্ত রৌদ্র-কিরণ দেয়ালের গায়ে ও ঘরে'র মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অমলা উঠিয়া বাসায় দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখিল—স্বামী হেমেন্দ্রনাথ ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া আছেন।

পুলকিত দৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাইয়া বিস্ময় আনন্দ বিমিশ্র কণ্ঠে অমলা প্রশ্ন করিল—তুমি কখ্ন এলে ? এর মধ্যেই ফিরলে যে !

হেমেন্দ্রনাথ হাতের 'সার্জারি কেসটি' টেবিলের উপরে রাখিতে রাখিতে বলিলেন—এই মাত্র আসছি—

—খুকুর অসুখের খবর পেয়ে বুঝি ব্যস্ত হ'য়ে চলে এলে ?

—না, সেখানকার কেসটা মিটে—বলিতে বলিতে ঢোঁক গিলিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া হেমেন্দ্রনাথ বলিলেন—হ্যাঁ খুকি'র অসুখের খবর শুনেও মনটা বড় ব্যস্ত হ'ল ত'ই শীগ্‌গির চলে' এলুম।

স্বামীর এই কথা-ঘুরাইয়া-লওয়া লক্ষ্য না করিয়া অমলা চিন্তা-কাতর স্বরে বলিল—খুকু'র জ্বর তো ক্রমশঃ বাড়ছে ! মুখের ভিতর ঘায়ের জন্য ওষুধ খেতে ভারী কাঁদে ! চোখের পূঁজ পড়াও বন্ধ হয়নি—

হেমেন্দ্রনাথ নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—হুঁ !

—তুমি এখানে না থাকায় আমার যা ভাবনা হয়েছিল কি বল'বো ! তুমি এসেছো বাঁচলুম !

খুকি ক্ষীণ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। অমলা ত্রস্তভাবে গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হেমেন্দ্রনাথ ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন—তুমি ওকে দিন রাত্রি অত বেশী ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। ওর সর্ব্বাঙ্গে এক্‌জিমা হয়েছে,—বড় ছোঁয়াচে !

অমলা আহত স্বরে কহিল—আমি না দেখলে কে দেখবে ? যে ক'টা দিন আছে একটু

নেড়ে চেড়ে নিই ? থাকবে বলে' তো আসেনি !

শেষের দিকের কথাগুলিতে তার গলার স্বর ভিজিয়া উঠিল। হেমেন্দ্রনাথ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে শুধু বলিলেন—একটু সাবধানে থেকো !

খুকুকে আল্‌গা ভাবে বুকে চাপিয়া মৃদু দোলা দিতে দিতে অমলা বলিল—কোথায় যাচ্ছ ?

—একবার বাইরে থেকে আসছি—

—খুকিকে একটু ভুলিয়ে আমি এখুনি যাচ্ছি,—তোমার চা জলখাবার সব তৈরী ক'রে দেব। বেরিয়ে যেও না যেন !

—না আমি বাইরেই আছি,—বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রনাথ এসেন্স্ সৌরভে দিক সুরভিত করিয়া, তাঁর জরীপাড় ধুতির ফিন্‌ফিনে ফুল কোঁচাটি ভূমিতে লুটাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অমলা এক দৃষ্টে সেই দিকে স্নিগ্ধ সপ্রেম নেত্রে তাকাইয়া রহিল। স্বামী দৃষ্টির অন্তরাল হইলে সে তার খুকুর শীর্ণ অধরে সন্তর্পণে একটি স্নেহগভীর চুম্বন আঁকিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—খুকু—সোনা আমার—সর্ব্বস্বধন !

তিন

—আর একটুখানি বোসোনা অম্‌লু !

হেমেন্দ্রনাথ স্ত্রীর ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন !

—খুকুকে যে অনেকক্ষণ ফেলে এসেছি,—

—ফেলে এসেছো কই ? তার কাছে তো দাই রয়েছে,—

ব্যথাকরুণ স্বরে অমলা বলিল—হ্যাঁগো, দাইয়ের কাছে ঐ রকম রোগা মেয়ে ফেলে কি মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে ?

হেমেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইয়া মিনতির সুরে বলিলেন—যাবেই তো এখুনি ! এখন সে ঘুমুচ্ছে, ততক্ষণ আমার কাছে ব'সলে কি কিছু দোষ আছে ?

স্বামীর অপ্রতিভ মুখভাব ও মিনতি-সুরের বাক্যে অমলা মনে আঘাত পাইল। সে আবার খাটের উপরে শায়িত স্বামীর কাছ ঘেঁষিয়া উঠিয়া বসিল এবং তাঁহার হাতের আঙুলগুলি আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে দিতে বলিল—আর বোধ হয় তোমার আঙুলের গাঁটে একটুও ব্যথা নেই না ? কোত্থেকে বাত নিয়ে এসে কী ভোগাই ভুগেছিলে বল তো গেল বছরটা ? হেমেন্দ্রনাথ অভিমানের সুরে বলিলেন—এ' বছরটাও বাত হ'লে বাঁচতুম। তবু তোমায় একটু কাছে পেতুম ! এখন তো তোমার দেখা পাওয়ারই জো' নেই !

বাহিরে অজস্র রূপালী জ্যোৎস্না জাম-গাছগুলার উজ্জ্বল চক্‌চকে সবুজ পাতার উপরে অবিরাম পিছলাইয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিন অগ্নিময় 'লু' চলিয়া রাত্রে বাতাসটি অতি স্নিগ্ধতর বহিতেছিল ! অমলা'র পাত্‌লা দেশী সাড়ীর কাঁধের ও মাথার কাপড়টুকু বাতাসে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। হেমেন্দ্রনাথ তাঁর অনিন্দ্য সুন্দরী পত্নীর নবনীত কোমল হাতখানি ধরিয়া তাঁহার জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত মুখখানির পানে মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়াছিলেন।

অমলা স্বামীর বিমুগ্ধ তৃষিত দৃষ্টিতে একটু সঙ্কুচিতা হইয়া উসখুস করিয়া নড়িয়া চড়িয়া

মৃদুস্বরে বলিল—হ্যাঁগা, খুকুর গায়ে যে এক্‌জিমা না গরলের মত হয়েছে সেটা একবার দেখবে ? মুখের ভিতরের ঘা'ও তো সার্‌ল না ? আজ আবার দেখছি ডান চোখ দিয়ে কের্বালি পুঁজ পড়ছে—তোমার বন্ধু ঐ বটু-ডাক্তারটি কোনও কাজের নয় বাপু !

হেমেন্দ্রনাথ গভীর ঔদাস্যভরে বলিলেন—জন্মরুগ্ন হ'লে অমনি একটা না একটা লেগেই থাকে।

কথাটায় অমলা আহতা হইলেও কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল বেশী। তার সন্তান যে জন্মরুগ্নই হয় এবং সে জন্য স্বামীকে যে তার অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তার জন্য অমলা সর্ব্বদাই মনে মনে নিজেকে অপরাধিনী মনে করিত।

হেমেন্দ্রনাথ এবার সাভিমান অনুযোগের সুরে বলিলেন—ওর সেবা ক'রে রাত জেগে জেগে তুমি নিজের শরীর মাটী করছো অমু ! দেখ দেখি,—আগের চেয়ে কত রোগা হ'য়ে গেছ,—চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোমার কিন্তু এই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিশেষ সাবধানে থাকাই উচিত।

কথাগুলি খুবই কাতর সুরে উচ্চারিত হইলেও অমলার ভাল লাগিল না। রুগ্না মৃতকল্পা কন্যার প্রতি অবহেলা করিয়া সুস্থা স্ত্রীর প্রতি হেমেন্দ্রনাথের এই অত্যধিক যত্ন তাহাকে কোনও দিনই তৃপ্ত করিতে পারিত না বরং পীড়াই দিত বেশী।

হেমেন্দ্রনাথ অমলার ক্ষুণ্ণ মুখভাব লক্ষ্য করিলেন। কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন—গ্রীষ্মের ছুটীতে কিশোর এবার আসবে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—সে এলে তোমার খুকু'র সেবা যত্নের খুব সুবিধা হবে।

—হ্যাঁ, কিশোর বড় ভাল ছেলে। সেবা শুশ্রূষায় তার জুড়ি মেলা ভার !

হঠাৎ হেমেন্দ্রনাথ পত্নীকে একেবারে বুকের উপরে টানিয়া লইয়া গাঢ় সোহাগপূর্ণ স্বরে বলিলেন—তোমার জন্যে এবার শহর থেকে একটা চমৎকার জিনিষ এনেছি। এখনই তোমায় দিতে পারি—কিন্তু আমায় তুমি কি দেবে বলো ?

অনেকক্ষণ খুকুকে দাইয়ের কাছে রাখিয়া আসায় অমলা মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল—ঐ সময়ে স্বামীর এইরূপ প্রেমাভিনয় তাহার একটুও ভাল লাগিল না। জোর করিয়া স্বামীর আলিঙ্গন মুক্তা হইয়া নিরুৎসুক মুখের উপরে একটু শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—আমি তোমায় কী আর দেবো বলো ? এ পর্য্যন্ত তো শুধু শোক আর রোগের ঝঞ্ঝাটই তোমায় দিয়ে এলুম—

হেমেন্দ্রনাথ উঠিয়া মাথার বালিশের নীচে হইতে একটি ভেলভেটের সুদৃশ্য কেস্‌ বাহির করিয়া অমলার সম্মুখে ধরিল এবং স্প্রিংটি টিপিতেই বাক্সের ডালা খুলিয়া গিয়া ভিতরে এক ছড়া বহু মূল্য হীরক নেক্‌লেস চাঁদের আলোয় ঝল্‌ঝল্‌ করিয়া উঠিল।

অমলার মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া হার ছড়াটা তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে দিতে হেমেন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিহ্বল-কণ্ঠে বলিলেন—এমন গলা নইলে কি এ' হারের শোভা হয় ?

খুকি পাশের ঘরে কাঁদিয়া উঠিল। অমলা ত্রস্তে উঠিতে যাইতেই হেমেন্দ্রনাথ আবার তাহাকে বাহু বন্ধনে বন্দিনী করিয়া ফেলিলেন !

—ওগো—পায়ে পড়ি এখন ছেড়ে দাও—খুকু কাঁদছে—

যাবেই তো—কিন্তু আমার পাওনাটা—হেমেন্দ্রনাথ অমলাকে আরও নিবিড় ভাবে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

পাশবদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় অমলা কাতর ভাবে মুহূর্ত্তেক ছট্‌ফট্‌ করিয়া—স্বামীর ব্যগ্র ওষ্ঠের উপরে পাওনার দাবী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চক্ষু বুজিয়া ক্রমে এক নিমেষে শোধ করিয়া দিয়া—"ছাড়ো মেয়েটা ক'কিয়ে গেল"—বলিতে বলিতে তাঁহার বাহু মুক্তা হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

চার

আরও কয়েক বৎসর পরের কথা। হেমেন্দ্রনাথ এখন এলাহাবাদে প্র্যাকটিস করেন। অমলার সেই খুকীটি মারা গিয়াছে। তাহার মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যে যে ছেলেটিকে সে কোলে পাইয়াছিল, সে'ই এখন তার একমাত্র সম্বল। কোনও রকমে তাহাতে সে আজ চার বৎসরের করিয়া তুলিয়াছে! তাহারও শরীর মোটেই ভাল নয়। কিছুদিন ধরিয়া চোখের অসুখে প্রায় শয্যাগত হইয়া আছে! অমলার নিজের শরীরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে! বারো মাস গলায় ঘা, জিভে ঘা, অরুচি, খাইতে পারে না। তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যও অনেক খানি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে!

দুপুরবেলা অমলা সিক্ত কেশ-রাশি পিঠে এলাইয়া স্বামীর গরম পোশাকগুলি রৌদ্রে দিয়া 'ড্রেসিং রুম' সাফ করিতেছিল। পাশের ঘরে ছেলে কাঁদিয়া উঠিল—মা—

—কি বাবা ? এই যে আমি—

অমলা ব্যগ্র ব্যাকুল মুখে শয়ন কক্ষে ছুটিয়া গেল।

—মা, তুমি আমার কাছ থেকে উঠে যেও না! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে—

ছেলেকে সন্তর্পণে বুকে তুলিয়া লইয়া নিবিড় স্নেহে ললাট চুম্বন করিয়া গভীরস্বরে মা বলিল—কেন বাবা ? আমি তো সব সময়েই তোমার কাছে আছি!—তুমি কি আজকে আরও ঝাপসা দেখছো ?

—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মুখটা ভালো করে' দেখতে পাচ্ছি না! আমার চশমার কাঁচ দুটো মুছে দাও না মা—

অমলা ছেলের চোখ হইতে ক্ষুদ্র চশমাখানি খুলিয়া, মোটা পুরু কাঁচ দু'খানি আঁচল দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া, ছেলের চোখে পরাইয়া দিয়া, ব্যগ্রভাবে বলিল—এইবার আমাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছো, না বাবা ?

বালক চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া বিস্ফারিত করিয়া বলিল—কই, না তো! বাবাকে বোলো আমার চশমাটা আবার বদ্‌লে দিতে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে—বালক কাঁদিয়া উঠিল।

অমলা কাতর মুখে ছেলের মুখে চোখে কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—তুমি আমায় ফেলে উঠে যেও না মা—

ঘরের দরজায় একটি শ্যামবর্ণা সুশ্রী যুবতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে স্থানীয় অন্যতম বাঙালী ডাক্তার নিত্যেশচন্দ্র বসুর স্ত্রী—প্রভাবতী।

ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রভা অমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—রোগা ছেলে তোমার, কেন তুমি আজ পোষাক রোদে দিতে গেলে দিদি ?

—পোষাকগুলো অনেকদিন রোদে পড়েনি, ঘরখানা অনেকদিন ঝাড়া হয়নি, ধুলো জমে আছে—উনি অপরিচ্ছন্নতা সইতে পারেন না! তাই গেছলুম একবার—

—তা' বলে ঐ ছেলেকে ফেলে উঠলে কি ক'রে ?

—কি করবো ভাই ? আমার ভাগ্নে কিশোরকে এর কাছে বসিয়ে রেখে উঠে গেছলুম ! অসুখ তো আমার কপালে বারোমাসই লেগে আছে ! ওঁর দেখা-শুনো সেবা-যত্ন কিছুই তেমন ক'রতে পারিনে !...আর এই খোকার চোখ নিয়ে কি করি বলতো দিদি ? উনি তো এত ওষুধপত্র দিচ্ছেন,—ওঁর বন্ধু বটু ডাক্তারটিও তো কলকাতা থেকে এসে দেখে গেল,—কিন্তু বাছা'র অসুখ তো দিন দিন বেড়েই চলেছে !—

প্রভা বলিল—আমাদের এখানে যে চোখের খুব বড় একজন 'স্পেশ্যালিস্ট' রয়েছেন, ডাক্তার এল্, এল্, ডেশাই ! তাকে খোকার চোখ দেখিয়ে ছিলে কি ?

—উনি এখানকার কোনও ডাক্তারকে দেখাতে কিছুতেই রাজী হ'ন না। ওঁর ঐ একটা কেমন চিরদিনের খেয়ালের জেদ ! নিজেই ছেলেদের চিকিৎসা করেন। যদি আমি বেশী ব্যস্ত হই, একেবারে কলকাতা থেকে ওঁর বন্ধু বটু ডাক্তারকে এখানেই আনেন—তবু এদেশী ডাক্তারদের দেখাতে চান না !

—বটু ডাক্তারের নাম শুনেছি বটে,—কলকাতায় সে মস্ত ডাক্তার, বত্রিশ টাকা তার ভিজিট ! কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তার ডেশাইকে দেখালে, তোমার খোকার চোখ নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে দিদি !

—দেখি,—কিশোরের সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রে না হয় ডেশাইকেই আনব। উনি তো আজ দিল্লীতে 'কলে' চলে গেলেন। এ ক'দিন দেখবে শুনবেই বা কে ?—

প্রভা মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল—বেটাছেলেদের আর কী বলো ? ওঁদের তো দশ মাস পেটে ধরে ছেলেকে গড়ে তুলতে হয়নি—না খেয়ে না ঘুমিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ ক'রতেও হয়নি—ছেলের দরদ ওঁরা কি বুঝবেন ?—

অমলা সখীর কথায় আঘাত পাইলেও প্রতিবাদ করিতে পারিল না। তাহার স্বামীর পত্নীর প্রতি যত্ন ও অনুরাগ আদর্শের মধ্যে গণনা করা যায়—কিন্তু সন্তানদের প্রতি তাহার অসীম ঔদাস্য—সে তো কোনও মতেই অস্বীকার করা চলে না।

পাঁচ

সে দিন সমস্ত রাত্রি চোখের অসহ্য যাতনায় খোকা ঘুমাইতে পারিল না। কিশোর সকালবেলায় বলিল—মামিমা, আমি ডাক্তার আনতে চললুম। মামাবাবু দিল্লী থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত যদি তুমি অপেক্ষা ক'রতে চাও—ছেলেটা জন্মের মত হয়তো দৃষ্টিহীন হ'য়ে যাবে !

শিহরিয়া অমলা বলিল—চুপ কর বাবা ! ও' কথা বলতে নেই !—তুই ডাঃ দেশাইকে আর ডাঃ নিত্যেশ বসুকে আজই ডেকে নিয়ে আয়।

মামীকে কিশোর যতটা ভালবাসিত ও শ্রদ্ধাভক্তি করিত মামাকে তাহা করিত না,—বরং মামার উপরে তার যেন বেশ একটু বিরাগই ছিল। মোরাদাবাদে মামার চাকরী যাওয়ার পর সে আর এ পর্যন্ত মামার কাছে আসে নাই। অমলার একান্ত অনুরোধে এবার বড়দিনের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইলে এলাহাবাদে আসিয়াছে। এই অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ ছেলেটিকে অমলা সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিত।

ডাক্তাররা যখন ছেলের চোখ পরীক্ষা করিতেছিলেন—অমলা পাশের ঘরে পর্দ্দার

আড়ালে উৎকর্ণা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ডাঃ ডেশাই ইংরাজীতে কথা বলিতেছিলেন,—কথাগুলি বুঝিতে না পারিলেও নিত্যেশবাবুর ও কিশোরের মেঘাচ্ছন্ন মুখভাব ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখিয়াই অমলা বুঝিতে পারিয়াছিল পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক নয়। তার পা' দুটি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে স্মরণ করিতে করিতে সে তাহার চোখের আরোগ্য কামনা করিতে লাগিল।

অমলা আড়াল হইতে দেখিল—ডাঃ ডেশাই ও নিত্যেশ বসু অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতেছেন এবং কিশোর ঘন-অন্ধকার মুখে অপরাধীর ন্যায় মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

খোকা অস্ফুট-ক্রন্দনস্বরে বলিল—মা'র কাছে যাব—

নিত্যেশবাবু তাহার প্রতি একবার ব্যথিত দৃষ্টিপাত করিয়া কিশোরকে বলিলেন,—আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি,—খোকার মা'কে আসতে বলুন।...আহা! নিরপবাধ কত শিশু যে এই রকম তাদের বাপের পাপে কষ্ট পাচ্ছে! হয় অকালে মরছে—না হয় ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকছে!...এরা কি মানুষ? পশুর চেয়েও অধম এরা!—নিজে চিকিৎসক হ'য়ে—নিজের দেহ এই দুরারোগ্য ব্যাধির বিষে ভরা—এ সমস্ত জেনে শুনেও—একটার পর একটা নরহত্যা-শিশুহত্যা করে চলেছে?...আপনার মামাবাবু এলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

ডাক্তার ডেশাইয়ের সহিত নিত্যেশ বসু বাহির হইয়া গেলেন। পর্দ্দার ওপাশে অমলা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

পরে কিশোরকে একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া অমলা যখন ব্যাপারটা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল,—তখন এক মুহূর্তেই তাহার চ'খের সম্মুখ হইতে একটি ঘন-কালো পর্দ্দা যেন সহসা সরিয়া গিয়া—অতীতের অনেক কিছু ভীষণ উৎকট সত্য দৃষ্টিপথে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল!

মোরাদাবাদে যখন একটা স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার উপলক্ষে হেমেন্দ্রনাথের চাকরী গেল—হেমেন্দ্রনাথ অমলাকে বুঝাইয়াছিল—বিদেশী বাঙালী এখানে এসে এত পশার করেছে, হাসপাতালের কর্ত্তা হয়েছে—সেই হিংসেয় হাসপাতালের লোকজনেরা 'নার্স'গুলোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার নামে এই কলঙ্ক দিচ্ছে। আমার চাকরী যাক দুঃখ নেই, কারণ, তুমি আমায় অবিশ্বাস ক'রবে না জানি।

অমলা সেদিন স্বামীর সেই অপমানে—দুঃখ ও ব্যথায় আকুল হইয়াছিল। হিংসুক দুষ্ট লোকগুলিকে মনে মনে কত অভিশাপ দিয়াছিল। কিন্তু, আজ সে ব্যাপারটা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল! এই রকম আরও কত ছোট বড় ঘটনা অমলার মনে পড়িল—যাহা তাহার চোখের সামনে নিরন্তর ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, কিন্তু সে অন্ধের চেয়েও অন্ধের মত সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, তার দুশ্চরিত্র কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর প্রেমে মুগ্ধা হইয়া, একটির পর একটি সন্তান হত্যা করিয়া চলিয়াছে।

অমলা পক্ষাঘাত-গ্রস্তের ন্যায় স্তম্ভিত নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। ও' ঘরে খোকা ব্যাকুল স্বরে কাঁদিতে লাগিল—মা-মা—আমার কাছে এসো—

অমলা উঠিতে পারিল না। কিশোর মামীমার অবস্থা বুঝিয়া নিজেই খোকাকে ভুলাইতে গেল।

অমলার চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার প্রত্যেকটি সন্তানের মৃত্যু-দৃশ্য ! ওঃ তিল তিল করিয়া কী যাতনাই না তারা ভোগ করিয়াছে !...অমলা শিহরিয়া উঠিল,—তাদের সেই যাতনা,—সেই কষ্টের জন্য সে'ও কি দায়ী নয় ?...হ্যাঁ। দায়ী বৈকি ! নিশ্চয়ই দায়ী !

সে মূর্খ অশিক্ষিতা নারী—জননী হইবার উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান যাহার নাই—সে জননী হইয়াছিল কী ভরসায়, কোন্ স্পর্দ্ধায় ?...স্বামীর আদরে সোহাগে প্রেমে সে অন্ধ হইয়াছিল। উঃ কী ভীষণ স্বার্থপর নারী সে ! এই নিরপরাধ শিশুগুলিকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার কি তার প্রায়শ্চিত্ত আছে ?...

স্বামী যে ভালবাসেন, সে কাহাকে ? অমলাকে—না অমলার যৌবন—সুন্দর নিটোল—দেহখানিকে—তার সেই অসাধারণ রূপ-লাবণ্যকে ?...অমলা নিজের প্রতি তাকাইয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল।

ছয়

হেমেন্দ্রনাথ দিল্লীর 'কল' হইতে প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে শিশ্ দিতে দিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁর কালো রংয়ের সাহেবী পোষাকের কোটের বুকে একটা টক্‌টকে লাল মস্ত বড় গোলাপ 'পিন্' করা রহিয়াছে !

হেমেন্দ্রনাথ তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া সহাস্য মুখে সাহেবী ভঙ্গীতে পত্নীকে আলিঙ্গনার্থে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন !

ব্যাঘ্র-ভীত হরিণীর ন্যায় ভীতি-কাতর নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া বিবর্ণ মুখে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া অমলা সে ঘর হইতে প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিশোর তাহার চোখে আস্তে আস্তে 'হট কম্প্রেস' দিয়া দিতেছে। অমলা মৃতের ন্যায় রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে খোকার পাশে গিয়া বসিল। কিশোর মামীর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে উঠিয়া গেল।

অমলা উন্মাদিনীর মত খোকার চোখের পূঁজ-লাগা নোংরা বোরিক তুলাগুলি মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া নিজের চোখে ঘসিতে ঘসিতে আপন মনে বলিতে লাগিল—বাবা আমার ! তোর সঙ্গে আমিও অন্ধ হ'ব ! এত দিন ভুল ক'রে অন্ধ হয়ে থাকায় তোদের এত কষ্ট দিয়েছি—আজ সত্যিকারের অন্ধ হব !

কিশোর তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া অমলার দিকে ব্যগ্র ভাবে অগ্রসর হইয়া বলিল—ক'রছো কি মামিমা ! পাগল হ'য়েছো নাকি ? ঐ বিষাক্ত তুলোগুলো নিয়ে নিজের চোখে লাগাচ্ছ ?—কিশোর হাত বাড়াইয়া অমলার হাতের তুলা কাড়িয়া লইতে গেল।

অমলা কিশোরের সেই প্রসারিত হাতখানি দেখিয়া সর্পদষ্টা'র ন্যায় শিহরিয়া ঘৃণাপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—তুমি, তুমি, ছেলে মেরেছো—না, না আমি,—আমিই 'মা' হয়ে সন্তান হত্যা করিছি। অমলা কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার কান্না শুনিয়া খোকাও কাঁদিয়া উঠিল—মা—মা—

অমলা তাড়াতাড়ি খোকার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ—ও' কথা বলতে নেই। বাপ মা কি কখনও সন্তানকে অন্ধ করে দিতে পারে ?

রাধারাণী দত্ত

'মধুরেণ সমাপয়েৎ'

১

'প্রকৃতির ভিতরে ফিরে যাও'—এ হচ্ছে বর্ত্তমান সভ্যতার সব চেয়ে আধুনিক বায়না !

এবং এ বায়না সনাতনবাবুকে যেন পেয়ে বসল।

কারণ স্ত্রী উন্মাদিনী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা নোটিসেই হঠাৎ একদিন পরলোকে প্রস্থান করাতে সনাতনবাবুর কলকাতায় থাকবার আর কোন জরুরি দরকার রইল না।

এমনি আর এক রকম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই সনাতনবাবু একদা উন্মাদিনীকে বিবাহ ক'রে ফেলেছিলেন এবং সেই সংক্রামক রোগের নাম হচ্ছে, প্রেম।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরদিন সনাতনবাবু মাসিকপত্রে একটি শোকের কবিতা পাঠিয়ে দিয়ে এবং একটি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ভাবতে লাগলেন, "আমার আর কলকাতায় থেকে লাভ কি ! গৃহিণীশূন্য গৃহ তো অন্ধকারে পূর্ণ ! প্রকৃতিকে আমি চিরদিন ভালোবেসে এসেছি, সহর আমাকে কোনদিনই আকর্ষণ করতে পারেনি, অতএব আমি এবারে সুদূর পল্লীগ্রামেই গিয়ে বাস করব ! উন্মাদিনী নেই, কিন্তু সেখানে কবিতা আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবে।...উদার আকাশ, শ্যামল কানন, কোকিলের কূজন এবং ফুলের গন্ধ ! আমি আবার প্রকৃতির ভিতরে ফিরে যাব !"

২

প্রকৃতির উপরে এতটা ভক্তি থাকলেও সনাতনবাবু জীবনে কখনো কল্‌কাতার বাইরে পা বাড়াননি। কাজেই পল্লীগ্রামে গিয়ে তার মনে যে বিমল আনন্দের সঞ্চার হ'ল সে

কথা বলাই বাহুল্য।

বিশেষ এ গ্রামটি সহর থেকে খুব দূরেও নয়, কারণ দরকার হ'লে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই অনায়াসে কলকাতায় নিরাপদে পালিয়ে আসা চলে।

বাগানের পরেই নদী, তারপরে মাঠ, তারপরে সবুজ বন।

পুকুরের ঘাটে ব'সে নদীর কলতান শুনতে শুনতে এবং কবিতা লিখ্তে লিখ্তে সনাতন যখন সেই মাঠের ওপারে সবুজ বনের দিকে চশ্মা—তীক্ষ্ণ চোখ তুলে তাকাতেন, তখন তাঁর মনটি স্বর্গীয় পুলকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত!

এখানে পরনিন্দা করবার ক্লাব, তাসের আড্ডা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ফুটবল-খেলার মাঠ বা স্বদেশী বক্তৃতার সভা নেই বটে, কিন্তু এখানে চারিদিকে যে নিবিড় নীরবতা ও নিশ্চিন্ত শান্তি বিরাজ করছে হতভাগ্য সহরবাসীরা তার মর্ম্ম বুঝতে পারে না ব'লে সনাতনের মনে যথেষ্ট করুণার সঞ্চার হ'ল।

গ্রীষ্মের দুপুরে রোদ যখন ঝাঁ-ঝাঁ করে এবং বাতাস আগুনের হল্‌কা বহন ক'রে আনে, সনাতনের মন তখন মাঝে মাঝে 'ইলেকট্রিক ফ্যান' ও বরফ-জলের জন্যে কাতর হয়ে উঠলেও মনের সে ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা অনায়াসে তিনি দমন ক'রে ফেলতেন।

তারপর এল বর্ষা। সনাতন কবিতায় অনেক বর্ষা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও এ বর্ষার মধ্যে তিনি কিছুমাত্র কবিত্ব আবিষ্কার করতে পারলেন না।

এ বর্ষায় নদী উপছে বাগান ভাসিয়ে দেয়, মানুষকে দিন রাত ঘরের ভিতরে বন্দী ক'রে রাখে, ঝড়ের দাপটে জান্‌লা পর্য্যন্ত খুলতে দেয় না;—সনাতনের মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হ'ল—কিন্তু তখনি নিজেকে প্রবোধ দিয়ে তিনি আবৃত্তি সুরু করলেন—

"এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা..."

৩

বাল্যবন্ধু তপন দিন কয়েকের জন্যে এল সনাতনের সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে বাস করতে।

তৃতীয় দিনের সকালে সে চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে সনাতনের ঘরে ঢুকে ডাকলে, "বন্ধু!"—

বিছানায় শুয়ে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে সনাতন বললে, "উঁ!"

—"আমার জ্বর এসেচে। ম্যালেরিয়া।"

—"কুইনিন আর আদার কুচি খাও।'

"—সে তো খাবই, কিন্তু একেবারে কলকাতায় গিয়ে। আমি আজই পালাব।"

—"সে কি! কেন?"

কোঁচা আন্দোলন ক'রে একপাল মশা তাড়াতে তাড়াতে তপন বললে, "কারণ কলকাতায় ম্যালেরিয়ার মশা নেই।' যাবার আগে তোমাকেও একটা কথা ব'লে যাই শোন। তুমিও কলকাতায় ফিরে চল এবং আবার বিবাহ কর।"

করুণ স্বরে সনাতন বললেন, "প্রকৃতিকে আমি ভালোবাসি। বিবাহ আর এ জীবনে করব না। কলকাতায় গিয়ে লাভ নেই।"

—"বেশ। আমি কিন্তু আজ বিকালের ট্রেণেই কলকাতয় যাব। যে প্রকৃতি

ম্যালেরিয়ার মশা লেলিয়ে দেন, তাঁকে আমি ভালোবাসি না।”

—“কিন্তু আজকের দিনটা থেকে যাও না! কাল এখানে দুটি মহিলা আস্‌বেন।”

—“মহিলা ?”

—“হ্যাঁ। একলা থাকি, গান শিখতে সাধ হয়েচে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম “মহিলা সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক”। কাল দু'জন মহিলা আসবেন, তাঁদের একজনকে পছন্দ ক'রে রাখব।”

—“কি ক'রে পছন্দ করবে ? রূপ দেখে, না গান শুনে ?”

সনাতন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—“গান শুনে।”

—“কিন্তু তুমি গান শিখবে তো মহিলাকে দরকার হ'ল কেন ? পুরুষে কি গান শেখাতে পারে না ?”

—“সঙ্গীতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন নারী,—ও বিদ্যা পুরুষের কাছে শেখা উচিত নয়।”

—“তোমার কথা শুনে থাকতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, ম্যালেরিয়ার উপরে গান আমার সহ্য হবে না।”

৪

পরদিন প্রভাতে উঠে সনাতন দেখলেন, আজ আর জ্বর নেই। এতে তাঁর মনটি এমন খুসি হয়ে উঠল যে, তাড়াতাড়ি সাবান মেখে তিনি চিরুণী ও বুরুস নিয়ে চুল আঁচড়াতে ব'সে গেলেন।

বেলা নয়টার সময়ে বেয়ারা এসে খবর দিলে, দুজন মেয়েমানুষ তাঁকে ডাকতে এসেছে।

সনাতন বুঝলেন, এঁরা তাঁরই শিক্ষয়িত্রী, সকালের ট্রেণেই দুজনে একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, “যা, যা, তাঁদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা গে যা !”

তাড়াতাড়ি আর্সিতে নিজের মুখখানি দেখে নিয়ে এবং দীর্ঘ কেশগুচ্ছের উপরে চিরুণীর সাহায্যে গোটাকয়েক ‘ফিনিসিং টাচ্’ দিয়ে সনাতন বাইরের ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর বাড়ীর কাছেই কোথায় কুকুরের লড়াই হচ্ছে।

আরো কয়েক পা এগিয়ে শুনলেন, তাঁর বাইরের ঘরের বাড়ীর কাছেই কোথায় কুকুরের লড়াই হচ্ছে।

আরো কয়েক পা এগিয়ে শুনলেন, তাঁর বাইরের ঘরের ভিতরে যেন দুটো বিড়ালের যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে !

সনাতন কুকুরের অত্যন্ত ভয় করতেন এবং বিড়ালকে করতেন অত্যন্ত ঘৃণা। মনে মনে বিরক্ত হয়ে বাইরের ঘরের ঢুকে তিনি যে দৃশ্য দেখলেন তা হচ্ছে হুবহু এই :—

ঘরের ভিতরে দুটি মহিলা দুখানা চেয়ারে পরস্পরের কাছ থেকে যতটা তফাতে সম্ভব টেনে নিয়ে গিয়ে ব'সে আছেন।

একজনের বয়স বছর পঞ্চাশ, দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর সেই

মাথায়-খাটো আড়ে-বড় চেহারা দেখলেই মনে হয়, সেকালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাকে। তিনি হেঁট হয়ে একটি টেরিয়ার-জাতীয় কুকুরের বগলোস দুই হাতে প্রাণপণে চেপে আছেন।

আর একজনের বয়স হবে বছর পঁচিশ। রং উজ্জ্বল শ্যাম, দেহখানি ছিপ্‌ছিপে ও মুখখানি সুন্দর বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর কোলের উপরে একটি ছোটখাট, লোমশ, জাপানী কুকুর।

ঘরের মেঝের উপরে একরাশ সাদা ও কালো লোমের থোপা প'ড়ে রয়েছে, কিছুক্ষণ আগে এই লোমগুলি যে ঐ জাপানী কুকুরের গায়ে সংলগ্ন ছিল, তা বুঝতে বেশী বিলম্ব হয় না।

দুটি মহিলাই তীব্র কণ্ঠে পরস্পরকে কি বলছিলেন এবং তাঁদের কুকুর দুটিও সেই সঙ্গে সারমেয়-ভাষায় আপন আপন মতামত ব্যক্ত করছিল।

সনাতন ঘরের ভিতরে ঢুকতেই দুই মহিলা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করলেন—"মশাই, এ কি ব্যাপার, আমার 'টমে'র লোম ঐ রাক্কুসে কুকুরটা" (কোঁ, কোঁ, কোঁ)—"কখ্‌খনো নয়, আমার কুকুর অতি ঠাণ্ডা! (গরর্‌-গরর্‌—র্‌-র্‌-র্‌) তা ব'লে ঐ পুঁচকে কুকুরটা হঠাৎ যদি তাকে অপমান করে 'জ্যাক্' তা সহ্য করবে কেন?" (কোঁ, কোঁ, কোঁ এবং গরর-গরর্‌-র্‌-র্‌-র)—"মশাই, ঐ রাক্কুসে কুকুরের কীর্ত্তি দেখেন, ঘরময় লোমের গোছা দেখেচেন? (কোঁ-কোঁ-আঁউ-উঁ-উঁ) টম, চুপ করো! ঐ লোমগুলো গজাতে কতদিন লাগবে বলুন দেখি? আমি"—"মশাই, ঐ মেয়েটি আপনার বন্ধু কিনা জানি না, কিন্তু ওঁকে বারোন করুন আমার এই খাস-বিলিতি কুকুরকে উনি যেন বার বার রাক্কস ব'লে না ডাকেন। (গরর্‌-র-র্‌-র্‌—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ), আমার জ্যাক্ রাক্কসও নয়, ওঁর কুকুরের মত মর্কটও নয়!"—"শুনলেন মশাই, টমকে উনি মর্কট ব'লে গালাগাল দিলেন! আমার টম মর্কট?—আরে গেল, যা নয় তা!" (তার পরেই একসঙ্গে দুজন মানুষ ও দুটো কুকুরে যে-গোলমাল সুরু করলে, সনাতন তার ভিতর থেকে আর কোনরকম অর্থই সংগ্রহ করতে পারলেন না!)

শেষকালে সকলেই যখন হাঁপিয়ে প'ড়ে চুপ করতে বাধ্য হল, সনাতন তখন কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "আপনারা একটু জিরিয়ে নিন, তারপর যা বলবার একে একে বলুন!"

প্রাচীনা মহিলাটি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আমি হলুম গিয়ে মাতঙ্গিনী সেন, আজ পঁচিশ বৎসর ছাত্রী-মহলে গান শিখিয়ে নাম কিনেচি, আমার কিনা আজ এই অপমান? আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে কথা—"

সনাতন বাধা দিয়ে বললেন, "উনি আমার বন্ধু নন, আপনার মত উনিও এখানে গান শেখাতে এসেচেন!"

—"আপনার কি দুজন লোকের দরকার?"

—"না। আপনাদের মধ্যে একজনকে আমি নিযুক্ত করব।"

—"আপনি কি ভাবচেন, ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে আমি প্রতিযোগিতা করব? অসম্ভব!" ব'লেই মাতঙ্গিনী দাঁড়িয়ে উঠলেন!

—"মুচিপাড়ায় আর ডোমপাড়ায় যে গান শেখায় তার সঙ্গে আমিও আর এখানে থাকতে রাজি নই,—আসি মশাই, আমি আর একদিন দেখা করব"—ব'লেই অন্য মহিলাটি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং শ্রীমতী মাতঙ্গিনীও সেইসঙ্গে বাইরে যেতে

কিছুমাত্র দেরি করলেন না !

সনাতন বুঝলেন, তিনি একদিনেই এই দুই মহিলাকে আহ্বান ক'রে প্রথম শ্রেণীর বোকার মতন কাজ ক'রেছেন। নারীজাতির মধ্যে একতার শোচনীয় অভাব দেখে তিনি আজ অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন এবং একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে হতাশভাবে ধপাস্ ক'রে শুয়ে পড়লেন। ...

হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে সনাতন চম্‌কে চেয়ে দেখলেন, মাতঙ্গিনী আবার তাঁর জ্যাককে নিয়ে ফিরে এসেছেন !

সনাতন দুঃখিত হলেন কি আনন্দিত হলেন তা বোঝা গেল না। তিনি উঠে শুধু বললেন, "বসুন।"

মাতঙ্গিনী চেয়ারের উপরে তাঁর বিপুল দেহ-ভার ন্যস্ত ক'রে বললেন, "আবার ফিরে এলুম কেন জানেন ? প্রথমত ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে এক গাড়ীতে আমি কলকাতায় যেতে চাই না। দ্বিতীয়তঃ ও ব'লে গেল আবার আর একদিন এখানে আসবে। আমি ওর আগেই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে চাই।"

সনাতন সন্দেহপূর্ণ নেত্রে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসেচেন বেশ করেচেন, কিন্তু আপনার কুকুরকে বাঁধুন।"

মাতঙ্গিনী বললেন, "কোন ভয় নেই, আমার জ্যাক ভেড়ার মত ঠাণ্ডা। অপমান না করলে কখনো রাগে না।"

ইতিমধ্যে জ্যাক এসে ঘরময়-ছড়ানো তার জাপানী প্রতিযোগীর চুলগুলো আগে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুঁকে পরীক্ষা করলে। কিন্তু তার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে টেবিলের একটা পায়া চর্ব্বণ করতে প্রবৃত্ত হ'ল।

সনাতন ভয়ে ভয়ে চেয়ারের উপরে নিজের পা দু'খানা তুলে ফেললেন।

মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কে গান শিখবেন ? আপনার স্ত্রী ?"

—"না। আমিই গান শিখব।"

মাতঙ্গিনী সবিস্ময়ে বললেন, "আপনি গান শিখবেন !"

—"সেজন্যে আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন ?"

—"আজ পঁচিশ বৎসরের ভিতরে কোন পুরুষ আমার কাছে গান শেখে নি !"

—"তার কারণ বোধ হয় পুরুষরা আজও নারীর কাছে খাটো হ'তে চান না। আমার মন সে-রকম সংকীর্ণ নয়। আমি নারীকে সম্মান করতে জানি।"

—"কিন্তু—"

শ্রীমতী মাতঙ্গিনীর মুখের কথা মুখেই রইল—ঘরের ভিতরে অকস্মাৎ যেন ভূমিকম্প উপস্থিত হ'ল।

৬

যে নবীনা মহিলাটি রাগ ক'রে সনাতনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন, তাঁর নাম কুমারী কমলা রায়। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ভদ্র-পরিবারে গান শিখিয়ে জীবিকা অর্জ্জন

করেন। কমলা ষ্টেশনের পথে সমান এগিয়ে চললেন। পিছনে সেই মাতঙ্গিনী আসছে জেনে একবারও ফিরে তাকালেন না এবং পাছে সেই 'রাক্কুশে' কুকুর আবার তেড়ে আসে তাই টমকেও আর কোল থেকে নামালেন না।

কিন্তু ক্রমেই তাঁর হাত ভেরে এল। তখন তিনি বাধ্য হয়ে পাশের একটা সরু পথে ঢুকে টমকে কোল থেকে নামিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নিলেন।

এতক্ষণে মাতঙ্গিনীর ঘৃণাজনক মূর্ত্তি নিশ্চয়ই ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে!...আচ্ছা, এক কাজ করলে কি-রকম হয়? মাতঙ্গিনীর সঙ্গে এক-গাড়ীতে কলকাতায় ফেরাও বিড়ম্বনা—ষ্টেশনে গেলেই আবার তার সঙ্গে চোখাচোখি হবে! তার চেয়ে সনাতনবাবুর সঙ্গে আর একবার দেখা করলে দোষ কি? কাজও হবে, পরের গাড়ীতে নিশ্চিন্তে হয়ে কলকাতায় যাওয়াও চলবে!...এমনি সাত-পাঁচ ভেবে কমলা আবার যে পথে আসছিলেন, সেই পথেই ফিরলেন।

...বাগান পেরিয়ে কমলা ধীরে ধীরে সনাতনের বৈঠকখানার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর টম সদ্য লব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে পূর্ব্ব-বিপদের কথা বেমালুম ভুলে, ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আগেই ঘরের ভিতরে ঢুকল এবং—

—এবং বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত পরমুহূর্ত্তেই জ্যাক এসে টমের ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়ল!...

এবারে দুই কুকুরে যে যুদ্ধ সুরু হ'ল, এর তুলনায় গেল-বারের লড়াই অসম্পূর্ণ ও প্রাণহীন 'রিহার্সাল' মাত্র! তিন-চারখানা চেয়ার ঘরের মেঝেতে উল্টে পড়ল, ত্রিপায়ার উপর থেকে একটা দামী বড় ঘড়ী প'ড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এবং সনাতন আতঙ্কে একলাফে টেবিলের উপরে উঠে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন।...অবশেষে মাতঙ্গিনী যখন অনেক কষ্টে তাঁর "ভেড়ার মত ঠাণ্ডা" জ্যাক্‌কে শিক্‌লির দ্বারা বন্দী করলেন তখন টমের কামড়ে তার একটা কানের অর্দ্ধাংশ অদৃশ্য হয়েছে!

ওদিকে টম যখন রক্তাক্ত কলেবরে জাপানী ভাষায় আর্ত্তনাদ করতে করতে ঘরের এককোণে গিয়ে আশ্রয় নিলে, তখন তার অবস্থা দেখে কমলা একখানা সোফার উপরে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সনাতন চেঁচিয়ে বললেন, "ওরে কে আছিস্ রে, শীগগির আমার বন্দুকটা নিয়ে আয়!"

মাতঙ্গিনী সচমকে বললেন, "বন্দুক? বন্দুক কি হবে?"

—"আপনার কুকুর পাগলা। গুলি ক'রে মারব।"

মাতঙ্গিনী আর একটিও কথা কইলেন না, একবার বক্র-কটাক্ষে কমলার দিকে চেয়ে জ্যাককে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সনাতন তৎক্ষণাৎ টেবিল থেকে নেমে প'ড়ে কমলার পাশে গিয়ে ব'সে ডাকলেন—"বেয়ারা, বেয়ারা! জল্‌দি পাংখা লে আও—পানী লে আও!"...

কমলাকে পাখার হাওয়া করতে করতে সনাতন দেখলেন, তার মুখখানি সত্যই সুন্দর! সে মুখের উপযোগী একটা নূতন উপমা খুঁজলেন, কিন্তু তাঁর স্মরণ হ'ল না।...সনাতন মনে মনে বললেন, "হুঁ, গান যদি শিখতে হয়, এঁর কাছেই শেখা উচিত। এঁর গান না শুনেই বুঝেচি, এমন গাইয়ে আর দুটি পাব না।...হে ভগবান, শ্রীমতী মাতঙ্গিনী আর যেন ফিরে না আসেন!"

৭

মাস দুয়েক পরে কলকাতার রাস্তায় তপনের সঙ্গে সনাতনের দেখা।

—"কি হে সনাতন, খবর কি ?"

—"শুভ। আসচে মাসে আমার বিবাহ।"

—"সে কি হে, কার সঙ্গে ?"

—"যাঁর কাছে প্রাণ দিয়ে গান শিখ্‌ছিলুম। —তাঁর নাম কমলা দেবী।"

—"আর 'প্রকৃতির ভিতরে ফিরে' যাবে না ?"

—"নিশ্চয়ই নয় ! কমলা দেবী কুইনিন আর আদার কুচি খেতে তোমার চেয়েও নারাজ !"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাইজি

তার নাম ছিল হরিদাস। রূপ্‌সা নদীর তীরে ছোট একখানি গ্রামে খুব ছোট একখানি বাড়ীতে সে থাকিত। রূপসা আগে তাহার বাড়ীর এত কাছে ছিল না। কয়েক বছরের মধ্যে ভাঙিতে ভাঙিতে নদী তার বাড়ীর বড় কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ছেলে বেলায় সে ভাবিত, আসুক আরও কাছে আসুক ; তার ক্ষুদ্র কুটীরের প্রাঙ্গণ দিয়া চলৎ ছলৎ করিয়া নদীর ঢেউ বহিয়া যাক্ ! একটু বড় হইয়া যখন সে দেখিল যে, নদী ঠিক তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য আসিতেছে না, তখন সে ভাবিত হইল। এবারে বর্ষায় যখন তাহাদের সাধের বাগান নদীর গর্ভে চলিয়া গেল, তখন তাহার উদ্বেগের অন্ত রহিল না। সেই বাগানের আম কাঁটাল কলা কুমড়া বিক্রয় করিয়া যে তাহাদের কোনও মতে সংসার চলিত ! এখন কি উপায় হইবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

সংসারের ভাবনা কোনও দিন তাহাকে বড় ভাবিতে হয় নাই। সে শুধু বাপমায়ের

আদুরে ছেলে ছিল না ; তাহাকে পল্লীর সকলেই ভালবাসিত। ছেলেরা যে বয়সে পদার্পণ করিলে, তাহাতে সমস্ত কমনীয়তা পাতার মধ্যে ফুলের মত স্নিগ্ধ সুষমায় ফুটিয়া উঠে, হরিদাস সেই বয়সে পড়িয়াছিল। তাহার দিকে একবার যে চাহিত, সে সহজে চোখ ফিরাইতে পারিত না। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে নবকিসলয়ের শোভা ফুটিয়া উঠিত। তাহার কুঞ্চিত কেশ যেন ইবনীর ফ্রেমে মুখচ্ছবিখানি বেড়িয়া রাখিয়াছে এইরূপ দেখাইত। তারপর যখন সে রূপসার কূলে বকুলের মূলে দাঁড়াইয়া গান গাহিত, তখন নৌকার মাঝিরা দাঁড় থামাইয়া গান শুনিত। হাটের লোক মাথার বোঝা কাঁধে নামাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত।

কিন্তু জীবনের এই প্রভাত-বেলায় মেঘ উঠিয়া সমস্ত আলো ম্লান করিয়া দিবার যোগাড় করিল। তাহার পিতা পুত্রের জন্য শেষ অশ্রুবিন্দু নিঃশেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সংসার আর চলে না। বাড়ীও বুঝি রূপসার ক্ষুধা মিটাইতে শীঘ্রই অগ্রসর হইবে! পড়শীরা পরামর্শ দিল, জমিদারের বাড়ীতে গিয়া কাঁদাকাটা কর, মনীবের দয়া হইলে এর অপেক্ষা ভাল বাড়ীও পাওয়া যাইতে পারে। শেষে তাহাই স্থির হইল। সে এক দিন অতি প্রত্যূষে শুভ যাত্রা করিয়া রওনা হইল। জননী কাঁদিয়া কাটীয়া বিদায় দিলেন।

২

হরিদাস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জমিদার বাড়ীতে পৌঁছিল। ইসফ্‌পুরের জমিদার রায় বাবুরা দেশবিখ্যাত লোক। তাঁহাদের হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া এবং গোলায় অপর্য্যাপ্ত ধান। অতিথি অভ্যাগত দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া তাঁহাদের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। ইঁহাদের কুলদেবতা শ্যামরায়ের মন্দিরের চারিদিকে বিস্তীর্ণ চত্বর এবং চত্বরের প্রান্তে অতিথিশালা। সারি সারি ঘরগুলি সর্ব্বদা লোকজনের কোলাহলে মুখরিত। অতিথিরা সকলেই শ্যামরায়ের প্রসাদ পান। দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতেই অতিথি সেবা হয়। কাজেই অতিথি নারায়ণ শ্যামসুন্দরের পারিষদ্‌রূপে অবস্থিতি করেন।

জমিদারের কর্ম্মচারীর নিকটে হরিদাস এতেলা করিলে, তিনি অতিথিশালার একটি ক্ষুদ্র কুঠুরীতে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সে 'দরবারী' ; দূর হইতে যে সকল প্রজা দরবার করিতে আসিত, তাহাদের জন্য অতিথিশালার একপ্রান্তে কতকগুলি ঘর খালি রাখা হইত। তাহারা শ্যামরায়ের প্রসাদ পাইত, জমিদারের অবসর হইলে 'দরবার' করিত এবং দরবার-সিদ্ধ বা অ-সিদ্ধ হইলে চলিয়া যাইত।

হরিদাসের মত আরও কত লোক অতিথিশালায় আশ্রয় লইয়াছে। সে তাহার মধ্যে একটিও পরিচিত লোক না পাইয়া হাঁফাইয়া উঠিল! এমন একটিও লোক সে সেই জনতার মধ্যে পাইল না, যাহার সহিত দুটো কথা কহিয়া মনটা জুড়ায়।

সন্ধ্যার পরে শ্যামরায়ের আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিশ্রম ভুলিয়া ছুটিল। দেখিল, সুন্দর সুঠাম ঠাকুর ; মোহন বেশ! অলঙ্কারের বাহার। তাহার উপর হীরামতিপান্না ঠাকুরের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছে। ফুলের সাজে, আলোর ঘটায় রূপ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যতক্ষণ আরতি হইল, সে পলকহীন চোখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। আরতি শেষ হইলে, সকলের সহিত 'গড়' করিয়া প্রণাম করিল। তাহার পিছনেই নাটমন্দিরে। সে এতক্ষণ সেদিকে একবারও ফিরিয়াও চাহে নাই।

এইবার সেখানে বাজনা শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল। নাটমন্দিররের ঝাড়-গেলাস বাতিদান সব জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বহু লোক সেখানে সমবেত হইয়াছে। মাঝখানে মূল্যবান গালিচা পাতা। সেই গালিচার সম্মুখে নানা আভরণভূষিতা একটি সুন্দরী রমণী। হরিদাস তেমন সুন্দরী জীবনে কখনও দেখে নাই।

বড় মধুর বাজিতেছিল। সারেং যেন কথা কহিতেছিল। এ যেন মানুষের গলায় কেহ সুরের মিছরী গলাইয়া ঢালিয়া দিয়াছে। তাহার কোমল মূর্চ্ছনাগুলি যেন প্রজাপতির অলস পক্ষে গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলাশেষে কুসুমগন্ধের মত ভাসিয়া আসিতেছিল। হরিদাস যেখানে ছিল, সেখানেই মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রমণী একখানি হাত তুলিল। কঙ্কণ রুণু রুণু করিয়া বাজিয়া উঠিল। তার পরেই সুধাবর্ষী কণ্ঠে গান উঠিল :

'যমুনা তটে শ্যাম গেলে হোরি যমুনা তটে—

রমণীর কণ্ঠ বড় কোমল। অঙ্গ ভঙ্গীর দ্বারা সে হোলি খেলার নটন-লীলা সুন্দর পরিস্ফুট করিয়া দিল। শ্রোতারা বিমুগ্ধ নেত্রে দেখিতে লাগিল। এমন সময় স্বয়ং জমিদার আসিলেন (হরিদাস পরে শুনিল যে তিনিই জমিদার)। গালিচার উপরে তিনি বসিলেন, তাঁহার দুই চারিটি মোসাহেবও বসিল। বাইজি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল এবং আরও অনেকে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল।

রমণী গান ধরিল—

সব সখি মিলি ঘেররি কুঞ্জবনসেঁ
না নিকসে কান্হাইয়া।

সঙ্গীতের মোহন ভঙ্গীতে মনে হইল যেন বহু সখি মিলিয়া কুঞ্জদ্বারে আবীর পিচকারী লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে! কণ্ঠে ও যন্ত্রে মিলিয়া যেন রীতিমত তাণ্ডব জুড়িয়া দিল। জমিদার স্বয়ং উচ্চ কণ্ঠে তারিফ্ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি উঠিল। রমণী সহাস সম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। হরিদাস একবার শ্যামসুন্দরের দিকে ফিরিয়া দেখিল ; তাহার মনে হইল, যেন তাঁহারও বিম্বফলের মত অধরে প্রশংসার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গান শেষ হইলে অধিক রাত্রে হরিদাস আসিয়া শুইয়া পড়িল। প্রসাদ পাইবার কথা তাহার মনে ছিল না। ঠাকুর বাড়ীর লোক যখন তাহাকে ডাকিতে আসিল, তখন সে ইন্দ্রের সভার স্বপ্ন দেখিতেছে। অপ্সরারা সব নৃত্যগীত করিতেছে, আর সে একপাশে দাঁড়াইয়া তাহা উপভোগ করিতেছে।

৩

পরদিন প্রাতে উঠিয়া সে ভুলিয়া গেল যে কি জন্যে সেখানে সে আসিয়াছে। ভুলিয়া গেল রূপসার ডাক, ভুলিয়া গেল তাহার জননীর করুণা ভরা দৃষ্টি। সে দেখিল অতিথিশালার একটি কক্ষের সম্মুখে সতরঞ্চ বিছাইয়া গত সন্ধ্যাব সেই গায়িকা তাহার বস্ত্রালঙ্কার গুছাইতেছে। হরিদাস একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পল্লীবালকের মূক বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টি সে বহুবার দেখিয়াছে। কিন্তু এই কিশোরবয়স্ক বালকের মুখে সে এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল, শ্যামরায়ের কোনও রাখাল-সখা

যেন তাঁহারই সন্ধানে এখানে আসিয়াছে। কত বালকই ত তাহাকে সকালে সন্ধ্যায়, দিবসে দুপ'রে দেখিবার জন্য নিত্য আনাগোনা করে! কিন্তু এমন স্থির স্নিগ্ধ সরল নয়নের জ্যোতিঃ এ বালক কোথা হইতে পাইল ? রমণী বার বার তাহাই ভাবিতে লাগিল। বসন গুছাইতে গুছাইতে এক একবার চোখ তুলিয়া দেখে, আর মনে মনে প্রশ্ন করে, এই সরল সৌম্য কিশোরমূর্ত্তি প্রভাতের বালরবি—কিরণরাশির মধ্যে কোথা হইতে নামিয়া আসিল ?

রমণী অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাহাকে আসিতে বলিল। হরিদাস অসঙ্কোচে সতরঞ্চের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, বসিল না। রমণী তাহার লজ্জারক্তিম শ্যামশ্রী দেখিয়া বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিল। জিজ্ঞাসিল—

"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

হরিদাস অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার বাক্য নির্গত করাইতে পারিল না। রমণী হাসিয়া উঠিল ; বলিল—

"গ্রামের নাম ভুলে গেছ ?"

"না, ভুলি নি"—

"তবে, বল্‌তে পাচ্ছ না যে ?"

"আমরা মালঞ্চের লোক ; মালঞ্চ হেথা থেকে অনেক দূর—"

"মালঞ্চ ! মালঞ্চ ! বাঃ খাসা নামটি ত—তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম হরিদাস। আমরা বোষ্টম—বাড়ীতে আমার মা আছে—"

"এখানে বুঝি গান শুনতে এসেছ ?"

হরিদাস একটু ইতস্ততঃ করিয়া মিছা কথাই বলিয়া ফেলিল। বলিল—

"হুঁ।"

রমণী যে সুখী হইল, তাহা বেশ বুঝা গেল। দেশ বিদেশ হইতে কত লোক তাহার গান শুনিতে আসে ! এ ছেলেটিও তাহার খ্যাতি শুনিয়া অনেক দূরের কোন্ মালঞ্চ থেকে আসিয়াছে। রমণী বলিল,

"বোসো। কেমন গান শুন্‌লে ?"

হরিদাস অকপটে বলিল—"খুব ভাল ! এমন গান কখ্‌খনো শুনিনি—"

গায়িকার নয়ন যুগল প্রীতভরা আবিলতায় হরিদাসের মুখের উপর স্থাপিত হইল, বক্ষস্থল হর্ষে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। সে দুই হস্তে হাতার মুক্ত কেশরাশি গ্রীবাদেশ দুলাইয়া তাহার উপর ভাল করিয়া ছড়াইয়া দিল।

হরিদাস তাহার রূপের প্রখর তেজ দেখিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রহিল।

৪

হরিদাস বয়সে কিশোর, কিন্তু শিশুর মত সরল। কৈশোরের মাধুর্য্যে সে ঢল ঢল করিতেছে, কিন্তু সে নিজে তাহার কিছুমাত্র খোঁজ রাখে না। যৌবন নিজের পূর্ণতায় নিজে বিভোর ; কৈশোর একেবারেই আত্মবিস্মৃত। যৌবন নিজের উছলিত তরঙ্গ দেখিয়া মুগ্ধ ; অন্য কোনও দিকে সে তাকায় না। কৈশোর ভুলিয়াও নিজের দিকে চাহিয়া দেখে না। তাই কৈশোর এত মিষ্ট।

গায়িকার নিকটে এই অচপল শিশুর সজীব প্রফুল্লতা বড়ই মিষ্ট লাগিল। তাহার

ব্যবসায় বিশুষ্ক প্রাণে এই বালক যেন নিদাঘ সন্ধ্যার একটু ফুরফুরে হাওয়া বহাইয়া দিল। তাহার গানের সুযশ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। অর্থ মান যত্ন আদর তাহাকে সাধিয়া বরণ করিয়াছে। রূপ যৌবন ও কণ্ঠ—এই তিনের একত্র সমাবেশ হইলে যাহা হয়, বিলাসিনীর ভাগ্যে তাহা হইয়াছিল। কত ধনী-সন্তান তাহার পায়ে আত্ম-বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। তাহার এক একটি কটাক্ষে এক দিন সুবর্ণমুদ্রার পুষ্পবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সে যৌবনের তৃতীয় যামে পদার্পণ করিলেও তাহার রূপলাবণ্য সমভাবেই আছে।

কিন্তু তাহার রূপের দ্যুতিতে হরিদাসের চোখ ঝলসিয়া গেলেও মন বাঁধা পড়ে নাই। তাহার মন মধুপের মত শুধু তাহার সঙ্গীতের চারিধারে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইত। গানের মজলিসে হরিদাস নিকটে বসিয়া হাঁ করিয়া গীত বাদ্য শোনে। গান জমিয়া উঠিলে, তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বিলাসিনী তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আরও মীড় দিয়া গানে কোমলতার সঞ্চার করে। ব্যবসাদারের গান যেমন মামুলী ধরণে সুরের কৃত্রিম জাল বুনিয়া চলিয়া যায়, বিলাসিনীর গান তাহা হইতে বেশ পৃথক হইয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠে নব নব মূর্চ্ছনা ফুটিয়া উঠিয়া গীতকে বড়ই সরস করিয়া তুলিল। মনে হইল যেন হৃদয়ের কোনও নিভৃত কোণে বহুদিন যে উৎস রুদ্ধ ছিল, আজ তাহা ছাড়া পাইয়া মৃদু কলতান তুলিয়া ছুটিয়াছে।

হরিদাস জগতের কোনই খবর রাখে না। সে যে জগত বিচরণ করিত, সে এক স্বপ্নের জগৎ। সুর দিয়া সে জগৎ তৈরী ; তাহার প্রতি কম্পনে, প্রতি মূর্চ্ছনায় সে জগৎ নিত্য নব মাধুরীতে বিকসিত হইয়া উঠে ! কত পরী, কত দেববালা সে সুরের তরঙ্গে প্রজাপতির রঙ্গীন পাখা মেলিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া আসে, ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায় ! তাহার প্রাণও সেই তরঙ্গের ছন্দে নাচিয়া নাচিয়া গুঞ্জন করিয়া উঠে ! একি সুন্দর অনুভূতি। এমনটা সে জীবনে কখনও অনুভব করে করে নাই। বিলাসিনীর সুরের গমকে রূপসার কলকল্লোল মিলাইয়া গেল। তাহার কঙ্কণ-শিঞ্জিতের তুলনায় সেই পল্লী জীবনের মধুময় স্পন্দনটুকু বড়ই পুরানো একঘেয়ে বলিয়া ঠেকিল।

সে যে কি জন্য রায়পুরে আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। যতক্ষণ সে বিলাসিনীর সঙ্গে থাকিত, ততক্ষণ তাহার আহার নিদ্রা থাকিত না। বিলাসিনী যে সুরের বিগ্রহ-প্রতিমা ! হরিদাস জীবনে সুরকে চিনিত ; কিন্তু সে সুর কখনও ত ধরা দেয় নাই। আজ যেন সে সুর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার বিমুগ্ধ আঁখির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সে সেই সুরের নেশায় দিবারাত্রি বিভোর হইয়া থাকিত। যখনই সে একলা বেড়াইত, তখনই সে আপন মনে গুণ গুণ করিয়া সুরের পশ্চাতে মালতীর পরিমলে মুগ্ধ মধুকরের ন্যায় ফিরিত। একদিন কাছারীর একজন কর্ম্মচারী তাহাকে ঐরূপ গুণ গুণ করিতে দেখিয়া বলিল—

"কিহে ছোক্‌রা, বেশ মসগুল হয়ে আছ দেখছি। —মালপো ভোগ বেশ চলছে ত ?

হরিদাস চমকিয়া উঠিল। সে যে 'দরবার' করিতে আসিয়া গানে মজিয়াছে, তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ মনে পড়িতেই তাহার চিত্ত লজ্জায় ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—

"আজ্ঞে আমাদের নদীতে বড় ভাঙন ধরেছে"—

"বটে ! শুধু নদীতে নয় বাপু, তিন কূলে ভাঙন ধরেছে"—

হরিদাস বাধা দিয়া বলিল,—"আজ্ঞে না, শুধু আমাদের কূলে"—

"তোরা কি জাত ?"—

"আমরা বোষ্টম"—

"তা' হ'লে এক কূলেই বটে—বোষ্টমের আবার কূল—"

কর্ম্মচারী মহাশয় আপন মনে বৈষ্ণবের কূল ভাঙ্গিতে গড়িতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

হরিদাস পরদিন সকালে সকালে স্নান সারিয়া তাহার ময়লা চাদরখানি গায়ে ফেলিয়া কাছারীর উদ্দেশে গমন করিল। আজ সে সঙ্কল্প করিল যে, তাহার প্রার্থনা জমিদার বাবুকে না জানাইয়া সে ফিরিবে না। এতদিন কিছুই করা হয় নাই বলিয়া মনে মনে সে বড়ই লজ্জা অনুভব করিতেছিল, কিন্তু আজই জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এই ব্যাপার শেষ করিতে হইবে। জমিদার বাবু হয়ত কোন কর্ম্মচারীর উপর হুকুম দিবেন,—ইহার বাড়ী যখন নদীতে যাইতে বসিয়াছে, তখন ইহাকে অন্যত্র বাড়ী করিয়া দাও। সে জমিদার বাবুর যেরূপ প্রফুল্ল উদার মুখমণ্ডল দেখিয়াছে, তাহাতে এইরূপই যে হুকুম হইবে, সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সে প্রার্থনা সিদ্ধির বিষয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াই যাত্রা করিয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে পূর্ব্বরাত্রে শ্রুত একখানা তেলেনা ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিল। জমীদারের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে গিয়া সে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। কিন্তু জমিদার যে কোথায় বসেন, তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। কাজেই সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে ফিরিয়া আসিল ; 'দরবার' করা হইল না। গৃহে আসিয়া সে ভাবিল, চেষ্টার ত্রুটি ত করি নাই। দর্শন পাইলাম না হইতে আমার কি দোষ ?

আরও কিছুদিন গেল। আর একজন কর্ম্মচারী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"বেটারা 'দরবার' করিতে আসে, আর শ্যামরায়ের প্রসাদ খেয়ে খেয়ে কুঁদো হয়ে ওঠে—এবারে জুতো মেরে সব না তাড়ালে হচ্ছে না।"

হরিদাস বুঝিল যে এইবারে যাইতে হইবে। কিন্তু সে বুঝিল না যে যাহারা রাখিলে রাখিতে পারে, তাহারা কেন তাড়াইতে এত ব্যস্ত। কিন্তু সে যায় কোথায় ? এত আনন্দ, এত উৎসব—এ সব ফেলিয়া কি যাওয়া যায় ? কিন্তু বিলাসিনীর বায়না ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন সে যে জমিদার বাবুর কৃপা-গুণে কয়েকদিন বেশী থাকিয়া যাইতেছে, এ কথা সে পরস্পর শুনিয়াছিল। এ আনন্দের হাট একদিন ভাঙ্গিবে, এই চিন্তায় তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

৫

'হরিদাস, ও হরিদাস ! তুমি কাঁদছ ? আরে পাগল ! অশ্রুর বাঁধনে কি আমাদের বেঁধে রাখা যায় ?"

হরিদাসের অশ্রু কপোল বহিয়া গড়াইতেছিল। বিলাসিনী একটু হাসিল, পরক্ষণেই সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। এই সুন্দর প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত শিশুমতি কিশোর—ইহার মনটি এখনও পূজার ফুলের মত নির্ম্মল। কোন্ ভাগ্যবতী ইহাকে লাভ করিবার জন্য শিবপূজা করিতেছে।

বিলাসিনী একুট কোমল হইয়া বলিল,—

"হরিদাস, কেঁদ না, আমি এখনও আর এক হপ্তা থাকব।"

"গান গাইবে ?"—

"হ্যাঁ, গাইব বই কি ? নইলে আমায় কি আর শুধু কেউ রাখে ?—"

হরিদাসের অশ্রুর ভিতর দিয়া হাসি বাহির হইল—যেন জল ভরা মেঘের কিনারে একটু সূর্য্যকিরণ ঝলমলিয়া উঠিল। বিলাসিনী চুল বাঁধিতে বাঁধিতে তাহা দেখিল। সে খোঁপাটি বাঁধিয়া হরিদাসকে বলিল,—

"আয়নাখানা উঁচু করে পিছনের দিকে ধর ত হরি।"

হরিদাস আয়না তুলিয়া ধরিল। রমণী একটু মুচকী হাসিয়া বসনপ্রান্তে ললাট মুছিতে লাগিল। হরিদাস আয়না তেমনই ভাবে পিছনে ধরিয়াই রহিল।

"আঃ আমার কপাল ! না বললে বুঝি আয়না রাখতে নাই ? আচ্ছা, আয়নাখানা এখন সামনে রাখত লক্ষ্মীটি।"

হরিদাস অমনি আয়না যথাস্থানে নামাইয়া রাখিল। বিলাসিনী হাসিয়া আকুল হইল। সে দেখিয়াছে যে হরিদাস তাহার নিকটে থাকিতেই ভালবাসে, তাহার কোন কাজ করিতে পারিলেই সে খুসী হয়। তাহার সামান্য ইচ্ছাটুকুও সে পালন করিতে পারিলে ধন্য হয়। সময়ে অসময়ে সে তাহার ডাগর ডাগর চোখের উদার সজল দৃষ্টি বিলাসিনীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। যখন সে গান করে, তখন হরিদাসের চক্ষু দুইটি অনবরত তাহারই চক্ষুর অনুসন্ধান করিয়া ফিরে।

হরিদাসকে অন্য কেহই বড় একটা লক্ষ্য করে না। সে গায়িকার এতই নিকটে থাকে যে, অনেকে তাহাকে তাহাদের একজন বলিয়া মনে করে। কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ জানিতেন যে, সে 'দরবার' করিতে আসিয়া বাইজীর কুহকে পড়িয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিতেন না। বাইজী বিরক্ত হইলে মনিব হয়ত পছন্দ করিবেন না। সুতরাং কেহই বড় একটা উচ্চবাচ্য করিত না।

কিন্তু একদিন তাহাকে সকলেই লক্ষ্য করিল। সে দিন গানের আসর তেমন জমিতেছিল না। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে শ্যামরায়ের মন্দিরে প্রতিবৎসর মহোৎসব হয়। কীর্ত্তন, যাত্রা, নাচ, রোশনচৌকী—কিছুরই অভাব নাই। অনেকদূর হইতে লোক এই উৎসব দেখিবার জন্য আসে। প্রভাতে কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহার পর যাত্রা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যখন আরতির সময় হইল, তখন আবার ঠাকুরবাড়ীতে ক্রমে ক্রমে লোক সমাগম হইতে লাগিল। আরতির পরে যখন বাইজীর গান আরম্ভ হইল, তখন নাটমন্দিরে ও চত্বরে আর লোক ধরে না। হরিদাস দেখিল, ঠাকুরবাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ জনারণ্যে পরিণত হইয়াছে ; এত লোকের ভিড় সে আর কখনও দেখে নাই। কীর্ত্তন বা যাত্রায় আজ যত ভীড় হয় নাই, বাইজীর গানে তাহা হইল। হরিদাসের মনে আশঙ্কা হইল, হয়ত এত লোকের গোলমালে বাইজীর গান ভাসিয়া যাইবে। সে দিন বাইজীর চেহারা দেখিয়া তাহার সে আশঙ্কা আরও বাড়িল। গায়িকার মুখমণ্ডল যেন আজ বড়ই চিন্তাকুলিত, বড়ই শুষ্ক। হরিদাস আজ তাহার খুব কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

বাইজী কঙ্কণে তাল দিয়া সারঙ্গের সঙ্গে ধীরে ধীরে সঙ্গত করিতে লাগিল। গোলমাল একটু থামিল। কিন্তু সে যখন গান ধরিল, তখন তাহার স্বর কেহ শুনিতে পাইল না। মনে হইল, যে তাহার গান তাহার কণ্ঠেই মিলাইয়া যাইতেছে। সে গানটি হরিদাসের অতি পরিচিত। এ ক'দিন সে কতবার সেই গানটি শুনিয়াছে ও উপভোগ করিয়াছে ! কিন্তু আজ এ কি হইল ? এ গান যেন সে গানই নয়। একদিন যে গান শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া

শুনিয়াছে, যে গানে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, আজ সে গান এমন প্রাণহীন, এমন 'সাধারণ', এমন ঝরা ফুলের মত মনে হইতেছে কেন ? হরিদাস একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আজ তাহার বেশ অন্য দিনের অপেক্ষাও চাকচিক্যমণ্ডিত ; কিন্তু তাহার ভিতরে যেন জ্যোতি নাই। তাহার সুরেও যেন কোনও ভাতি নাই। বিলাসিনীর গলা আজ আর উঠিল না। জনসংঘ চঞ্চল হইয়া উঠিল। বরকন্দাজ, চোপদার, জমাদার বহু চেষ্টা করিয়াও গোলমাল থামাইতে পারিল না। বরং তাহাদের গোলমালে আরও উপদ্রবের সৃষ্টি হইল। জমিদার বাবু নিরুপায় হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ গোল থামাইয়া দিবে কে ? এক বিলাসিনী পারিত, কিন্তু আজ তাহার কণ্ঠ নষ্ট তারযন্ত্রের মত সুরভ্রষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছিল।

গোলমাল যখন বড় বাড়িয়া উঠিল, তখন হরিদাস সহসা দাঁড়াইল। সে যে কেন দাঁড়াইল, তাহা সে নিজেও বলিতে পারিত না। বিলাসিনীর চোখে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই, বিলাসিনী একটু হাসিল। এই অজ্ঞ পল্লীবালক সভার মধ্যে সহসা দাঁড়াইয়া তাহার সহবতের অভাবের পরিচয় দিল—ইহাই মনে করিয়া বাইজী হাসিল। হরিদাসের অধর স্ফুরিত হইতেছিল। সে কি কিছু বলিতে চাহে ?

বাদকেরা নিপুণভাবে বাজাইতেছিল। বিলাসিনী হস্ত উত্তোলন করিল, সুর ধরিয়া লইল, কিন্তু তাহার গলা গোলমালে ডুবিয়া গেল। হরিদাস তখনও দাঁড়াইয়া আছে। বিলাসিনীর এত কাছে যে, সে তাহার জন্য লজ্জিত হইতেছিল। জমিদার বাবু মনে করিলেন যে সে বুঝি হঠাৎ গোল থামাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে! বিলাসিনী হরিদাসের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—

'গান গাইবে নাকি ? গাও না—'

হরিদাস যেন এই ঈঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে সত্যই গান ধরিয়া ফেলিল। বিলাসিনী অবাক হইল, এ আবার গান শিখিল কবে ? এ যে তাহারই গান ! কথা ও সুর অবিকল নকল করিয়া যেন যন্ত্রে তুলিয়া লইয়াছে। বিলাসিনী বড়ই কৌতুক অনুভব করিল।

কোথাকার একটি পাঁড়াগায়ের ছেলে অমন করিয়া দাঁড়াইয়া রাজসভায় গান ধরিবে, এ ধৃষ্টতা কেহই অনুমোদন করিত না। কিন্তু অনেকেই তাহাকে বাইজির দলের গায়ক মনে করিয়া তাহার গান শুনিতে আপত্তি করিল না। বিলাসিনী যখন দেখিল যে, তাহারই গান সুন্দর তান লয়ে গীত হইতেছে, তখন সেও অল্প অল্প যোগদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভাবিল, ইহার গানে যদি গোল কিছু থামে !

গোল থামিল। যেন কোনও যাদুমন্ত্রে কোলাহল দূরে অতি দূরে বায়ুতরঙ্গের কোণে লুকাইয়া বাঁচিল ! একই অপূর্ব্ব সুর পরদায় পরদায় উঠিয়া সভাস্থলে ভরিয়া দিল ! সারেঙ্গের সবটুকু মধু লুটিয়া লইয়া সুর যেন মিষ্ট হাওয়ার মত সকলের মনে এক মধুর স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে। সভা নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে সেই সভাস্থলে ধ্বনিত করিয়া প্রশংসার ধ্বনি উঠিতে লাগিল। বিলাসিনী ভাবিতে লাগিল, এমন সুমিষ্ট সুর ত সে আর কখনও শুনে নাই। হরিদাস স্বপ্নাবিষ্টের মত গান গাহিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ললাটে অবিরল স্বেদ-বিন্দু গড়াইতে দেখিয়া জমিদার বাবু একজনকে পাখা আনিবার জন্য ঈঙ্গিত করিলেন—এবং নিজে উঠিয়া তাহার মূল্যবান সিল্কের চাদরখানি হরিদাসের ময়লা জামার উপর জড়াইয়া দিলেন। হরিদাস সে দিকে লক্ষ্যও করিল না। সে আজ কি এক

প্রেরণায় গান গাহিতে উঠিয়াছে—আজ সুর-তরঙ্গে তাহার প্রাণমন, ইন্দ্রিয়বপু সমস্ত প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। এমন তন্ময়তার সঙ্গে সে গায়িতেছিল যে পৃথিবীতে সে আর তাহার গান ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহার সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি নিবিড় কৃষ্ণ কেশের পাশে বড়ই মানাইয়াছিল। শ্রোতারা নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার কিশোর মূর্ত্তি দেখিতেছিল ও তাহার বাঁশীর মত কণ্ঠ শুনিতেছিল।

'তানসেনকে প্রভু মুরলী অধর ধরে
জা কি এই লোক রাজধানী ॥
মুরলিয়া কৈসে বাজে রস সানী।'

বিলাসিনীর হৃদয় প্রথমটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। আজকার যে জনতা সে কোনও মতে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া চারিদ্দিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, হরিদাস সেই জনতাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার মনে একটু গর্ব্বও হইল যে এই বালক একলব্যের মত বিরলে বসিয়া তাহাকেই গুরুত্বে বরণ করিয়া অপূর্ব্ব সাধনা করিয়াছে। কিন্তু ক্রমেই যখন হরিদাসের গানে সেই বিপুল জন-সংঘ আন্দোলিত হইতে লাগিল, যখন তাহার সুরের বিচিত্র বিন্যাসে তাহাদের ভাবপ্রবাস বিচিত্রভাবে লীলায়িত হইতেছিল, তখন বিলাসিনীর আত্মাভিমান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে দেখিল যে, হরিদাসের কণ্ঠে তাহার নিপুণ শিল্প না থাকিলেও অপূর্ব্ব প্রতিভার গুণে সুরের বিচিত্র লীলা নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। বিধাতার মুক্তহস্ত দানের নিকটে মানুষের শিল্পচাতুরী, কলা-বিলাস চিরদিনই মস্তক নত করিয়াছে। বিলাসিনীর চক্ষে জল আসিল, সে ধীরে ধীরে যখন সভাস্থল ত্যাগ করিল, তখন হরিদাসের আবেশ ছুটিয়া গেল। সে অবসন্ন হইয়া হঠাৎ বসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ গান-ভঙ্গ হওয়াতে জনতা কিছুক্ষণ কোলাহল করিয়া মিলাইয়া গেল।

৬

বিলাসিনীর গানের তার যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আজ তাহার ব্যর্থতা তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে পীড়া দিতে লাগিল। হরিদাসের প্রতি তাহার মন ক্রমেই বিষিয়া উঠিল। অকৃতজ্ঞ, নির্লজ্জ, প্রসাদান্নভোজী হরিদাস আজ তাহাকে সভার মধ্যে এমন করিয়া লজ্জা দিল! হরিদাস যে কোনও দিন তাহার নিকট কোনও বিষয়েই ঋণী নহে, তাহা আজ অভিমানের ঘোরে সে বিস্মৃত হইল। তাহার গানই ত হরিদাস গোপনে শিক্ষা করিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিল! তাহারই আদরে আদরে ত সে মাটী হইয়া গিয়াছে! সে দয়া করিয়া তাহাকে গান শুনাইয়াছে, ডাকিয়া কাছে বসাইয়াছে, আদর করিয়া কত কথা কহিয়াছে, সেই জন্যই ত সে এমন গান করিতে পারিল। নহিলে তাহার কি সাধ্য ছিল? এমনি অকৃতজ্ঞ সে, যে একদিনের জন্যও তাহাকে বলে নাই যে সে গান গায়িতে জানে। ছোটলোক কিনা, তাই এমন করিয়া সমস্ত গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। বিলাসিনীর হৃদয়ের সমস্ত হিংসা, সমস্ত ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

একটি বিষয়ে বিলাসিনী নিজের নিকটে কখনই ধরা দেয় নাই। সে যে হরিদাসকে ভাল বাসিত এই কথাটি নিজের অন্তর্যমীর নিকটেও কখনও স্বীকার করে নাই। হরিদাস বালক! সে প্রেমের কিছুই বুঝে না, কিন্তু তথাপি সহানুভূতির মধ্য হইতে কেমন করিয়া তাহার প্রতি গায়িকার এমন একটি টান জন্মিতেছিল, যাহার প্রতিস্পন্দনে সে সুখানুভব

করিত। কিন্তু কদাচিৎ কখনও ইহা মনে হইলে সে নিজেই তাহাতে হাসিত। হরিদাস যে তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারে না, তাহা সে বুঝিয়াছিল। অজ্ঞ, মূক, ইতর জন্তু যেমন করিয়া ভালবাসে, হরিদাস প্রায় এই মাসাবধি ধরিয়া তাহাকে তেমনই এক রকম ভালবাসা দিয়া ভালবাসিয়াছে। কিন্তু বিলাসিনীও যে তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া সুখী হইত, কিছুক্ষণ সে না আসিলে, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইত, তাহার মনস্তুষ্টির জন্য গান গায়িত, বেশ রচনা করিত, সে কি শুধু সহানুভূতি ? সে কি শুধু দয়া ? আজ তাহার হৃদয়ের নিভৃত তারে ঝঙ্কার দিয়া সেই সত্যটী অনুরণিয়া উঠিল। বিলাসিনী কাঁদিয়া ফেলিল। গায়ক বাদককে বিদায় দিয়া সে অ-ঝোরে চোখে জল ছাড়িয়া দিল। যেখানেই ভালবাসা, সেখানেই হৃদয় বড় কোমল হইয়া পড়ে। আজ বিলাসিনীর সেই কোমল মর্ম্মস্থানে একটু আঘাতেই বড় বাজিল। সে কিছুতেই ভাবিতে পারিল না যে, হরিদাসের কোনও অপরাধ নাই।

গান-ভঙ্গের পর হরিদাস যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সমস্ত ব্যাপাবটাই তাহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে যে এতবড় সভায় গান গায়িয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহা সে শুনিল অপরের মুখে। আজ সকলে অতি যত্ন করিয়া তাহাকে শ্যামরায়ের প্রসাদ ভোজন করাইল। তাহার প্রসাদ পাইবার সময় পুরোহিত স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইলেন। এত যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ কোনও দিন খাওয়ায় নাই। সে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। তখনও অনেকে তাহার গানের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিল ; বাইজী যে বহু যত্ন করিয়া তাহাকে গান শিখাইয়াছে, একথাও সে তাহাদের মুখে শুনিল।

সত্যই ত সে বিলাসিনীর নিকট ঋণী। তাহারই কৃপায় যে সে আজ এত বড় সভা জয় করিয়াছে ; এই কথাই তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল। বিলাসিনীকে না দেখিয়া সে আজ বিশ্রাম করিতে পারিল না। অধিক রাত্রে সে বিলাসিনীর কক্ষদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। তখনও বিলাসিনী শয়ন করে নাই। প্রসাদ একপার্শ্বে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে, সে তাহা স্পর্শও করে নাই। হরিদাস দেখিল, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝিল না। সন্ধ্যাবেলায় দেখিয়াছিল বিলাসিনীর মুখ আঁধার ; এখন সে অন্ধকার আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিনের অভ্যাস মত আজও বিলাসিনী হবিদাসকে ডাকিল। বলিল—

'তুমি যে এমন গান গায়িতে জান, তা ত কোনও দিন আমায় বল নি ?—'

'তোমাকে বলবার মত কিছু ত জানি নে। যদি কিছু শিখে থাকি ত' তোমার নিকটে—

বিলাসিনী একটু একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। বলিল—

'যদি আগে জানতাম যে তুমি গান গায়িতে পার, তা হলে আরও কত গান তোমায় শিখিয়ে দিতাম—'

এখন শিখাও না—'

'আর হয় না' বলিয়া বিলাসিনী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

হরিদাস কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে শুধু মৌন হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ না, সে শুধু মৌন হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ বিলাসিনীর মুখের দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া থাকিয়া শেষে সে বলিল—

'আমি যাই তা' হলে'—

বিলাসিনী একটু বক্র হাসি হাসিয়া বলিল—

'সাধ্য কি ? বোসো ; চুপ করে থাক—'

যন্ত্রচালিতের মত হরিদাস বসিল। বিলাসিনী তাহার পেটারি খুলিয়া একটি শিশি বাহির করিল ; গেলাসে সরবতের সহিত সেই শিশির ঔষধ মিশাইয়া হরিদাসকে পান করিতে দিল। হরিদাস ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সে ধমক দিয়া বলিল—'খাও।'—

হরিদাস সবটুকু এক চুমুকে পান করিল। তার পরে টলিতে টলিতে আসিয়া নিজের ঘরে কখন শুইয়া পড়িল, তাহা তার জ্ঞান ছিল না।

* * *

পর দিন যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন শ্যামরায়ের মধ্যাহ্ন ভোগ হইয়া গিয়াছে। প্রসাদ পাইবার জন্য যে ডাকিতে আসিয়াছিল, সে দেখিল যে হরিদাসের বাক্‌শক্তি নাই। হরিদাস কেবল তাহার দিকে নিতান্ত অসহায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

অসতী

বি, এল পরীক্ষা দিয়া অতুল কিছু দিন কলিকাতায় ছিল। সেই সময় তার এক বন্ধুর নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া সে বিবাহের জন্যে একটি মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল।

মেয়েটির বয়স তখন ষোল, অপরূপ লাবণ্য তার সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া অতুল একেবারে কাবু হইয়া পড়িল। বন্ধুর পীড়াপীড়ির অজুহাত দিয়া সপ্তাহ মধ্যে অতুল লতিকাকে বিবাহ্ করিয়া ফেলিল।

লতিকার বাপ খুব বড়লোক, অতুলের অবস্থা তত ভাল নয়।

* * *

কথাটা প্রথম ধরা পড়িল অতুলের মার কাছে। তারপর ক্রমে বেশ সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল। বিবাহের একমাস মধ্যে লতিকাকে বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইল।

লতিকার বাপ অতুলকে হাতে পায়ে ধরিয়া ভজাইবার চেষ্টা করিলেন—অপমান হইয়া ফিরিলেন। কিন্তু তারপর দিন অতুলের মামা শ্বশুর বিশ হাজার টাকার একখানা চেক

হাতে লইয়া গেলেন এবং অতুলকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। অতুল তিন দিন বাদে' লতিকাকে লইয়া নাগপুর গিয়া ওকালতী আরম্ভ করিল। ব্যবসা ক্রমে জমাট হইয়া উঠিল।

বিবাহের ঠিক ছয়মাস বাদে লতিকা একটি সুপুষ্ট সন্তান প্রসব করিল।

লজ্জায় লতিকা আর দেশে ফিরিল না, বাপের বাড়ীর কেহও তাকে আনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিল না।

ছেলেটি দেড় বৎসর বাদে মারা গেল।

* * *

ছেলেটি হারাইয়া লতিকা বড় কান্নাকাটি করিল, কিন্তু অতুলকে লুকাইয়া। অতুলের কাছে দৈবাৎ কোনও দিন ধরা পড়িয়া গেলে তার লাঞ্ছনার শেষ হইত—সেদিন আর তার মুখে অন্ন উঠিত না।

এত দুঃখেও লতিকার মনে হইত যে ছেলেটা মরিয়া বাঁচিয়াছে।

ছেলেটার জন্মের পর হইতেই অতুল লতিকাকে শাসাইয়া রাখিয়াছিল যে পরের ছেলে মানুষ করিবার জন্য সে কষ্টে রোজগারের টাকা খরচ করিতে পারিবে না। কাজেই ছেলের দুধ জুটিত না। তার ফলে যখন তার রিকেট্‌স্ রোগ হইল তখন অতুল বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়া নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিল, কিন্তু ডাক্তারেরা ছেলেকে দেখিয়া যে ছাগ দুগ্ধ তাকে দিবার ব্যবস্থা করিলেন, তার এক বিন্দুও লতিকা কাঁদিয়া কাটিয়াও সংগ্রহ করিতে পারিল না। তা ছাড়া লতিকাকে এক মুহূর্ত্ত ছেলে কোলে করিয়া থাকিতে দেখিলেও অতুল তার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া এমন অকথ্য গালিগালাজ করিত যে লতিকাকে ভয়ে ভয়ে ছেলের কাছ হইতে সরিয়া থাকিতে হইত।

মুখ ফুটিয়া লতিকার একটি কথা বলিবার উপায় ছিল না। সে যে অসতী তা তার আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই জানে—এই ছেলেটাই সেকথা ঢাক পিটাইয়া লোককে জানাইয়াছে। কাজেই অতুলের আশ্রয় হারাইলে তার পিতৃকুল কি অন্য কোনও কুলে ঠাঁই নাই। অতুল অনুগ্রহ করিয়া তাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয় নাই ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য। এ কথা লতিকার সর্ব্বদাই মনে থাকিত—আর আপনি তার মনে না পড়িলেও তার মনে না করিয়া উপায় ছিল না, কেন না অতুল উঠিতে বসিতে দিনরাত একথা তাকে স্মরণ করাইয়া দিত। কাজেই অতুল যত যাই বলুক তার উত্তরে তার মুখ ফুটিয়া বলিবার কোনও কথাই ছিল না। চুপ করিয়া সহিয়া যাওয়া ছাড়া তার উপায় ছিল না।

* * *

অতুলের সংসারে লতিকার অভাব কিছুই নাই। অবশ্য লতিকার বাপের ঐশ্বর্য্য অতুলের নাই, তবু অতুল এখন সঙ্গতিপন্ন উকীল। বড় বাড়ী, মোটরগাড়ী দাসদাসী সবই আছে। লতিকার কাজকর্ম্ম বেশী কিছুই করিতে হয় না, কেবল সংসারটা দেখা শোনা করা ছাড়া তার কোনও কাজই নাই। তবু লতিকার অনেকদিনই মনে হইয়াছে যে, যদি গরীবের ঘরের বধূ হইয়া তার দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া খাইতে হইত তবু তার ভাল হইত। কেন না তার সব থাকিলেও ছিল না একটি জিনিষ যার অভাবে সংসাটা একেবারে বিষ হইয়া গিয়াছিল—তার ছিল না সম্মান।

সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীকে যেমন আদর যত্ন করে অতুল তাহা না করিত এমন নহে। সে লতিকার উপর অত্যাচার কিছুই করিত না। কিন্তু অসতীকে গৃহে রাখিয়া সে যে

মহানুভবতা দেখাইয়াছে, এবং লতিকার তাহাতে যে সৌভাগ্য হইয়াছে একথা সে নিজেও ভুলিত না, লতিকাকেও ভুলিতে দিত না।

*   *   *

লতিকার দ্বিতীয় পুত্রের যখন জন্ম হইল, তখন বাড়ীতে কি সমারোহ! ছেলের জন্য কাপড়চোপড়, দোল্‌না, গাড়ী খেলনা রোজ আসিতে লাগিল। কিছুদিন যাইতেই ছেলের দুধ খাইবার জন্য খুব ভাল গরু কেনা হইল। অতুল বন্ধুবান্ধবকে বলিত, প্রথম ছেলেটার কেনা দুধ খাইয়া রিকেট্‌স্‌ হইয়াছিল বলিয়াই এবার অতুল গরু কিনিয়াছে।

লতিকা কিছুতেই দুধের বোতল তার ছেলের মুখের কাছে ধরিতে পারিত না—ধরিতে তার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত। ছেলের জন্য অতুল যা' কিছু করিত তাতেই তার বুক ফাটিয়া যাইত। আদরে লালিত এই সন্তানকে স্নেহ করিবে কি, লতিকার ইহার উপর হিংসা হইত। অতুলের সন্তানের এত সমাদর!—কিন্তু তার এমনি নাড়ী ছেঁড়া ধন যে এত সম্পদের মাঝে না খাইয়া মরিয়াছে, একথা লতিকা ভুলিতে পারিত না।

এ ব্যাপারটা এমনই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হইল যে, অতুলের চোখে সেটা অনায়াসেই ধরা পড়িয়া গেল। অতুল লতিকাকে যা নয় তাই করিয়া গালি দিল, বলিল—"কয়লার কালো দাগের মত দুশ্চরিত্রা নারীর স্বভাব দোষ কিছুতেই যায় না" ইত্যাদি। এবং দুশ্চরিত্রা নারীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় ভাবিয়া সে দাসী চাকরদের এমন হুকুম দিল যে লতিকার কাছে আর তার ছেলে আসিতেই পায় না।

লতিকার অন্তরের ভিতর আজ প্রথম কি একটা যেন ফোঁস করিয়া উঠিল। একটা অসহ্য জ্বালায় সে ছট্‌ ফট্‌ করিয়া উঠিল, তার সমস্ত চিত্ত স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু সে অল্পক্ষণ। বিদ্রোহ করিবার তা যে অধিকার নাই, উপায় নাই; চোখের জলে তার সে বিদ্রোহ ধুইয়া গেল।

*   *   *

এমনি করিয়া বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। অসহ্য যাহা ছিল তাহা সহনীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে লতিকা আর দশ জন মহিলার মত হাসিতে খেলিতে এবং দশজনের সঙ্গে মিশিতেও লাগিল।

এমনি করিয়া দশটা বছর কাটিয়া গেল।

*   *   *

লতিকার অনেক গুণ ছিল। সে লেখাপড়া কিছু পূর্ব্বেই শিখিয়াছিল। বিবাহের পর সে অনেক পড়াশুনা করিয়া রীতিমতো পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহকর্ম্মে ও শিল্পকার্য্যে তার যে সহজ দক্ষতা ছিল তাহা তার বিদ্যা ও অভ্যাসের ফলে অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। তা' ছাড়া তার মিষ্ট স্বভাবের গুণে সে দাস-দাসী হইতে বন্ধু-বান্ধব সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নাগপুরের মধ্যে আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ নারী বলিয়া তার প্রতিপত্তি জন্মিয়া গিয়াছিল।

অতুলের কাছে যখন সকলে শতমুখে লতিকার সুখ্যাতি করিত, তখন অতুলের ছাতি ফুলিয়া উঠিত—সৌজন্যের সামান্য আবরণ রাখিয়া উত্তরে সে যে কথা সকলকে বলিত তার স্থুল মর্ম্ম এই—হবে না কেন? আমার স্ত্রী!

বাড়ীতে আসিয়া সে হাসিমুখে এই সব কথা একখানাকে দশখানা করিয়া স্ত্রীর কাছে বলিত। প্রশংসায় লতিকার অন্তর প্রসন্ন হইয়া উঠিত। কিন্তু তার পরেই হয় তো অতুল

বলিত, "ভেবে দেখ, কি হ'ত তোমার দশা, যদি আমি তোমাকে গ্রহণ না করতাম। এতদিন হয় তো সোনাগাছি ছেড়ে খোলার চালায় আশ্রয় নিতে হত।" এমনি একটা তীব্র বিষাক্ত স্মারক নিয়মিতভাবে তার প্রশংসার শেষে আসিয়া লতিকার সমস্ত শরীর মন বেদনায় চুর চুর করিয়া দিত। ক্রমে এমন হইল যে, স্বামীর মুখে কোনও প্রশংসাবর্ষণের সূচনা দেখিলেই তার পরিশিষ্টে এই অবশ্যম্ভাবী বজ্রের আশঙ্কায় তাহার বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইত।

ভুলিয়াও ভুলিতে পারিল না লতিকা তার দুর্ভাগ্যের কথা! দশ বৎসর কাটিয়া গেল, তবু এমন দিন তার কখনও হইল না যে দিনান্তে একটিবার তার মরিবার জন্য একান্ত কামনা না হইত!

* * *

নাগপুরে সেবার ভয়ানাক প্লেগের উপদ্রব আরম্ভ হইল।

হঠাৎ লতিকার একটা খেয়াল হইল—সে কয়েকটি বিধব' বন্ধুর কাছে বলিল, প্লেগ-রোগী দেখিলেই লোকে পালায়, তাদের শুশ্রূষা হয় না—তারা কয়েকজন প্লেগ-রোগীর শুশ্রূষার ভার লইলে বেশ হয়। আট দশজন উৎসাহী মহিলা পাওয়া গেল। একটি মারাঠি মহিলা অগ্রণী হইয়া আয়োজন করিলেন। একটা সেবা-সদন ও সেবিকা-সঙ্ঘ গঠিত হইয়া গেল।

অতুল সেদিন লতিকা ও ছেলেমেয়েদের স্থানান্তরে পাঠাইবার আয়োজন করিয়া বাড়ী ফিরিল। লতিকাকে বলল, "শীগ্‌গির বাঁধা-ছাঁদা ক'রে ফেল, সন্ধ্যা বেলায়ই রওনা হতে হবে।"

লতিকা বলিল, "আমার যাবার কোনও দরকার নেই, ছেলেপিলেদের পাঠাও—আমি তোমাকে বিপদের মাঝে একলা রেখে যাব না।"

এই সামান্য বঞ্চনায় অতুল গলিয়া গেল। সে খানিকটা পীড়াপীড়ি করিলেও বেশী জোর করিল না। কেন না, লতিকার নানাবিধ সেবায় সে এত অভ্যস্ত যে, সে সহজেই অনুভব করিল যে, লতিকা না থাকিলে তার দিন চলা কঠিন হইবে।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় অতুল ছেলেপিলেদের লইয়া তাদের উটিতে রাখিতে গেল। আটদিন পর ফিরিয়া আসিল।

অতুল আসিয়া দেখিল, লতিকা সেবাসদনে।

তেলেবেগুণে জ্বলিয়া সে সেবাসদনে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়া যখন শুনিল, তাহা প্লেগরোগীতে ভরিয়া গিয়াছে, তখন আর তাব সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না।

* * *

এক মাস পরে লতিকা ঘরে ফিরিল।

এ একমাস সে চারিদিকে মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে বাস করিয়াও জীবনে প্রথম তৃপ্তি ও আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছিল। জীবনে তার ধিক্কার আসিয়াছিল, তাই মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্যই সে এই মৃত্যুর মহাযজ্ঞের মাঝখানে গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চারিদিকে দুঃখ ও বেদনার ভিতর পড়িয়া সে আপনার দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিল, সেবার ভিতর তার সমস্ত প্রাণপণ ঢালিয়া দিয়াছিল। এক একটি রোগীকে মৃত্যু-যন্ত্রণার ভিতর হইতে সেবার বলে ফিরাইয়া সে আত্মার এমন একটা অভ্যুদয় অনুভব করিতে লাগিল যে, মরিবার কথা আর তার মনে উঠিল না। তাই যখন সে ফিরিল তখন তার জীবনভরা অসার্থকতার ব্যথার

বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। সে পূর্ণানন্দে হাসিমুখে গৃহে ফিরিল।

অতুল মনে মনে অনেক কথা জড় করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সে কথা তার বলা হইল না। ইতিমধ্যে লতিকার কীর্ত্তিতে সমস্ত দেশময় এমন একটা খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল যে লাটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া নাগপুরের ইংরেজ ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও নারী অতুলকে ভয়ানক অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এমন কি লাটসাহেবের পত্নী তাহাকে জানাইয়াছিলেন যে, লতিকা ফিরিলে একবার তাহাকে লইয়া অতুল যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে। লাট দরবারে নিমন্ত্রণের জন্য অতুলের মনে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। লতিকার কার্য্যে সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া গেল ; দরবার লিষ্টে অতুলের নাম উঠিল, গার্ডেন পার্টিতে তার ও লতিকার নিমন্ত্রণ হইল।

কাজেই তার পর যখন লতিকা অক্ষত শরীরে ফিরিয়াই আসিল, তখন আর তার লতিকাকে তিরস্কার করিবার কথা মনে হইল না। বরং সে খুব আনন্দের সহিত তাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তার এই সমাদরের কথা তাকে জানাইল। শেষে হাসিয়া বলিল, "ভেবে দেখ কি আশ্চর্য ! কোথায় তুমি ক'লকাতার রাস্তায় পান বেচবে না, একেবারে লাট দরবারে নেমন্তন্ন !"

আজ এই অভ্যস্ত কথাটা অনেক দিন পরে লতিকার অন্তরে অসহ্য বেদনার সহিত বিঁধিল। সে মুখ কালী করিয়া উঠিয়া গেল।

* * *

সন্ধ্যাবেলায় পাদরী ব্রাউন লতিকার সঙ্গে দেখা করিয়া তাকে অভিনন্দন করিতে আসিলেন। পাদরী সাহেব অমরাওতিতে থাকেন ; নাগপুরে আসিয়াছেন, এখানকার প্লেগের কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে। অমরাওতিতে সম্প্রতি প্লেগের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। নাগপুরের অভিজ্ঞতা সেখানকার কাজে লাগিবে বলিয়া ব্রাউন এখানকার কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন।

লতিকার সঙ্গে আলাপ করিয়া ব্রাউন বলিলেন, "আপনার সঙ্গে এই এক ঘণ্টা ক'য়ে আমি যতটা শিখলাম, এক সপ্তাহ নাগপুরে থেকে আমি তা' শিখতে পারিনি। আপনি অপূর্ব্ব শক্তির অধিকারিণী ! আপনার মত একজনকে যদি আমরা পেতাম আমাদের সেখানে !"

তারপর অনেকক্ষণ তাদের দু'জনের পরামর্শ হইল—অনুচ্চ কণ্ঠে।

অতুল একটু দূর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিল। দেখিতে পাইল, উভয়ের মুখ এক অপূর্ব্ব উৎসাহ আগ্রহ ও আবেগে ভরা। ব্রাউনের দিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, পাদ্রী সাহেব যুবক, দেখিতেও সুপুরুষ। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অতুল বলিল, "হুম্"।

ব্রাউন যখন বিদায় লইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে খুব জোরে লতিকার সঙ্গে করমর্দন করিলেন—লতিকার মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ব্রাউন সাহেব চলিয়া গেলে অতুল লতিকাকে বলিল, "লোকে বলে স্বভাব যায় না ম'লে। তিন ছেলের মা হলে, এখনও ছেনালী গেল না। কোন লজ্জায়, কি সাহসে আমার সামনে তুমি ঐ সাহেবটার সঙ্গে অমনি ফিস্ ফিস্ ক'রে আলাপ ক'রলে বল দেখি—আর সে কি হাসি ! কি প্রেম ! মরণ হয় না ?"

লতিকার মুখ প্রথমে ফ্যাকাসে তার পর ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল। সে হইার উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিতেই অতুল বলিল,—"আবার কথা বলতে চাও কোন লজ্জায় ? চুপ

ক'রে থাক। শোন, এই্ শেষবার তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। যদি ফের কোনও দিন এমনি শয়তানী দেখি তবে টুঁটি ধরে রাস্তায় বের ক'রে দেব। বারবার তিনবার। দুবার ক্ষমা ক'রলাম—আর করবো না। পথের পাঁক থেকে তুলে এনে তোমায় রাণীর সম্মান দিয়েছি। সে সম্মান যদি না রাখতে পার লাথি মেরে দূর ক'রে দেব।" বলিয়া গট্ গট্ করিয়া অতুল চলিয়া গেল।

* * *

পরের দিন কাছারী হইতে ফিরিয়া অতুল দেখিল, লতিকা বাড়ী নাই। দাসী-চাকরদের জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইল না। শোফার বলিল, মেমসাহেব বাহির হইয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী লইয়া গিয়াছেন।

অতুল সন্দেহ করিল না—সন্দেহ করিবার অভ্যাস তার কোনও দিন ছিল না—সে নিশ্চয় স্থির করিল লতিকা কোনও স্থানে অভিসারে গিয়াছে। নিশ্চয় অনেক দিনই যায়, আজ ধরা পড়িয়াছে। আজ ফিরিয়া আসিলে "তারই একদিন কি আমারই একদিন" এবং মনে মনে স্থির জানিল যে চিরদিন যেমন হইয়াছে আজও তেমন দিনটা তারই হইবে, লতিকার নয়।

কিন্তু লতিকা ফিরিল না।

* * *

ক্রমে তিন দিন পর সংবাদ পাওয়া গেল, সেই দিন দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে লতিকা ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে আমরাওতি গিয়াছে।

আরও পরে সংবাদ আসিল অমরাওতির পাদ্রীদের পরিচালিত প্লেগ হাঁসপাতালে লতিকা অধ্যক্ষ হইয়াছে।

খবর পাইয়া অতুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সে আপনাকে ঝাড়া দিয়া উঠাইয়া মনে মনে বলিল—"এ তো জানা কথাই! স্বভাব যায় না ম'লে। অসতীকে ঘরে রাখা এই জন্যই ঋষিরা বারণ ক'রেছেন।

অবশ্য কোন ঋষির এ বিধান আছে, তাহা অতুল জানিত না।

* * *

অমরাওতিতে প্লেগ নির্ম্মূল হইলে সহস্র সহস্র নর-নারী সেবিকা লতিকাকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে লাগিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বিরহ

হুইশ্‌ল্ দিতে দিতে হুস হুস শব্দে ট্রেন প্লাটফর্ম্ম ছেড়ে চললো। বহুদূর যাত্রাপথের কথা মনে করে ট্রেণ যেন তার সমস্ত শক্তিকে পুঞ্জিত করছিল—এক প্রচণ্ড প্রয়াসের জন্য! দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু তোমার চোখ বেয়ে পড়লো! রুমাল দিয়ে নিজের চোখ মুছতে মুছতে আমি বাড়ীর পথ নিলুম। হঠাৎ কি করে সমস্ত পৃথিবীটা আমার চোখের দৃষ্টিতে অমন বদলে গেল, বল দেখি!

সেই পথ-ঘাট এখনও ঠিক আগের মতই রয়েছে! গাছে গাছে পাখীরা এখনও ঠিক সেই আগের মত কলরব তুলছে! রাস্তার দু'ধারের দোকানগুলি এখনও ঠিক আগের মতই তাদের চকচকে জিনিষপত্রে বাহার ফুটিয়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে! লোকজন এখনও ঠিক আগের মতই তেমনি ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে তাদের কাজের উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করছে! বাহিরে কোথাও তো কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি!

আমার কাছে কিন্তু তারা সবই বদলে গেছে! পথ ঘাট আমার সে কৌতূহল আর উদ্রেক করলে না। পাখীর কলরব সে অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা আর আমার প্রাণে জাগিয়ে তুললে না! দোকানের পণ্য-সম্ভার আমার-মনে পয়সা খরচের সে প্রবৃত্তি আর সঞ্চারিত করলে না! লোকজনের ঐ ব্যস্ত-ত্রস্ত ভাব আমার সে কর্ম্মোদ্যম আর উদ্দীপ্ত করতে পারলে না! মনে হলো, নিজের দেশেও আমি যেন আজ একান্ত এক পরদেশী! এর জীবন-প্রবাহে আমার কোন স্থান যেন আর নেই! আমি এখন এই বিচিত্র খেলার দর্শক-দলেরও বাইরে যেন!

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলুম। ভাবলুম, এখানে একটু সোয়াস্তি পাব। হায়রে কপাল, সেই চির-পরিচিত ঘর যে আজ একেবারে বদলে গেছে! যে-ঘর একদিন তোমার আনন্দ-কাকলীতে মুখর হতো, তোমার অবর্ত্তমানে সে-ঘর এখন কবর-ভূমির মতই প্রাণহীন হয়ে পড়েছে! যেদিকে চাই, কেবল তোমরই স্মৃতিচিহ্ন! আমার প্রাণ কিন্তু চাইছিল তোমাকে, আর সেই তোমাকে তো সেখানে পেলুম না, প্রিয়তমে!

ছবিগুলি তুমি যেমন সাজিয়ে রেখেছিলে, তেমনি সাজানো রয়েছে; বইগুলি তুমি যেমন গুছিয়ে রেখেছিলে, তেমনি গোছানো রয়েছে; টেবিল, চেয়ার আসবাব-পত্র সবই তোমার নিপুণ শিল্পী-হাতের পরিচয় দিচ্ছে! কিন্তু দূরদৃষ্ট আমার, তাদের অন্তরের ধন, আমার অন্তরের ধন, সেই তোমাকে যে তাদের মধ্যে আমি পেলুম না! তোমার অভাবে তারাও যে আমারই মত ম্রিয়মান আমার প্রাণ আরও অধীর হয়ে উঠলো!

কে যেন আমায় টেনে নিয়ে চললো শয়ন-কক্ষের ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে তোমার সেই ঐন্দ্রজালিক অস্ত্রাগারে, যেখান থেকে সাজসজ্জা করে তুমি বের হতে—দিগ্বিজয়ের

জন্য। সেখানকার সব খুঁটিনাটি জিনিসগুলি,...তোমার পরিত্যক্ত হেয়ারপিন, তোমার ভুলে-যাওয়া রিবন, তোমার গণ্ডদেশবিলাসী পাউডার-পাফ...সবই তোমার কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলো। আনমনে সেই ড্রেসিং টেবলের একটি ড্রয়ার আমি খুললাম। জেস্মিতের এক সুবাস এসে আমার প্রাণকে বিমুগ্ধ বিবশ করে তুললে ; আর সঙ্গে সঙ্গে অতীতের এক সুমধুর স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো !

হঠাৎ তোমার একটী হেয়ারব্রাশের উপর আমার নজর পড়লো। সে তার বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোমার অনুপম কেশগুচ্ছকে জড়িয়ে রেখেছিল। তার অব্যক্ত ভাষায় তোমাকে উদ্দেশ করে সে যেন বলছিল,—বঁধু আমার, তোমার ভালবাসা আমার অন্তর থেকে কখনও যাবে না, কখনও না ! দেহ থেকে আমার প্রাণ ছিঁড়তে পারে, প্রাণ থেকে তোমার ভালবাসা কিন্তু কেউ ছিঁড়তে পারবে না, পারবে না !

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। শয্যার উপর বসে পড়লুম। কেশগুচ্ছ-সমেত তোমার সেই হেয়ার-ব্রাশটীকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলুম, আর উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলুম,—প্রাণ আমার, হৃদয় আমার, প্রেয়সী আমার, আমি তোমায় ভালোবাসি।...হঠাৎ মনে হলো, তুমি তো এ বাড়ীতে নাই, তুমি যে এখন সুদূর পথের যাত্রী !

আমার অন্তরের গোপনতম দেশে কে যেন তীক্ষ্ণ একটা তীর ফুটিয়ে দিয়ে গেল ! অধীর, অস্থির হয়ে আমি শয্যায় লুটিয়ে পড়লুম ; আর কাতর বাষ্পাকুল কণ্ঠে, মিনতির সুরে তোমায় বললুম,—প্রাণ আমার, হৃদয় আমার, ফিরে এসো তুমি ! তোমার বিহনে এখানে আমি থাকতে পারবো না এই অসহ্য যাতনা থেকে, যাদু আমার, আমায় তুমি উদ্ধার করো !

আমার সেই আকুল আহ্বান কি তুমি শুনেছিলে ?

এস. ওয়াজেদ আলি

মেশের বাসায়

১

মেশের বাসার পাশেই যদি কোন ভদ্রলোকের বাড়ী থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষার ছোট গল্প জমে ভালো। এই মেশের বাসার বাসিন্দা ছেলেদের লইয়া কতই না অঘটন বাঙ্গলা সাহিত্যে নিত্য ঘটিয়া উঠিতেছে। কমলাক্ষ যখন কলিকাতার একটা ছোটোখাটো মেশের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, সে কি তখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে সেও এক দিন হঠাৎ তথাকথিত শত শত গল্পের নায়কের মতই তার মেশের বাসার কল্যাণে বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিবে ? ঘটনাটি বাস্তবিকই একটু অপ্রত্যাশিত এবং অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই ঘটিয়া গিয়াছিল।

কমলাক্ষ উত্তর-বঙ্গের কোন একটা জেলার কোন্ পল্লীগ্রামের লোক। বাপ বুঝি কোন্ এক জমিদারী সেরেস্তায় কি নাকি চাকরি করিতেন, পয়সা উহারই মধ্যে কিছু রোজগার করিয়াছিলেন। তবে সে এমন বেশী নয়, যাতে করিয়া তাঁর তিন পক্ষের সাতটী ছেলের মিলিয়া বসিয়া খাওয়াপরা চলে। বিশেষ যখন হইতে তাঁর শেষের পক্ষটী আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতেই প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে-মেয়েদের দলে একটা অশান্তির চাঞ্চল্য রীতিমত জাগিয়া উঠিয়াছিল। শেষের পক্ষের গৃহিণী এ-গৃহে নিতান্ত অসহয়া অবস্থায় প্রবেশ করেন নাই। তাঁর অপেক্ষা দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত বয়সের সপত্নী-সন্তানদের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য একদল বেশ শক্ত-গোছ "বডিগার্ড" তাঁর সঙ্গে আসিয়াছিল। এঁরা, —তাঁর ভাই, ভাইপো আর বাপ। মা-টি বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই আসিতেন, তবে তার অবর্ত্তমানে তাঁর জন্য অবশ্য খুব বেশী অসুবিধা ঘটিতে পারে নাই ! তাঁর স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরম পূজণীয়া বিধবা বড়দিদি স্নেহের ছোট বোন্‌টীকে ঘর-কর্ণা শিখাইবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

নলিনাক্ষ, কমলাক্ষ, সরোজাক্ষ—এরা তিন ভাই নিজের নিজের পথ দেখিয়া সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া পড়িল। এরা এদের বাপের প্রথম পক্ষোদ্ভূত বলিয়া এতদিনে যাহোক খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়া কিছু কিছু রোজগারের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এদের মধ্যে নলিনাক্ষ বি-এ ফেল হইয়াও একটা সওদাগিরি অফিসে শ'খানেক টাকা মাহিনার এক চাকরি পাইয়াছিল। সে শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় লইল। সরোজ ঢাকায় বাপের চাকরিতে বাহাল হইয়াছে। আর কমল চাকরির সন্ধানে দুবেলা কলিকাতার অলি-গলি ঘুরিয়া ঐ মেশের বাসায় দিন কাটায় এবং প্রাইভেট টিউসনি করে।

কমল ছেলেটী একটু সৌখীন গোছের। চেহারা ভালো, চুলগুলি স্বতঃই কুঞ্চিত। গায়ের বর্ণ খুব উজ্জ্বল গৌর। তাকে পথে দেখিয়া ঘটক্ ঘটকীরা প্রায়ই সাগ্রহে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তবে পাশ বেশী করে নাই এবং ছোট্ট একটা মেসের বাসায় থাকে

দেখিয়া তার পর তাদের সে আগ্রহ প্রায় অবসাদে পরিণত হয়। তবুও কনের খপর সে মাঝে মাঝে প্রায়ই পায়।

কিন্তু এ-সব কনের খপরের জন্য কমলাক্ষ কোন দিনই বিশেষ উৎসুক ছিল না। আই-এ পরীক্ষায় দুবার ফেল করিলে কি হয়, ইংরাজী বাঙ্গলা বিশেষতঃ আট আনা ও একটাকা সিরিজের বইগুলি, এদিকে সিক্সপেন্স নভেলের প্রায় সমুদায়গুলিই সে পড়িয়া ফেলিয়াছিল। এই সব বহি পড়িয়া-শুনিয়া তার স্থির প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে কি বাঙালী আর কি সাহেবদের ঘরের মেয়েরা 'লভে' পড়িবার জন্য রাত দিন ঘুর ঘুর করিয়া বেড়াইতেছে! তেমন সুন্দর তরুণ যুবা পাইলে এমন কোন তরুণী নাই যিনি তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারেন! আইবুড়ো মেয়েদের তো কথাই নাই! বিধবারা তো তাদের বৈধব্যের জ্বালা লইয়া পত্যন্তর গ্রহণের উগ্র আকাঙ্ক্ষায় হিন্দু সমাজের শেষ নিশ্বাসটুকুর প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হইয়া আছে। আবার সধবারাও,—যাঁদের বরের মাথায় টাক, বা নাক একটু ছোট, অথবা রং কালো, বা গড়ন কিছু লম্বা, তারাও সুপুরুষ দেখিলে টাকওয়ালা খাঁদা-নাক কিম্বা লম্বকর্ণ পতির গৃহকে জীর্ণ বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিয়া আসিতে অনিচ্ছুক নন! ফরাসী এবং রাসিয়ান নভেলিষ্টরা এর নজীর দিয়াছেন। তবে কুমারী ও বিধবার... ? তা সে নজীরও সকল দেশের ভাষা হইতে আবর্জ্জনার ঝুড়ি ভর্ত্তি হইয়া বাঙ্গলা ভাষার ভাঙ্গা কূয়াকে ভরাট করিতেছে! কমলাক্ষর মনটাও এই নভেল সুলভ দুর্ল্লভ-প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় রাত-দিন উৎসুক হইয়া ফিরিত। তবে সুযোগ এখনও মিলিল না, এ যা দুঃখ!

২

হঠাৎ একদিন সুযোগ মিলিয়া গেল। আর কোথাও নয়, ঠিক সেই পাশের বাড়ীতে। কি আশ্চর্য্য নভেল লেখকদের দূরদৃষ্টি! সেকালে প্রেমে পড়িতে হইলে দূরদেশে নৌকাযাত্রা করিতে হইত, বন প্রদেশের ভাঙ্গা দেবমন্দিরে ঢুকিতে হইত, গঙ্গাসাগরে গিয়া সঙ্গীজনের পরিত্যক্ত অবস্থায় নির্জ্জন সমুদ্রসৈকতে কাপালিকের হস্তগত হইতে হইত, এমনি কত না বিপদ-বিপ্লব! আর এখনকার দিনে চতুর্দ্দিকেই কি সুবর্ণ সুযোগ! একেবারে পাশের বাড়ীর জানালায়! পথেও বাহির হইতে হয় না! ঘোড়া ছাড়িয়া ট্রামে চাপিবারও দরকার নাই,—পরম নিশ্চিত চিত্তে গরম চা শিপ্ করিতে করিতে, হইল-বা সিগারেট টানিতে টানিতে সবচেয়ে নিকট-প্রতিবেশীর তরুণী কন্যা বা দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর সহিত ইচ্ছাসুখে প্রেম পড়া,—এমন সহজ ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁর একটা মার্ব্বেল ষ্ট্যাচু কিন্তু গড়ের মাঠে খাড়া করিয়া দেওয়া উচিত!

কমলাক্ষর পাশের বাড়ীর জানালায় হঠাৎ একদিন একখানি তরুণ মুখ রূপশ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! কমল সেদিন তার প্রাইভেট টিউশিনি সারিয়া একটু সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিয়াছিল! ঘরে ঢুকিতেই তার চোখ পড়িয়া গেল, পাশের বাড়ীর খোলা জানালার ওধারে এক আশ্চর্য্য সুন্দর মূর্ত্তির উপর! তরুণী অসামান্য রূপলাবণ্যবতী! একবার চকিত চক্ষে চাহিয়াই কমলাক্ষর দৃষ্টি যেন তার সেই অপরূপ রূপ সাগরে মগ্ন হইয়া গেল! নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে কেবল নেত্রাশ্রয়ী চিত্ত হইয়া চোখ ভরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। মেয়েটী ঘরের খালি মেজের উপর আনত চক্ষে বসিয়া কতকগুলি আধ-ময়লা

কাপড়ে কালি দিয়া চিহ্ন করিতেছিল। মেয়েটী তাকে দেখিতেও পাইল না।

কমলাক্ষ দেখিল, এই রূপসী নারীটী বিধাতৃ সৃষ্টির একটী আদর্শ! ইহার মত সুন্দরী তার জীবনে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না! বয়স আন্দাজ কুড়ির মধ্যে—ষোড়শী হওয়াই সঙ্গত! চিরদিন এই রকমটাই ঘটিয়া আসিতেছে। তারপর সে গভীর উল্লাসে আরো কি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া একটা স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এই রূপসী তরুণীটী খুব সম্ভব বিধবা।

তার চুলগুলি খোলা, গায়ে গহনা নাই, গোলানো হাতদুখানিতে শুধু দুগাছি করিয়া খুব সরু চুড়ি। অনেকগুলি চুড়ি খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়া যেন এই দুটী মাত্রই বাকি আছে! আধময়লা সাদা সেমিজের সঙ্গে একখানা হাফ কালা পাড়ের মোটা শাড়ী পরা। সধবা মেয়েরা এত কম-চওড়া পাড়ের শাড়ী প্রায়ই পরেন না। নিশ্চয়ই এ বিধবা! তবে কমলাক্ষর পক্ষে এটা দুর্যোগ নয়,—সুযোগই! তাই সে ইহার উদ্দেশ্যে 'আহা' বলিতে পারিল না। তার মনে হইল, বিধাতা তার জন্যই যেন ইহার এই অকাল-বৈধব্যের সৃষ্টি করিয়া ইহাকে তার পাশের ঘরটিতে আনিয়া দিয়াছেন। এখন বাকিটুকু তাহার হাত-যশ।

ইহার পর আর দু'বার সে তার সবচেয়ে নিকটস্থা প্রতিবেশিনীকে দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিল। মেশের বাড়ীর পাশে যে-ভদ্রলোকের বাড়ী থাকিবে, সে-বাড়ীটা এ-রকম অসভ্য রকম বড় হইলে ভারী বিসদৃশ ঠেকে! বাড়ীটায় ঘর-দ্বার খুবই বেশী, কাজেই এই পাশের ঘরটাকে ঐ তরুণীর শয়ন-ঘর করিয়া দিবার দরকার একেবারেই ছিল না। তা বসিবার ঘরও তো হইতে পারিত, তাও না! সেই একদিন, আরও দুদিন শুধু আচারের পাথর রৌদ্রে দিবার জন্য তাকে সে এ ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াছিল। আজ আবার তাকে দেখিতে পাইল।

পাশের বাড়ীতে কি যেন একটা উৎসবের আয়োজনে চলিতেছিল, মনে হইতেছে। এমন কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও তরুণীটী একা একা চুপ করিয়া তারই ঘরের দিকের জানালাটার কাছে এই দিকে মুখ করিয়াই ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছে। পিঠের উপর রাশীকৃত রুক্ষ চুলের ভার। মেয়েটীর অবস্থা এ-রকম না হইলে মনে হইত, সে যেন মাথা ঘষিয়া চুলগুলিকে অমন করিয়া ফুলাইয়া তুলিয়াছে। গায়ে একটু সাদা সেমিজ, তাও মোটা খদ্দরের, আর পরণে সরু পাড় খদ্দরেরই কাপড়। কমলাক্ষ আজ তাকে অনেকখানি কাছে পাইয়া বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মাথায় তার সিন্দুর বা হাতে এয়োতির চিহ্নস্বরূপ লোহার বালাই নাই! বিধবা, নিশ্চয়ই অনাথা বিধবা! তাও আবার হয়তো এ-বাড়ীর সঙ্গে তার সম্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ নয়। নতুবা ওই অত বড় বাড়ীতে থাকিয়া এমন মোটা কাপড়, রুক্ষ মাথা ও ম্লান মুখ তার হইত কি? হয়তো প্রাণপণে খাটিতে হয়, হয়তো বাড়ীর লোক কত নিষ্ঠুর ব্যবহারই করে। আহা, একেই তার বিরহী চিত্ত নিজের বেদনার ভারে অধীর হইয়া আছে, তার উপর এমন অবিচার সে কেমন করিয়া সহিবে?

অনেকক্ষণ পরে মেয়েটী মুখ তুলিয়া চাহিতেই কমলাক্ষর উৎসুক আকাঙ্ক্ষাভরা দৃষ্টির সহিত তার দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া গেল। মেয়েটী তার দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া পরে চোখ ফিরাইয়া লইল, তার ভরা গাল দুটী ফুটন্ত গোলাপের মত লাল হইয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে জানলার কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

কমালাক্ষ দেখিল, মেয়েটী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। নিশ্চয়ই কর্ত্রীর কাছে অন্যায় তিরস্কারে তিরস্কৃত হইয়া অভাগিনী বিধবা একান্তে আসিয়া নীরবে গভীর বেদনার ভার লঘু

করিতে চাহিতেছিল !—আচ্ছা, এত জায়গা থাকিতে সে তার জান্‌লাটীর ধারে আসিয়াই কাঁদিতেছিল কেন ? এ কি শুধু নিরর্থক ? না, এর একটা অর্থ আছে ? মধ্যে মধ্যে এই ঘরে আনাগোনা করিয়া আর কিছু না হোক, কমলাক্ষকে সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছে। তার এই নারী বিমোহন রূপশ্রী কি আর তার চোখে পড়ে নাই ? তা' নাকি না পড়িয়া থাকিতে পারে ? আচ্ছা, এই অশ্রু নিবেদনের ভিতর আর কিছু কি সত্যই নাই ? ওই অশ্রুর সহিত অশ্রুসলিলসিক্ত হৃদয়খানি কি আজ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথাটীই বলিতে আসে নাই যে,—'ওগো, আমার পাশের ঘরের বন্ধু, শুধু কি তুমি দূর হইতেই আমায় দেখিবে ? কাছে কি কোন দিনই আসিবে না ? আমার এই ব্যর্থ জীবনের বৃথা দিনগুলাকে পূর্ণ ও সার্থক কর—এ যে আজ তোমারই জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে !

সেদিন তরুণী বারে-বারেই পাশে ঘরে আসা-যাওয়া করিল। এ বাড়ীর জানালার দিকেও তার চোখ যে প্রতিবার ফিরিতেছিল, তাও কমলাক্ষর দৃষ্টি এড়াইল না। আর থাকা যায় না ! এর উপর আর প্রতীক্ষা করিবার অবসর কোথায় ? মেশের ঝিকে ডাকিয়া তাকে পান খাইতে একটা টাকা দিয়া কমলাক্ষ তার কাছে পাশের বাড়ীর খপর সংগ্রহ করিতে বসিল। বাড়ীতে নাকি একজন সব জজ তাঁর ছোট বোনের বিবাহ দিতে আসিয়া উঠিয়াছেন। পরশু বিবাহ...বর নাকি খুব বড়। বিধবা ? হ্যাঁ, একটী কম-বয়সী বিধবা আছে বৈ কি ! এ পোড়া কালে বিধবা আবার কার ঘরেই বা নাই ? মেয়েটী বড় লক্ষ্মী, মুখে কথা নাই, সর্ব্বদা কাজ লইয়াই আছে। বাবুর বুঝি পিসতুতো বোন হয়। আপন বলিতে আর কেহ তো নাই, কাজেই এইখানে থাকে !

কমলাক্ষ পূর্ণ আশ্বাসে মনে জোর করিয়া সেই রূপসী তরুণীর উদ্দেশে একখানা পত্র লিখিতে বসিল। তাহাতে অনেক উচ্ছ্বাস, কবিতা, কোটেশন বসিল। তাহাতে উচ্ছ্বাস, কবিতা, কোটেশন চাপাইয়া সব-শুদ্ধ এই কথা জানাইল যে, সে তার রূপে মুগ্ধ এবং দুর্ভাগ্যে ক্ষুব্ধ। তার ওই অতুল রূপ বৈধব্য-যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইবার জন্য সৃষ্টি হয় নাই ! ভগবান তাকে তার রক্ষাকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ রূপরাশিতে সে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। একদিন গভীর রাত্রে খিড়কির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলেই তাদের দুজনের জীবন জন্মের মত সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে ইত্যাদি।

তরুণী ঘরে আসিলেই সে সেই দেলখোশ্‌-এসেন্স বাসিত চিঠিখানা জানলা দিয়া তার ঘরের মধ্যে ছুড়িয়া দিল। আচম্‌কা সেটা অন্যমনস্ক মেয়েটীর গায়ের উপর পড়ায় আরশুলা ভাবিয়া মেয়েটী একেবারে আতঙ্কে লাফাইয়া উঠিল ; তারপর আরশুলার বদলে সুরভিত সুদৃশ্য খাম দেখিয়া সে যেন সহসা সমধিক আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল ! এদিকে কমলাক্ষ তার সেই স্তম্ভিত ভাবকে আনন্দ-বিহ্বলতা মনে করিয়া আশানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। আঃ, তা হইলে ওই রূপসী তরুণী তার আবেদন গ্রহণ করিলেন ! তবে আর তার জীবন সার্থক হইতে বাকি কি ! আচ্ছা, মেয়েটী খিড়কির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবার সময় বুদ্ধি করিয়া তার গহনার বাক্সটী সঙ্গে আনিবে তো ? ওখানে কার জন্যই বা ফেলিয়া রাখা !

৩

পাশের বাড়ীতে রশুনচৌকি বাজিয়া প্রতিবেশীদের সে-বাড়ীতে বিবাহবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। সকাল বেলাতেই মেশের অধিবাসীরা আশ্চর্য হইয়া জানিল যে ঐ বিবাহ-বাড়ীতে তাদের সকলকারই সে-রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। পশ্চিমবাসী সবজজের বুদ্ধিকে সকলেই প্রশংসা করিতে বাধ্য হইল। একজন বলিল,—যদিও সচরাচর সবজজের বুদ্ধি, মানে একটু ইয়ে হয়, তবে ওঁর কিন্তু সে রকমটা হয়নি, দেখছি!

কমলাক্ষও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। যদিও সেদিনের পত্রের উত্তর না পাইয়া মন তার নৈরাশ্যে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে বাড়ীতে একবারের জন্যও যে যাইতে পারিবে, হয়তো চকিতের মত একবার দেখাও ঘটিয়া যাইতে পারে,...এ ভাবিয়া তার পীড়িত চিত্ত একটু শীতল হইয়া আসিল।

বৈকালে একজন ঝি আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া তখনি দ্রুত পায়ে চলিয়া গেল। চিঠিখানা এই রকম,—

বন্ধুবরেষু,

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ প্রীতা ও অনুগৃহীতা হইলাম। আপনি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমায় এ দুঃখময় জীবন হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছেন এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি ঠিক লিখিয়াছেন, বাস্তবিকই তো দুটো মন্ত্র পাঠ করিলেই কাহারও সহিত জীবন-মরণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। ভালোবাসাই নর-নারীকে একমাত্র একত্র করে। বাড়ীতে বিবাহ। অদ্য রাত্রে নিমন্ত্রণে আসিলে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে। আপনার গুণ-মুগ্ধ সতী!

কমলাক্ষর মনে হইল, আকাশের চাঁদ সহসা তার হাতের নাগালে নামিয়া আসিয়াছে! এই দেখ, আধুনিক লেখকদের কথাই ঠিক কি না! নিপীড়িতা হিন্দু বিধবা পুরুষের একটু ভালোবাসা আর প্রীতির জন্য কি-রকম উগ্র আগ্রহ বক্ষে লইয়া বাঞ্ছিতের আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, এই তো তার মস্ত বড় এক নজীর! কিন্তু ইহাকে লইয়া গিয়া কমলাক্ষ রাখিবে কোথায়? বিদ্যাসাগরের মতে উহাকে সে বিবাহ করিবে?...কিন্তু বিবাহ করা সুবিধার নয়! বিবাহ করিলে নানা দায়িত্বও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘাড়ে চাপিবে।

আর সতীও তো তারি লেখা কথাটাকে কোট্ করিয়া উল্টিয়া লিখিয়াছে, বিবাহের মন্ত্র কাহারো সহিত জীবনমরণের সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে না! তার সঙ্গে এতখানি তার মতের মিল। যাহোক, তাহা হইলে আপাতত তাহাকে কোন এক অভিনেত্রী বা এমনি কাহারো গৃহে লইয়া গেলেই চলিবে। পরে চাকরি-বাকরি জুটিলে তখন যেমন হয়...

বিবাহ-বাড়ীর জাঁক-জমক দেখিয়া কমলাক্ষ কিছু বিস্মিত হইল। এঁরা যে এতটা ধনী, তা বাড়ীখানির একটীমাত্র পড়্তি ঘরের জান্‌লার মধ্য দিয়া সে বুঝিতে পারে নাই। সভাস্থল বৈদ্যুতিক আলোর প্রবাহে ইন্দ্রপুরীর মত প্রতীয়মান হইতেছিল। একপাশে কৃত্রিম শৈল, নির্ঝর-রূপী উৎস, বিচিত্র ফলের ও ফুলের টব দিয়া রচিত নিকুঞ্জ-মধ্যে বরাসন...

প্রকাণ্ড একখানা সিড্‌লী কারে বর আসিল। কারখানা পদ্ম-গোলাপ চাঁপা করবীর গুচ্ছে ও দেবদারু পত্রে সুন্দর ভাবে সজ্জিত। বর হাইকোর্টের বেশ বড় ব্যারিস্টার। বয়সে অপ্রধান হইলেও বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনে তাঁর সুপ্রচুরতার অভাব ছিল না।

কমলাক্ষ বরের আসনের ঠিক পাশেই স্থান লইয়াছিল। হঠাৎ দুজনের কথাবার্ত্তা তার

ানে গেল। বরের দুই বন্ধুতে কথা-বার্ত্তা হইতেছিল। একজন বলিল,—মিনির আজ খুব আনন্দ হচ্ছে!

অপরটি হাসিয়া কহিল,—"তা আর হবে না! সেই কবে সাত বছর বয়স থেকে দুজনের বিয়ের কথা হয়ে আছে, আর সেই আঠারো বছর বয়স হলো। নন্-কো অপারেসনে যোগ দিয়ে ক'বছর খুব কাজ নিয়ে মেতে রইলো। না হলে আর দু'বছর আগেই তো বিয়ে হতো। তা হোক, সতীর কপাল ভালো, মিনু ওকে এখন থেকেই দেবতার মত ভক্তি করে। সতী আমায় বলছিল, সম্প্রতি এমন একটা ঘটনা ঘটেচে, যে, সে শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। তখনি মীনা ওকে ডাকিয়ে আনিয়ে সব কথা জানায়, তবে নিশ্চিন্ত হয়। দ্যাখো, বেঁচে-বর্ত্তে থাকে তো ওরা খুবই সুখী হবে। অভিন্নচিত্ততাই দাম্পত্য জীবনের প্রধান সুখ।

কমলাক্ষর বুকের মধ্যে জোরে জোরে কে যেন ধাক্কা মারিতে লাগিল। সতী! এ কি এরা কার কথা বলিল! কিছুই যেন বুঝা গেল না! এ কি তার সতীর নাম? না, এ যেন কোন্ পুরুষ সতী! এই বিবাহের বরকে উল্লেখ করিল না? হয়তো এরও নাম সতীশ, কি সতীন্দ্রমোহন কিম্বা এই রকম কিছু হইবে। তাইতো, ঠিক কথা! নিমন্ত্রণ-পত্রে যে লেখা ছিল, বরের নাম সতীরঞ্জন, আর কনের নাম শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী! তাই সতী ও মিনি বলিয়া এরা তাদের উল্লেখ করিতেছে। এ সতী তার সতী নয়!

তাহা হইলে?...নিশ্চিন্ত মনে সে ভাবিতে লাগিল, আতর বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে একখানা ঘর পাওয়া গিয়াছে। নভেলেই এ রকম ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিকই তো, এর কোন প্রতিকারও নাই! যেহেতু ফ্রীলডে পড়া এই নভেল-প্লাবিত বঙ্গে বেশী শক্ত নয়, কিন্তু লভে পড়িলেই তো আর নায়কদের জায়গীর দেওয়ার রীতি দেশে নাই! আহা! যদি ছাই একটা স্কলারশিপও থাকিত! নহিলে নায়িকাদের রাখা যায় কোথায়?

স্ত্রী-আচার শেষ করিয়া বরকে সম্প্রদানে বসানো হইয়াছে। পুরোহিত বেশ উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। কনের ভাই তাঁর প্রতিধ্বনি করিয়া চলিয়াছেন। অসংখ্য বিবাহ-যৌতুকের মধ্যে দু'চার রকমের চরকাও আছে। কমলাক্ষ উৎপ্রেক্ষিত চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছিল, কোন্ মুহূর্তে তার সেই আকাঙ্ক্ষিত মুখখানি তার সমুৎসুক দৃষ্টিপথে ভাসিয়া ওঠে!...তার পর কোন্ পথে তারা দুজনে যে ভাসিবে...!

ডাগর মেয়ে...চার জন বাহক বহন করিয়া কনে আনিল। টকটকে লাল খদ্দরের চওড়া জরি-ঢালা পাড়ের শাড়ী পরা, গায়ে আগাগোড়া ফুলের সাজ। সোনা-হীরার কোন বালাই নাই! সাংঘাতিক নন্-কো-অপারেটর বটে! বরের মুখে স্নিগ্ধ স্মিত হাস্য, তারও পরণে ঐ সাজ। কনের ঠোঁটে সুগভীর প্রেমের প্রকট চিহ্ন মধুর হাসিটুকু গোপনের চেষ্টায় আরও গভীরতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।

চমকিয়া কমলাক্ষ দেখে, ইনিই...সেই নির্য্যাতিতা হিন্দু বিধবা! ইনিই তার সেই মন্ত্রহীন বিবাহের প্রার্থিতা নির্ব্বাচিতা পাত্রী, ইনিই সেই পত্রলেখিকা সতী!

তার পাযের তলার মাটী দুলিতে লাগিল। তার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল। তবে সেই পত্রের লেখক...? এই বিবাহের নায়ক সতীরঞ্জন নিজে? সম্ভব বটে! লেখাটাও পুরুষোচিত, মেয়েলি ছাঁদের মোটেই নয়!

তবে সেদিনের সে কান্না...সেও কি—হয়তো বিবাহার্থিনীর সে কৌমার স্নেহের বিদায়-অশ্রু! ওঃ কি বিষম ভ্রান্তিতে পড়িয়াই সে—

এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে এখান হইতে বিদায় লইতে পারিলে যে বাঁচিয়া যায়। মার-ধোর না খাইতে হয়!

পলাইতে গিয়া পা বাধিয়া একটা চেয়ার উল্টাইয়া গেল। বেশ একটু শব্দ হইল। বর কনে সংযুক্ত করে বিবাহ-মন্ত্র তন্ময় ছিল, তবু চাহিয়া দেখিল। কনের দৃষ্টি শব্দকারীর উপর পড়িতেই তার মুখ এক অকথ্য ঘৃণায় রোষে লজ্জার কালিমাকে কোথায় ডুবাইয়া দিল! সে তীব্র নেত্রে চাহিয়াই তখন মুখ ফিরাইয়া লইল।

কমলাক্ষ দ্রুত পদে ফিরিয়া গেল এবং পরদিনই সে মেশ ছাড়িয়া দিল।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

স্বখাত সলিলে

আশামুকুল মাঘ মাসের সাধক মাসিকপত্রের ৩৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শব-সাধনা প্রবন্ধটি বার বার সাত বার প'ড়ে যখন শেষ কর্‌লে তখন তার চোখ মুখ দিয়ে খুশীর জেল্লা কমল-হীরার জ্যোতির মতন চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়ছিলো ; প্রবন্ধটা তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে ; প্রবন্ধটা তার নিজের লেখা...তার এই প্রথম রচনা সাধকের মতন প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে !

তার প্রবন্ধ প্রকাশের আনন্দের আতিশয্যটা সাতবার প'ড়ে দেখার পর যখন মনের মধ্যে অনেকটা থিতিয়ে বস্‌লো তখন তার মনটা একটু খুঁৎখুঁৎ কর্‌তে লাগ্‌লো—তার প্রবন্ধটা ছাপা আরম্ভ হয়েছে ৩৮২ পৃষ্ঠার নীচের দিক্ থেকে... এক জোড় সংখ্যার বাঁ দিকের পৃষ্ঠা, তায় আবার নীচের দিকে ! তার পরে আবার প্রবন্ধের মধ্যে ছাপার ভুল আছে তিনটে...শাস্তি ছাপায় হয়েছে শাস্তি, একটা কমা কম দেওয়া হয়েছে, আর বর্ণ ছাপা হয়েছে বর্গ ! কিন্তু এ ক্ষোভ তার আনন্দের প্রবল প্রবাহের মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পার্‌লো না...প্রবন্ধটা ছাপা যে হয়েছে এই আনন্দের গভীরতায় ছাপার সকল ত্রুটি তলিয়ে গেলো ।

সে আট বারের বার প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে হঠাৎ মাঝখানে থেমে গেলো, তার মুখ চোখ খুশীর আলোয় দ্বিগুণ দীপ্তিতে জ্বলজ্বল ক'রে উঠ্‌লো ; সে কাগজখানা রেখে দিয়ে একখানা চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লো ।

সে চিঠি লিখ্‌লে সাধক পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে সসম্মানে এই নিবেদন কর্‌বার জন্য যে সে সাধক পত্রের একজন নিয়মিত পাঠক ; সাধক পত্রের মাঘ মাসের সংখ্যার ৩৮২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত আশামুকুল মিত্র মহাশয়ের শব-সাধনা প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে সে অত্যন্ত প্রীত আনন্দিত তৃপ্ত উপকৃত হয়েছে এবং তার জন্য সে লেখক ও সম্পাদক মহাশয়দের দুজনকে তার অন্তরের আনন্দাপ্লুত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে । এই আশামুকুল মিত্র যে কে তা সে জানে না, কিন্তু এই একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ ক'রেই সে জানতে পেরেছে যে তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী শক্তিমান্ লেখক...তিনি ভাবুক, কবি, নিপুণ শব্দশিল্পী ! তিনি নিশ্চয় আগামী যুগের আগন্তুক সাহিত্য-সম্রাট্ ! কী তাঁর ভাষার বাঁধুনি, কী ওজস্বী মধুর রচনারীতি, কী যথাযথ অপরিবর্ত্তনসহ শব্দ নির্ব্বাচন, কী অকাট্য যুক্তি, কী গভীর সত্যোপলব্ধি, কী নির্ভীক স্বদেশভক্তি, কী আরো কতো কি...সেই-সব অনির্ব্বচনীয় গুণাবলী কেমন ক'রে সে ভাষায় ব্যক্ত কর্‌বে ! এমন সে এর আগে কখনো পড়ে নি...বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যধুরন্ধরদের রচনা এর কাছে ম্লান হয়ে গেছে...রবি-বাবুর রচনা

দুর্ব্বল ও নলিনীকান্ত গুপ্তের রচনা জটিল প্রতিপন্ন ক'রে দেবার জন্যে কোন্ সাহিত্য-সাধক কোন্ গোপন মনোগুহায় কঠোর শবসাধনা কর্‌ছিলেন! এমন প্রবন্ধ যে-কোনো মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করবে তার গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হবে ; তার গ্রাহকেরা আগ্রহে উন্মুখ হয়ে পরবর্ত্তী সংখ্যার প্রতীক্ষা করবে। এমন অসামান্য লেখক সাধককে অনুগ্রহ ক'রে সাধকের সাহিত্য-সাধনা সিদ্ধ করেছেন ; সাধক যেনো এমন লেখককে হাত-ছাড়া না করেন। এঁর রচনা প্রতিমাসেই প্রকাশ করতে পারলে সাধকের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার যে কতোদূর বর্দ্ধিত হবে তা অনুমানেরও অতীত। কিন্তু একটি ত্রুটির বিষয়ে সে বিচক্ষণ প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়...এমন উঁচুদরের অপূর্ব্ব প্রবন্ধ তাঁর প্রকাণ্ড কাগজের আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত নয়...এমন হীরকখনি-তুল্য মহামূল্য প্রবন্ধ কি কখনো জোড় সংখ্যার বাঁ-হাতি পৃষ্ঠার তলা ঘেঁসে ছাপ্‌তে হয়! এর স্থান সকল রচনার শীর্ষদেশে...অন্ততঃ বিজোড় পৃষ্ঠার প্রথমেই হওয়া উচিত ছিলো। এ রকম ত্রুটি যেনো ভবিষ্যতে মুগ্ধ ভক্ত পাঠকদের চিত্তে ক্ষোভ উৎপাদন না করে,—সকল পাঠকদের তরফ থেকে একজন নিয়মিত পাঠকের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

এই রকম ভাবের একখানি লম্বা পত্র লিখে শেষ ক'রে আশামুকুল প্রফুল্ল মুখে পত্রখানা বার দুই পড়লে ; তারপর চিঠির নীচে নাম স্বাক্ষর করলে—শ্রীআনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন, লালবাগ, ঢাকা।

পত্রখানি খামে ভ'রে খামের উপরে সাধক-সম্পাদকের নাম ঠিকানা লিখে আশামুকুল তার বালক ভৃত্যকে ডাকলে—ওরে কুমুদ! কুমুদ রে!

বাড়ীর নীচের তলার রান্নাঘর থেকে কুমুদ চেঁচিয়ে সাড়া দিলে—আজ্ঞা, আইতে আছি।

আশামুকুল কর্কশস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—আইতে আছি না হতাভাগা, চট কর্যা আয়।

কুমুদ উনন ধরাচ্ছিলো ; দু হাতে কয়লা কেরোসিন-তেল মেখে আশামুকুল কাছে এসে দাঁড়ালো।

আশামুকুল কুমুদের দিকে দৃক্‌পাত করেই ধম্‌কে উঠলো—দুর হতভাগা গোভূত কোথাকার! দু হাতে তেল কালী মেখে বাঁদর সেজে এসে হাজির! এক তোর নিজের দুইগাল চড়ানো ছাড়া তুই আর অন্য কোন্ কাজ কর্‌তে পারিস ঐ নোংরা বাঁদুরে হাতে যে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এলি! বাঃ...হাত ধুয়ে চট্ ক'রে আয়...

কুমুদ আর দ্বিরুক্তি না ক'রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে।

আশামুকুল তাকে আবার ডেকে বল্‌লে—ওরে এই ছোঁড়া, এই...সাবান নিয়ে যা...বেশ ক'রে হাত ধুয়ে পরিষ্কার কাপড়ে হাত মুছে চট্ ক'রে আয়...

আশামুকুল ভৃত্যের হাত ধোবার জন্য একখানা আস্ত পিয়ার্স সোপই বাহির করে বক্‌শিশ দিয়ে ফেললে।

কুমুদ যেতে যেতে বল্‌লে—চুলোটা ধরিয়ে দিয়েই আস্‌ছি।

আশামুকুল বিরক্ত হয়ে কর্কশস্বরে বললে—চুলো ধরানো চুলোয় যাক! তুই সব কাজ ফেলে রেখে আগে যা বল্‌ছি তাই কর্ হনুমান!

কুমুদ নির্বাক হয়ে দ্রুতপদে চলে গেলো।

আশামুকুল আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধনের বেনামীতে লেখা চিঠিখানা হাতে ক'রে হাসি-হাসি মুখের

থুতু দিয়ে খামের আঠা ভিজিয়ে খাম আঁট্‌তে আঁট্‌তে ভাব্‌ছিলো—এই চিঠি পেয়ে সাধকের সম্পাদক নিশ্চয়ই একেবারে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে যাবে আর সে প্রতিমাসে প্রবন্ধ লিখে দেবার জন্য তাকে অনুনয় বিনয় ক'রে চিঠি লিখ্‌বে। সেই চিঠির উত্তরে সে খুব বিনীত সম্মানের সহিত লিখ্‌বে যে আপনার অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো, কিন্তু আমার সময় অল্প আর অপর বহু সম্পাদকও আমার এই প্রবন্ধ পাঠ ক'রে আমাকে প্রবন্ধ পাঠাতে অনুরোধ ক'রেছেন ; তা যাই হোক্ আপনার দাবী অগ্রগণ্য...ইত্যাদি...

কুমুদ কাপড়ের কোঁচায় হাত মুছ্‌তে মুছ্‌তে প্রভুর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

তাকে দেখেই আশামুকুলের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য পথে প্রবাহিত হলো, সে বল্‌লে—এসেছিস ? দেখি তোর হাত...হ্যাঁ, হয়েছে...আচ্ছা, আর-একবার বেশ ক'রে কাপড়ে মুছে নে...এই চিঠিখানা...বুঝচস্ ?...অ্যাঁ... এই চিঠিখানা লয়্যা চকে যাবা...বোঝ্‌লা ?...মোটর-বাসে চড়্যা চকে যাবা...দু আনা লাগ্‌বো যাইতে, আর দু আনা লাগ্‌বো আইস্‌তে...কেমন ?...বোঝ্‌লা নি ?...চকে যায়্যা এই চিঠিখান...এই চিঠিখান বুঝচ্‌স তো ? ...হ্যাঁ এই চিঠিখান বহুত জরুরী, বহুত দামী...হারাবা না, হ্যদিক উদিক ফেল্‌বা না...চকে যায়্যা চকের ডাকঘরের...আরে চকের ডাকঘর ...যারে তোরা কস্ পুষ্ট আপিস...সেহানে ডাকবাক্‌স আছে নি...চিনস্ তো ? হ...হ...হেই ডাক-বাক্‌সে এই চিঠিখান ফেল্যা দিবা...ডাক্-বাকসের বিতরে...এক্কিবারে মইদ্ধে...ফেল্‌বা, বাইরা-উইরা না...বোঝ্‌লা তো ?...

কুমুদ হাত বাড়িয়ে চিঠি ও পয়সা নিতে নিতে গলার কণ্ঠনালী থেকে খানিকটা নিশ্বাসের বাতাস এক ধাক্কায় মুখের বাহিরে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে শব্দ কর্‌লে—হঃ !

আশামুকুল ভৃত্যের বুদ্ধিহীনতায় শঙ্কিত বিরক্ত ও সন্দিগ্ধ হয়ে ব'লে উঠলো—আরে হঃ কইলেই তো অইলো না... কি বোঝলা আমারে কও তো...

কুমুদ হাসি চেপে নিটোল মুখে বল্‌লে—এই চিঠি আর পয়স্যা লয়্যা মোটর-বাসে চড়্যা চক-বাজারে জামু আর ওহ্‌নের ডাকঘরের ডাকবাকসে চিঠিটা ফিকা দিয়া ফির্‌যা আমু ফের মোটরবাসে চড়্যা।

আশামুকুল আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে—হ হ ঠিক বুঝচ্‌স...যা যা চট কইর‌্যা চইল্যা জা !...

কুমুদ চিঠি ও পয়সা নিয়ে প্রস্থান কর্‌লো।

আশামুকুল আবার ডেকে তাকে সাবধান ক'রে দিলে—চিঠি য্যান্ হারান্ যায় না, দেখস্।

কুমুদ নেপথ্য থেকেই হেঁকে বল্‌লে—না আজ্ঞা, চিঠি হারান যাবে না আজ্ঞা।

আশামুকুলের কল্পনা সুখস্বপ্নের মোহন জাল বুন্‌তে ব্যাপৃত হলো।

কুমুদ ছোক্‌রার স্বভাবটা তার নামের অর্থেরই অনুরূপ—সে কুকর্ম্মেই আমোদ পায় বেশী। তার প্রভু তাকে ঐ চিঠিখানা সম্বন্ধে অতো সতর্ক কর্‌লে ব'লেই তার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠ্‌লো, সে বাড়ী থেকে পথে পা দিয়েই চিঠিখানার দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে, তার মনে হলো বাবু নিশ্চয় কোনো ভালোবাসা মেয়্যা-লোককে ঐ চিঠি লিখেছে...কি লিখেছে খাম খুলে দেখ্‌তে হবে।

কুমুদ নাইট্-স্কুলে পড়ে ; ইংরেজী বাংলা দুই ভাষাই অল্প স্বল্প পড়্‌তে পারে। সে খামের উপর চোখ দিয়েই দেখ্‌লে সাধক সম্পাদকের নামে চিঠি। ওখানে তো কুমুদ এই গত মাসে বাবুর কতো চিঠি নিয়ে কতো বার গেছে ; সে তো সেই আপিস বেশ চেনে।

তবে বাংলা-বাজার থেকে দিগ্‌বাজারে চিঠি নিয়ে যেতে কোনো যে শহরের উল্টা দিকে চকে গিয়ে চিঠি ডাকে দিতে হবে তা সে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লে না। হঠাৎ কি বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেলো ? বাড়ীর পাশের বাড়ীতে চিঠি দেবার জন্যে এক আনার ডাক-টিকিটই বা খরচ করার কোনো আর চার আনা পয়সাই বা গাড়ীভাড়া দেওয়া কেনো ?

কুমুদ তখনও-ভেজা ডাক-টিকিটখানা খামের উপর থেকে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে টেনে তুলে ফেল্‌লে। তার পর টিকিটখানা নিজের ফতুয়ার পকেটে রেখে দিলে এবং খামের উপর যেখানটায় টিকিট লাগানো ছিলো সেখানকার আঠার দাগটার উপর এক ধ্যাবড়া থুতু ফেলে আঙুল দিয়ে একটু ঘ'সে শেষে কাপড় দিয়ে বেশ ক'রে মুছে মুছে সাফ ক'রে দিলে। তার মুখখানা চাপা হাসির প্রভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, তার চোখ দিয়ে আনন্দ ঠিক্‌রে বেরুতে লাগ্‌লো। চকে যেতে আস্‌তে এক ঘন্টা লাগ্‌তো ; সেই সময়টা সে বাঁচিয়ে কাজ থেকে ছুটি পাবে ; আর পাঁচ-পাঁচ-আনা পয়সা উপ্‌রি পাওয়া হয়ে গেলো ! আজ না-জানি সে কা'র মুখ দেখে উঠেছিলো !

কুমুদ অল্প দূর অগ্রসর হয়ে যেতে না যেতেই তার কানে এসে পৌঁছালো ফেরিওয়ালার মধুর স্বর—বরই, বরই, বালো বরই।

কুমুদ চট্‌ ক'রে কুল-ওয়ালার দিকে ফিরে ডাক্‌লে—এই বরই, এক পয়সার দাও তো। চুকা তো অইবো না ?

এক পয়সার কুল কিনে ফতুয়ার দুই পকেট ভর্ত্তি করে নিয়ে যেতে যেতে সে অগ্রসর হ'লো ?

পথে আজ যা দেখে তাই কিন্‌তেই আজ তার আগ্রহ ; চার আনা কাঁচা পয়সা আজ তার উপ্‌রি লাভ হয়েছে ; ডাক-টিকিটখানা তো ফাউ আছে, পরে সেখানা বেচ্‌লে এক আনা পয়সা ট্যাকে আসবে, অথবা ডাকঘর থেকে বদ্‌লে দুখানা 'পুষ্টকাড' আন্‌লে দু মাস বাড়ীতে চিঠি লেখা চল্‌বে। সে চীনাবাদাম, আর পান-বিড়ি কিনে আরো দুটো পয়সা খরচ কর্‌লে। কিন্তু এমন সব সস্তা মালের খুচরা সওদা ক'রে তার পকেটের পুঁজি বিশেষ ক্ষয় হচ্ছিলো না ; এতে তার মনটা কেমন নিশ্‌পিশ কর্‌ছিলো, কেমন করে কতোক্ষণে পয়সা কটা নিঃশেষে খরচ ক'রে ফেল্‌বে তার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। সে এক মিঠাইর দোকানে ঢুকে তিন আনার খাবার পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিলে। এবং দোকান থেকে বেরিয়েই দেখ্‌লে একজন অন্ধ পথের ধারে ব'সে ভিক্ষা কর্‌ছে ; বাকী একটা পয়সা সে সেই ভিক্ষুককে দিয়ে-ফেলে খুশী হাল্কা মনে সাধক-আপিসের দিকে যাত্রা কর্‌লো।

সাধক-আপিসের ভিতরে ঢুকতেই একজন ভদ্রলোক তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কী চাও তুমি ?

কুমুদ তাড়াতাড়ি বল্‌লে—একখানা চিঠি আছেন আজ্ঞা।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন—দেখি।

কুমুদ তাঁর হাতে চিঠি দিলে। তিনিই সাধকের সম্পাদক ডাক্তার মোহিনীমোহন দাস।

সম্পাদক পত্রখানি হাতে নিয়েই দেখ্‌লেন তাঁর নামেই পত্র। তিনি পত্র খুল্‌তে খুল্‌তে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা থেকে চিঠি আন্‌ছিস ?

কুমুদ বললে—এই বাংলা-বাজারের আশামুকুলবাবুর কাছ থনে। যিনি গেলো মাসে

সাত বার চিঠি লেখেছিলো...

আশামুকুল। নামটা সম্পাদকের পরিচিত। অনেক প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যান করার পর এ মাসের সাধকে একটি লেখা অনেক দুরমুষ ক'রে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু চিঠির নীচে নাম সই করা আছে শ্রীআনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন।

সম্পাদকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হলো। তিনি পত্র পড়তে আরম্ভ করলেন। একটু প'ড়েই তাঁর মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সম্পাদকের মুখ প্রফুল্ল হ'তে দেখেই কুমুদ মনে করলে সে খুব একটা খোস-খবর এনে দিয়েছে। তাই বাবুকে আরো খুশী ক'রে দেবার জন্যে সে বললে—বাবু আমারে বলেছিলো চকবাজারে গিয়া চিঠি পোষ্ট-আপিসে দিতে ; তা অতোখানি উজায়ে যায়্যা চিঠি ডাকে দিলে এহানে আসতে দেরী হবো বলে আমি নিজেই নিয়া আলাম।

কুমুদ পয়সার কথাটা চেপে গেলো।

সম্পাদক হাসি-চাপা খুশীর মুখে বললেন—বেশ ক'রেছিস। ...দাঁড়া জবাব দেবো...

তার পর তিনি তাঁর আপিসের ম্যানেজারকে বললেন—দীনবন্ধু, দেখো তো এই মাসের সাধকে ছাপা প্রবন্ধের কপির ফাইলের মধ্যে আশামুকুলবাবুর শব-সাধনা প্রবন্ধের কপিটা আছে কি না ?

দীনবন্ধু উঠে গিয়ে ফাইল থেকে কপি এনে দিলে।

সম্পাদক প্রবন্ধের ও চিঠির লেখা মিলিয়ে দেখ্‌লেন দুই এক হাতের লেখা—চিঠির লেখাটা একটু টানা, অযত্নে লেখা, নিজের লেখার ছাঁদ গোপনের চেষ্টায় একটু বিকৃত ; আর প্রবন্ধটি সযত্নে লিখিত। এই আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন যে আশামুকুলই স্বয়ং সে বিষয়ে সম্পাদকের আর কোনো সন্দেহই রইলো না।

আশামুকুল বেচারা মনে করে নি যে আপিসে আবার ছাপা প্রবন্ধের কপি ফাইল ক'রে রাখা আছে, এবং সম্পাদক আবার সন্দিহান হ'য়ে তার লেখার সঙ্গে এই চিঠির লেখা মিলিয়ে দেখ্‌বেন।

সম্পাদক আশামুকুলকে একখানি পত্র লিখে খামে বন্ধ করলেন এবং কুমুদের হাতে সেই খাম আর একটি সিকি দিয়ে বল্‌লেন—এই চিঠিখানি তোমার বাবুকে দিয়ো...একটু দেরী ক'রেই দিয়ো না হয়, বোলো একজন লোক দিয়ে গেছে...আর এই সিকিটি তুমি নিয়ো, জল খেয়ো।

কুমুদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো—আজ তার সুপ্রভাত হয়েছিলো, ন আনা পয়সা উপরি রোজ্‌গার। আজ বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সদরঘাটে বায়োস্কোপ দেখ্‌তে হবে এই সিকিটি দিয়ে। কুমুদ দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে—নমস্কার

তার পর সে দ্রুত পদে বাসার দিকে ফিরে চল্‌লো।

সে বাসায় ফিরেই সম্পাদকের চিঠিখানা নিজের বালিসের তলায় লুকিয়ে রেখে দিলে এবং অতি নিরীহ ভালোমানুষের মতন যেনো গৃহকর্ম্মেই ব্যস্ত আছে এমনি ছুতা ক'রে একবার বাবুর ঘরের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেলো।

কুমুদকে যেতে দেখেই আশামুকুল ব্যগ্র হয়ে তাকে ডাকলে—আরে কুমুদ, শুনে যা...

কুমুদ এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো।

আশামুকুল জিজ্ঞাসা করলে—চিঠি দিয়ে এলি ?

—আজ্ঞা।

আশামুকুল নিশ্চিত হবার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করলে—চকের পোষ্টাপিসে দিয়েছিস তো ?

—আজ্ঞা।

—কোথাও ফেলে দিস্ নাই তো ?

—না আজ্ঞা। পুষ্ট-আপিসেই দিয়ে আস্ছি আজ্ঞা।

আশামুকুল আশ্বস্ত হয়ে বল্লে—আচ্ছা যা।

প্রভুর মুখ প্রফুল্ল দেখে কুমুদ বল্লে—আমি বিকালে দু ঘন্টার ছুটি চাই আজ্ঞা।

আশামুকুল বিরক্তস্বরে জিজ্ঞাসা কর্লে—ছুটি ? ছুটি আবার কিসের জন্যে ?

কুমুদ বল্লে—আমার দেশের থনে একজন লোক আস্ছে, তার সঙ্গে...

আশামুকুল সমস্ত কথা শোন্বার ধৈর্য্য ধারণ কর্তে না পেরে বল্লে—আচ্ছা, যা, যা, শিগ্গির আসিস্...

কুমুদ বোঁ ক'রে ছুটে চ'লে গেলো, বায়োস্কোপ দেখ্তে যেতে পাবে এই আনন্দে সে অস্থির হয়ে উঠেছিলো।

আশামুকুল ব'সে ব'সে জাগ্রত স্বপ্নে কল্পনা কর্তে লাগ্লো—সম্পাদক চিঠিখানা আজই বিকালে পাবে। পেয়েই আবার হয় তো প্রবন্ধ চেয়ে পাঠাবে।...আমি লিখ্বো...সাধকে আমার প্রবন্ধ ক'রে প্রবাসী ভারতবর্ষ আর বসুমতীর সম্পাদকেরা আমার কাছে প্রবন্ধ চেয়ে পাঠিয়েছেন ; প্রবাসীর তরফ থেকে কবি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত চিঠি লিখেছেন সাধকের শবসাধনা প্রবন্ধ তাঁরা প্রবাসীর কষ্টি পাথরে তুল্বেন। সে যাই হোক, সাধকের দাবী আমার কাছে অগ্রগণ্য। আমি সাধককে প্রবন্ধ দিয়ে সময় পেলে অন্যান্য সম্পাদকের প্রার্থনা পূরণ কর্বো...এই চিঠি সম্পাদক পেলে আমার দর আরো বেড়ে যাবে...কল্কাতার বড়ো বড়ো নামজাদা কাগজের সম্পাদকেরা আমার প্রবন্ধ চেয়ে পাঠিয়েছে জান্লে এখন থেকে আমার যে লেখা পাবে তাই আগ্রহের সঙ্গে ছাপ্বে...কালে আমার নামটা প্রচার হয়ে যাবে...তখন ঢাকার শান্তি দীপিকা আর নারায়ণগঞ্জের বীণা, ময়মনসিংহের সৌরভ আমার লেখা চাইবে...তার পর অতি সহজেই বসুমতী ভারতবর্ষ থেকে বিচিত্রা আর প্রবাসী পর্য্যন্ত আমার বিজয়রথের অভিযান অনায়াসে হবে...

কুমুদ বায়স্কোপ দেখে রাত্রে বাসায় ফিরে এলো এবং জমা কাজকর্ম্ম ও আহারাদি সেরে সে গিয়ে শুয়ে পড়লো ; বায়স্কোপের হাসির ছবিতে একটা লোক যে রঙ্গ করেছে তারই কথা মনে প'ড়ে প'ড়ে হাসিতে তার পেট ফুলে ফুটে উঠ্ছিলো ; এই ব্যাপার ভাবতে ভাবতে সে শীঘ্রই সুখস্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে গেলো, তার বালিসের তলায় যে তার প্রভুর চিঠি চাপা আছে তার কথা তাব মনেও পড়লো না।

কুমুদ সকালে উঠে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছে ; চিঠির কথা তার মনেই নেই।

কিন্তু আশামুকুল পত্রের প্রত্যাশায় ছট্ফট্ কর্ছে। সে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে কর্ছে এইবার সাধক-আপিসের চাপ্রাসী চিঠি নিয়ে আস্বে। যখন বেলা মধ্যাহ্নের দিকে ঝুঁকে চল্লো তখন তার মনে হলো সম্পাদক চিঠি বোধ হয় ডাকে দিয়েছে, এই সকালের ডাকে পাওয়া যাবে। প্রতীক্ষায় জান্লায় ব'সে পল পল গুণে সময় আর কাট্তে চায় না। অবশেষে দেখা গেলো ডাকপিওনের খাকী-পোশাক। ডাক-পিওন তার দরজা পেরিয়ে চ'লে যায় যে! লোকটা কি চিঠি নিয়েই চল্লো, দিতে ভুলে গেলো ? আশামুকুল উদ্বেগাকুল স্বরে

হেঁকে ডাক্‌লে—ইস্রাফিল, আমার কিছু আছে ?

ইস্রাফিল বাড়িটাকে পথের সমান্তরল ক'রে মাথা পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে উর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনার কিছু নেইকা আজ্ঞা।

আশামুকুল হতাশায় মুস্‌ড়ে পড়লো। সে নিরাশ্বাস অন্তরকে আশা দেবার জন্য ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লে—কালকে চিঠি পেয়েই কি আর তখনই আমাকে প্রবন্ধের জন্য লিখ্‌বে ? আজ-কালই লিখ্‌বে...শীগগিরই চিঠি পাবো।... তা একখানা চিঠির কর্ম্ম নয়...নানান জায়গা থেকে নানান জনে চিঠি লিখছে দেখ্‌লে সম্পাদকের চাড় আর আগ্রহ বেশী হবে। ...কতকগুলো চিঠি লিখে আমি রোজ নানা জায়গায় গিয়ে গিয়ে পোষ্ট করবো...একদিন নারায়ণগঞ্জে যাবো, একদিন টঙ্গি আর কাওরাইদ যাবো ; যেখানে যেখানে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে তাদের চিঠির মধ্যে খামে বন্ধ নামঠিকানা লেখা এক একখানা চিঠি পাঠিয়ে দেবো, তারা সেখানেই পোষ্ট্‌ ক'রে দেবে, আর সম্পাদক পত্রবাণে আচ্ছন্ন হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌বে।

এই কৌশল মাথায় আস্‌তেই আশামুকুলের মুখ উজ্জ্বল ও মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। সে কতকগুলি বেনামী চিঠি নানারকম ভাবে লিখে ফেল্‌বে ব'লে উঠে পড়্‌লো এবং কাগজ কলম নিয়ে বাঁ হাতে লিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। বাঁ হাতে লেখা ভালোও হয় না, লেখা অগ্রসর হতেও চায় না ; এদিকে মন ভাবের বন্যার তোড়ে ছুটে ভেসে যেতে চায়। সে অস্থির হয়ে কাগজ কলম ফেলে রেখে ডাকলে—এই কুমুদ, হতভাগা, শুইন্যা যা...

কুমুদ ছুটে এসে হাজির হলো।

আশামুকুল জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কাল চিঠিখানা ঠিক ডাকে দিয়েছিলি তো ?

কুমুদের মনে পড়্‌লো সেই চিঠির উত্তর তার উপাধানের তলায় চাপা আছে। সে বল্‌লে—হাঁ, দিয়াছিলাম আজ্ঞা।

আশামুকুল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে—দিয়াছিলাম আজ্ঞা ! দিয়েছিলি তো জবাব আসে না ক্যান ?

এই প্রশ্ন ক'রেই আশামুকুলেব মনে হলো চিঠি দিলেই কি জবাব আসে ? এই পাল্টা প্রশ্ন পাছে কুমুদ ক'রে বসে এই লজ্জায় সে কুমুদকে ধমক দিয়ে বল্‌লে—যা, যা...

কুমুদ অপরাধীর মতন অপ্রতিভ মুখে সেখান থেকে স'রে পড়্‌লো। এবং নিজের ঘরে গিয়ে বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা বার কর্‌লে। তার তৈলসিক্ত বালিসের আসক্তিতে চিঠিখানার স্থানে স্থানে তেলের ছোপ লেগেছে, কুমুদ সেই চিঠিখানা হাতে ক'রে ভাবলে এখনই গিয়ে চিঠিখানা দিলে তো ঠিক হবে না ; আর একটু দেরী ক'রে দিতে হবে। সে চিঠিখানা ফতুয়ার পকেটে রেখে আবার কাজে লেগে গেলো।

আশামুকুল বাঁ হাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কুঁদে কুঁদে অতিকষ্টে আর-একখানা চিঠি সাধকের সম্পাদককে লিখ্‌লে...নারায়ণগঞ্জ থেকে শ্রীমতী বীণাপাণি গুপ্ত লিখ্‌ছেন—আশামুকুল-বাবুর প্রবন্ধের তুল্য প্রবন্ধ ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি ! আশামুকুল চিঠি লিখে আবার প'ড়ে দেখ্‌লে ; লেখার ছাঁদ আর ভঙ্গী ঠিক মেয়েলীই হয়েছে। সে খুশী হয়ে খামের উপর ঠিকানা লিখ্‌ছে এমন সময় কুমুদ এসে বাবুর কাছে একখানা চিঠি রেখে দিলে। চিঠির দিকে দৃক্‌পাত করতেই আশামুকুলের আশা একেবারে নেচে উঠ্‌লো, আশামুকুলের আশামুকুল এইবার প্রস্ফুটিত হয়েছে !...খামের উপর সাধক-সম্পাদকের হাতের

লেখা !...সে তো তাঁর হাতের লেখা চেনে !

আশামুকুল উৎসাহব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—এ চিঠি কখন এলো ?

কুমুদ স'রে পড়তে পড়তে ব'লে গেলো—এহনই একজন লোক দিয়া গেলো ।

আশামুকুল খাম খুল্তে খুল্তে তাড়াতাড়ি বল্লে—দেখ্ দেখ্ লোকটা যদি থাকে তাকে চার আনা পয়সা বক্‌সিস দিয়ে দে...তোর কাছেই তো বাজারের পয়সা আছে...

কুমুদ দরজার ওপার থেকে আনন্দে দন্তবিকাশ ক'রে ব'লে গেলো—"আজ্ঞা ।" তার ট্যাঁকে আর চার আনা পয়সা বাসা নিলে ।

আশামুকুল খাম থেকে তাড়াতাড়ি চিঠি বাহির ক'রে পড়লে সম্পাদক লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের পত্রের একজন পাঠক লালবাগনিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন আপনার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত আমাদিগকে জানাইয়াছেন ; আপনার অবগতির জন্য সেই পত্র আপনাকে পাঠাইলাম ।

বিনীত

শ্রীমোহিনীমোহন দাস

আশামুকুলের মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো...তারই নিজের লেখা বেনামী চিঠিটা সম্পাদক তাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন ! কিন্তু আর লেখা তো চান নি ? বোধ হয় প্রশংসা দ্বারাই বোঝাতে চেয়েছেন যে আমার লেখার জন্য সাধক যখন সমাদৃত হয়েছে তখন আমার লেখা যে স্বাগত তা বলাই বাহুল্য ।

আশামুকুল সম্পাদকের চিঠির তলা থেকে আর-একখানি পত্র বাহির কর্‌লে এবং তার উপরে দৃষ্টিপাত করেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেলো...এ চিঠি তো তার লেখা সেই চিঠি নয় !...এ যে সম্পাদকের নিজের হাতে লেখা !...তিনি আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধনের বেনামীতে লিখেছেন—

সম্পাদক মহাশয়,

এ মাসের সাধকে শব-সাধনা প্রবন্ধটি পচা-মড়ার গন্ধে ভরপুর । নূতন লেখককে উৎসাহ দিবার জন্যও এমন কাঁচা বিশ্রী লেখা ছাপা আপনার উচিত হয় নাই, এ রকম লেখা ভবিষ্যতে আর যেনো সাধকের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত না করে এই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ । আশামুকুলের আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন করিতে গিয়া আমাদের আনন্দচন্দ্রকে বিরক্তির রাহুগ্রাসে ফেলিবেন না । ইতি—বিনীত শ্রীআনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন, লালবাগ ।

আশামুকুলের হাত থেকে পত্র দুখানা খ'সে মাটিতে পড়ে গেলো শীতের ছোঁয়া-লাগা গাছের দুটির জীর্ণ পত্রের মতন । আর সে স্থাণুর মতন নিশ্চল অবাক হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলো !

রমণা, ঢাকা । **চারু বন্দ্যোপাধ্যায়**

শাড়ী ও শেমিজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তরুণ-তরুণী

পটলডাঙ্গার এক গলি। গলির মধ্যে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া ঢুকিল। রাত তখন আটটা বাজিয়াছে। গাড়োয়ান কহিল—কোন্ বাড়ী, বাবু ?

গাড়ীর মধ্যে দু'জন মাত্র আরোহী ; একজন পুরুষ, অপরটি নারী—উভয়েই বয়সে তরুণ। গাড়োয়ানের কথায় পুরুষটি গাড়ীর মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল—এ তো ৩৭ নম্বর দেখচি। আরো আগে রে...১২ নম্বর বাড়ী।

গাড়োয়ান ঢিমা চালে গাড়ী হাঁকাইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল, আর পুরুষ-আরোহী মুখ বাড়াইয়া পাশাপাশি বাড়ীর নম্বর দেখিতে ব্যস্ত রহিল।

অবশেষে ছোট একটা দোতলা বাড়ীর দ্বারে ইংরাজীতে ১২ নম্বরের প্লেট মারা দেখিয়া তরুণ বলিয়া উঠিল—সবুর, সবুর, এই বাড়ী।

গাড়ী থামিল। বাড়ীর দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তরুণীর দিকে চাহিয়া তরুণ কহিল—এই তো বাড়ী...এই যে ১২ নম্বর।

তরুণ কহিল—তুমি আগে নামো। নেমে দ্যাখো,—বাড়ী বদলেচে কি না...

তরুণ কহিল,—হ্যাঁ, বাড়ী বদলাবে অমনি শুধু-শুধু ? আচ্ছা, বল্‌চো যখন—বেশ, নেমেই দেখি।

তরুণ গাড়ী হইতে নামিল, নামিয়া বদ্ধ দ্বারের কড়া নাড়িল। একটা উড়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তরুণ কহিল— কালিদাস বাবু এই বাড়ীতে থাকে ?

উড়ে তরুণের পানে চাহিল। তরুণ প্রমাদ গণিল, আবার কহিল,—কালিদাস বাবুর বাড়ী এইটে ? সে বাবু একলা থাকেন, বুঝলি ? মেয়েছেলে থাকে না—বাবু কলেজে পড়েন ?

উড়ে কহিল—হ, কলিদাসো ববুর বসা অছে।

তরুণ কহিল—বাবু বাড়ী আছে ?

উড়ে কহিল,—না।

তরুণ কহিল,—বাবুর চাকর সদা ?

উড়ে কহিল,—না।

তরুণ আপন-মনে কহিল, বাঃ ! তারপর উড়ের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—ঘর খোলা আছে, না, চাবি-বন্ধ ?

উড়ে কহিল—চাবি বন্ধ অছে...চাবি মোর কছে।

—যাক্, বাঁচা গেল। বলিয়া তরুণ গাড়ীর দিকে ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—নামো। এই বাড়ীই ঠিক,—তবে বাবু বাড়ী নেই। তাহোক্, নেমে আস্তানা পাওয়া যাবে'খন।

তরুণ গাড়ী হইতে নামিল। গাড়ীর মাথায় বিস্তর মোট। তরুণ উড়েকে ডাকিল ; এবং গাড়োয়ান ও উড়ের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া মোটঘাট নামাইয়া দ্বিতলে উঠিল। উড়ে চাবি খুলিয়া দিলে তরুণ জামা খুলিয়া আল্‌নায় মেলিয়া দিয়া খাটে শুইয়া পড়িল। তরুণী বলিল,—আমি গা ধুয়ে আসি। এসে খাওয়ার যাহোক্ ব্যবস্থা করা যাবে'খন। তারপর উড়েকে কহিল—কল-ঘর কোন্ দিকে রে ?

উড়ে কল-ঘর দেখাইয়া দিলে তরুণ গা ধুইতে চলিয়া গেল।

তরুণ উড়েকে কহিল—বাবুর বামুন নেই ?

উড়ে কহিল,—অছে।

তরুণ কহিল—কোথায় গেল ?

তরুণের বিবিধ প্রশ্নে উড়ে তার বিশুদ্ধ কটকী-ভাষায় উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিল, বাবু বাড়ী নাই ; কাছে এক-জায়গায় যাত্রা হইতেছে, সদা ভৃত্য ও বামুন ঠাকুর—এরা দুজনেও সেখানে যাত্রা শুনিতে গিয়াছে ; যাইবার সময় তার উপর বাড়ী চৌকির ভার দিয়া গিয়াছে। বাবু কখন্ ফিরিবেন, তা তার জানা নাই।

তরুণ কহিল,—বাবুর খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই ?

উড়ে কহিল—জনি না।

তরুণ কহিল—তা, তুই এক কাজ করতে পারবি। সামনে কোনো খাবারের দোকান থেকে লুচি, আলুর দম, রাবড়ি, আর মিষ্টি-টিষ্টি কিছু কিনে আনতে পারবি নে ?

উড়ে জানাইল, পয়সা পাইলে সব সে কিনিয়া আনিতে পারিবে।

তরুণ উঠিয়া ব্যাগ খুলিয়া উড়ের হাতে দুইটা টাকা দিল, দিয়া কহিল—যা, দু'জনের মত লুচি, আর খাবার-দাবার কিনে আন্ তো বাবা...তোর বক্‌শিস আলাদা মিলবে।

উড়ে টাকা লইয়া চলিয়া গেল। তরুণ আবার বিছানায় শুইল।

তরুণ গা ধুইয়া আসিয়া কহিল,—তুমি স্নান করে নাও...শেষ রাত্রে ফের বেরুতে হবে, তখন কি আর স্নান করতে পারবে ?

তরুণ কহিল—তা পারবো। তবে এখনো স্নান চাই। না হলে রেলের কয়লা মেখে থাকলে নিদ্রাদেবী স্পর্শ করতে কুণ্ঠিত হবেন। মাথা ঝাড়লে বোধ হয় আড়াই সের কয়লার গুঁড়ো বেরোয় !

তরুণী কহিল—তাহলে যাও...আমি দেখি, খাওয়ার ব্যবস্থা কি করতে পারি।

তরুণ কহিল—সে আর কাজ নেই। আমি উড়েটাকে খাবার আনতে দিছি।

তরুণী কহিল—যা বলেচো। তাতে হয় কখনো ? কাল সারা দিন আবার রেলে কাটবে। সাহেবগঞ্জ পৌঁছুতে সেই যার নাম রাত আটটা।

তরুণ কহিল—তোমার ভ্রাতৃবর নিরুদ্দেশ, সেই সঙ্গে তাঁর বামুন-চাকরও। কথায় বলে না, বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর্।

তরুণ কহিল—দাদা মোদ্দা বাসা ছেড়ে গেল কোথায় ? রাত্রে ফিরবে না ? মেশোমশায় জানতে পারলে মহা অনর্থ বাধাবে ! যেখানেই যাক্, না ফিরলে দেখা হবে না, এই যা দুঃখ ! বলিয়া সে একটু হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তরুণ উঠিয়া বসিল, বসিয়া কহিল—শালা ভারী ওস্তাদ্ হয়েচে, দেখচি।...

তরুণী কহিল—তুমি যাও, স্নান করে এসো। এক চৌবাচ্চা জল আছে, সেখানে তোয়ালে সাবান সব পাবে...আর দেরী করো না। আমি যাই, রান্নাঘরটা খুঁজে পেতে

হাঁড়িতে দুটি চাল চড়িয়ে দি.. ভাতে-ভাত করা যাবে...খেয়ে শুয়ে পড়া যাক। জিনিষপত্র ঠিক আছে, আর খুলে কাজ নেই...যেমন যা আছে, থাক! কে আবার গুছোবে? ভোরেই তো ট্রেণ। তুমি বরং আমার কাপড়খানা পরেই নাও গে যাও, আর একটা কাপড় নাই ভিজুলে।...

—বেশ তাই হবে। বলিয়া তরুণ স্নানের উদ্দেশে কল-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিচয়

শিবনাথ লাহিড়ীর বাস পাবনা অঞ্চলে। পয়সাওয়ালা লোক। এককালে কলিকাতার সৌখীন সমাজে তিনি বিশেষ নাম কিনিয়াছিলেন; কিন্তু মস্ত দায়ে ঠেকিয়া দল ছাড়িয়া রাণাঘাটে ফিরিয়া আসেন। সে সব কাহিনী আজ এখানে তোলার কোন কোন প্রয়োজন দেখি না।

শিবনাথের পুত্র কালিদাস ইন্টারমিডিয়েট পাশ করিলে তার কলিকাতায় বি-এ পড়ার কথা উঠিল। শিবনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। নিজের প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়িল,—কলেজে পড়িবার সময়ই নানা সঙ্গীর আবির্ভাব হয়। এবং সেই সব সঙ্গীর সাহচর্য্যে সৌখীনতার যা কিছু সরঞ্জাম যেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে সব স্থানই তাঁর চরণ-পাতে ধন্য হইয়া উঠিয়াছিল। তবু তখনকার হাওয়া এখনকার মত এমন অবাধ বিস্তার লাভ করে নাই! ছেলেকে সেই কলিকাতায় পাঠাইতে তাঁর মন সরিতেছিল না। কিন্তু না পাঠাইলেও চলে না! লেখাপড়ার দিকে ছেলের স্বাভাবিক অনুরাগ প্রবল, সেটাকে দাবিয়া দেওয়াও তো ঠিক নয়! তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, কালিদাস কলিকাতায় গিয়া হোষ্টেলে না থাকিয়া ছোট একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া সেই খানে থাকিবে। তার সঙ্গে যাইবে বাড়ীর পুরানো ভৃত্য সদানন্দ আর পাচক-বামুন শশিনাথ। ছেলেকে তিনি বলিয়া দিলেন,—কখনো সে থিয়েটার বা বায়োস্কোপে যাইবে না; ফুটবল-ম্যাচ দেখিতে যাইতে পারে কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় ফেরা চাই: হোটেলে খাওয়া চলিবে না; বন্ধুর দল লইয়া বাসায় আড্ডা দেওয়া নিষেধ; মিটিং করা বা হুজুগে পড়িয়া কলেজ-কামাই করা—এ সবও নিষেধ। এই আদেশগুলি কড়ায়-গণ্ডায় না মানিলে যে-কোন মুহূর্ত্তে কালিদাসকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া গৃহে ফিরিতে হইবে।

ভৃত্য সদানন্দকে আদেশ দেওয়া হইল,—দাদাবাবুর সম্বন্ধে যে-সব নিষেধ তিনি প্রচার করিয়া দিলেন, সে-সব যাহাতে প্রতিপালিত হয়, সে দিকে সে খুব হুঁশিয়ার থাকিবে, এ কয়টা আদেশ কালিদাস যেন পুরাপুরি মানিয়া চলে। সর্ব্বোপরি তিনি এ কথাও বলিয়া দিলেন যে, মাঝে মাঝে তিনি দুম্ করিয়া বিনা-নোটিশে কলিকাতায় আসিয়া দেখিয়া যাইবেন, তাঁর আদেশ কালিদাস ও ভৃত্যবর্গ ঠিক মানিয়া চলিতেছে কি না। অতএব সাবধান!

খুঁজিয়া পাতিয়া পটলডাঙ্গার এক গলির মধ্যে এই বারো নম্বরের বাড়ীখানা সব দিকে মনঃপূত বুঝিয়া ছেলেকে তথায় রাখিয়া শিবনাথ লাহিড়ী বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। কালিদাস তদবধি এই বাসায় থাকিয়া কলেজে পড়াশুনা করিতেছে। পিতার আদেশ

যথাসাধ্য সে মানিয়া চলে। আজ ছ' সাত মাস এখানে আসিয়াছে, ইহার মধ্যে থিয়েটারে বা বায়োস্কোপে কখনো যায় নাই—টাউনহল চক্ষে দেখিয়াছে শুধু মাঠে ফুলবল ম্যাচ দেখিতে যাইবার সময়। পিতার অনুমতি লইয়া একদিন সে চিড়িয়াখানায় গিয়াছিল, আর একদিন মিউজিয়মে,—তাও বন্ধুরা কেহ সঙ্গে ছিল না। এ দুই স্থানেই সদানন্দ ও শশীঠাকুর মাত্র তার সঙ্গী ছিল। সে পড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে। বন্ধু দু-একজন মিলিয়াছে, তবে কাহারো গৃহে সে কোনোদিন পদার্পণ করে নাই বা কাহাকেও নিজের বাসায় ডাকিয়া আনে নাই। কি জানি, বন্ধু আসিয়া বসিয়াছে, আর তখন দুম্ করিয়া পিতা শিবনাথ লাহিড়ী যদি আসিয়া পড়েন! তাঁর যা মেজাজ! মুখের কথায় আর কাজে তফাৎ বড় একটা হয় না—বিশেষ যেখানে নিজের প্রতিপত্তি লইয়া কোনো কথা ওঠে! এই ছ'সাত মাসের মধ্যে শিবনাথ লাহিড়ী আট-দশবার এ-বাসা ঘুরিয়া গিয়াছেন। তাঁর আদেশ ঠিকঠাক বজায় আছে দেখিয়া তিনি খুসী হইয়াই ফিরিয়াছেন।

সহরের হাওয়ায় কালিদাসের আজন্ম-পল্লী-বদ্ধ মনে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ গজাইয়া উঠিয়াছে। তার ফলে অনেকগুলা মাসিকপত্র সে নিয়মিত খরিদ করে; বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকার লেখা অনেকগুলো উপন্যাস-নাটক ও কাব্য-গ্রন্থ কিনিয়া সে ট্রাঙ্ক-জাত করিয়াছে। এই সব বই পড়িয়াই সে অবসর-কাল যাপনে করে। থিয়েটার বা বায়োস্কোপের প্রলুব্ধকর কাহিনী শুনিয়াও সে কোনোদিন সেদিকে পদার্পণ করে নাই। বন্ধুরা অনুযোগ তুলিলে সে বলিত,—আমার ও-সব ভালো লাগে না ভাই! বন্ধুরা অবাক হইয়া ভাবিত, একালে এমন বেরসিকও থাকে!

যে-রাত্রে ভাড়াটিয়া গাড়ীখানা তার দ্বারে এই তরুণ-তরুণী অতিথি দুজনকে আনিয়া নামাইয়া দিল, সে রাত্রে কালিদাস বাসায় ছিল না। তার এক সহপাঠী মোহিত ইটন হোষ্টেলে থাকে; আজ দশ-বারো দিন মোহিতের খুব জ্বর। জ্বরে সে বেহুঁশ অচৈতন্য আছে। ক্লাশের চার-পাঁচজন বন্ধু খপর পাইয়া দেখে-শোনে,—তারাই পালা করিয়া রাত্রি জাগিয়া তার পরিচর্য্যা করিতেছে। আজ কালিদাসের পালা। এত বড় প্রয়োজনীয় ব্যাপারে না বলিবার তার শক্তি ছিল না। পিতা যদি আসিয়া পড়েন? আসুন,—এ ব্যাপারে কখনো তাঁর দিক হইতে অনুযোগ উঠিবে না—এ বিশ্বাস কালিদাসের মনে বিলক্ষণ আছে। সদাকে সব কথা খুলিয়া বলিবে? না। শক্ত অসুখ শুনিয়া সে যদি যাইতে মানা করে? তাই সদা বা শশী-ঠাকুরকে কিছু না বলিয়াই সন্ধ্যায় আহারাদি শেষ করিয়া সে ইটন হোষ্টেলে চলিয়া গেছে।

দাদাবাবু বাহির হইয়া গেলে শশীঠাকুর ও সদা খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাস লইয়া বসিয়াছে, এমন সময় সদার বন্ধু সাম্‌নের বাড়ীর দীনু আসিয়া তাকে বলে, কাঁশারিপাড়ায় তার বাবুর এক ভাইপোর বাড়ী যাত্রা হইবে,—সে যাত্রা শুনিতে যাইতেছে। এ কথা শুনিয়া শশীঠাকুর আর সদার মন নাচিয়া ওঠে। বন্দীর মত তারাই বা কি করিয়া এমন পড়িয়া থাকে! দু'বেলা তাশ পিটিয়া তাশে তাদের অভক্তি ধরিয়া গিয়াছে। তারাও পাশের বস্তীর উড়ে ফুলুরিওয়ালা ভজাকে ডাকিয়া তার হাতে গৃহের চার্জ্জ দিয়া যাত্রা শুনিতে বাহির হইয়াছে। দাদাবাবু যদি রাত্রে ফেরেন, তাই চাবি বন্ধ করিয়া ঘরের চাবি উড়ের হাতে রাখিয়া গিয়াছে। ভয় নাই...ভজার দোকান আছে—বহুকালের দোকান। তাছাড়া এ কয়মাসে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও অল্প হয় নাই। চুরি করিয়া সে পলাইতে পারিবে না তো! যাত্রা ভাঙ্গিলেই তারা চলিয়া আসিবে।

ঠিক এমনি অবস্থার মাঝখানে তরুণ-তরুণী আসিয়া ১২ নম্বর বাড়ীতে হাজির। তরুণীটি সম্পর্কে কালিদাসের মাসতুতো ভগ্নী...তরুণ তার স্বামী, ললিত সান্যাল এম-এ। বেহারের ডেপুটী। আরারিয়ায় সম্প্রতি বদলি হইয়াছে। বাড়ী কুষ্টিয়ায়। পত্নী নীহারিকা কুষ্টিয়ায় ছিল। তাকে লইয়া আরারিয়া যাইতেছে। কুষ্টিয়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া নামিয়াছে ; ভোরে ৬-৪৯এর ট্রেণে সাহেবগঞ্জ-প্যাশেঞ্জারে ফের রওনা হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিফল প্রতীক্ষা

স্নান করিয়া আসিয়া ললিত ডাকিল,—ওগো...

নীহার একটা ট্রাঙ্ক খুলিয়া কি-সব গুছাইয়া রাখিতেছিল ; ললিতের আহ্বানে তখনি কাছে আসিল, কহিল,—কেন ?

ললিত কহিল—সত্যিই রান্নাবান্না করবে ? আমি যে খাবার আন্‌তে পাঠিয়েচি।

নীহার কহিল—কে তোমায় গিন্নেমো কর্‌তে বলেছিল ?

ললিত কহিল—গিন্নেমো নয় গো—কর্ত্তামি করেচি। তা আমি বলি কি, আর রান্নায় কাজ নেই। ঐ খাবার খেয়েই শুয়ে পড়া যাক্, আবার তো ভোরে উঠতে হবে।

নীহার কহিল—তারপর কাল সারাদিন কাটবে কি করে ?

ললিত কহিল—কেন ? রিফ্রেশমেন্ট-রুম আহার জোগাবে।

নীহার কহিল—তোমার প্রবৃত্তি হয়, তুমি খেয়ো। আমি ও শতেক জাতের পাত-কুড়ুনো এঁটো খেতে পারবো না।

ললিত কহিল—বেশ, তোমার মত, শুনি ?

নীহার কহিল—আমি বলি, খাবারই এখন নয় খাও ! রান্নাবান্না করে খেয়ে শুতে গেলে ঢের রাতও হবে,—যদি আবার ঠিক সময়ে ঘুম না ভাঙ্গে ? তোমার সেই এ্যালার্ম্ম-দেওয়া ঘড়িটা বার করেছিলুম—রান্নাঘর এই দোতালাতেই। ভাবনা নেই,—রাত চারটেয় বরং উঠে দুটী ভাতে-ভাত রেঁধে খেয়ে নেবো'খন সেই বেশ হবে, নয় ?

ললিত হাসিয়া কহিল—ফার্ষ্টক্লাশ ! শ্রীমতী নীহারিকা দেবীর মস্তিষ্কের দাম কি অল্প ! কিন্তু সব ভেস্তে দিলে এই কালী-শালা ! দ্যাখো তো, তিন জনে কেমন গল্প-স্বল্প করে রাতটা কাটানো যেতো !

নীহার কহিল—তাহলে আমি বরং উয্যুগ করে রাখি সব...কিন্তু যাই বলো, এখানকার কাণ্ড এ কি ! বাবু বাইরে গেছে, চাকর-বামুন দুটোর কি আক্কেল, দ্যাখো ! কোথাকার উড়ে-ম্যাড়ার হাতে বাড়ী ফেলে রেখে যাত্রা শুন্‌তে গেল ! আরারিয়ায় পৌঁছেই আমি মাসিমাকে চিঠি লিখবো।

ললিত কহিল—আরে, না, না। চাকরি করতে এসেচে বলে কি ব্যাচারাদের প্রাণে কোনো সখ থাকবে না ? এও যে তোমাদের অন্যায় আব্দার !

নীহার কহিল—বটেই তো ! এত সখের প্রাণ নিয়ে চাকরি করা চলে না !...তুমি পারো ? আমি যদি বলি, আমায় নিয়ে কাল কাশ্মীরে চলো, পারো যেতে ?...আমাদের কি হয়রানী, বলো দিকিন্ ! কি মতলব করে এলুম ! তারা থাকলেও দাদাকে ডেকে আনতে

পার্‌তো তো !

ললিত কহিল—তারা তো আর জানে না যে আমরা এসে অতর্কিতে উদয় হবো। মোদ্দা কালীর কাণ্ড কি এ ? রাত্রেগেল কোথায় ? আজ আবার মঙ্গলবার, থিয়েটারও নেই !

নীহার কহিল—বায়োস্কোপ দেখতে গেছে, বোধ হয়।

ললিত কহিল—তাহলে তো বারোটার মধ্যেই ফিরবে।

উড়েটা আসিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল, কহিল,—খাবার আনুচি।

ললিত কহিল—ওই যে কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ এসেচেন। খাবড় এসেছে—এসো, আরম্ভ করে দি ! উড়েকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—নিয়ে আয় খাবার।

খাবারের ভাঁড়-ঠোঙা হাতে ভজু উড়িয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ললিত কহিল—দে, খাবড় দে...হ্যাঁরে, সদা আর ঠাকুর কুথকে গউছি, কিছু জানিছন্তি ?

উড়ে এই অপূর্ব্ব ভাষা শুনিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীহারিকা তার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া কহিল—যা, যা, তোর আর জানিছুন্তির দরকার নেই, বাপু।

ভজু চলিয়া গেল। সে চলিগা গেলে ললিত কহিল—ওই যে দুটো প্লেট দেখচি ; টেনে আনো। কুঁজোয় জল আছে, তার পর বিছানাও আছে...ব্যস্‌...আশ্রয়ের ভাবনা নেই।

দুইজনে বাজারের লুচি, আলুর দম, সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়া মুখ-হাত ধুইয়া ঘড়ির পানে চাহিল—রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ললিত বিছানায় শুইয়া পড়িল। নীহার টেবিলের উপর বই-খাতা-গুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। হঠাৎ একটা খাতার পৃষ্ঠায় কয় ছত্র বাংলা কবিতা দেখিয়া সে ললিতকে ডাকিল,—হ্যাঁগো, ওগো...ঘুমুলে নাকি !

ললিত কহিল—সেই চেষ্টাই করচি।

নীহার কহিল—না, না, এরমধ্যে ঘুমুনো কি, বাবু। দাদা আগে আসুক। এই দেখে যাও, কেমন একটা জিনিষ আবিষ্কার করেচি।

ললিত শুইয়াই কহিল—কি ? তোমার হবু-ভাজের ফটো ?

নীহার কহিল—আঃ, কি যে চালাকি করো। না গো, না। দাদা মস্ত কবি হয়ে উঠেচে—কবিতা লিখেচে, দেখে যাও।

ললিত লাফাইয়া উঠিয়া বসিল, বসিয়া কহিল—এ্যাঁ, বলো কি ! ওই মিন্‌মিনে কালী...সে হলো কবি ! দেখি, দেখি—বলিয়া সে টেবিলের কাছে গিয়া খাতাখানা লইয়া পড়িল। লেখা আছে—

উদাস আমার মন !
কিসের লাগি এমন উচাটন।
এই বসন্তে উতল হাওয়ায়
কে আসে ? কার চোখের চাওয়ায়
মিলবে পরম-ধন !

হাসিয়া ললিত কহিল—পূর্ণচন্দ্রে গ্রহণ লেগেচে, তাহলে। তবু যদি বসন্ত সত্যই আসতো ! যাক্‌, দাদার মন বুঝতে পারচো ? এ তোমার আসার অভ্যর্থনার গান !

নীহার ললিতের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া দিয়া কহিল—ছোটলোক ! আমার সংসর্গে

থেকেই ভদ্রতা আয়ত্ত হলো না তোমার। তুমি একেবারে জংলী! কাকে রসিকতা বলে, তা জানো না!

ললিত কহিল—ভাগ্যে জংলী, তাইতো এমন মিষ্টি শাসনটুকু ভাগ্যে জোটে! ওই কমল হাতের কোমল আঘাত...

নীহার কহিল—থামো...যাও, তোমায় কাব্য চর্চ্চা করতে হবে না আর—তুমি ঘুমোও গে। যতক্ষণ না দাদা আসে, আমি জেগে বসে বই পড়বো।

ললিত কহিল—সেই ভালো! শেষে যেন রবিবাবুর সেই গানটা না গাইতে হয়,—

জাগি পোহালো বিভাবরী!

নীহার কহিল—আবার?

ললিত কহিল—আর নয়। এবার সত্যই নিদ্রার সাধনায় চললুম।

ললিত গিয়া শুইয়া পড়িল। নীহার টেবিলের উপর হইতে একটা মাসিক-পত্র টানিয়া পড়িতে বসিল। গল্প আর কবিতাগুলা পড়া হইলে সে 'বেদান্তে ঈশ্বরবাদ' প্রবন্ধটার দিকে মনোনিবেশ করিল।

বাংলা হরফে এমন দুর্বোধ ব্যাপারও ছাপা হয়—নীহারিকা আশ্চর্য্য হইল! স্বতন্ত্র কথাগুলোর মানে সে জানে, কিন্তু এই জানা কথাগুলোই একত্র হইয়া এমন হেঁয়ালির সৃষ্টি করিতে পারে! সে ললিতের পানে চাহিল; ললিতের নাসিকা তখন তার আরামের বিপুলতা জলদ-মন্দ্রে বিঘোষিত করিতেছে। ঘুম ভাঙাইয়া এই বেদান্তের জঙ্গলে স্বামীকে সার-তত্ত্বের সন্ধানে পাঠাইতে তার নারী-প্রাণ ব্যথিত হইল। ভাবিল, আহা বেচারী, ঘুমাক্ একটু।

বহি রাখিয়া সে ঘড়ির পানে চাহিল—সর্ব্বনাশ! বারোটা বাজিয়া গিয়াছে! খোলা খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইয়া সে তখন পথের পানে চাহিয়া রহিল। চারিধার স্তব্ধ নিশুতি, শুধু অদূরে বড় রাস্তায় রিক্‌শর ঘন্টা মৃদুতালে বাজিয়া চলিয়াছে—তার মাঝে মাঝে এক-একটা মোটরের ভেঁপু!

রাত্রি বাড়িয়া চলিল; কালিদাস কিন্তু আসিল না। সে তখন এ্যালার্ম্ম-ঘড়ির কাঁটাটা চারিটার ঘরে চালাইয়া রাখিয়া শয্যায় স্বামীর পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বুধের উষা

চারিটার সময় ঘড়ির এ্যালার্ম্ম শুনিয়া ললিত ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল, বসিয়া নীহারকে ঠ্যালা দিয়া কহিল—ওঠো গো, চারটে বেজেচে। গোছগাছ করে নাও, যা করবার...আমি একটা গাড়ীর চেষ্টা দেখি। পাবো কি না, কে জানে!

নীহার উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া কহিল—অন্যায় করেচো! সেই ভাড়াটে গাড়ীটাকে বলে রাখলে পারতে!

ললিত কহিল—তখন কি জানি, তোমার ভাই সারা রাত ফেরার থাকবে! শালাকে নিশাচরবৃত্তিতে পেলে দেখছি।

নীহার কহিল—ও সব বদ্ কথা বলতে হবে না। ওকে রসিকতা বলে না। আমি যাই, মুখে-চোখে জল দিই গে। দিয়ে ভাতে ভাত চড়িয়ে দিইগে...তুমি স্নান করতে চাও যদি তো করে নাও।

ললিত কহিল—না, এ সময় আর স্নান করবো না। তুমিও স্নান করো না যেন...গলা ধরে যাবে ঠাণ্ডা লেগে!

হাসিয়া নীহার কহিল—গেলই বা! গাওনার মুজ্‌রো করতে যাচ্ছিনে তো...

ললিত কহিল—না, ঠাট্টা নয়। এই রাত্রে গায়ে জল ঢেলো না সত্যি।

নীহার চলিয়া গেল। ললিতও হাত-মুখ ধুইয়া জিনিষ-পত্র গুছাইয়া ফেলিল। গুছাইয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া কহিল—তোমার ভিজে শাড়ী আর শেমিজটা কলতলায় পড়ে রইলো।

—ঐ যা, ভুলে গেছি! তাই তো কি হবে? বলিয়া নীহারিকা স্বামীর পানে চাহিল।

ললিত কহিল—আমি নিংড়ে এই বারান্দায় মেলে দি—আধ-শুক্নো হবে'খন—তারপর সঙ্গে নিলেই চলবে।

নীহার কোনো আপত্তি তুলিল না। ললিত সে দুটা নিংড়াইয়া বারান্দায় মেলিয়া দিল।

তারপর নীহার কহিল—গাড়ীর কি হবে?

ললিত কহিল—উড়ে ব্যাটাকে দেখি, নয়তো নিজেই যাই।

নীহার কহিল,—তোমার উড়ের কর্ম্ম নয়! তোমার যাওয়া ছাড়া উপায় দেখচি না। কিন্তু এই রাতে—

—ভয় কি! বলিয়া ললিত নীচে নামিয়া আসিল। নীহারও সঙ্গে সঙ্গে সদর অবধি আসিল। তারপর নীহার কহিল—দেরী করো না বাবু—একলাটি আমি ভয়েই মরে যাবো।

ললিত কহিল—কোন ভয় নেই! এ কলকাতা সহর, পুলিশ-পাহারায় ঘেরা। তাছাড়া নীচে উড়ে ব্যাটা রইলো। তুমি সদর দরজা বন্ধ করে উপরে যাও। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম—যতক্ষণ না তুমি দোতলায় যাচ্ছো! আমিও এখনি আসচি।

নীহার উপরে আসিয়া দোতলায় পথের দিককার বারান্দায় আসিল, আসিয়া দেখে, ঐ যে ললিত চলিয়াছে।

গলির বাঁকে সে অদৃশ্য হইয়া গেলে নীহার গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। ভাতে ফুট্ ধরিয়াছে। আর কতক্ষণই বা! সে রান্নাঘরেই বসিয়া রহিল। ওদিকে কাদের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল। একটা কচি ছেলে কোথায় ট্যাঁ করিয়া উঠিল। নীহার ভাবিল, তাইতো, এখনো গাড়ী আসিল না? মনে নানা দুর্ভাবনা জাগিতে লাগিল। ললিতের বুক পকেটে সোনার চেনে সংলগ্ন ঘড়িটা রহিয়া গেছে...কোনো বদমায়েস যদি...? তার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। তাইতো, কেন নিজে গেল গাড়ী ডাকিতে? উড়েটাকে পাঠাইলেই চলিত! তাকে এক টাকা বকশিসের লোভ দেখাইলে সে যেখান হইতে পারিত, গাড়ী ডাকিয়া আনিত!... কি করা যায়? উড়েটাকে সন্ধান লইতে পাঠাইবে? বাপ্‌রে! ভাবিতেই গা তার শিহরিয়া উঠিল। এই অজানা বাড়ীতে সে একলা থাকিবে?... আর কোথায়ই বা পাঠাইবে? তাছাড়া কে জানে, উড়েরা দল বাঁধিয়া নীচের ঘরে যদি শুইয়া থাকে—কেমন লোক, কে জানে! ডাকিয়া কাজ নাই! বারান্দা তবু পথের

ধারেই। ভয় পাইলে চীৎকার করিবে, কেহ-না-কেহ শুনিতে পাইবেই।

সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। জনহীন পথ। সার-সার গ্যাস জ্বলিতেছে। আকাশে এক রাশ নক্ষত্র। দুর্ভাবনায় সে তুলসী-তলায় হরির লুট মানত করিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল—হে হরি, নির্ব্বিঘ্নে ওকে ফিরিয়ে আনো, গাড়ী না মিলুক, ক্ষতি নেই... ও আসুক...হে হরি, হে ঠাকুর...

ঐ না একটা গাড়ীর শব্দ ? হাঁ, তাই। একটা ট্যাক্সি ! ট্যাক্সিতে ঐ যে ললিত।...

ট্যাক্সিটা আসিয়া বাড়ীর সামনে থামিল। নীহার ছুটিয়া গিয়া সদর-দ্বার খুলিয়া দিল। ললিত লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, এবং বাড়ীতে ঢুকিতে ঢুকিতেই কহিল—ফ্যাসাদ ! হ্যারিসন রোডের মোড়ে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে...কা কস্য পরিবেদনা ! কোথায় গাড়ী ! শেষে একখানা রিক্‌শ ধরে শেয়ালদা ষ্টেশনের দিকে চলেছিলুম—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে এই ট্যাক্সিটা পেলুম...নাও, চটপট তৈরী হয়ে নাও। যত দেরী করবে, ট্যাক্সির ভাড়া অনর্থক তত বাড়বে। তোমার রান্নার কদ্দূর ?

নীহার কহিল—সব তৈরী। খেয়ে নিলেই হয় !

—চলো, চলো—বলিয়া ললিত দোতলায় ছুটিল।...

আহারাদি চট্‌পট্‌ শেষ করিয়া ললিত উড়েকে ডাকিয়া তুলিল—তার সঙ্গে নিজের ধরাধরি করিয়া মাল-পত্র গাড়ীতে তুলিয়া নীহারের সহিত সে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল ;—উড়েকে এক টাকা বখশিস দিয়া কহিল—ওপরের ঘরে চাবি দি'গে যা, বুঝলি ?

উড়ে টাকা পাইয়া খুশী মনে কহিল,—হ।

ট্যাক্সিতে চলিল। উড়ে বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

গাড়ী যখন হাবড়ার পুলে উঠিয়াছে, তখন নীহার কহিল,—ঐ যা, আমার শাড়ী-সেমিজ ?

ললিত কহিল—বেশ, ফেলে এসেচো !

নীহার কহিল—কি আর হবে। সেখানে গিয়ে দাদাকে চিঠি লিখে দেবো, প্যাক করে পাঠিয়ে দেবে'খন।

ললিত কহিল—উড়ে ব্যাটা যদি গ্যাঁড়া না দেয় !

নীহার কহিল—সে কি গো !...আমার ভালো দেশী শাড়ী যে—তাছাড়া সেমিজটাও নতুন !

ললিত কহিল—তোমার ভায়ার কাছ থেকে গুণকার নেবো, যদি হারায় !... একটা কিন্তু অন্যায় হলো, নীহার...

নীহার কহিল—কি ?

ললিত কহিল—কালীকে একটা চিঠিও লিখে রেখে এলুম না...

নীহার কহিল—বেশ হয়েচে। বাড়ী ছিল না যেমন। এসে জানতে পারলে দুঃখ করবে, তখন ভারী মজা হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঘ আসিল

৬-৪৯ মিনিটে সাহেবগঞ্জ প্যাশেঞ্জার হাওড়া ছাড়িল, আর তার ঠিক ছ'মিনিট পরে এদিকে সদানন্দ ভৃত্য শশী-ঠাকুরের সঙ্গে যাত্রা শুনিয়া বাসায় ফিরিল। দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র উড়ে দ্বার খুলিয়া দিল।

সদা মৃদু স্বরে কহিল—দাদাবাবু ফিরেচে রে?

উড়ে দুই চোখ পাকাইয়া জানাইল, দাদাবাবু ফিরিয়াছিল, এবং তাঁর সঙ্গে ছিল এক মেয়েলোক। দু'জনেই আবার ভোর রাত্রে ট্যাক্সি করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

খবর শুনিয়া সদানন্দ বসিয়া পড়িল। শশী-ঠাকুর হতভম্ব!

সদানন্দ কহিল—আমাদের দাদাবাবু?

উড়ে কহিল—হঃ! গোরা বাবু! মু জানিনে?

শশী ডাকিল—সদা...

আর সদা! সদার বাক্‌শক্তি তখন বিলুপ্ত হইয়া গেছে! দাদাবাবুকে সামলাইয়া রাখিবার জন্য কর্ত্তাবাবু পুনঃ পুনঃ হুঁশিয়ার করিতেছেন...সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ-হাত ধুইতে গেল।

ভিতরে গিয়া দেখে, দোতলার বারান্দায় একখানি শাড়ী শুকাইতেছে!...একটা সেমিজও! সে শিহরিয়া উঠিল—ভূত দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া ওঠে, ঠিক তেমনি! ভজু তাহা হইলে মিছা বলে নাই। শাড়ী তো এ বাড়ীতে ঢুকিয়া অবধি সে চক্ষে দেখে নাই। ...কার শাড়ী? সন্ধ্যার পর তারা বাহির হইয়া গেছে, শাড়ীর তখন চিহ্নও ছিল না! শাড়ীর চেহারাই তারা এ বাসায় আসা ইস্তক ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এ বাড়ীতে এ শেমিজ ও শাড়ী আনিল কে? রাত্রে ঝড়ও হয় নাই যে পাশের কোনো বাড়ী হইতেও...অথচ এ গৃহে শাড়ী পরিবার লোক নাই! শুধু এই রাত্রির ক'ঘন্টার জন্য শাড়ী পরিয়া আসিলই বা কে? আবার শাড়ী শুকাইতে দিয়া চলিয়া গেল, এই ভোরে! সে ভাবনায় পড়িল। দাদাবাবু কি...

কিন্তু ভাবিয়াই বা কি করিবে? এক দিকে দাদাবাবু, অপর দিকে কর্ত্তাবাবু...কাজেই সে চুপ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। শশী-ঠাকুরের ততক্ষণে অর্দ্ধেক রাত্রি!

বেলা প্রায় আটটা—কালিদাস আসিয়া উপস্থিত। সদর দরজা তখনো ভিতর হইতে বন্ধ। চীৎকার-শব্দে শশীর আব সদার ঘুম ভাঙ্গাইয়া সে হুকুম দিল—শীগগির দুটি ভাত রেঁধে দাও—আমি খেয়ে আবার এখনি বেরুবো। খুব জলদি চাই।

আদেশ দিয়া দ্রুত সে দোতলায় নিজের ঘরে গিয়া উঠিল। গিয়া যা দেখিল, তাহাতে তার চক্ষু স্থির। বারান্দায় একটা শাড়ী আর শেমিজ ঝুলিতেছে, তাছাড়া তার বিছানায় মেয়েদের খোঁপায় গুঁজিবার কাঁটা একটা...। সে শিহরিয়া উঠিল। দুই পা তখন এমন ভারী যে নড়া দুষ্কর! রোগীর পাশে সারারাত জাগা হইয়াছে; চোখ জ্বলিতেছে...সমস্ত শরীর ঝিমাইয়া আছে। তার পরে এই কাণ্ড!...

কোনোমতে রান্নাঘরের দিকে আসিতে সে দেখে, রান্নাঘরে রাঁধা ভাতের অবশিষ্ট আর

শকড়ি প্লেট ! রাগে তার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ঐ হতভাগা সদা আর শশীর কাজ এ...রাত্রে সে বাড়ী ছিল না, কোথা হইতে কাদের আনিয়া খুব ইয়ার্কি চালাইয়াছে! ঠিক...তাই এত বেলা অবধি আরামে নিদ্রা দিতেছে! হতভাগা বওয়াটে দুটো...কাণ মলিয়া জুতা মারিয়া এখনি বিদায় করিলে তবে গায়ের জ্বালা সারে!

কিন্তু না—এখন তার জরুরি কাজ...মোহিতের অবস্থা শেষ রাত্রি হইতে ভারী খারাপ...তাকে চট্ করিয়া মুখে দুটো ভাত গুঁজিয়াই ইটন হোষ্টেলে ছুটিতে হইবে। বহু কষ্টে রাগটাকে সামলাইয়া সে স্নান করিয়া লইল, তারপর খবরের কাগজটা নাড়িয়া তার পাতাগুলায় চোখ বুলাইতেছে, এমন সময় সদা আসিয়া কহিল—ভাত দিয়েচে।

তীব্র দৃষ্টিতে সদ্যার দিকে একবার চাহিয়া সে খাইতে গেল। খাওয়ার পর আবার বাহির হইয়া গেল...আসিয়াছিল যেমন ঝড়ের একটা ঝাপটার মত, তেমনি ভাবেই সে চলিয়া গেল।

দাদাবাবু বাহির হইয়া গেলে শশীঠাকুর ও সদা স্নানাহার সারিয়া কষিয়া ঘুম দিবার সংকল্প করিতেছে, এমন সময় দুম্ করিয়া স্বয়ং শ্রীযুক্ত শিবনাথ লাহিড়ী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শশী ও সদা সচকিত হইয়া তাঁকে অভ্যর্থনা করিল। শিবনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে আর একজন লোক ছিলেন,—তাঁর এক বন্ধু...নিবাস এই কলিকাতাতেই। নাম শ্রীপতি বাবু। তাঁর গৃহেই শিবনাথ কাল আসিয়া উঠিয়াছেন ; আজ আচম্‌কা ছেলের উপর নজর-তদারকীর উদ্দেশে এই বে-টাইমে এখানে তাঁর আবির্ভাব!

শিবনাথ কহিলেন—খাওয়ার উদ্যোগ করতে হবে না—এঁর ওখানেই খাবো।...বলিয়া তিনি দোতলায় উঠিলেন।

বারান্দায় তখনো সেই শাড়ী ও শেমিজ তেমনি ঝুলিতেছিল। দেখিয়া শিবনাথের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সগর্জ্জনে তিনি হাঁকিলেন—সদা...

সদা আসিল। শিবনাথ কহিলেন—তোর দাদাবাবু কোথায় রে ?

সদা কহিল,—কোথায় বেরিয়েচেন।

শিবনাথ কহিলেন—এ শাড়ী কার ?

সদা কি যে বলিবে স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু জবাব না দিলেও বকুনি খাইতে হইবে। কর্ত্তাবাবুর কড়া হুকুম, দাদাবাবুকে চৌকি দেওয়া—দাদাবাবুর কু-সঙ্গে পড়িয়া বহিয়া না যায়! রাত্রে সে আর শশী-ঠাকুর যে বাড়ী ছিল না, সে কথা বলিলেও গোল! উপায় ? দাদাবাবুও যখন কাছে নাই, তখন...

বুদ্ধি করিয়া সে কহিল—আজ্ঞে...

শিবনাথ কহিল—যা, বেরো আমার সামনে থেকে...পাজী, ছুঁচো, শয়তান কোথাকার...

তাড়া খাইয়া সদা আরাম বোধ করিল। সে সরিয়া পলাইল।

শ্রীপতির পানে চাহিয়া শিবনাথ কহিল—এ তো ভালো কথা নয়, ভায়া...

শ্রীপতি কহিল—আগে খপর নাও...তোমার ছেলের এমন প্রবৃত্তি কখনো হতে পারে না।

শিবনাথ কহিলেন—তাহলে... ?

শ্রীপতি কহিলেন—চাকর-বাকরদের কি এমন আস্পর্দ্ধা হবে ? মোদ্দা কালী গেল কোথায় ?

শিবনাথ কহিলেন—এমনি করে লেখাপড়া করচেন! আসুক একবার। আমি এইখানে

চেপে বসলুম—এর হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বো না।

শ্রীপতি কহিলেন,—তা বলে এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে বকাবকি করো না—যদি সত্যি হয়, তাহলে যেটুকু লজ্জা-সঙ্কোচ আছে, সেটুকুও খসে যেতে পারে! মানে desperate হয়ে ওঠে যদি... ?

শিবনাথ কহিলেন—তাহলে কি করা যায় ?

শ্রীপতি কহিলেন—বাড়ী নিয়ে যাও এই বেলা। তবে তাও খুব সাবধানে ব্যবস্থা করা চাই...অর্থাৎ তুমি বলো যে তোমার গৃহিণী দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে সেখানে কান্নাকাটি করচেন—তোমায় দেখতে চান্—এখনি বাড়ী চলো। তারপর বাসা...আমি নয় বাসা তুলে দিয়ে জিনিষপত্র পাঠাবার বন্দোবস্ত করবো'খন। দু'দিন সঙ্গীছাড়া হলেই এ-রোগ ঠিক সেরে যাবে। হুঁ, কলকাতা সহর যা হয়েচে এখন, সে আর কহতব্য নয়!

—তাই দেখচি। আমাদের কালে এতখানি বুকের পাটা কারো দেখিনি মোদ্দা! বলিয়া শিবনাথ হতাশ ভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় কালিদাস বাসায় ফিরিল। উশ্‌কো-খুশ্‌কো শুষ্ক চেহারা...দুই চোখ জবাফুলের মত রাঙা। সে আসিতেই শশী-ঠাকুর ছুটিল শ্রীপতি বাবুর বাড়ী কর্ত্তাকে সংবাদ দিতে ; তিনি সেইখানেই আহারাদি সম্পন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

দাদাবাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া সদা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। নিশ্চয় দাদাবাবু মদ খাইয়াছেন, না হইলে এমন আলুথালু বেশ, রাঙা চোখ! সে প্রমাদ গণিল। এতকালের আরামের চাকরিটাই এবার তার খোয়া গেল! সে কোনো মতে কহিল—খাবেন না ?

কালিদাস কহিল—না। তার স্বর গম্ভীর।

কালিদাস দোতলায় উঠিল। বারান্দায় সেই শাড়ী ও শেমিজ তখনো তেমনি মেলানো! কারো তুলিবার খেয়াল হয় নাই! শাড়ী ও সেমিজ দেখিয়া প্রথমে সে অবাক হইল, তার পরক্ষণেই...রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কার এ দুটো সামগ্রী... ? ঐ সদা ? ঠিক। তারই কাজ। অমন ফিট্‌ফাট্ বেশ, ছোট-বড় চুল ছাঁটা...ইয়া টেরি! তার দু-একজন বন্ধুও তামাসা করিয়া কতদিন বলিয়াছে, এ তোমার চাকর, না, গার্জ্জেন হে! তা হইলেও এমন নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা যে এতটুকু ভয়-ডর নাই! বেল্লিক! পাজী! ব্যাটার কান ধরিয়া চাবকাইয়া দিলে তবে এ রাগের জ্বালা থামে! সগর্জ্জনে সে ডাকিল,—সদা...

সদা আসিল। কালিদাস কহিল—বাড়ী ঘর-দোর দেখবার বুঝি আর অবসর মেলে না ? কোথাকার জিনিস কোথায় থাকা উচিত, তাও ভুলে গেছ! একরাত বাড়ী ছিলুম না, অমনি বানর-নাচ নেচেছো বাড়ীতে—শূয়ার কোথাকার!

সদা অবাক! কি সে করিয়াছে, যার জন্য...

সদাকে সামনে দেখিয়া কথায়-কথায় কালিদাসের রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল,—কিন্তু একটা চাকরের সঙ্গে এ সব ব্যাপার লইয়া ঘোঁট করাও কুৎসিত ঠেকে, তাই সে কোনোমতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল,—যাও, নীচে যাও....

সদা ভয়ে ভয়ে কহিল—কর্ত্তাবাবু এসেচেন।

—বাবা!

—হ্যাঁ।

—কোথায় ? কখন এলেন ?

সদা কহিল,—আজ সকালে। তাঁর এক বন্ধুর বাসায় উঠেচেন...সেই শ্রীপতিবাবুর ওখানে। সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া করেচেন।

কালিদাস বিস্মিত হইল। সে কহিল—আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

—করেছিলেন।

—তুই কি বললি ?

—আজ্ঞে, আমি তো জানতুম না, আমি বললুম, কলেজে গেছেন।

—মিথ্যে কথা বললি কেন ! আমি কি বই নিয়ে বেরিয়েচি ? না, অত সকালে কলেজে বেরুই কোনো দিন ? ব্যাটা গাধা...বাবু শ্রীপতিবাবুর বাড়ী, বল্লি না ?

—হ্যাঁ, শ্রীপতিবাবুর বাসায় !

—ওঃ, তাহলে এই মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে। একটা রিক্শ ডাক্ দিকিনি...এখনি যাই।

সদা রিক্শ ডাকিয়া দিলে কালিদাস রিকশয় চড়িয়া মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে শ্রীপতি বাবুর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতের মূষিক-প্রসব

ছেলেকে দেখিয়া পিতা একেবারেই বলিয়া উঠিলেন—তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গে আজ রাত্রেই বাড়ী যাবে।

কালিদাস অবাক্ ! কহিল—হঠাৎ ?

পিতা শিবনাথ কহিলেন—তোমার গর্ভধারিণী দুঃস্বপ্ন দেখে ভেবে কান্নাকাটি লাগিয়েছেন—তোমায় না নিয়ে গেলে তিনি সুস্থির হবেন না। বাসায় সদা আর শশীঠাকুর থাকুক এখন...

কালিদাস কহিল—কিন্তু ও-দুটোর উপর বাসার ভার রেখে যেতে আমার মন সরে না।

শিবনাথ ভাবিলেন, তা তো সরিবেই না...তুমি কি আর সে-কালিদাস আছো, বাপু। ওরা পুরানো বিশ্বাসী লোক—তোমার চাই এই সহরের জল-খাওয়া নূতন চাকর-বামুন। নহিলে...প্রকাশ্যে তিনি কহিলেন—সে ভাবনা পরে। আজ তুমি আমার সঙ্গে বাড়ী চলো তো রাত্রে।

প্রেসিডেন্সিতে বি-এ পড়িলে কি হইবে, পিতাকে কালিদাস বাঘের মত ভয় করে। তাছাড়া মনটা খারাপ ছিল...মাকেও কতদিন দেখে নাই। কাজেই কোন আপত্তি না তুলিয়া পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেই রাত্রেই বাপের সঙ্গে সে গৃহ মুখে যাত্রা করিল।

যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন তার বেশ জ্বর ! দেখিয়া মা কহিলেন—ভাবিয়ে তুললি বাছা !

সাভিমানে পুত্র কহিল—তা আমার দোষ কি ! দু'রাত জাগা গেছে উপরি-উপরি, তার

উপর দুর্ভাবনা।

মা উদ্বিগ্ন চিত্তে কহিলেন—কেন রে ?

কালিদাস কহিল—আমাদের এক বন্ধু...এক সঙ্গেই পড়তুম। সে অন্য হোষ্টেলে থাকতো। তার টাইফয়েড হয়—আমরা ক'জনে মিলে পালা করে রাত জেগে সেবা-শুশ্রূষা করেও তাকে বাঁচাতে পারলুম না, মা...

মার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন—আহা, বাছারে !

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কালিদাস কহিল—কাল বেলা দশটায় তার বাপ-মা এলেন, আর বারোটায় তার সব শেষ হয়ে গেল। আমরাই শ্মশানে নিয়ে যাই...তারপর শ্মশান থেকে ফিরে শুনি, বাবা আমায় নিতে এসেচেন,—চলে এলুম...

ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া মা তার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন,—তোমায় বিদেশে পাঠিয়ে কি কাঁটা হয়ে যে এখানে পড়ে আছি, বাবা !...একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মা মনে মনে ঠাকুরকে ডাকিলেন। তারপর ছেলেকে কহিলেন—শুয়ে পড়োগে বাবা...অসুখ নিয়ে আমার কাছে এসেচো, তবু রক্ষে ! না হলে সেখানে অসুখ হয়েচে শুনলে ভাবনাতেই মরে যেতুম আমি !...

গৃহিণীকে নিভৃতে ডাকিয়া শিবনাথ শাড়ী ও শেমিজের কাহিনী তাঁকে শুনাইলেন ; শুনাইয়া কহিলেন—এইখানেই থাকুক...আর পাশ করে কাজ নেই। এত বড় বুকের পাটা যে বাসায় একটা স্ত্রীলোক আনে !

গৃহিণী সরোষে কহিলেন—তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েচে, তাই অমন ছিষ্টিছাড়া কথা বলো ! আমার ছেলে এমন হতেই পারে না—নিশ্চয় কোথায় কোন গোল হয়েচে...ছেলে বলে, রাত জেগে বন্ধুর বাসায় তার রোগে সেবা করছিল ! এ তোমার ঐ সদা পাজীর কারসাজী...

কর্ত্তা কহিলেন—থামো তুমি...কলকাতার নাড়ী-নক্ষত্র আমার জানা আছে। ওখান না হতে পারে, এমন কাজ নেই ! আমিও ঐ বয়সে ভালো ছিলুম...শেষে বদ-সঙ্গে পড়ে...

গৃহিণী কহিলেন—তুমি বখেছিলে বলে আমার ছেলেও বখবে—এমন ছেলে পেটে ধরিনি !

কর্ত্তা কহিলেন—ঐ কথাই ঠিক করে বসে থাকো। তা যাহোক আমার সাদা কথা...ছেলেকে আমি কলকাতায় আর পাঠাবো না...এতে উনি গেরুয়া পরে বনেই যান্, আর ওঁর গর্ভধারিণী মান করে পিত্রালয়েই সরে পড়ুন...বুঝলে ?...

গৃহিণী কহিলেন—ভারী ইতর মন তোমার, তাই ছেলেকে সন্দ কর !...যাই হোক, ছেলের কাছে এ সন্দেহ খুলে বললে আমি অনর্থপাত করবো, তা কিন্তু বলে রাখচি ! সাবধান !

কর্ত্তা-গৃহিণীর মধ্যে মনান্তর ঘটিয়া গেল। কালিদাস দুদিন জ্বর-ভোগ করিয়া পথ্য পাইল। পথ্য পাইয়া মার কাছে শাড়ী-শেমিজের প্রসঙ্গ তুলিয়া সেদিন সে কহিল—ঐ সদা আর শশী-ঠাকুরকে আর আমি সঙ্গে রাখবো না, মা...তা কিন্তু বলে রাখচি।

মা কহিলেন—কেন রে ? কি করেচে তারা ?

কালিদাস কহিল—যে রাত্রে আমি মোহিতের সেবার জন্য রাত জাগতে যাই—তার পরের দিন সকালে বাসায় এসে দেখি, বাড়ীর বারান্দায় একটা শাড়ী আর একটা শেমিজ শুকোচ্ছে...কি এ, বলো তো মা ?

শাড়ী ও শেমিজ ! মা অবাক্ ! আগেই তিনি এ কথা শুনিয়াছিলেন কর্ত্তার মুখে...এখন কালিদাসের মুখেও এ-কথা শুনিয়া তাঁর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ...তবে বুঝিলেন, এর মধ্যে ভারী একটা রহস্য কিছু ঘটিয়া থাকিবে...মুখ ফুটিয়া কোনো কথাই তিনি বলিতে পারিলেন না। না কর্ত্তার কাছে, না ছেলের কাছে...এ রহস্যের ভারী বোঝা নিজের বুকেই বহিলেন। মার প্রাণে এইটেই বড় বেদনা !

সে রহস্য আর-একদিন পরে প্রকাশ হইয়া গেল—কলিকাতার ঠিকানা ঘুরিয়া কালিদাসের নামে লেখা নীহারের চিঠি যেদিন এখানে আসিয়া পৌঁছিল। চিঠির মধ্যে তাদের সে-রাত্রির আতিথ্যের কথা সবিস্তারে লিখিয়া শেষে দুঃখ করিয়া নীহার জানাইয়াছে যে, এমন তার বরাত, সে-রাত্রে বাড়ীতে ছিল না দাদা, না সদা, না শশীঠাকুর। ভোরেই তাদের ট্রেণ, কাজেই থাকিবার উপায় ছিল না ! না হইলে কি আর দেখা না করিয়া চলিয়া আসে। তারপর নীহার আরো লিখিয়াছে...

তুমি বোধ হয় রান্নাঘরে রাঁধা-বাড়ার চিহ্ন আর শকড়ি প্লেট দেখে অবাক হয়ে গেছে, না দাদা ? নিশ্চয় ভেবেচো, বাড়ীতে ভূত এসেছিল না কি রে ? কিন্তু ভূত নয়...তোমার বোনটি যে গিয়ে হঠাৎ উদয় হয়ে গেরস্তালী করে এসেচে, তা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবো নি। ভারী মজা হয়েচে, না ?

কিন্তু যাই বলো, সদার ভারী অন্যায়—ঐ ঘুমন্ত উড়েটার হাতে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কি বলে শশীঠাকুরকে নিয়ে যাত্রা শুনতে গেল ? আমি মাসিমাকেও লিখবো। ও-দুটোর উপর আমার এমন রাগ হয়েছিল সে দিন !...

যাই হোক্, তোমার ভগ্নীপতি লিখতে বললেন, তাই লিখচি, তোমার উপর তাঁর খুব রাগ হয়েচে—বিনা-নিমন্ত্রণে কুটুম মানুষ তোমার বাড়ী গেল—তুমি তাঁর অভ্যর্থনাও করলে না। আর-কখনো তিনি তোমার বাসায় যাবেন না। এখন আবার বলচেন, যাবেন, কিন্তু তুমি যদি সামনের ছুটীতে দু'তিন দিনের জন্য আমাদের এখানে বেড়িয়ে যেতে পারো, তবেই ; নাহলে নয়। ...আজ আসি, ভাই। আমাদের প্রণাম নিয়ো...

তোমার স্নেহের বোন্ নীহার

ইহার পর আবার 'পুনশ্চ' আছে—পুনশ্চর মধ্যে লেখা,—

"ভালো কথা, সেদিন এঁর ভুলের জন্য আমার একটা শাড়ী আর শেমিজ বারান্দায় শুকোচ্ছিল...তোলা হয়নি। সেইখানেই সে দুটো ফেলে এসেচি। যদি উড়েটা না চুরি করে থাকে তো পাবে। সে দুটো পেলে প্যাক করে রেল-পার্শেলে পাঠিয়ে দিয়ো। চিঠি লিখে আসিনি, তার কারণ, রান্নাঘরে রান্না দেখে তুমি অবাক হয়ে ভাববে, কে এসে রেঁধে গেল ?...তাই ! তার জন্যে রাগ করো না ভাই, লক্ষ্মীটি ! ইতি নীহারিকা।"

বাঃ ! কালিদাস চিঠি পড়িয়া নিজের মনে খুব খানিকটা হাসিল। বেচারা সদা আর শশী-ঠাকুরের উপর কি সন্দেহই না করিয়ছিল ! কিন্তু ধমক খাইয়াও যে সদা বড় চুপ করিয়াছিল ! সে ঐ অপরাধের জন্য...দুটোতে মিলিয়া রাত্রে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, বাড়ী ছিল না—তাই,—নহিলে সদা বিনাদোষে চুপ করিয়া বকুনি সহিয়া থাকিবার পাত্রই নয়।

মার কাছে চিঠি লইয়া গিয়া কালিদাস পড়িয়া শুনাইল। ...শুনাইয়া মাকে কহিল—দেখো তো মা, নীহারের আক্কেল ! ললিত বেচারাই বা কি ভাবলে বাসায় আমায় না দেখে ! তা, আমার দোষ কি ! আমায় একটা খপর আগে দেওয়া উচিত ছিল না কি ?...আর মা, সে শাড়ী-শেমিজ নীহারটাই ফেলে গেছে, ললিতের দোষ। আচ্ছা হুঁশ

বাবুদের !

মার দুই চোখ অপূর্ব্ব আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—দে তো রে চিঠিখানা...ওঁকে একবার দেখাইগে...

বলিয়াই চিঠি লইয়া মা মহা-উৎসাহে তখনি শিবনাথের কাছে ছুটিলেন। কালিদাস অবাক ! এ চিঠিতে এমন কি আছে...

গৃহিণী গিয়া শিবনাথের সামনে চিঠি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—নাও, পড়ো ! বুদ্ধির গর্ব্ব করে বেড়ান উনি ! শাড়ী-শেমিজের খপর পাবে এই চিঠিতে।

কর্ত্তা চিঠি পড়িলেন। পড়া শেষ হইলে তিনি বিস্ফারিত নেত্রে গৃহিণীর পানে চাহিলেন। গৃহিণী কহিলেন—বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি ! বুদ্ধির বড় বড়াই করো না ! আর কলকাতার হাওয়া ! ইতর মন তোমার, তাই ছেলেকে অমন নীচ সন্দ করো ! ছি, ছি, ছি !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পুরুষোত্তম

নটবর শহরের এক মহাজনের কাছে তিরিশ টাকা বেতনে সরকারি করে।

একটি ছেলে, একটি মেয়ে, এবং পত্নী কাত্যায়নীকে নিয়ে মাসিক তিরিশটাকা মাত্র আয়ে শহরে বাড়ী ভাড়া দিয়ে থাকা ও সংসার চালানো তার পক্ষে অসম্ভব ব'লে, সে গঙ্গার ওপারে গিয়ে একখানা ছোট একতলা বাড়ীতে বাস করছিল।

বাড়ী খানিতে দুটি ঘর, আর ঘরের সামনে একটু দালান। সেই দালানেরই এক পাশে কাত্যায়নীকে রাঁধবার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হয়েছিল, কারণ সে বাড়ীতে রান্নাঘর বলে পৃথক কিছু ছিল না।

এই বাড়ীটুকুর ভাড়া দিতে হ'তো নটবরকে মাসে এগারো টাকা। বাকী উনিশ টাকায় সে নিজে, স্ত্রী ও দুটি ছেলে মেয়ের ভরণ-পোষণ যে ভাবে চলতে পারে নটবরের দিন সেই ভাবেই চলছিল ; অর্থাৎ, অভাব ও অনটন তার সংসারে নিত্যই লেগেছিল ! কিন্তু

কাত্যায়নীর মতো একটি অসীম কষ্ট-সহিষ্ণু মেয়েকে পত্নীরূপে পাওয়াতে সকল দুঃখের মধ্যেও নটবরের মনের সুখ-শান্তি একটি দিনের জন্যেও নষ্ট হয়নি। কাত্যায়নীর প্রাণপণ সেবা যত্ন ও ভালোবাসায় এবং স্নেহের পুত্র কন্যা দুটিকে বুকে করে—নটবর তার সকল অভাব ভুলেছিল।

কিন্তু, বাজারে জিনিস পত্রের দাম ক্রমশ আক্রা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নটবরের সংসার যেন আর চলছিল না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ছেলে মেয়ে দু'টি ক্রমেই বড় হচ্ছে, উনিশ টাকায় কি আর বরাবর কুলিয়ে উঠতে পারা যায়?

কাত্যায়নী একদিন স্বামীকে ডেকে বললে—ওগো, এক কাজ করলে হয় না? ওই সামনের মাঠ-কোঠার উপর একখানা ঘর খালি হয়েছে; শুনলুম, ভাড়া নাকি মাসে পাঁচ টাকা। চলো না আমরা ওখানে উঠে যাই; তা হলে মাসে আমাদের ছ'টা করে টাকা বাঁচবে! সে কি কম সুবিধে?

নটবর স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে মাথা চুলকোতে সুরু করে দিলে।

কাত্যায়নী বল্‌লে—এই ছ'টা টাকা থেকে কি ক'রবো জানো—

নটবর একটু ইতস্ততঃ করে বললে—তাইত, কাতু! শেষটা—মাঠ-কোঠায় গিয়ে উঠবো—এতদিন পাকা বাড়ীতে বাস করে—

কাত্যায়নী বেশ শান্তভাবে বললে—তা'তে আর কি হয়েছে? আমরা তো আর শহরে লোক নই। মাটির চালা-ঘরে জন্মেছি, বড় হয়েছি, মাঠ-কোঠায় থাকতে আমাদের তো আর কোনও অসুবিধে হবে না. বরং এই পুরানো স্যাঁতসেঁতে একতলা পাকা-বাড়ীর চেয়ে ওই নতুন মাঠ-কোঠার শুকনো খট্‌খটে দোতলার ঘরে ঢের ভালো থাকবো—

নটবর একটু ভেবে বললে—অবশ্য, তুমি যা বলছো সবই ঠিক, কিন্তু, কি জানো কাতু? আমি মাঠ-কোঠায় থাকি জানলে কলকাতার লোকগুলো আমাকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখবে—তাদের কাছে আর আমার কোনও খাতির থাকবে না—

কাত্যায়নী এবার একটু উত্তেজিত হয়ে বললে—কলকাতায় লোকগুলো যদি আমাদের খাতির নাইই করে—তা'তে কি এসে-যাচ্ছে শুনি? তারা তো কেউ আর ছাতা দিয়ে আমাদের মাথা রাখতে আসছে না? দু'টো টাকা ধার চাইলে কি কারুর কাছে পাওয়া যায়? আমাদের হাঁড়ি চড়লো কি না সে খবর কি কেউ রাখে? অসুখে প'ড়লে কি কেউ উঁকিটিও মারে?—তবে, কিসের জন্য শহুরে লোকগুলোর মুখ চেয়ে নিজেরা উপোস ক'রে. ছেলে মেয়ে দুটোকে আধ-পেটা খাইয়ে, মাসে মাসে ছ'টা করে টাকা লোক্‌সান কর'বো শুনি?

নটবর চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ তার মুখে আর কথা নেই। খানিকপরে সে একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে বললে—আচ্ছা, কাতু! আর এক কাজ করলে হয় না? আমাদের এই দুটো ঘরই না রেখে—একটা ঘর যদি কোনও ভদ্রলোককে ভাড়া দিই, তাহলে—?

কাত্যায়নী একটু মুখ টিপে হেসে বললে—বুঝিচি, তুমি একেবারে শহুরে ফতো-বাবু হ'য়ে পড়েছো, মাঠ-কোঠায় গিয়ে থাকতে আর মন সরছে না—তা বেশ, আমার একটা ঘর হ'লেই চলে যাবে। আর একটা ঘর ভাড়া দিয়ে তুমি যদি আমাকে মাসে ছ'টাকা তুলে দিতে পারো—আমি এখান থেকে এক পা'ও নড়বো না!

নটবর একটু মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ব'ললে—তবেই তো তুমি মুস্কিলে ফেললে কাতু. দু'খানা ঘরের জন্য আমি দিই এগারো টাকা, এ শুনলে কি আর একখানা ঘরের জন্য কেউ ছ'টাকা দিতে রাজী হবে মাসে?

সজোরে ঘাড় নেড়ে কাতু বললে—তা আমি জানিনি, তাহ'লে তোমাদের সঙ্গে ঐ মাঠ-কোঠাতে গিয়েই উঠতে হবে। নইলে,—এই পর্য্যন্ত ব'লেই কাত্যায়নী চুপ করলে। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করে তারপর যেন একটু অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে বলে ফেললে—নইলে জীবনে কোনও কালে যে তোমার ভাগ্যে 'পুরুষোত্তম' দর্শন ঘটবে এ তুমি স্বপ্নেও মনের কোণে স্থান দিও না।

সে একদিন তাদের দৃপ্ত যৌবনে পত্নীর প্রথম প্রেমমুগ্ধ নটবর আলিঙ্গনাবদ্ধ কাত্যায়নীকে সোহাগজড়িত কণ্ঠে বলেছিল—"তোমার কি সাধ যায় বলো, আমি যেমন করে পারি তোমার সাধ নিশ্চয় মেটাবো!"

স্বামী-প্রেমে গরবিনী কাত্যায়নী সেদিন পতির বাহুবেষ্টনের মধ্যে থেকে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল—"আগে তোমার মনের কি সাধ আছে আমায় বলো।"

বৈষ্ণব কুলের ভক্ত সন্তান নটবর সেদিন আনন্দে বিহ্বল হয়ে তরুণী পত্নীর কাণে কাণে বলেছিল—"একবার শ্রীক্ষেত্রধাম গিয়ে পুরষোত্তম দর্শন ক'রে আসবার বড্ড সাধ আছে আমার প্রাণে!"

কাত্যায়নী সেদিন তার প্রাণেশ্বরকে অভয় দিয়ে ব'লেছিল "পুরুষোত্তম তোমার এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন নিশ্চয়!"

সেদিন থেকে আজও পর্য্যন্ত কাত্যায়নী সে কথা ভোলেনি। দু'আনা, চার'আনা—এক টাকা, আট আনা—যখন যা বাঁচাতে পা'রছে তখনই সে তা নটবরের 'পুরুষোত্তম' দর্শনে যাবার জন্য প্রাণপণে জমিয়ে আসছে।

নটবর একথা জানতো,—তাই কাত্যায়নীর মুখে পুরুষোত্তমের নাম শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠে, দু'হাত জোড় ক'রে পুরুষোত্তমের উদ্দেশে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে—তা যদি হয় কাতু, আমি তোমার দিব্যি ক'রে বলছি, মাঠ-কোঠায় আমি আনন্দের সঙ্গে গিয়ে থাকবো! একটু কষ্ট না ক'রলে কি কখনও জগবন্ধুর দেখা মেলে?

* * *

পরদিন নটবর কাজে চলে যাবার পরে কাত্যায়নী অনেক ভেবে স্থির করলে—না; ওঁর যখন মাঠ-কোঠায় থাকতে এত অনিচ্ছে, তখন কিছুতেই মাঠ-কোঠায় যাওয়া হবে না। ওঁর মান যাবে, উনি লজ্জা পাবেন—ছিঃ! তাকি হয়? টাকাটাই কি বড় হ'লো...

কাত্যায়নী একখানা কাগজে বড় বড় করে লিখলে—"ভদ্রপরিবারের বাসোপযোগী একখানি ভাল ঘর ভাড়া আছে, ভিতরে অনুসন্ধান করুন।"

একটু ময়দার আটা ক'রে একখানা পুরানো এ্যাল্‌মানাকের পিছনে কাগজখানা এঁটে ছেলেকে দিয়ে সেটা বাইরে রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে দেওয়ালে।

সারাদিনের মধ্যে অনেক রকমের লোকই ঘরখানি ভাড়া নেবার জন্য ভিতরে অনুসন্ধান ক'রতে এলো।

কাত্যায়নী ছেলেকে মধ্যস্থ রেখে সকলের সঙ্গেই ভাড়ার কথাবার্ত্তা কইলে।

প্রথমেই এসেছিল গুটি দু'য়েক অসচ্চরিত্র যুবা। তন্বী-শ্যামা কাত্যায়নীর যৌবনপুষ্ট, অটুট-স্বাস্থ্য, নিটোল দেহ-লতাটির প্রতি তাদের লুব্ধ দৃষ্টি অনেকদিন থেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কাজেই কাত্যায়নীর সান্নিধ্য লাভের এ সুযোগ তারা ছাড়তে চাইলে না।

কিন্তু তাঁরা কেউ সস্ত্রীক এসে থাকবেন না—শুনে, কাত্যায়নী তাদের হাঁকিয়ে দিলে। তারা একখানা ঘরের জন্য আট-টাকা থেকে দশ-টাকা—দশ-টাকা থেকে বারোটাকা—বারোটাকা থেকে পনেরোটাকা পর্য্যন্ত ভাড়া দিতে চাইলে,—কিন্তু, কাত্যায়নীর এক কথা।

বিকেলের দিকে একটি সুচেহারা ভদ্র ছোকরা এসে একমাসের ভাড়া অগ্রিম সাত টাকা জমা দিয়ে, পরের দিন থেকেই ঘরখানি নেবার বন্দোবস্ত ক'রে চলে গেল। থাকবে সে আর তার স্ত্রী। ছোট ছেলে পুলের হাঙ্গামা নেই। বাবুটি তদেরই স্বজাত শুনে কাত্যায়নী টাকা সাতটি নিতে আর দ্বিধা করলে না।

নটবর এ খবর কিছুই জানতো না। স্বামীকে একেবারে অবাক্ করে দেবে বলে কাত্যায়নীও নটবরকে আগে কিছু জানায়নি যে—একখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে।

নটবর বেরিয়ে যেতো সেই ভোরে উঠে, আর ফিরে আসতো রাত্রি আটটা-নটায়! সকালের আহারটা হ'তো তার শ্রীপতি ঠাকুরের বিশুদ্ধ পবিত্র হিন্দু হোটেলে। রাত্রে বাড়ীতে ফিরে এসে একবেলা সে কাত্যায়নীর হাতের সুপক্ক অন্ন খেয়ে বাঁচতো।

কাত্যায়নী কতবার বলেছে—"তুমি দুপুরে বাড়ী এসে খেয়ে যাও না কেন?" কিন্তু নটবর বলে—"তার খরচা দেবে কে কাতু?—শহরে যাওয়া আসার পারের কড়ি মনিব যোগাচ্ছেন এবং ওবেলার খোরাকীটাও তিনিই দিচ্ছেন; দুপুরে আমার বাড়ীতে খেতে আসবার সখ চাপলে কি মাসিক তিরিশ টাকায় তোমার মত অন্নপূর্ণাও এ টানাটানির সংসার চালাতে পারবে।"

কাত্যায়নী কথাটা বুঝে স্বামীকে আর এ নিয়ে অধিক পীড়াপীড়ি করতে পারেনি।

ভাড়াটেরা আসবার দিন নটবরের শহর থেকে ফিরতে একটু রাত হ'য়েছিল, কাজেই নবাগতদের বিষয় সে সম্পূর্ণই অনবগত ছিল। কাত্যায়নীও ইচ্ছে করেই সেকথা তাকে কিছু বলেনি।

পরের দিন সকালে নটবর শহরে যাবার সময় দেখলে তাদের ছোট দালানটির আর একদিকে কাদের একটি সুন্দরী বউ মাথায় ঘোম্‌টা দিয়ে পৃথকভাবে রান্নাবান্নার আয়োজন ক'রছে।

নটবর বিস্মিত হ'য়ে যখন কাত্যায়নীর কাছে এই মেয়েটির পরিচয় জা'নতে চাইলে, কাত্যায়নী এক গাল হেসে বললে—ওমা! ওকে চিনতে পারলে না তুমি? ওযে সুষমা!

নটবর অনেকক্ষণ চিন্তা করেও 'সুষমা' নামে পরিচিতা কোনও আত্মীয়ার কথা স্মরণ করতে পারলে না, কিন্তু সে কথা স্বীকার করলে পাছে স্ত্রীর কাছে অপদস্থ হ'তে হয় এই ভয়ে শুধু বললে—"ওঃ! তা আলাদা রান্নাবান্নার আয়োজন হচ্ছে কেন?"

কাত্যায়নী এবার উচ্চহাস্য করে উঠে বললে—"ওমা, তাও শোনোনি বুঝি?—সুষমাকে কত বারণ করলুম, তা ও কিছুতেই শুনলে না, বললে—একদিনের জন্যে যদি আসতুম দিদি, তাহ'লে তোমার হাতের পান্‌সে রান্না না হয় কোনও রকমে চোখকাণ বুজিয়ে খেয়ে একটা দিন কাটিয়ে যেতুম; কিন্তু, বারোমাস যখন থাকতে হবে, তখন নিত্যি তোমার ও বদ্‌রান্না বরদাস্ত হবে না,—তাই ও আলাদা, হেঁসেল কেড়েছে!"

কাত্যায়নীর দেওয়া এ অস্পষ্ট পরিচয় নটবরের কাছে ব্যাপারটাকে আরও রহস্যজনক ক'রে তুললেও, তার কাজে যাবার বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে সে আর এ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলে না। কাত্যায়নীকে এ মেয়েটি 'দিদি' বলে ডাকে শুনে এ

নিশ্চয়ই কাতুর কোন বোন-টোন্ হবে অনুমান করে—বেরিয়ে যাবার সময় নটবর বলে গেল—তা উনি ভালই করেছেন, কাল থেকে আমিও ওঁর হাতের রান্না খাবো, তোমার রান্না আর মুখে রুচছে না।

কাত্যায়নী বললে—তা বেশত ; তাহ'লে তো আমি বাঁচি! দু'দিন ছুটি পাই—

কিন্তু নটবর তখন বাড়ীর বাইরে চলে গেছে। সব কথা হয়ত সে শুনতেই পেলে না।

মেয়েটি শুধু ঘোমটা তুলে বললে—দিদি, এত রঙ্গও তুমি জানো ভাই ?

* * *

পত্নী সুষমাকে নিয়ে মোহনলাল যেদিন এ বাড়ীর একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে এসেছিল, সেদিন ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি যে বাড়ীওয়ালা নটবরবাবু ও তাঁর স্ত্রী কাত্যায়নী দাসী তাদের এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয় হ'য়ে উঠবে!

মোহনলাল এক খবরের কাগজের অফিসে কাজ করতো। মাসান্তে পঁচিশটি টাকা সে বেতন পেতো! তা থেকে ঘর ভাড়ার সাত টাকা দিয়ে বাকী আঠারো টাকায় তাদের স্বামী স্ত্রীর খোরাক পোষাক বেশ স্বচ্ছলভাবে চ'লতো না! তাই মোহনলালকে মাঝে মাঝে 'ওভারটাইম' খেটে কিছু কিছু উপরি রোজগার ক'রতে হ'তো। মোহনলালের শরীর খুব ভাল নয় বলে সে আবার সবদিন বেশী পরিশ্রম ক'রতে পারতো না।

এমনি করেই কায়ক্লেশে কোনও রকমে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলছিল। নেহাত যেদিন হাতে কিছু থাকত না, মোহনলাল বলতো—আজ দিদির কাছ থেকে একটা টাকা ধার ক'রে নিয়ে চালিয়ে দাও সুষমা, আমি মাইনে পেলেই দিয়ে দেবো।

সুষমা ব'ল্তো—না বাপু, সে আমি পারবো না। রোজ রোজ চাইতে আমার বড় লজ্জা করে, আর, দিদিই বা পাবেন কোথা থেকে বলো, তাঁরও তো এই টানাটানির সংসার! বরং তুমি এককাজ করো—আমার কাণের এই মটর টাপ্ দুটো কারুর কাছে রেখে তুমি দু'টো টাকা ধার করে নিয়ো এসো—মোহনলাল বলতো—না সুষী, সে আমি কিছুতেই পারবো না, যাকে আজ পর্য্যন্ত কখনও আমি নিজে একখানা গহনা গড়িয়ে দিতে পারিনি, তার গা' থেকে আমি গহনা খুলে নিয়ে গিয়ে বাঁধা দিয়ে আসতে পারবো না।

আনন্দে ও গর্ব্বে সুষমার দুই চোখ জলে ভরে উঠতো। স্বামী সোহাগের সম্পদের কাছে দারিদ্র্যের এ যন্ত্রণা তার অতি তুচ্ছ বলে মনে হ'তো!

সুষমাদের উনুনে আগুন পড়ছে না এবং মোহনলালের বাজার যাবার কোনও তাড়া নেই দেখে বুদ্ধিমতী কাত্যায়নীর ব্যাপারটা বুঝতে বেশী বিলম্ব হ'তোনা! সে সুষমাকে ডেকে ব'লতো—পোড়ারমুখী, আমার কাছে চাইতে তোর লজ্জা হয় কেন এত ? আমিও যে তোরই মতো দুঃখীরে! তুই আমার ঘরেই উপবাস ক'রে দাঁতেদাঁত দিয়ে পড়ে থাকবি, আর আমি বুঝি পিণ্ডী রেঁধে গিলতে ব'সবো মনে করেছিস্ ?

তারপর আঁচল থেকে দুটো টাকা খুলে নিয়ে সুষমার হাতে গুঁজে দিয়ে কাত্যায়নী বলতো—মোহনলাল মাইনে পেলে দিস্। আর আজ তোদের দু'জনের আমার কাছে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ রইল বুঝলি!

সুষমা কৃতজ্ঞ সজল চক্ষে কাত্যায়নীর মুখের পানে তাকিয়ে সবিনয়ে বল'তো—দিদি, ভগবান যদি ভাই আমাদের তোমার আশ্রয়ে না এনে ফেলতেন, তাহ'লে কতদিন যে

স্বামীকে আমার চোখের সামনে অনাহারে আছেন দেখতে হ'তো তা কে জানে ?

কাত্যায়নী তাকে ধমক দিয়ে ব'লতো—থাম্ বাপু, তুই আর ওই হাড়-জ্বালানো কথাগুলো ক'সনি !—ভগবান তোদের এমন আশ্রয়ে এনে ফেলেছেন যে তার নিজেরই দিন চলে না !

নটবরের ছেলেমেয়ে সুষমাকে মাসীমা বলতো ! সুষমার নিজের ছেলেপুলে ছিল না বলে, কাত্যায়নীর ছেলেমেয়ে দুটী হয়েছিল সুষমার গলার হার। মাসীমা না খাইয়ে দিলে তাদের খাওয়া হতো না মাসীমা না ঘুমপাড়ালে তাদের ঘুম হ'তো না !

এমনি করে এ দু'টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে একটা অকৃত্রিম স্নেহ মমতা ও সহানুভূমির সুদৃঢ় বন্ধন ধীরে ধীরে অটুট হয়ে উঠেছিল।

*   *   *

সুষমারা আসবার মাস আষ্টেক পরে কাত্যায়নী একদিন নটবরকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁগা, কত টাকা হলে তোমার 'পুরুষোত্তম' দর্শন হ'তে পারে বলো তো ?

নটবর ব'ললে—আমি যদি একা যাই, তাহ'লে খুব বেশী নয়, গোটা পঁচিশেক টাকা হ'লেই হ'তে পারে—কিন্তু—

মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে কাত্যায়নী বললে—আর কিন্তু-টিন্তু নয় ; একটা ভালোদিন দেখে মহাপ্রভুকে স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়ো—আমার হাতে জমেছে প্রায় চল্লিশ টাকা !

নটবর খুশী হ'য়ে উঠে বললে—এ্যাঁ ! বলোকি ? তুমি যে অবাক করে দিলে আমায় ! কিছু ভেল্কী জানো নাকি ? এই হাহাকারের মধ্যে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছো ? নাঃ, তোমাকে নিশ্চয় খেতাব দেওয়া উচিত—'সঞ্চয়-বিদ্যা-মহার্ণব !'

কাত্যায়নী স্বামীর প্রীতি সম্পাদনে সমর্থা হ'য়েছে দেখে বেশ একটু সার্থকতার হাসি হেসে বললে—তাহ'লে এই সামনের ত্রয়োদশীতে দিন ভাল আছে, বেরিয়ে পড়ো—জগবন্ধু এবার তোমায় টেনেছেন—

নটবর বললে—না কাতু, আরও কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা ক'রতে হবে। চল্লিশ টাকায় আমাদের দু'জনের যাওয়ার খরচ ঠিক কুলিয়ে উঠবে না ! গোটা পঞ্চাশ হ'লেও বা 'জয় জগন্নাথ !' বলে তাল ঠুকে বেরিয়ে পড়তে পারতুম !

কাত্যায়নী দুই চোখ কপালে তুলে বললে—আমিও যাবো এ কথাতো ছিলো না ! তোমারই ত অনেকদিনের সাধ ! লক্ষ্মীটি যাও, তুমি একলাই ঘুরে এসো। তুমি ফিরে এলে, তোমাকে দেখলেই আমার 'পুরুষোত্তম' দর্শন হবে !

প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে নটবর বললে—তোমাকে ফেলে আমি স্বর্গে যেতেও রাজি নই ! তা'ছাড়া শাস্ত্রেও আছে কাতু—সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরেৎ ! স্ত্রীকে স্বামীর 'সহধর্ম্মিণী' বলে এইজন্যেই বুঝলে ? তুমি যদি যাও, তাহ'লে আমার 'পুরুষোত্তম' যাওয়ার কোনও ফলই হ'বে না !

কাত্যায়নী মনে মনে অত্যন্ত খুশী হ'য়ে উঠলেও মুখে বললে—কিন্তু আমি কি ক'রে যাই বলো ? ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ঘাড়ে করে ত' আর তীর্থ দর্শন করতে যাওয়া চলে না ?

নটবর বললে—ওদের ঘাড়ে করেই বা যেতে হবে কেন ? ওরা যে রকম সুষমার

অনুগত হয়ে পড়েছে, তুমি অনায়াসে ওদের দিন পনেরোর জন্যে সুষমার কাছে রেখে যেতে পারো। ওরা মাসীর কাছে বেশ থাকবে।

দাঁত দিয়ে জিভ কেটে কাত্যায়নী বললে—ছিঃ! সে কি ভাল দেখায়? ও বেচারী ছেলেমানুষ একলাটি আমার ওই দুই দস্যি ছেলেমেয়েকে সামলাতে পারবে কেন?

—ওঃ! তা ও খুব পারবে। সুষমা বড় ভাল মেয়ে।—ওর উপর আমি ভরসা ক'রতে পারি। এই বলে নটবর কাত্যায়নীকে সাহস দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু, কাত্যায়নী এবার স্পষ্টই বললে—আমি বাপু ছেলেমেয়ে ছেড়ে ন'ড়তে পারবো না। ধড়ফড় করে' মরবো। একরাত্রিও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোতে পারবো না। আমায় নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ করো। 'জয় জগন্নাথ' বলে একলাই বেরিয়ে পড়ো—নইলে এরপর আর হয়ত' হবে না—

নটবর ঘাড় নেড়ে বললে—উহুঁ। সে কিছুতেই হতে পারে না কাতু, এতদিন যখন গেছে, আরও কিছুদিন না হয় যাক্। আরও গোটাকতক টাকা জড় হ'লেই একেবারে স্পরিবারে বেরিয়ে পড়া যাবে—

দুই চোখ কপালে তুলে কাত্যায়নী বললে—সে কি গো! ছেলেমেয়ে নিয়ে সবশুদ্ধ যাবে নাকি?

—নিশ্চয়! ছেলেমেয়ে রেখে গেলে যখন তোমায় উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে, তখন ওদের সঙ্গে না নিয়ে কি আর বেরুবো মনে করেছো?—নটবর বেশ জোরের সঙ্গেই এ কথাগুলো বল্‌লে, কিন্তু কাত্যায়নী তবু যেন জোর পেল না; একটু ভেবে শুষ্কমুখে বললে—কিন্তু, সে যে—অনেক টাকার ফের—সে খেয়াল আছে?—

নটবর উচ্চহাস্য ক'রে বললে—পাগল হয়েছো তুমি? ছোট ছোট ছেলেমেয়ের রেলে হাফ্ টিকিটও লাগবে না, 'অনেক টাকার ফের' হ'লো কিসে শুনি? খরচ যা সেতো শুধু তোমার আর আমার—

কাত্যায়নী এবার এক-গাল হেসে বললে—ছেলে মেয়ে দুটোর টিকিটের দাম লাগবে না বুঝি? তবে তো ভালো! তা'হলে সেই ঠুঁটো ঠাকুরটির মনে যা আছে তাই হবে। এতদিন যখন গেছে তখন আরো দুটো মাস যাক্—সামনেই রথ আসছে। সেই রথের সময় সব একসঙ্গেই যাওয়া যাবে—শাস্ত্রে বলে—"রথেচ বামনং দৃষ্টা"—আর তুমি যখন একলা কিছুতেই নড়বে না—তখন আর উপায়ই বা কি?

দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। রথের দিনও এগিয়ে এল, টাকারও যোগাড় হয়েছে। নটবর 'পুরুষোত্তম' দর্শনে যাবার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

কোনদিনটিতে শ্রীক্ষেত্র রওনা হওয়া সবচেয়ে নিরাপদ—পঞ্জিকার পাঁচশ পাতা ঘেঁটে নটবর যেদিন সেটা স্থির ক'রতে নিযুক্ত, কাত্যায়নী এসে মৃদু কোমল কণ্ঠে বললে—তাইত, তুমিতো সব বন্দোবস্ত ক'রতে সুরু করে দিয়েছো—কিন্তু, হ্যাঁগা, আমাদের মোহনলালের যে অমন বাড়াবাড়ি অসুখ—বেচারি বিছানায় পড়ে—এই অবস্থায়, ওই কচি মেয়েটাকে একলা আতান্তরে ফেলে—আমরা গোষ্ঠিবর্গ কোন আক্কেলে পুরী চলে যাবো বলোতো? সেটা কি উচিত হবে?

নটবরের মনে হ'লো—কথাটা কাত্যায়নী ঠিকই বলেছে—প্রায় মাসাধিক কাল হ'তে চললো মোহনলাল শয্যাগত, জ্বর আর ছাড়ছে না, কাশীর সঙ্গে নাকি একটু আধটু রক্তও দেখা দিয়েছে। একেই সে ছিল একটু কৃশ, তার উপরে এই ক'দিনের অসুখে ভুগে

একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে পড়েছে।

পাড়ার ডাক্তারবাবু দয়া করে দু'বেলা অমনি দেখে যান বটে ; কিন্তু তার ওষুধের দাম যোগাতে যোগাতে সুষমার হাতের সোনার রুলি গাছাটি পর্য্যন্ত বাঁধা পড়েছে। এ অবস্থায় তাদের ফেলে সপরিবারে পুরী যাওয়া শুধু যে অভদ্রতা, তাই নয়, একটা অমানুষিক হৃদয়হীনতার কাজ।

কাত্যায়নী ব'ললে—আমরা পুরী চলে যাবো শুনে মেয়েটার যেন আতঙ্ক হ'য়েছে। কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছে—

নটবর বললে—কাতু, সত্যিই এখন যাওয়াটা ভাল দেখায় না। এখন থাক্—মোহনলাল সেরে উঠে পথ্য করলে, তারপর যাওয়া যাবে—কি বলো ?—

মহাউৎসাহিত হয়ে উঠে কাত্যায়নী বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বেশ হবে! এখন এইখান থেকেই মহাপ্রভুকে প্রণাম জানিয়ে রাখি—জগবন্ধুর ডুরী গলায় না টান দিলে তো আর বেরুতে পারছিনি।...

নটবর চুপ করে হাতের পাঁজিখানার দিকে চেয়ে কি ভাবছিল—কাত্যায়নী বললে—কিন্তু, দেখো, আমাদের পাড়ার এ ডাক্তার ছোকরাটি তো কিছু করে উঠতে পারছে না বাপু, দেখতে দেখতে তো আজ হ'য়েও গেল অনেক দিন। তোমাকে ক'দিন থেকেই ব'লবো ব'লবো মানে করছি—এ ডাক্তারের ভাব গতিক তো আমি বড় ভাল বলে বোধ করছিনি—রুগী দেখতে এসে সারাক্ষণ সে সুষমার মুখের দিকেই হাঁ করে চেয়ে থাকে—যেন মেয়েছেলে কখন দেখেনি। সুষী ব'লছিল সেদিন নাকি মোহনের হাত দেখতে গিয়ে ডাক্তারবাবু ভুলে সুষমার হাত ধ'রতে গেছল!

ওঃ। তাই বটে, না ডাকতেই দু'বেলা আপনি রুগী দেখতে আসে ? সুষমার সুন্দর মুখ দেখে ভুলেছে—দেখেছি।—নাঃ, ওর হাতে চিকিৎসার ভার থাকলে রুগী তো সহজে সারবে না—আমি কালই কলকাতা থেকে অন্য একজন বড় ডাক্তার নিয়ে এসে দেখাবো। তিনি আমাদের মহাজন-বাড়ীতে দেখেন, প্রবীণ লোক, বড় ভদ্র, আমাকে খুব ভালবাসেন, আমার ছোট ভা'য়ের অসুখ ক'রেছে শুনলে তৎক্ষণাৎ তিনি দেখতে আসবেন—

কাত্যায়নী খুশী হয়ে উঠে বললে—ওগো, এখুনি এখুনি, আমি তোমাকে কবে থেকে এই কথাই ব'লবো ভাবছি। আহা, তাহলে ছোঁড়াটা প্রাণে বাঁচবে—নইলে এ আনাড়ী তো দেখছি ওকে মারতে বসেছে।

নটবর বললে—পারি তো কালই ফেরবার সময় তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবো।

নটবর কথা রাখলে। পরের দিন যথাসময়ে সে তাদের মহাজনদের ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে হাজির হলো।

ডাক্তার বাবু মোহনলালকে বেশ করে পরীক্ষা করে দেখে ব'লে গেলেন রুগীকে আজ কালের মধ্যেই কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য না পাঠালে বাঁচবার সম্ভাবনা খুবই কম।

ডাক্তার চলে যাবার পর—সুষমা একেবারে কাত্যায়নীর পায়ের উপর আছড়ে কেঁদে পড়লো—ও দিদি কি হবে ? কী করে ওকে বাঁচাবো ? আমার যে আর কিছু নেই। হাওয়া বদলাতে যে অনেক টাকা লাগবে—ভাই, আমি কোথায় পাবো বলো—কে আমাকে দেবে— ?

কাত্যায়নী সুষমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে বললে—কাঁদিসনি বোন্ চুপ কর, ভগবান্ নিশ্চয় একটা কিছু উপায় করে দেবেন। আমি আজই ওঁকে ব'লে কিছু ব্যবস্থা যাতে হয় করাবোই করাবো—তুই কিছু ভাবিসনি।

সুষমা গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কাত্যায়নীর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিয়ে বললে—দিদি তোমার ভরসাই আজ আমার একমাত্র অবলম্বন।

নটবর সব শুনে বললে—তা, পঞ্চাশ ষাট টাকার কমতো ওদের কিছুতেই যাওয়া হ'তে পারে না কাতু। অত টাকা আমায় শুধু হাতে কে ধার দেবে ব'লো ? কেমন করেই বা যোগাড় হবে—

কাত্যায়নী বললে—আচ্ছা, আমার গলার এই বিছেহার ছড়াটা আর হাতের এই পালংপাতার বালা দু'গাছা যদি খুলে দিই—ষাট্ টাকা কি কেউ দেবে না ?

নটবর কাতর হ'য়ে বললে—তুমি কি আমার অসময়ের সম্বলটুকুও খোয়াতে চাও কাতু ? তার চেয়ে আর এক কাজ করো না—

কাত্যায়নী বললে—বুঝিচি তুমি কি বলবে ? ওই 'পুরুষোত্তম' যাবার টাকা ক'টা বিলিয়ে দিতে বল্‌বে তো ? কিন্তু, সে আমি কিছুতেই পারবো না। ও আমি তোমার নাম করে রেখেছি। না খেয়ে-না দেয়ে, আট আনা এক টাকা করে কত কাল ধরে জমিয়েছি ; ও আমার বড় কষ্টের ধন। ও তুমি দিতে বোলো না—

নটবর একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে—কিন্তু, যদি ও টাকাটা তুমি প্রসন্ন মনে ওদের দিতে পারতে কাতু, তা'হলে আমার বোধ হয় 'পুরুষোত্তম' দর্শনের চেয়েও আমাদের বড় কাজ হতো—

কাত্যায়নী অনেকক্ষণ নীরবে নতমুখে কি ভাবলে, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—তবে তাই হোক্। এ তোমার জগবন্ধুরই ইচ্ছে।...

নটবর মহানন্দে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিলে।

* * *

কিছুদিন পরে সুষমার একখানা চিঠি নিয়ে কাত্যায়নী নটবরকে পড়ে শোনাচ্ছিল—

দিদি, তোমারই দয়াতে এবার আমার স্বামীকে আমি ফিরে পেলুম। পুরুষোত্তমে এসে পৌঁছতেই, ওঁর জ্বর ছেড়ে গেছে। উনি এখন বেশ উঠতে হাঁটতে পারছেন। সমুদ্রের হাওয়ার দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে—

নটবর চিৎকার করে উঠলো—জয় মহাপ্রভু। কাত্যায়নী তখনও পড়ছিল—আমরা এখন প্রায় প্রত্যহই মন্দিরে গিয়ে 'জগবন্ধু' দর্শন করে আসি—"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জিত্‌লে কে ?

শরৎকাল, মেঘমুক্ত নীলাকাশ, দিগন্ত-প্রসারিত ধানের ক্ষেতগুলির অপরূপ শোভা হয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হ'চ্ছিল যেন কে সযত্নে সবুজ মখমলের আস্তরণ মাঠে মাঠে বিছিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে মৃদু বাতাসে নবীন ধানের শীষগুলি হেলে দুলে মাথা নেড়ে নেড়ে কোন্ অজানা ভাষায় কি যে ব'লছিল তা শুধু তারাই জানে।

কোনো কোনো ক্ষেতে আবার চাষারা লাঙ্গল দিচ্ছিল আর রাখালরা গরুবাছুর মোষ আর ভেড়ার পাল চরাচ্ছিল। পুকুর আর ডোবার ধারে ধারে দুধের বরণ বকেরা সার গেঁথে ব'সে মাছ্ ধরবার জন্যে উৎসুক হয়ে চেয়েছিল। কিছুর একটা শব্দ পেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কেউ কেউ বা পুকুর বা ডোবা থেকে খপ্ করে মাছ্ ধরে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। নীল আকাশের কোলে শুভ্র বকের পাঁতি দেখে মনে হ'চ্ছিল যেন আকাশের গায়ে সাদা ধবধবে ফুল সব ফুটে উঠেছে। দূরে, নিরবচ্ছিন্ন শাল, দেবদারু আর বিবিধ গাছের শ্রেণী সতেজ সজীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, চোখের সাম্‌নে বায়স্কোপের ছবির মত তারা আস্‌ছিল আর দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছিল। আকাশে বাতাসে আনন্দ ; কাশের গুচ্ছে, শিউলি ফুলের গন্ধে, সারা প্রকৃতিই যেন শরৎকে সম্বর্দ্ধনা করে বরণ ক'রে নিতে এসেছে।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী জননী বঙ্গভূমির মূর্ত্তি দেখে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠছিল, কি এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে চোখ জলে ভ'রে আসছিল আর মনে হচ্ছিল—

"আজি কি তোমার মধুর মূরতি হেরিনু
শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে
অমল শোভাতে"

কি এক ভাবে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তন্ময় হয়ে ছিলুম, হঠাৎ আমার পাশে ব'সে আমার ছোট বোন অমলা বলে উঠলো "কি সুন্দর দিদি, এই শরৎকালের ক্ষেতগুলি।" আমার তন্ময়তা ছুটে গেল, আমি হেসে ব'ল্‌লুম "আমিও ওই কথাই ভাবছিলুম ভাই ; সত্যিই ভারি চমৎকার।"

আমার স্বামীর পাশের বেঞ্চিতে আমার দুবছরের ঘুমন্ত খোকা মন্টুবাবুর পাশে ব'সে ষ্টেশন থেকে সদ্যক্রীত নোতুন ইংরিজি নভেলখানি এক মনে প'ড়ছিলেন। আমাদের কথা শুনে ব'লে উঠলেন "কি ব'লছো তোমরা ?" আমি ব'ল্‌লুম "এতক্ষণে বুঝি নভেল

পড়া শেষ হলো ?" তিনি ব'ল্লেন "তা হ'লো বই কি। বেশ সুন্দর বই খানা। যাক হ'ক্ তোমরা সুন্দরের কথা কি ব'লছিলে ?"

"শরৎকালের ধানের ক্ষেত্রে শোভার কথা হ'চ্ছিল।"

"বেশ, বেশ, তোমরা হ'লে সাহিত্যিকা, লেখিকা, তোমরা সব ভাব সঞ্চয় ক'রে নাও, সময়ে কাজে লাগবে। আমি অকবি মানুষ ও সবের কিছু ধার ধারিনা।" অমলা ব'লে উঠলো, "অত ঠাট্টা কেন গো কবি মশাই, তবু যদি না লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতেন।" "সত্যি নাকি অমু ? আমি আবার কবে কবিতা লিখলুম ? মনে তো প'ড়ছে না, তবে বোধ হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লিখে থাকবো। এই যে বর্দ্ধমান এসে গেল দেখছি, যাক এক পেয়ালা চা খেয়ে চাঙ্গা হ'য়ে নেওয়া যাক্। তোমরা খাবে নাকি ?" অমলা হেসে ব'ল্লে "মন্দ কি ?" ততক্ষণে গাড়ী এসে বর্দ্ধমান ষ্টেশনের প্লাটফরমে ঢুক্‌ছে। আমরা যাচ্ছিলুম এক্সপ্রেসে, একেবারে লম্বা পাড়ি। সেই হাওড়া থেকে ছেড়ে একেবারে এই বর্দ্ধমানে এসে গাড়ী থামলো। গাড়ী থামতে কত আরোহী নেমে গেল, আবার কত আরোহী উঠতে লাগলো। ইনি নেমে গিয়ে চা খেয়ে এলেন, আমাদের জন্যে নিয়েও এলেন ; আমরা চা খেতে খেতেই মন্টুবাবু ঘুম থেকে উঠে এসে তার মাসিমার কোল দখল ক'রে ব'সে চা খেতে সুরু ক'র্‌লেন। এমন সময় গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘন্টা বেজে উঠলো, ইনি তাড়াতাড়ি চাওয়ালাকে পয়সা দিয়ে নিজের জায়গায় উঠে এসে ব'স্লেন। তখন একটী সুবেশ সুন্দর যুবা দ্রুতপদে এসে গাড়ীতে উঠলেন আর কুলীর হাত থেকে তাড়াতাড়ি হ্যান্ডব্যাগ বিছানা বাক্স টেনে নিয়ে গাড়ীতে রাখলেন। ততক্ষণে গাড়ী চ'ল্‌তে আরম্ভ করেছে। সব গুছিয়ে রেখে আমার স্বামীর পাশে ব'সে প'ড়ে কপালের ঘাম রুমালে মুছে, তিনি ব'ল্‌লেন "আর একটু হ'লেই ট্রেন ফেল হ'য়েছিলুম আর কি !"

ইনি ব'ল্‌লেন "সময়ের ঠিক ছিল না বুঝি ?"

যুবক ব'ল্লেন "আজ্ঞে না, পথে একটী পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে কথা কইতে কইতে দেরী হ'য়ে গেল। প্রথম ঘন্টা দিতে তবে হুঁস হলো ; ছুটে এলুম।"

"কোথায় যাবেন আপনি ?"

"মধুপুর, আপনি ?"

"আমিও মধুপুর যাচ্ছি।"

"বেশ, বেশ, তাহ'লে তো ভালই হ'লো, সেখানে বেশ থাকা যাবে। জানাশোনা হয়ে রইলো আপনি পূজার ছুটিতে যাচ্ছেন।"

"না এখনও আমার ছুটির দেরী আছে, শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে তাই আমি আগেই ছুটি নিয়েছি। আপনার পূজোয় ছুটি হ'য়েছে বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ছুটি হ'য়ে গেছে। হাইকোর্ট অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ছুটিতে একবার বর্দ্ধমান ঘুরে এলাম। সেইখানে আমার বাড়ী কিনা।"

"ভালো, ভালো, আপনার কি করা হয় ?"

"আমি এই এক বছর হ'লো ব্যারিষ্টার হ'য়ে হাইকোর্টে প্রাক্‌টিশ ক'রছি।"

"আপনার নামটী জান্‌তে পারি কি ?"

"আমার নাম অমলকুমার বসু, আপনার ?"

"আমার নাম অতুলচন্দ্র বসু।"

যুবক অমলকুমার হেসে ব'ললেন, "যখন স্বজাতি এবং স্বগোত্র তখন আজ থেকে

আপনি আমার দাদা হলেন, কেমন রাজী আছেন তো ?"

আমার স্বামী বললেন "নিশ্চয়ই, এমন একটি ভাই কে না আকাঙ্ক্ষা করে বলুন ?" অমলবাবু আবার ব'ললেন "তাহ'লে আপনি আর আমায় 'আপনি' ব'লবেন না।"

ইনিও তাঁর পিঠ চাপড়ে সস্নেহে ব'ললেন।

"আচ্ছা ভাই, সেই কথাই রইলো।

"দাদা, আপনি কি করেন ?"

"আমি ভাই আপাততঃ আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কলকাতায় তোমার বাড়ী কোথায় অমল ?"

"আমার বাড়ী বালিগঞ্জে, আপনার বাড়ী কোথায় দাদা ?"

"আমার বাড়ী ভবানীপুর রসারোডে।"

"যাক্ তা'হলে তো কাছাকাছিই বাড়ী ব'লতে হবে। কলকাতায় গেলে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হবার আশা রইলো।"

"বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন অমল ?"

"দেশের বাড়ীতে বাবা, মা, দাদা আর বৌদিদি আছেন। বৌদির একটী খুকী। বালীগঞ্জের বাড়ীতে থাকি আমি, আর থাকে আমার ঠাকুর চাকর। বাবা, মা, দাদা, বৌদিদি মাঝে মাঝে এসে থাকেন। দাদার বেশী এলে চলে না, তাঁকে দেশের জমিদারী দেখাশোনা ক'রতে হয়। বাবার বয়স হ'য়েছে, তিনি আর পেরে ওঠেন না। আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন দাদা ?"

"আমি আর উনি, অর্থাৎ তোমার বৌদিদি, তাঁর কনিষ্ঠা সহোদরা মিস্ অমলারাণী, এই মণ্টুবাবু আর লোকজন চাকরবাকর। দেশের বাড়ীতে আছেন আমার বাবা আর মা। আমার শ্বশুর শাশুড়ী মৃত্যুকালে তাঁদের ছোট মেয়েটিকে তার একমাত্র অভিভাবিকা দিদির হাতে সমর্পণ ক'রে যান। তুমি মধুপুরে কোথায় বাড়ী ঠিক করেছ অমল ?"

"বাড়ী এখনও ঠিক করিনি দাদা, প্রথমে গিয়ে ডাকবাঙ্গালায় উঠবো তারপর একটা মনের মত বাড়ী দেখে শুনে নেবো। আপনাদের বাড়ী নিশ্চয়ই ঠিক আছে।"

"হ্যাঁ ভাই, বাড়ী আগেই ঠিক করা আছে। মেয়েদের নিয়ে আসা, তাই আগেই ঠাকুর চাকর এসে গেছে, তারা সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখবে। তা তুমি এক কাজ কর না অমল, তুমিও আমাদের বাড়ীতে চল না ; সেখানে বেশ থাকা যাবে এখন এক সঙ্গে।"

"আপনাদের অসুবিধা হবে যে দাদা।"

"আমার অসুবিধা, কিছুমাত্র না।"

"মেয়েদের হ'তে পারে তো ?" উনি আমাদের দিকে চেয়ে হেসে প্রশ্ন ক'রলেন, "কিগো, তোমাদের কিছু অসুবিধা হ'বে ?"

আমি মৃদু কৌতুকে ব'ললুম "কিছুমাত্র না।"

ইনি তখন অমলকে ব'ললেন "দেখলে ভায়া. ওঁরা হলেন অবলা নারী, গুরুজনের মতেই ওঁদেব মত, অন্য মত ওঁদের নেই।" খুশীভরা মুখে অমল ব'ললে "আপনি ভারী চমৎকার লোক দাদা।" স্বামী বললেন "তুমিই বা কম যাও কিসে ? তোমার নীরস দাদাটিকেও তুমি সরস ক'রে তুলেছো।"

অমলকুমারের কথাবার্ত্তায় হাসিগল্পে এমন একটা মিষ্টতা ছিল, যে, সে সকলকেই অল্প সময়ের মধ্যে আপনার ক'রে নিতে পারতো। তার প্রাণখোলা হাসিতে তার সরল প্রাণের

নিঃসন্দেহ পরিচয় পাওয়া যেতো। এই পথে-পাওয়া অতিথিটিকে লাভ করে আমরা খুব আনন্দ পেলুম। আমাদের সেকেণ্ড-ক্লাস কামরায় আর কেউ ওঠে নি। এঁর আর অমলকুমারের সরস আলাপে আমাদের সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা জানতেই পারলুম না। মণ্টু তো গাড়ীর মধ্যেই তার অমলকাকার কোলটি দখল ক'রে ব'সলো।

আমরা মধুপুরে পৌঁছুতে অমল আর তার চাকর দু'জনে মিলে আমাদের সব জিনিষপত্তর এমন গুছিয়ে নিলে যে আমাদের আর কিছু দেখতে শুন্‌তে হ'লো না। বাড়ীতে গিয়েও তাই! গৃহপ্রবেশ ক'রেই এঁকে আর অমলকে চা ক'রে দিলুম। তাঁরা মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার আর চা খেয়ে বাগানে চেয়ার পেতে ব'সে গল্প ক'রতে লাগলেন, মণ্টু বাগানে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াতে লাগলো। ততক্ষণে আমি আর অমলা দুজনে সব গোছগাছ ক'রে নিলুম। ঠাকুর আগেই রান্না চড়িয়ে দিয়েছিল।

মধুপুরে আমাদের দিনগুলি বেশ সুখে শান্তিতে কাট্‌ছিলো। অমলকে আর মোটেই এখন পর ব'লে মনে হয় না। সে আমাদের ঘরের লোকেরই সামিল, নিজের দেওরের মতই হ'য়ে গেছে। সেও আমায় নিজের বৌদিদির মতই শ্রদ্ধাভক্তি, আমার সঙ্গে সসম্ভ্রম হাস্যপরিহাস করে। অমলা আগে অমলের সামনে বেরুতে লজ্জা ক'রতো, কিন্তু এখন আর করে না, আমাদের সঙ্গে বসে, গল্পে যোগ দেয়, গান গেয়ে শোনায়। অমলা ম্যাট্রিক পাশ ক'রেছিল, দেখতেই সে ছিল অপরূপ সুন্দরী। বাবা, মা তাকে ভারী ভালবাসতেন, কিন্তু তার কপালক্রমে সেই ভালবাসা বেশীদিন সে ভোগ ক'রতে পেলে না। সে ছিল রূপে গুণে লক্ষ্মী, ভারী শান্ত আর নম্র। সে জন্যে সকলেরই সে প্রিয় ছিল। আমি তাকে যারপরনাই স্নেহ ক'রতুম, সেও ছিল দিদি-অন্ত প্রাণ। আমার স্বামী তাকে সহোদরার মতই ভালবাসতেন, সেও তাঁকে বড় ভায়ের মতই দেখতো। মণ্টুবাবু ছিল তার নয়নের তারা, সে চব্বিশ ঘন্টাই তাকে নিয়ে থাকতো। নাওয়ান, খাওয়ান, ঘুম পাড়ান সবি ক'র্‌তো অমলা, কিছুই আমায় দেখতে হতো না। মণ্টুও ছিল তার পরম ভক্ত। সে নইলে মণ্টুর কিছুই পছন্দ হ'তো না। এম্‌নি ক'রে আমাদের মধুপুরে বেশ সময় কাট্‌ছিল। রোজ নোতুন নোতুন জায়গায় বেড়ান হ'তো, কোনোদিন ঝাঝা, কোনোদিন দেওঘর, কোনোদিন শিমুলতলায় যাওয়া হ'তো। কোনোদিন বা পিক্‌নিকের ব্যবস্থা হ'তো।

একদিন আমরা মাঠ দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ একটা মোষ, বোধহয় অমলার রঙীন কাপড় দেখে, ভীষণবেগে আমাদের তাড়া ক'রে এলো। আমরা প্রাণভয়ে ছুটতে লাগলুম। ছুটতে ছুটতে যখন আমরা ক্লান্ত হোয়ে প'ড়েচি, মোষটাও প্রায় অমলার কাছে এসে পড়ে পড়ে হয়েছে, সেই সময় অমল বিদ্যুৎগতিতে মোষের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সজোরে তার শিং দুটো ধ'রে দিলে পেছনে এক ঠেলা। আমরা ততক্ষণে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাঁড়ালুম।

ইনি আমাদের নির্ব্বিঘ্ন দেখে অমলকে সাহায্য কর্ত্তে ছুটে গেলেন। অমলের গায়ে জোর ছিল খুব, তাই তার ঠেলা খেয়ে মোষটা ভয় পেয়ে ভ'ড়কে গিয়েছিল। পরক্ষণেই কিন্তু সে অমলকে একটা ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে অমল প'ড়ে গেল, একটা পাথরে মাথা লেগে তার মাথা কেটে রক্ত প'ড়তে লাগলো, পা'টাও ছ'ড়ে গেল। হাতটা তার আগেই একটু জখম হয়েছিল।

স্বামী ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিলেন। গায়ের কাপড় ভিজিয়ে ক্ষতস্থানের রক্ত মুছে দিয়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সে দিন রাতেই অমলের খুব জ্বর এলো। সেই

জ্বর ক্রমে বিকারে দাঁড়ালো। আমরা প্রাণপণে তার সেবা শুশ্রূষা ক'রতে লাগলুম। সব বড়ো ডাক্তারকেই তার জন্যে ডাকা হোলো। তাকে বাঁচাতে গিয়েই এই ব্যাপার ঘ'টলো ব'লে অমলা দুঃখে কাতর হোয়ে প'ড়লো। সে এক রকম আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে অমলের সেবায় প্রাণ ঢেলে দিলে। টেলিগ্রাম পাঠাতে, অমলের বাবা, মা, দাদা, বৌদি সকলেই এসে উপস্থিত হ'লেন। অনেক ক'রে সে যাত্রা ভগবানের আশীর্ব্বাদে অমল রক্ষা পেলে।

অমলার সেবা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে সকলেই তাকে ধন্য ধন্য ক'রতে লাগ্‌লো। অমলের মা খুব চমৎকার মানুষ। অমলের বৌদিদি যেন দেখনহাসি, মুখে তাঁর সব সময়ে হাসি লেগেই আছে। মণ্টুর সঙ্গে তার খুকুর খুব ভাব হ'য়ে গেছে। সমস্তক্ষণ দুজনে এক সঙ্গে খেলাধূলা করে।

অমল সেরে গেলে, অমলের মা আমাদের সকলকে নিয়ে একদিন বৈদ্যনাথে গিয়ে অমলের সেরে ওঠার জন্য পূজো দিয়ে এলেন। তারপর অমলের মা অমলার রূপে গুণে এমন আকৃষ্ট হলেন যে একদিন আমায় ডেকে ব'ললেন "দেখ মা, তোমার বোন্‌টিকে আমায় দিতে হবে। আমার অমলের সঙ্গে ওর বে দেবো।" ভাবলুম আমার প্রার্থনা কি ভগবান শুন্‌লেন, আমার বাপ-মা-হারা আদরের বোনটির ভাগ্যে কি সত্যিই এমন ঘর, বর, শ্বশুর, শাশুড়ী লাভ হবে ? এ যে স্বপ্নের অতীত।

আমি আনন্দে কেঁদে ফেললুম। ব'ললুম, "মা আপনি যে দয়া ক'রে আমার বোন্‌টিকে পায়ে স্থান দিতে চাচ্ছেন, সে তো তার পরম সৌভাগ্য।" তিনি সস্নেহে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "ছিঃ মা, ওকথা কি বলতে আছে ? আমার অমলা কি পায়ে রাখবার জিনিষ ? ওযে বুকে ক'রে রাখবার নিধি। সবি ভবিতব্য, সবি ভগবানের হাত ; আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।" আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে অমলের সঙ্গে অমলার বিয়ে দেবার কত কল্পনা জল্পনা করেছি ; কিন্তু সে কথা প্রকাশ ক'রে বলতে সাহস পাইনি। যাই হোক, এতদিনে আমাদের সে আশা মিট্‌লো। কলকাতায় ফিরে গিয়ে অমল-অমলার শুভবিবাহ হ'য়ে গেল।

আমি আড়ি পেতে শুনেছিলুম ফুল-শয্যার রাতে অমলা অমলকে জিজ্ঞাসা ক'রছে, "আচ্ছা, এবার মধুপুরে গিয়ে কে জিত্‌লো বলো দেখি।"

অমল হেসে উত্তর দিলে, "কে ? বল না।" অমলা বললে "আমি।"

"কিসে ?"

"তোমার মত দেবদুর্ল্লভ স্বামী পেয়ে।"

আমার মাতাপিতৃহীন বোন্‌টির সুখে আমার চোখদুটি আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠেছিল।

শ্রীতমাললতা বসু

গিরিকা

১

সারাদিন পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরে জলযোগান্তে দক্ষিণের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে গোষ্ঠবিহারী মিত্র মুখে গড়-গড়ার নলটা দিয়েছেন, এমন সময় স্ত্রী মন্দাকিনী উপস্থিত বললেন, "একটা কথা আছে।"

পাটের দালালী ক'রে গোষ্ঠবিহারী যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন তাতে একটা বড় জমিদারি কিনে রাজাবাহাদুর খেতাবের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্ত্রী মন্দাকিনী আধুনিক চলনের নারী ; পুত্রকন্যার উচ্চ শিক্ষার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। গোষ্ঠবিহারীর দুই পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ প্রভাতনাথ গ্লাসগোয় এঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে ; কনিষ্ঠ প্রদোষনাথ হেয়ার স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসে, এবং কন্যা মণিমালা বেথুন কলেজে থার্ডক্লাসে পড়ে।

স্ত্রীর কথা শুনে গোষ্ঠবিহারী বুঝলেন, কথা মানে অনুরোধ ; বল্‌লেন, "কি কথা বল ?"

একটু চিত্তদ্রবকারী হাসি হেসে মন্দাকিনী বল্‌লেন, "মণির ম্যাট্রিক্ দেবার ত আর বছর তিনেক রইল ; তার পড়ার একটু ভাল ব্যবস্থা না করলে ভাল ক'রে পাশ করবে কেমন ক'রে ? মণির স্কুলের একটি টিচারকে দিয়ে আমি একটি মেয়ে জোগাড় করেছি। মেয়েটি প্রাইভেটে বি, এ, দেবে। ভারি চমৎকার মেয়ে ; রূপে যেমন লক্ষ্মীপ্রতিমাখানি, কথাবার্ত্তা তেমনি মিষ্টি। দেখবে ?"

"বাড়িতে আনিয়েছ নাকি ?"

"আনিয়েছি।"

গড়-গড়ায় দুটো লম্বা লম্বা টান দিয়ে গোষ্ঠবিহারী বল্‌লেন, "মাইনে কত দিয়ে হবে ?"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "যোগ্যতা হিসেবে সে এমন বেশি কিছুই নয়। খাওয়া, থাকা আর মাসে মাসে কুড়িটাকা হাত খরচ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গোষ্ঠবিহারী বল্‌লেন, "থাকা ! সে আমাদের বাড়িতে থাক্‌বেও না কি ?"

"থাকাটাই ত' তার সব চেয়ে বেশি দরকার। মামার বাড়ি থেকে লেখাপাড়া করত—মামা কিছুদিন হ'ল মারা যাওয়ার কলকাতার বাসা উঠে গেছে। আত্মীয় বল্‌তে আছে এক দূর সম্পর্কের জেঠা—তিনি জবাব দিয়েচেন আশ্রয় দিতে পারবেন না—বোধ হয় পাছে বিয়ের খরচ ঘাড়ে পড়ে সেই ভয়ে। কোনো ভদ্রপরিবারে আশ্রয়ই তার সব চেয়ে বেশি দরকার।"

গোষ্ঠবিহারী আর না ব'লে গড়-গড়ায় আবার বড় বড় টান দিতে লাগলেন। লক্ষণ শুভ অনুমান ক'রে মন্দাকিনী মেয়েটিকে এনে হাজির করলেন।

নত হয়ে গোষ্ঠবিহারীর পদধূলি গ্রহণ ক'রে মেয়েটি যখন সোজা হ'য়ে দাঁড়াল তার

মনীয় মূর্ত্তির অপরিসীম মাধুর্য্যে গোষ্ঠবিহারীর চিত্ত দীপ্ত হ'য়ে উঠল।
"তোমার নাম কি মা ?"
সুমিষ্ট কণ্ঠে মেয়েটি বল্লে, "গিরিকা। গিরিকা বসু।"
গোষ্ঠবিহারী মনে মনে বল্লেন, "গিরিকা না হয়ে গিরিজা হ'লে মনে হ'ত উমাই বুঝি রে এস!" মুখে বল্লেন, "আচ্ছা মা, তুমি মণিকে পড়াবে।"
স্থির হ'য়ে গেল পরদিন জিনিষ-পত্র নিয়ে গিরিকা আস্‌বে।

সন্ধ্যার পর প্রদোষ বাড়ি আস্‌তেই মণিমালা তার আছে উপস্থিত হয়ে বল্লে, "শুনেছ মজদা, আমার টিচার আমাদের বাড়িতেই থাক্‌বেন। একটু আগে এসেছিলেন। কাল একেবারে জিনিষ পত্র নিয়ে আস্‌বেন। নাম কি জানো ?—গিরিকা ; গিরিকা বসু।"
অবহেলা ভরে প্রদোষ বল্লে "গিরিকা আবার মেয়েমানুষের নাম হয়! যা তা!"
চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মণিমালা বল্লে, "যা তা কি গো ? বেশ মিষ্টি নাম।"
প্রদোষ বল্লে, "একটুও মিষ্টি নয়—বিশ্রী। তা হ'লে দেশের মধ্যে গিরিডিও খুব মিষ্টি নাম ?" ব'লে প্রদোষ হেসে উঠল।
অপ্রস্তুত হ'য়ে মণিমালা বল্লে, "মিষ্টিই ত।"
"মধুপুরের চেয়েও মিষ্টি ?"
আর তর্ক চল্‌ল না ;—মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ক'রে মণিমালা বল্লে, "খবরদার মেজদা, গিরিকা দিদির কাছে গিরিডির নাম মুখে এনো না।"
উৎফুল্ল হয়ে প্রদোষ বল্লে, "মুখে আন্‌ব না। খুব আন্‌ব। বল্‌ব, গিরিকা বসুর বাড়ী, গিরিডি নগরী।"
"চল্লুম মাকে বল্‌তে।" ব'লে মণিমালা সক্রোধে প্রস্থান করলে।
পাঁচ মিনিট পরে প্রদোষ চেঁচিয়ে উঠল, "ইঁদুর! ইঁদুর! নেঙটি ইঁদুর! গিরিকা মানে নেঙটি ইঁদুর!"
দূর থেকে প্রদোষের হাতে একটা মোটা অভিধান দেখে মণিমালা আরক্ত মুখে ছুটে এল। "কক্ষণো নয়!"
"এই দেখ!"
প্রদোষের তর্জ্জনীর উপরের লেখা পাঠ ক'রে মণিমালার মুখ পাংশু হয়ে গেল! সত্যিই গিরিকা মানে নেঙটি ইঁদুর। পরমুহূর্ত্তেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "হাত সরাও, দেখব নীচে কি লেখা আছে!"
শক্ত ক'রে অভিধানের উপর হাত চেপে রেখে প্রদোষ বল্লে, "এই ত—নেঙটি ইঁদুর।"
খপ ক'রে প্রদোষের হাত থেকে অভিধান খানা টেনে নিয়ে লুকানো অংশ প'ড়ে দেখে মণিমালা ব'লে উঠল, 'তবে ?"
"তবে আবার কি ? নেঙটি ইঁদুরও ত হয়।"
"নেঙটি ইঁদুরের কথাও তুমি গিরিকা দিদিকে বল্‌বে নাকি ?"
"বলব না ? বল্‌ব, গিরিকা বসুর ঘর, গিরিডি বিবর। বিবর মানে গর্ত্তো।"
রুষ্ট মুখে মণিমালা বললে, "জানি। কিন্তু দেখ মেজদা, তুমি যদি গিরিকা দিদির কাছে গিরিডি কিম্বা ইঁদুরের নাম মুখে আনো তা হ'লে আর যদি কখনো তোমার পিট চুল্‌কে

দিই।"

এ দণ্ডটা প্রদোষের পক্ষে সত্যই গুরুতর,—বল্‌লে, "আচ্ছা, আজ যদি আধঘণ্টা পিট চুলকে দিস্, তা হলে বলবে না। কিন্তু পাকা আধঘণ্টা—ঘড়ি ধ'রে।"

মণিমালা স্বীকৃত হ'ল। বল্‌লে, "মেজদা তুমিও গিরিকা দিদির কাছে একটু একটু পোড়ো না ?"

বিস্ময়ে প্রদোষ আকাশ থেকে প'ড়ে বল্‌লে, "মেয়েমানুষের কাছে আমি পড়ব কিরে !"

"মেয়েমানুষ কি ?—বি, এ, পড়েন।"

কথাটা শুনে প্রদোষ একটু দ'মে গেল—পরমুহূর্ত্তেই জোর ক'রে বল্‌লে, "পড়ুক বি এ। ও মেয়েমানুষের বি এ।"

মণিমালা বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, "বি, এ, আবার মেয়েমানুষের বেটাছেলের কি ?"

বিজ্ঞভাবে প্রদোষ বল্‌লে, "মেয়েমানুষের বি, এ, সহজ হয়। আচ্ছা, তুই ত থার্ডক্লাসে পড়িস, বল্ দেখি It is too hot to-day—এর correct ইংরিজি কি হবে ?"

মণিমালা মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগল। বল্‌লে, "এ ত এখনি আমি বদলে দিতে পারি মেজদা, কিন্তু আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, I have an important business to doর correct ইংরিজি কি, তুমি কি বল্‌বে বল দেখি ?"

জিজ্ঞাসা করলে যে সবিশেষ বিপদ তাতে প্রদোষের সন্দেহ ছিল না ; বল্‌লে "তোর ত বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েচে দেখচি ! তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিস !"

সহাস্য মুখে মণিমালা বল্‌লে, "আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করব না।"

২

পরদিন স্কুল থেকে এসে বই রাখতে গিয়ে প্রদোষ দেখলে পড়বার ঘরে চেয়ারের উপর ব'সে টেবিলের উপর হেলান দিয়ে গিরিকা জানলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েচে। তার মুখের বাঁ দিকের মাত্র আধখানা দেখা যাচ্ছে—কিন্তু তারি শক্তি কত ! এক পা চৌকাঠের ভিতরে আর এক পা বাইরে রেখে প্রদোষ থমকে দাঁড়ালো।

একটু যা পায়ের শব্দ হয়েছিল তাইতে গিরিকা ফিরে দেখলে একটি ষোল সতের বছরের লম্বা, ছিপছিপে, সুশ্রী শ্যামবর্ণ ছেলে হাতে একগোগ্র বই নিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখোচোখী হতেই প্রদোষের মুখ লাল হয়ে উঠল।

মৃদু হেসে গিরিকা বল্‌লে, "ঘরখানি অধিকার ক'রে বসেচি। বড় অসুবিধা হবে,—না ?"

একটু বিমূঢ় ভাবে স্খলিত স্বরে প্রদোষ বললে, 'না, এমন কি আর—"

গিরিকা বল্‌লে "হ'লে উপায়ই বা কি ? আশ্রয় যখন দিয়েছ, তখন কষ্ট সহ্য করতেই হবে।"

প্রদোষের মুখ আবার লাল হ'য়ে উঠল ; বল্‌লে, "না, না, কষ্ট কি ?"

গিরিকা বল্‌লে, 'দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ভেতবে এসে বসো না ? বাড়ির সকলেরই সঙ্গে আলাপ হয়েচে খালি তোমাকেই এ পর্য্যন্ত দেখিনি। তোমার কথা কিন্তু অনেক শুনেচি মণিমালার কছে। ঘরে এসো।"

মোটের উপর সমস্ত ব্যাপারটায় প্রদোষের ভারি সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল—কিন্তু এ আহ্বান

প্রত্যাখ্যানও করতে পারলে না। ঘরে প্রবেশ ক'রে একখানা চেয়ার একটু দূরে টেনে নিয়ে বসল।

গিরিকা আর কোনো কথা না ব'লে চুপ ক'রে ব'সে রইল। এক মিনিট, দু-মিনিট, তিন মিনিট কেটে গেল, কেনো শব্দটি পর্য্যন্ত নেই। প্রদোষ বিস্ময়ে অধীর হয়ে মনে মনে বল্‌তে লাগল, 'আচ্ছা লোক যা হ'ক ! ঘরে ডেকে এনে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন ! এ রকম চুপ ক'রে কতক্ষণ ব'সে থাকা যায় !' তারপর হঠাৎ তার তার মনে হ'ল প্রতিবারে গিরিকাই যে কথা আরম্ভ করবে তারই কি বা কি মানে আছে, সেও ত আরম্ভ করতে পারে, বিশেষত তাদেরি গৃহে, এমন কি তারি ঘরে, গিরিকা যখন অতিথি।

একটু কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে প্রদোষ বল্‌লে, "আজ দুপুর বেলা তুমি এলে ?"

ফিরে তাকিয়ে গিরিকা বল্‌লে, "হ্যাঁ।" সমস্ত মুখখানা তার কৌতুকের মিষ্ট হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ঠিক যেন সন্ধ্যা-মলিন ফুল বাগানের উপর অকস্মাৎ এক ঝলক সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল। প্রদোষের অসঙ্কোচ তুমি সম্বোধন এতই তার মিষ্টি লেগেছিল।

ঘরের এক পাশে একটা খাট পেতে তার উপর গিরিকার শয্যা রচিত হ'য়েছিল। খাটের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রদোষ বল্‌লে, "এই ঘরেই রাত্রে শোবে ?"

স্মিতমুখে গিরিকা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"বি, এ দেবে এবার ?"

গিরিকা হেসে ফেল্‌লে ; বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু সে-সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন, যার উত্তর তুমি নিজেই জানো। এমন কোনো কথা জিজ্ঞাসা কর, যার উত্তরে তুমি নতুন কোনো কথা শুন্‌তে পাবে।"

লজ্জিত হ'য়ে প্রদোষ শুধু একটু হাসলে, কিছু বল্‌লে না। একটু পরেই সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

গিরিকা বল্‌লে, "এরি মধ্যে চল্‌লে ? আর একটু বস্‌বে না ?"

প্রদোষ বল্‌লে, "মুখ হাত ধুয়ে জলটল খেয়ে আবার না হয় আস্‌ব অখন।"

ব্যস্ত হ'য়ে গিরিকা বল্‌লে, "ও মা সত্যি ! সে কথা আমার একেবারে মনেই নেই। যাও, যাও শীগগীর যাও !"

বইগুলি হাতে তুলে নিজে প্রদোষ গমনোদ্যত হ'ল, তারপর কি মনে ক'রে পিছন ফিরে গিরিকার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "বইগুলো খানিক ক্ষণের জন্যে এখানে রাখলে কোন অসুবিধে হবে ?" বোধ হয় মনের নিভৃত প্রদেশে উদ্দেশ্য ছিল আর একবার গিরিকার ঘরে আসবার পথ রেখে যাওয়া।

গিরিকা বললে, "খানিকক্ষণের জন্যে কেন, বরাবরের জন্যেও রাখলে কোনো অসুবিধে হবে না। টেবিলের উপর রেখে দাও।"

টেবিলে বইগুলি স্থাপিত ক'রে প্রদোষ প্রস্থান করলে।

পিছন থেকে গিরিকা ডাক্‌লে, "প্রদোষ ! প্রদোষ বাবু !"

দ্বারের কাছ থেকে একটু ফিরে এসে প্রদোষ। বল্‌লে, "কি ?"

অত্যন্ত গম্ভীর মুখে গিরিকা বল্‌লে, "বই রেখে যাচ্ছ যাও, কিন্তু এ ঘরে নেঙটি ইঁদুরের

উপদ্রব আছে।”

প্রদোষ বল্‌লে, “নেঙটি ইঁদুর ?—না, না, একেবারেই”—তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়ে আসল কথাটা বুঝতে পেরে প্রদোষের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, মুখ একেবারে টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠল।

গিরিকা হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, “যাও, যাও, তোমার কোন ভয় নেই। গিরিডি বিবরের নেঙটি ইঁদুর তোমার বই কাট্‌বেনা—হয়ত একটু ঘাঁট্‌বে।”

ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যথিত স্বরে প্রদোষ বল্‌লে, “গিরিকা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ ?”

গিরিকা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, “ওমা, তাও কখন করি ! পরিচয় পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে অভিধান খুলে নামে মানে বার করে তার ওপর কখনো রাগ হয় ?”

“এ সত্যি কথা ?”

“একেবারে খাঁটি সত্যি কথা।”

“গিরিকার কিন্তু ভাল মানেও আছে।”

“নেঙটি ইঁদুরই গিরিকার সব চেয়ে ভাল মানে। তুমি এখন যাও, মুখ বড্ড শুকিয়ে গিয়েছে।”

আর কোনো কথা না ব'লে প্রদোষ ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, তারপর ত্বরিত বেগে মণিমালার কাছে উপস্থিত হ'য়ে একেবারে তার বিলম্বিত বেণী টেনে ধ'রে বল্‌লে, “ষ্টুপিড !”

এই অতর্কিত আক্রমণে কাতর হ'য়ে মণিমালা আর্ত্তস্বরে ব'লে উঠল, “আঃ লাগছে ! ছাড়ো, ছাড়ো !”

আর একটু টান দিয়ে প্রদোষ বল্‌লে, “ছাড়ি, কি ছিঁড়ি দেখাচ্ছি ! কেন তুই গিরিকাকে নেঙটি ইঁদুরের কথা বলেছিস্‌ বল।”

মণিমালা প্রদোষের কথা শুনে হেসে ফেল্লে, বল্‌লে, “এরি মধ্যে সে কথা শোনা হয়েচে ? বিউনি ছাড়ো বলছি।”

বেণী ছেড়ে দিয়ে সক্রোধে প্রদোষে বল্লে, “বল্‌ !”

স্মিতমুখে মণিমালা বল্‌লে, “কথায় কথায়। কিন্তু গিরিকাদিদি ত সে কথায় একটুও রাগ করেননি।”

তর্জ্জন ক'রে প্রদোষ বল্লে, “আর যদি করত ?”

“তা হ'লে তোমার কি ক্ষতি হ'ত বল ?”

প্রশ্ন কঠিন। উত্তর দেবার কোনো চেষ্টা না ক'রে বিকৃতস্বরে প্রদোষ মণিমালার প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করলে, “তা হ'লে তোমার কি ক্ষতি হ'ত বল ?”

প্রদোষের ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখে মণিমালা ভুরু কুঁচকে হাস্‌তে লাগল।

দেখে প্রদোষের পিত্ত উঠল জ্বলে। “মেয়ে মানুষের বি এ, পাশের কথাও বলেছিস ?”

পরিতাপের ব্যথায় মণিমালার মুখ হ'য়ে গেল। দুঃখার্ত্তস্বরে বল্‌লে “যাঃ ! একেবারে ভুলে গেছি !”

অত্যন্ত কঠোর ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রে প্রদোষ বল্‌লে, “খবরদার ও কথা বলবিনে।”

ততোধিক তাচ্ছিল্যভাবে মণিমালা বললে, "নিশ্চয়ই বলব। তুমি মেয়েমানুষের বিদ্যে হয় না ব'লে নিন্দে করবে,—আর আমি বলব না ? তুমি বল, গিরিকাদিদির কাছে রোজ এক ঘণ্টা ক'রে পড়বে, তা হ'লে বলব না।"

প্রদোষ সরবে আস্ফালন ক'রে উঠল, "কক্ষণো পড়ব না! বেটা ছেলে হ'য়ে মেয়েমানুষের কাছে পড়া পড়ব ? তার চেয়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে পানের দোকান ক'রে বস্‌ব সেও ভাল।"

"তা হ'লে ব'লে দেব।"

"দিস্ ব'লে ; আমি ভয় করিনে। বাড়িতে ভদ্রলোক এসেছে—

মণিমালা হেসে গড়িয়ে পড়ল—"ভদ্রলোক কি মেজদাদা ? ভদ্রমহিলা।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, ভদ্রমহিলা।"

এমন সময় দেখা গেল অদূরে সেই ভদ্রমহিলাই হাস্‌তে হাস্‌তে অগ্রসর হচ্চেন। আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে ক্রুদ্ধ অথচ চাপা গলায় প্রদোষ বল্‌লে, "আধঘণ্টা ক'রে পড়ব। খবরদার ও কথা বলিস্‌নে !"

"জব্দ !"

মণিমালার প্রতি একটা ক্রূর কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে প্রদোষ স'রে পড়ল।

৩

মাস খানেক পরে একদিন সন্ধ্যা বেলায় মন্দাকিনী তাঁর স্বামী হাস্‌তে হাস্‌তে বলছিলেন, "হ্যাঁগা, তোমার ছেলে যে গিরিকাকে নিয়ে ক্ষেপে উঠলো ! একি ব্যাপার বল দেখি ? প্রেম নয় ত ?"

গোষ্ঠবিহারী গড়গড়ায় একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, "কিন্তু বল তার ঠিক নেই। গিরিকা হ'ল পদোর চেয়ে তিন বছরের বড়।"

মন্দাকিনী একটু হেসে বললেন, "হলেই বা। এ কি তোমাব তৌল-বাটখারা ? বয়সের হিসেবে এর হিসেব সব সময় চলে না।"

নলটা মুখ থেখে খুলে নিয়ে গোষ্ঠবিহারী বল্‌লেন, "বেগতিক দেখ ত মেয়েটাকে না হয় ছাড়িয়ে দাও।" এটা কিন্তু অন্তরের কথা নয়।

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "ওকথা মুখে আন্‌লে তোমার ছেলেমেয়ে দুজনে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে। তা ছাড়া মেয়েটা সত্যিই বড় ভাল। ও-যে মেয়ে তাই সয়, অন্য মেয়ে হ'লে পদোর সেবা যত্নের পীড়নে মরিয়া হ'য়ে উঠত। তা ছাড়া এই এক মাসে মণির যা উন্নতিটা করিয়েচে তা যদি দেখতে।"

স্বামী স্ত্রীতে যখন এইরূপ আলোচনা চলছিল তখন গিরিকার ঘরে প্রদোষ ঐকান্তিক আগ্রহে গিরিকাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "আচ্ছা গিরিকা, তুমি সর্ব্বদা অত কি ভাবো ?"

গিরিকা স্মিতমুখে বল্‌লে, "এম্‌নি—যা তা।"

"যা তা ?—মিছিমিছি ভাবো।"

"না, সত্যি সত্যি ভাবি।"

ব্যগ্র হ'য়ে প্রদোষ বল্‌লে, "না, সে কথা বল্‌চিনে। কিছু নিয়ে ভাবো কি না তাই

জিজ্ঞাসা করছি।"

"কখনো কিছু নিয়ে ভাবি, কখনো বা কিছু দিয়ে ভাবি।"

সবিস্ময়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "দিয়ে ভাবা আবার কি?"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "নিয়ে ভাবার উল্টো।"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বল্‌লে, "তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারিনে গিরিকা।"

"তার মানে আমার সব কথা বোঝাবার ক্ষমতা নেই।"

"কিম্বা আমার সব কথা বোঝবার ক্ষমতা নেই।"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "তাও হ'তে পারে।"

"আচ্ছা গিরিকা, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হয়?"

"হয়।"

অধীর ঔৎসুক্যে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "কি খেতে ইচ্ছে হয়?"

"কোনো একটা ভাল হোমিওপ্যাথিক ওষুধ।—নক্স-ভমিকা টু হানড্রেড, কিম্বা ডল্কামারা থার্টি—এই রকম একটা কিছু।"

সভয়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কোনো অসুখ আছে নাকি?"

"আছে বৈকি।"

ব্যগ্র হ'য়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "কি অসুখ?" শরীরের, না মনের?"

"খানিকটা শরীরের, আর খানিকটা মনের।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "সে আবার কি রকম?"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "মনের জন্যে খানিকটা শরীরের, আর শরীরের জন্যে খানিকটা মনের।"

"তাতে কষ্ট কী রকম হয়?"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "কখনো পেট জ্বালা করে, কখনো বুক জ্বালা করে।"

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বল্‌লে, "আচ্ছা, তোমার একলা থাক্‌তে ভাল লাগে গিরিকা, না লোকজন থাক্‌লে ভাল লাগে?"

গিরিকা বল্‌লে, "কোনো কোনো লোক থাকার চেয়ে একলা থাক্‌তে ভাল লাগে, আবার একলা থাকার চেয়ে কোনো কোনো লোক থাকলে ভাল লাগে।"

প্রদোষ দেখলে এ প্রসঙ্গে আর বেশী অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নয়। জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, কথা কইতে ভাল লাগে, না চুপ ক'রে থাক্‌তে ভাল লাগে।"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "রোগের লক্ষণ নির্ণয় করছ নাকি প্রদোষ? কারুর কারুর সঙ্গে কথা কওয়ার চেয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তে ভাল লাগে, আবার চুপ ক'রে থাকার চেয়ে কারুর কারুর সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগে।"

এ প্রসঙ্গও নিরাপদ নয়। একবার ভারি ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞাসা করে সে কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, কিন্তু সাহস হ'ল না। উঠে প'ড়ে বল্‌লে, "চল্লুম গিরিকা।"

গিরিকা প্রদোষের মনের কথা বুঝতে পেরে হাসি-মুখে বল্‌লে, "এরি মধ্যে চল্‌লে? আমি ত বলিনি প্রদোষ, তুমি থাক্‌লে বা তুমি কথা কইলে আমার ভাল লাগে না।"

অপ্রতিভ হ'য়ে প্রদোষ বল্‌লে, "না, না, সে জন্যে নয়—এম্‌নি।" তারপর সাহস পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা গিরিকা, আমি কোন দলের ? আমি থাক্‌লে, আমি কথা কইলে, তোমার ভাল লাগে, না ভাল লাগে না ?"

গিরিকা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বল্‌লে, "তুমি একেবারে ভিন্ন দলের প্রদোষ। তুমি থাক্‌লে মনে হয় কখন যাবে, আবার গেলে মনে হয় কখন আস্‌বে। তুমি কথা কইলে মনে হয় কখন থাম্‌বে, আবার থাম্‌লে মনে হয় কখন কথা কইবে।"

এই গোলমেলে কথার অর্থ নিরূপণের জন্যে এক মিনিট নির্ণিমেষে তাকিয়ে থেকে বিমূঢ়ভাবে প্রদোষ বল্‌লে, "এরকম কেন মনে হয় ?"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "বোধ হয় মনের কোনো রকম ব্যাধির জন্যে।"

"এ সারে কি কর্‌লে ?"

"হয় ত এক ডোজ ডলকামারা খেলে।"

পরদিন বেলা বারোটার সময় একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এসে উপস্থিত। ইনি গোষ্ঠবিহারীর গৃহ-চিকিৎসক। গোষ্ঠবিহারী অফিসে, প্রদোষ মণিমালা স্কুলে, বাড়িতে কেবল মন্দাকিনী আর গিরিকা। কারো সর্দ্দি, মাথাধরা পর্য্যন্ত নেই ; কাকে দেখবার জন্যে ডাক্তার এসেছেন মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন। উত্তর এল গিরিকাকে।

চক্ষু কপালে তুলে গিরিকা বল্‌লে, "দেখ দেখি মা। প্রদোষের এ কি কাণ্ড! ঠাট্টা ক'রে কাল কি বলেছিলাম, একেবারে ডাক্তারকে খবর দিয়ে হাজির।"

মন্দাকিনী সহাস্য-মুখে বল্‌লেন, "তোমার কোনো অসুখ-টসুখ আছে না-কি ?"

"কিচ্ছু না! খুব চমৎকার আছি!"

মন্দাকিনী হাস্‌তে লাগলেন ; বললেন, "ওর কাণ্ডই ঐ রকম। যা হ'ক ডাক্তার যখন বাড়িতে এসেচেন একবার দেখাও।"

ত্রস্তভাবে গিরিকা বল্‌লে, "সে কি মা! কি দেখাব ?"

মন্দাকিনী সহাস্যমুখে বল্‌লেন, "পেট কামড়ায় চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে—এমনি যা হয় কিছু বোলো।"

গিরিকা প্রথমে প্রবলভাবে আপত্তি কর্‌লে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারের স'মনে তাকে উপস্থিত হ'তেই হ'ল। মন্দাকিনী বল্‌লেন, না হ'ল বড় খারাপ্ দেখায়।

গিরিকার নাড়ী দেখে, পেট টিপে ডাক্তার বল্‌লেন, "একবার জিভটা দেখাও ত মা।"

রাগে গিরিকার পিত্ত জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু উপায় কি ?—জিভ দেখালে। জিভ দেখ্‌তে গিয়ে ডাক্তার ঔৎসুক্যভরে ব'লে উঠলেন, "রোসা, রোসা মা, তোমার টনসিল দুটো দেখি।" একটু চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "একটা চাম্‌চে।"

অন্তরালে দাঁড়িয়ে মন্দাকিনী যুগপৎ করুণা এবং কৌতুকে মথিত হচ্ছিলেন ;—একটা চাম্‌চে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাক্তার চামচেটা গিরিকার গলার ভিতর চেপে ধরা মাত্র গিরিকা খক্ ক'রে কেশে উঠল।

পকেট থেকে রুমাল বার কোরে মুখ মুছে ডাক্তার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার কি হয় মা ?"

একটু চুপ ক'রে থেকে গিরিকা বল্‌লে, "পেট কামড়ায়।"

"খাবার আগে, না খাবার পরে ?"

"খাবার আগে।"

"ওপর পেট, না তলপেট ?"

"তলপেট।"

"ডান দিক, না বাঁ-দিক ?"

"ডান দিক্।"

এই ভাবে আরো অনেকগুলি প্রশ্ন ক'রে ডাক্তার বল্লেন, "আচ্ছা মা, তুমি ডলকামারার কথা বলেছিলে কেন? আমি ত' ডলকামারার কোনো লক্ষণ পাচ্ছি নে।"

ডাক্তারের কথায় গিরিকার মুখ টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠল।

এক মুহূর্ত্ত উত্তরের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন, "ডলকামারা এখন থাক্। আমি অন্য একটা অষুধ দিচ্ছি—খেয়ে যেমন থাকো এক সপ্তাহ পরে খবর দিয়ো—তারপর দরকার হ'লে আবার ওষুধ দেবো।"

ওষুধের বাক্স খুলে একটা ওষুধ তুলে নিয়ে ডাক্তার বল্লেন, "একবার হাঁ কর ত মা।"

গিরিকা স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণকাল ডাক্তারের দিকে চেয়ে থেকে হাঁ ক'রলে। তার জিভের উপর ডাক্তার কয়েক ফোঁটা ওষুধ ফেলে দিলেন।

গিরিকার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠ্‌ল—তা সে ওষুধের ঝাঁঝে, কি ক্রোধের ঝাঁঝে বলা কঠিন।

স্কুল থেকে এসেই প্রদোষ গিরিকার ঘরে উপস্থিত হ'ল। টেবিলের উপর ঝুঁকে গিরিকা একটা বই পড়ছিল।

পিছন থেকে প্রদোষ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ডাক্তার দেখে কি বল্লেন গিরিকা ?"

ফিরে তাকিয়ে গিরিকা তর্জ্জন ক'রে উঠল, "যাও, যাও, প্রদোষ, তুমি ভারী ছেলেমানুষ! কে তোমাকে বলেছিল ডাক্তার ডাক্‌তে ?"

"কেউ বলে নি, আমি নিজেই ডেকেছিলাম। ডাক্তার কি কর্‌লেন বল না? ডলকামারাই দিলেন ?"

গিরিকা ঠিক তেমনি ভাবে তর্জ্জন ক'রে বল্‌লে, "আরে রেখে দাও তোমার ডলকামারা! কোথা থেকে এক মানুষমারা ডাক্তার এনেছিলে—আধ শিশি স্পিরিট্ জিভে ঢেলে দিলে, দম আটকে মরি আর কি!"

দু-দুবার তাড়না খেয়ে প্রদোষের চোখ ছল-ছলিয়ে এল। দুঃখিত স্বরে বল্‌লে, "আমি বুঝতে পারি নি—আমাকে মাপ কর গিরিকা।"

গিরিকার চক্ষের কোণে হাসি উছলে উঠল;—বল্‌লে, "মাপ ক'রব কেন প্রদোষ? তোমার ডাক্তারের ওষুধ জাল। এরি মধ্যে উপরকার বোধ হয়েছে। সমস্ত দিন খালি মনে হয়েচে কখন্ তুমি আস্‌বে—আর এখন একটুও মনে হচ্চে না কখন তুমি যাবে। তা ছাড়া মনে হচ্চে, আজ সমস্ত সন্ধ্যেটা তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাব।"

"সত্যি ?"

"একেবারে।"

"আচ্ছা, আধঘণ্টার মধ্যে আমি আসচি।" ব'লে উৎফুল্ল মুখে প্রদোষ প্রস্থান করলে।

৪

এম্‌নিভাবে একটি অপরূপ ধারার মধ্য দিয়ে এ দুটি প্রাণীর নিত্যকার জীবন প্রবাহিত হ'য়ে চল্‌ল। মন্দাকিনী মাঝে মাঝে বলেন, "কিন্তু বুঝিনে বাপু! শেষকালে একটা কিছু গোলযোগ না ঘটে!" গোষ্ঠবিহারী বলেন, "ওগো না, না! তাও কখনো হয়? গিরিকার চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট!"

একদিন হঠাৎ মাস চার পাঁচ পরে হায়দ্রাবাদ থেকে একেবারে দুখানা চিঠি এসে হাজির; এক খানা গোষ্ঠবিহারীর নামে গিরিকার জেঠামহাশয়ের, অপরখানা গিরিকার নামে গিরিকার জেঠাইমার। উভয় পাত্রের মর্ম্ম,—গিরিকার সমস্ত বিবরণ শুনে হায়দ্রাবাদ কলেজের একটি প্রোফেসার বিনা পণে গিরিকাকে জীবনসঙ্গিনী করতে প্রস্তুত; মধ্যে কার্ত্তিক মাস, অঘ্রাণ মাসে বিবাহ—অতএব গোষ্ঠবিহারী যেন অন্ততঃ অঘ্রাণ মাসের প্রথম সপ্তাহে গিরিকাকে হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে দেন।

এ কথা শুনে প্রদোষের মুখ শুকিয়ে গেল—সে গিরিকার নিকট উপস্থিত হ'য়ে তার হাত চেপে ধ'রে কাতর কণ্ঠে বললে, "তোমাকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না গিরিকা! তোমার যাওয়া হবে না!"

গিরিকা হাস্‌তে লাগল; বল্‌লে, "তুমি যদি আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট না হ'তে প্রদোষ, তা হ'লে আমি না হয় তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমারি কাছে থাক্‌তাম। কিন্তু তা'ত আর হবার নয়। এমন চমৎকার সম্বন্ধটি হাত ছাড়া ক'রে শেষকালে আমার কপালে এমনটি আর যদি না জোটে? তখন?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ বল্‌লে, "কিন্তু বিয়ে যে তোমাকে কর্‌তেই হবে, তার কি মানে আছে? তুমি যদি বিয়ে না কর—এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি গিরিকা—আমিও কক্ষণো বিয়ে করব না!" ব'লে আবার গিরিকার হাত চেপে ধর্‌লে।

এবার আর গিরিকা হাস্‌তে পার্‌লে না—তার দুই চক্ষু সজল হয়ে উঠল;—স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "সত্যি প্রদোষ, বিয়ে ছাড়াও যে এতবড় একটা উপায় আছে, তা আমার মনে হয়নি। কিন্তু এতেও অনেক ভাববার কথা আছে।"

ব্যগ্রভাবে প্রদোষ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আবার কি ভাববার কথা?"

"প্রথমত ধর, মণি ত চিরকালই পড়বে না—আমার খরচ-পত্র চল্‌বে কি ক'রে?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে প্রদোষ বল্‌লে, "শোন কথা! আমিই কি চিরকাল পড়ব? আমি উপার্জ্জন কর্‌ব না?"

এবার আবার গিরিকার মুখে হাসি দেখা দিলে, বল্‌লে, "হ্যাঁ, সেও একটা ভাববার কথা বটে। যাক্‌, এখন স্কুলের সময় হয়েচে, স্কুলে যাও, পরে দুজনে মিলে সব কথা ভেবে দেখলেই হবে।"

পরদিন অতি প্রত্যুষে গিরিকার দ্বারে আঘাত পড়ল—গিরিকা! গিরিকা!

ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি দোর খুলে গিরিকা দেখলে উৎফুল্ল মুখে প্রদোষ দাঁড়িয়ে।

বিস্মিত হয়ে গিরিকা বল্‌লে, "কি প্রদোষ, এত সকালে ব্যাপার কি বল দেখি?"

সহাস্যমুখে প্রদোষ বল্‌লে, "সমস্ত রাত্রে পাঁচমিনিটও কি ঘুমিয়েচি? খালি ভেবেছি। কিন্তু অবশেষে হয়েচে গিরিকা, এখন তুমি রাজি হ'লেই হয়।"

সবিস্ময়ে গিরিকা বল্‌লে, "কি হয়েচে, কি হয়, কিছুইত বুঝতে পাচ্ছিনে প্রদোষ ! এস, ঘরে এস ! "

ঘরে গিয়ে প্রদোষ আর গিরিকা মুখোমুখী দুটো চেয়ার অধিকার ক'রে বস্‌ল। উষার অনুজ্জ্বল কিরণে সমস্ত মনোরম হ'য়ে উঠেছিল।

প্রদোষ বল্‌লে, "দাদা দিন পনেরো পরে দুমাসের জন্যে আস্‌ছে শুনেছ ত ?"

"শুনেছি !"

"দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে তোমাকে আমার ছাড়তে হয় না ; দাদাকে বিয়ে কর্‌তে তুমি রাজি আছ কি না ?—দাদাকে তোমার পছন্দ হয় ?

গিরিকা হাস্‌তে লাগল ; বললে, "পছন্দ হয় না ? অমন বর, এমন ঘর—খুব পছন্দ হয় ! কিন্তু তোমার দাদার যে আমাকে পছন্দ হবে তার কি মানে আছে ?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ বললে, "তোমাকে দাদার পছন্দ হবে না ?" একদৃষ্টে একটুখানি গিরিকার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "পেলে বেঁচে যাবে—আর বলে কি না পছন্দ হবে তার কি মানে আছে ?"

শুনে গিরিকা হাস্‌তে লাগল, বলল, "বেশ ত। তোমার বউ না হয়ে বউদিদি হ'লে আমি আরো খুসি হব। তখন তোমাকে প্রদোষ ব'লে না ডেকে লক্ষ্মণ ব'লে ডাক্‌ব।"

প্রসন্নমুখে প্রদোষ বললে, "আচ্ছা তা ডেকো—কিন্তু এ কথা কাউকে এখন বোলো না। প্রথম কথা হবে একেবারে দাদার সঙ্গে।"

গিরিকা হাসিমুখ বললে, "আমার বিয়ের কথা কি আমি কাউকে বলতে পারি ? কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই, নিজেই এখনি সকলকে ব'লে দেবে অখন।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রদোষ বললে, "আমি ? দেখো, কক্ষণো না।"

৫

প্রভাত কলিকাতায় পৌঁছ্‌বার দিন গিরিকার ঘরে গিয়ে প্রদোষ বল্‌লে, "দাদাকে আন্‌তে আমরা ষ্টেশনে যাচ্চি গিরিকা, তুমি যাবে ?"

গিরিকা হাসিমুখে বল্‌লে, "তা কখনো যেতে পারি ? সম্বন্ধ কর্‌ছ তাঁর সঙ্গে, লজ্জা কর্‌বে যে।"

একটা স্বচ্ছ সরল হাস্যে প্রদোষের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। "সত্যি ?"

"সত্যি।"

"কম ছেলেমানুষ ত' তুমি নও !"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "আমি যে মেয়েমানুষ প্রদোষ !"

প্রভাত এসে পৌঁছ্‌বার কিছুক্ষণ পরে গিরিকার সঙ্গে তার সাধারণ পরিচয় হয়ে গেল। সুযোগমত এক সময়ে গিরিকার নিকটে এসে প্রদোষ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "দাদাকে পছন্দ হয়েছে ?"

"খুব !"

"রাজি ত ?"

"রাজি !"

সে-দিন গোলমালে কোনো সুবিধে হ'ল না। পর দিন সকাল বেলা সুযোগমত প্রভাতের উপস্থিত উপস্থিত হ'য়ে প্রদোষ বল্‌লে, "দাদা একবার গিরিকার ঘরে চল।"

বিস্মিত হয়ে প্রভাত বল্‌লে, "কেন রে ?"

"একটা দরকারি কথা আছে।"

"কি কথা ?"

"চলনা সেখানেই শুনবে।"

প্রদোষের পিছনে পিছনে প্রভাত ঔৎসুক্যভরে গিরিকার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। গিরিকা তখন তার এসরাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে ভৈরবীর একটা মিঠে টান দিচ্ছিল।

ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রদোষ বল্‌লে, "গিরিকা, দাদা এসেছেন।"

তাড়াতাড়ি এসরাজটা বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আরক্ত মুখে গিরিকা বল্‌লে, "আসুন।" একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "বসুন।"

বিমূঢ়ভাবে চেয়ারে উপবেশন ক'রে প্রভাত জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা পদো ?"

প্রদোষ বল্‌লে, "গিরিকার হায়দ্রাবাদে বিয়ের কথা হচ্ছে, মার মুখে কাল তুমি শুনেছ ? গিরিকাকে ছেড়ে কিন্তু আমি থাকতে পারব না দাদা।"

প্রভাত একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলে গিরিকার সঙ্কুচিত দেহ একটা চেয়ারের মধ্যে মিলিয়ে যাবার উপক্রম করছে। তারপর প্রদোষের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে, "তা আমাকে কি করতে বলিস্ ?"

"গিরিকাকে বিয়ে করতে বলি।"

সবিস্ময়ে প্রভাত ব'লে উঠল, "বলিস্ কি রে !"

প্রদোষ বল্‌লে, "হ্যাঁ তাই বলি। কেন, গিরিকাকে তোমার পছন্দ হয় না না-কি ?" তার পর গিরিকার দিকে ফিরে গিরিকার অবস্থা দেখে একটু হেসে বল্‌লে, "গিরিকার লজ্জা হয়েচে। গিরিকা, এদিকে মুখ ফেরাও, দাদা তোমাকে ভাল ক'রে দেখবে।"

কিন্তু এ অনুরোধেও গিরিকা যেমন ছিল তেমনি মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল দেখে গিরিকার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রদোষের বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রভাতের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে, "দাদা, গিরিকার চোখে জল ! গিরিকা কাঁদছে !"

প্রদোষের কথা শুনে প্রভাত তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে গিরিকার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে, "গিরিকা, মনে যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, কিম্বা অপমানিত বোধ ক'রে থাকো, তা হ'লে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তা যদি না হয় তা হ'লে—তা হ'লে—

সমস্ত কথাটা শোনবার জন্যে প্রদোষের আগ্রহের অন্ত ছিল না ; অধীরভাবে বল্‌লে, "তা হ'লে কি, বল না ?

"তা হ'লে যে প্রস্তাব প্রদোষ এখনি করেছে আমরা দুই ভাইয়ে একান্ত ভাবে সে বিষয়ে তোমার সম্মতি ভিক্ষা করচি ! তুমি কি রাজি আছ গিরিকা ?

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রদোষ বল্‌লে, "আছে ! আছে ! আমাকে কালই বলেছে রাজি আছে !" তারপর গিরিকার দিকে ঝুঁকে বললে, "আচ্ছ, দাদার কাছেও একবার বল না গিরিকা। আর বলতে যদি লজ্জা করে, তা হলে দেখ—আমার দিকে চেয়ে দেখ ?"

গিরিকা আরক্ত মুখে অপাঙ্গে প্রদোষের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

নিজের দক্ষিণ হস্ত গিরিকার দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে প্রদোষ বললে, "আমার হাত তুমি ছুঁলেই আমরা বুঝব তুমি রাজি আছ।"

"ছোঁও—ছোঁও—ছোঁও"—প্রদোষের হাত ধীরে ধীরে গিরিকার হাতের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। হঠাৎ একটা-কোন মুহূর্ত্তে দেখা গেল গিরিকার হাত প্রদোষের হাতকে চেপে ধরেছে—আল্‌গা ভাবে নয়, একেবারে সজোরে,—বোধ হয় কতকটা স্নায়বিক উত্তেজনার বশে।

"পদো, তোর বউদিদিকে বল, আজকে আমার সুপ্রভাত!" ব'লে প্রভাত ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

এর ঘণ্টা দুই পরে গিরিকার ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রদোষ ডাক্‌লে, "বউদিদি!"

আরক্ত-স্মিত মুখে গিরিকা বল্‌লে, 'কি ভাই, লক্ষ্মণ ?"

"বাবা আর মা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসচেন।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রিয়তমার পত্র

বিনোদের আজ এগারো বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তার স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রণয় এখনো এতটা টাট্‌কা আছে যে সেটা তার বন্ধুদের মনে অসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বন্ধু-বেচারাদের প্রথম-প্রণয়ের রঙিন নেশা কবে যে কেটে গেছে, তা মনেই পড়ে না; এমন কি, তার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মনের গহ্বর থেকে হাঁট্‌কে বার করতে হয়; কিন্তু স্ত্রীর প্রসঙ্গমাত্রেই বিনোদের চোখে-মুখে এখনো যে-রকম তৃপ্ত-আবেগের বিদ্যুৎ খেলতে থাকে, তাতে মনে হয়, সে যেন এই সদ্য-বিবাহিত যুবক। বিনোদের স্ত্রী অতি সাদা-সিধে পাঁচ-পাঁচি মেয়ে; তার দ্বারা প্রাচীন গার্হস্থ্য প্রেমের মধ্যে এমনতর নূতন অসাধারণত্ব আনা কি কোরে সম্ভব হলো—ভেবেই পাওয়া যায় না। বিনোদের দাম্পত্য-প্রেমের এই

অবিচলতা দেখে কোনো বন্ধু বলে, লোকটা ভাগ্যবান বটে! আবার কেউ বলে, ওটা আস্ত গাড়োল—চোখ-ঢাকা বলদের মতো এই সংসার-ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিজের স্ত্রীটিকেই প্রদক্ষিণ কোরে মরচে,—দুনিয়াতে আর যে রমণী আছে, সে তার চোখেই পড়ছে না।

বিনোদের গায়ে কিন্তু এ সব খোঁচা বিঁধতো না;—সে প্রেম-স্বপ্নে এমনি বিভোর হয়ে ছিল যে স্ত্রী-সম্বন্ধে কোনো রূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ তার মন-রাজ্যে আমোলই পেত না; বরং এই বিদ্রূপগুলোকেই অবলম্বন কোরে সে তার স্ত্রীর সম্বন্ধে বেশ-একটি মনোরম আলোচনার অবকাশ রচনা কোরে নিত। একবার সুবিধা পেলে হয়, বন্ধু-মজলিসের সমস্ত তর্ক-বিতর্ককে ঠেলে দিয়ে, সে তার পরম প্রেয়সী স্ত্রীটিকে যে-রকমে একবার বন্ধুবর্গের শ্রুতি-পথের মধ্যে এনে ফেল্‌বেই। এগারো বছর ঘর করা-গৃহিণী দুদিনের জন্যে বাপের বাড়ী গেলে, তার বিরহে রচিত কবিতা, গান ও প্রণয়-লিপির-খসড়া বিনোদের বন্ধু-মহলের হাতে-হাত যে ঘুরতে থাকে এখন সেগুলো যেন বিনোদের আবেগকম্পিত কণ্ঠে সেই সভায় বারম্বার পঠিত হয়—সে কথা এখন আর সাক্ষী ডেকে প্রমাণ করবার দরকার হয় না। অর্থাৎ বিনোদের পত্নীনিষ্ঠতা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না।

এগারো বৎসরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে বিনোদের স্ত্রী চারটি সন্তানের জননী হয়ে যখন পাঁচের কোঠায় পা দিলেন, তখন তাঁর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে এমন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটলো যে আশু বায়ু-পরিবর্ত্তন তাঁর নিতান্ত আবশ্যক হয়ে উঠলো। অনেক বিচার-আলোচনার পর দার্জ্জিলিং-পাহাড়ে যাওয়াই স্থির হলো। ডাক্তার বল্লেন, বিনোদ সঙ্গে না গেলেই ভালো হয়। কিন্তু কার্য্যত তা সম্ভব হলো না। কারণ বিনোদ স্পষ্টই বল্লে, সে স্ত্রীকে ছেড়ে এতদিন একলা কিছুতেই থাকতে পারবে না।

দার্জ্জিলিঙে বিনোদের দিন বেশ মনের আনন্দে কাটছিল। কারণ তার স্ত্রীর শরীর দিন-দিন সত্যই সুস্থ হয়ে উঠছিল; এবং তার স্বাভাবিক দেহ-সৌন্দর্য্যের যেটুকু অংশ রুগ্নতায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল, তা ধীরে-ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। বিনোদ তার স্ত্রীর সেই নতুন-কোরে-লাল-হয়ে ওঠা দুটি গালের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে যেত। তার মনে হতো—দার্জ্জিলিং-পাহাড়ের সূর্য্যাস্তের অপরূপ শোভা বেশী সুন্দর, না স্ত্রী ঐ টুকটুকে গাল-দুটি বেশী সুন্দর? স্ত্রীকে এই অপরূপ সৌন্দর্য্য দান করার জন্য বিনোদ ঐ পাহাড়টার উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো। সে মনে-মনে কখনো তাকে প্রণাম করত, কখনো আশীর্ব্বাদ করত। এবং তার অসীম উদারতা নিয়ে গোটাকতক কবিতাও সে লিখে ফেলেছিল। কবির এই কবিতার জবাব হিমালয় কোন্ ছন্দে দিয়েছিলেন, এখন তারই তল্লাস করা যাক।

একদিন সকালে বিনোদ চা-খাওয়া শেষ কোরে দেশে চিঠি লিখতে বসেছে, এমন সময় ছোট্ট ভুটিয়া চাকরটা তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে ছুটে পালালো। বিনোদ চিঠিখানা খুলে পড়ল প্রথমেই লেখা—"প্রিয়তম!"

প্রিয়তম?

বিনোদ তাড়াতাড়ি খামখানা উল্টে দেখলে; ঠিকানায় তারই নাম লেখা বটে—শ্রীবিনোদবিহারী বসু। কুসুমিকা হাউস। দার্জ্জিলিং। এ তো তারই চিঠি।

কিন্তু প্রিয়তম?

প্রিয়তম কে লিখলে? নীচে নাম-সইয়ের জায়গায় লেখা আছে—ইতি অপিরিচিতা।

অপরিচিতা ?

এতক্ষণে বিনোদের চিঠিখানা পড়াই হয়নি। ঐ প্রিয়তম-সম্ভাষণেই তার মাথাটা একেবারে ঘুলিয়ে গিয়েছিল। তার কারণ কোনো নবপ্রিয়তমা-লাভের সম্ভাবনা নয় ; তার কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ গোপন মধুর সম্ভাষণটির অধিকার একমাত্র দেবতা-সাক্ষী-কোরে-বিয়ে-করা স্ত্রীর আছে। কোনো রমণী পর-পুরুষকে যে ঐ সম্ভাষণ করতে পারে—এ তার ধারণাতীত, স্বপ্নাতীত !

বিনোদ চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লে—

"প্রিয়তম !

লজ্জার মাথা খাইয়া নারীর মনের গোপন কথা পুরুষের নিকট স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতেছি, ক্ষমা করিবেন ;—আমি আপনার অনুরাগিনী। আমার এ উচ্ছ্বসিত অনুরাগ আপনার নিকট কোনো পার্থিব প্রতিদান দাবি করবার সাহস করে না ; কেবলমাত্র নিজেকে আপনার সমক্ষে প্রকাশ করিয়া সার্থক হইতে চায়। আপনার চক্ষে আমি সুন্দরী বলিয়া প্রতিভাত হইব কি না জানিনা—কিন্তু আমি কুৎসিত নহি। অতএব আজ সন্ধ্যার সময় বার্চ্চ হিলের উত্তর দিকে যে একটি নিভৃত কুঞ্জ আছে, সেইখানে আমার সহিত নির্জ্জনে একটিবার দেখা করিয়া আলাপ করিলে, আপনার সময়ের নিতান্ত অপব্যয় বা মনের বিশেষ বিরক্তির কারণ ঘটিবে না ; এবং আমিও ধন্য হইব। ইতি—

আপনার অপরিচিতা।"

বিনোদ চিঠিখানা পড়েই হো-হো-কোরে হেসে উঠলো। এ নিশ্চয় ঠাট্টা ! এ তার ছোট শ্যালি কমলের কাজ। কমল তার দিদির সঙ্গে দার্জ্জিলিং বেড়াতে এসেছিল। এ কীর্ত্তি তারই। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির হাসি-তামাসার পালা, সে তো অনেকদিন চুকে গেছে ; এখন সে বুড়ো-জামাই ; এখন তাকে নিয়ে কি আবার নতুন-কোরে রসিকতা আরম্ভ হলো ? বিচিত্র কি ? বিনোদ ভাবলে, চিঠিখানা হাতে কোরে কমলরাণীর কাছে গিয়ে এখনই তার এই ছেলেমানুষী তামাসাটা ভেঙে দিয়ে আসে। কিন্তু, কিন্তু এ যদি কমলের কীর্ত্তি না হয় ? সত্যিই যদি অপর কোনো মেয়ে লিখে থাকে ? তা হলে তার এই একান্ত গোপন-কথাটা এমন নির্দ্দয়ভাবে পরের কাছে ফাঁশ কোরে দেওয়া কি ঠিক হবে ? না, না, সে হতে পারেনা ! তবে কি করবে সে ?

অনেকক্ষণ চিন্তা কোরে কিছু ঠিক করতে না পেরে বিনোদ মনে-মনে বোলে উঠলো—দূর হোক গে ছাই, আমার এত ভাবনা কিসের ? যেই চিঠি লিখুক না, আমার তাতে আসে-যায় কি ? আমি তো এই চিঠি পেয়েই ছুটে যাচ্ছি না—কোথাকার কে এক অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ করতে ? তবে আমার এত মাথাব্যথা কেন ?...

মেয়েমানুষ অবুঝ—না-বুঝে সে হয় ত একটা অন্যায় কাজ কোরে ফেলেছে, তাই বোলে পুরুষ মানুষ হয়ে তার সেই অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দেবে ?—এত-বড় পাষণ্ড সে ? ছিঃ ! আর কি কোরেই বা পর-স্ত্রীর কাছে সে যাবে ? সে যে বিবাহিত—মন প্রাণ দিয়ে যে স্ত্রীকে সে ভালোবাসে !...

কিন্তু এ মেয়েটির কি বিয়ে হয়েছে ? সে কি স্বামীকে তবে ভালোবাসেনা ?—না, এ কুমারী ? বুঝিবা বিধবা ? লজ্জার মাথা না হয় খেয়েছে, কিন্তু ভয়ও কি নেই ? কোন্ সাহসে পর-পুরুষকে এই কলঙ্কের চিঠি সে লিখলে ? ও, বোঝা গেছে কেমন মেয়ে সে ! ছি, ছি ! এমন ভ্রষ্টা মেয়ের কথা মনে আনলেও পাপ হয় !...

বিনোদ এই অসচ্চরিত্র মেয়েটার কথা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, একখানা ইংরাজি উপন্যাস নিয়ে পড়তে বস্‌লো। কিন্তু বেশীক্ষণ সে-বই ভালো লাগলো না। সে তখন খবরের কাগজ নিয়ে বস্‌লো ; তাতেও যখন মন লাগলো না, তখন তার বড়-ছেলেকে ডেকে তার পড়ার বই খুলে তাকে পড়াতে বসলো—খুব মনোযোগ দিয়ে। ছেলের পড়ায় খুব ঝোঁক দেখা গেল বটে, কিন্তু বাপের দিক থেকে তার খুবই অভাব বোধ হতে লাগলো। বিনোদ বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলে, মনের ভিতর থেকে সব কিছু ঠেলে ফেলে ঐ চিঠির মধ্যেকার মেয়ের কথাটাই কেবল জেগে-জেগে উঠছে। সে যতই চেষ্টা করুক, কিছুতেই যেন তাকে আট্‌কানো যাচ্ছেনা। তা না যাক্‌, তাতে হয়েছে কি ? সে তো আর সন্ধ্যাবেলায় ঐ অপরিচিতার কুঞ্জে প্রেমালাপ করতে যাচ্ছেনা ; তবে তার জন্যে এত ভাবনা কেন ? না-হয় ঐ মেয়েটির কথা একটু মনে-মনে ভাবলেই। তাতে এমন কি অপরাধ হবে ? ছেলের পাঠ্য পুস্তকখানা মুড়ে রেখে, পকেট থেকে চিঠিখানা বার কোরে বিনোদ আর-একবার সেটা আগাগোড়া পড়লে। মনে-মনে হেসে বলে উঠলো—হায়রে অপরিচিতা নারী ! তুমি ভেবেছ তোমার ঐ কোমল কণ্ঠের মধুর আহ্বানে আমি তোমার পায়ের তলায় গিয়ে লুটিয়ে পড়বো ? কিন্তু তুমি যদি জানতে রমণী বল্‌লে আমি একমাত্র আমার স্ত্রীকেই চিনি, এবং ভালোবাসতে একমাত্র তাঁকেই জানি, তাহ'লে এ দুঃসাহস তোমার হতনা। বল্‌তে-বল্‌তে বিনোদ রান্নাঘরের দিয়ে এগিয়ে গেল—যেখানে তার স্ত্রী বসে-বসে কড়াইসুঁটির কচুরি ভাজছিল। আগুনের তাপে বিনোদের স্ত্রীর রাঙা মুখখানি আরো রাঙা হয়ে উঠেছিল ; বিনোদ তার সেই সুন্দর রাঙা মুখখানিতে ধীরে-ধীরে একটি চুমু খেয়ে চলে গেল।

আজ স্নানের পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বিনোদের হঠাৎ মনে হলো সে নিজেকে যতটা বুড়ো মনে করে, ততটা বুড়ো সে তো নয়। এখনো তার দেহে দিব্য যৌবন-শ্রী আছে। এবং সে দেখতে এমনই বা কি মন্দ ? বরং আর-পাঁচজনের চেয়ে একটু ভলোই দেখতে। কিন্তু একথাটা এতদিন পরে আজ হঠাৎ মনে হলো কেন ?—ভাবতে গিয়ে বিনোদের মনের সামনে এগারো বছর আগেকার নব-বিবাহিত স্ত্রীর মন ভোলাবার ছেলেমানুষী ব্যস্ততার একটা ছবি জেগে উঠলো। তাড়াতাড়ি সেটাকে চাপা দিয়ে সে স্ত্রীকে ডেকে বল্লে—কি গো এখনো ভাত দিলে না যে ! যেন এতক্ষণ ধোরে যে প্রসাধনটা চলছিল, সেটা ঐ তাড়াতাড়ি ভাত খেতে বসবার জন্যেই !

স্ত্রী বল্লে—দাঁড়াও, রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আসি—দেরী হচ্ছে কেন।

বিনোদ ব্যগ্রকণ্ঠে বোলে উঠলো—না না, তুমি বোসো—আমার কাছটিতে। বোলে স্ত্রীর হাতখানি ধোরে বুলিয়ে-বুলিয়ে পরখ করতে লাগলো—দার্জ্জিলিং এসে সে কতটুকু মোটা হয়েছে।

আহারের পর বিশ্রামের সময় বিনোদের হঠাৎ একবারে ধাঁধা লাগলো—চিঠিখানা আমাকেই লেখা তো ?—ঠিক দেখেছি তো ?—ভুল হয়নি তো ? ভুল হয়েছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে চিঠিখানা বার কোরে আবার একবার সে পড়লে। না, ঠিকই আছে—তাকেই লেখা বটে।

কিন্তু ভারি রহস্য তো। কে এ চিঠি লিখলে ? চুপ-কোরে বসে তাই ভাবতে-ভাবতে বিনোদের মনে হতে লাগলো সে চিঠিখানি যেন না-চেনা না-জানা, না-দেখা কার একটি মধুর কোমল পরশ তার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিচ্ছে। ধরাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, অথচ

যেন একটি আবেশ-মাখা সুখ-ভরা আলিঙ্গন তাকে ধীরে-ধীরে আকর্ষণ করেছে। কি সুখ-স্পর্শের শিহরণ সেই আলিঙ্গনে! বিনোদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই আলিঙ্গনের মধ্যে বাঁধা পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে উঠে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার পর ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। তার স্ত্রী পাশে বসে কার্পেট বুন্‌ছিল ; সে স্বামীর দিকে চোখ তুলে বল্লে—কিগো, কি হয়েছে তোমার ? অমন কর্‌ছ কেন ?

বিনোদ স্ত্রীর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল কোরে চেয়ে বল্লে,—কৈ কিছু তো হয়নি। কিছু তো করিনি! বোলে সে আবার ধুপ-কোরে বসে পড়লো।

বিনোদের স্ত্রী একবার বক্রদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে, কার্পেটের দিকে মন দিলে।

আবার ঘুরে-ফিরে সেই চিঠির কথা—সেই অপরিচিতার কথাই বিনোদের মনে আস্‌তে লাগলো। কি জানি কেন, কেবলই কৌতূহল হতে লাগলো—কে এই মেয়েটি ? সে যেই হোক, নিশ্চয়ই খুব রোমাণ্টিক ! নইলে একবার মাত্র চোখের দেখাতেই ভালোবাসা ? কিন্তু এই রোমান্টিক ভালোবাসা কেমন ? সে কি বিনোদের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে অকূলে ভেসে পড়েছে ? তাই তো মনে হয়। আহা, বেচারা ! মনে করলে মায়া করে।...স্ত্রী তাকে ভালোবাসে খুবই—কিন্তু সে ভালোবাসা কি এই ভালোবাসার মতোই ? স্ত্রীর ভালোবাসা, সে পলে-পলে দিনে-দিনে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু এই মেয়েটির ভালোবাসা যেন বন্যার মতো—ঝড়ের মতো—হঠাৎ ছুটে এসেছে। এ ভালোবাসার স্বাদ না-জানি কেমন ? না-জানি তার কতখানি উন্মাদনা ! কিন্তু হায় নারী, এ তোমার কী দুর্ভাগ্য ! যাকে ইহ্‌জীবনে কখনো লাভ করতে পারবো না, সমস্ত হৃদয়-মন তার কাছেই বিনা বিনিময়ে বিকিয়ে দিলে ? বিনোদের সমস্ত হৃদয়টা এই অপরিচিতা অভাগিনী নারীর প্রতি সমবেদনায় ভরে উঠলো। কেবলই মনে হতে লাগলো, যদি কোনো উপায়—কোনো উপায়—থাকতো তাহ'লে একে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসতুম।

কিন্তু কে এই নারী ? আমার চক্ষু-পথে সে কি কোনোদিন পড়েনি ? সে কি কেবল অলক্ষ্যে থেকে আমাকেই দেখেছে, আমি তাকে কোনো দিন দেখিনি ? ভাবতে-ভাবতে বিনোদ দার্জ্জিলিঙে এসে পথের মাঝে এদিকে-ওদিকে যেখানে যত মেয়ের মুখ দেখেছে, একে-একে মনে করতে লাগলো। পরে-পরে কত মেয়ের কত রকমের মুখই মনে পড়লো,—বিনোদ তার মধ্যে থেকে বাছতে-বাছতে ভাবতে লাগলো—এর মধ্যে কোন্ মেয়েটি হবে কে জানে ?

চিঠিতে লেখা আছে—আমি কুৎসিত নই। নিশ্চয় তাহলে সে সুন্দরী। হয় তা বা অপরূপ সুন্দরী ! কেমনতর সুন্দরী সে হতে পারে, কল্পনায় তারই একটি চিত্র আঁকতে-আঁকতে বিনোদের হঠাৎ মনে পড়লো একটি মেয়েকে। তাকে যেন অনেকবার সে দেখেছে—দার্জ্জিলিঙের নানা পথে—এখানে-ওখানে। এমনি উজ্জ্বল মূর্ত্তি যে চোখ এড়ায় না—আর কী সপ্রতিভ ! বাঙালী মেয়ের মতো ভেঙেপড়া নুয়ে পড়া মোটেই নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ এই মেয়েটিই তো সেদিন চৌরাস্তার কাছে বরাবর বিনোদের দিকে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছিল। পরণে লাল রেশমী সাড়ী, হাতেও লাল রঙের একটি ছোট্ট ছাতা। সকালবেলাকার স্নিগ্ধ রৌদ্রের আভায় এই মেয়েটিই কি হবে ? নইলে বার-বার সে বিনোদের দিকে অমন-কোরে তাকাচ্ছিল কেন ? হয় ত বা হবে !

বিনোদ ইজি-চেয়ারে এলিয়ে পড়ে চোখ-বুজে এই লাল সাড়ি-পরা, লাল ছাতা-হাতে মেয়েটির মূর্ত্তি ভাবতে লাগলো। মনে হতে লাগলো মেয়েটি বাস্তবিকই সুন্দরী—অপরূপ

সুন্দরী ! বিশেষ তার সেই উজ্জ্বল ছল্‌ছল্‌ চোখ-দুটি ! সেই চোখ-দুটি যেন কত-কালের কত স্বপ্নভরা গানের সুরে টল্‌টল্‌ করছে। ঐ চোখ যেন সব ভুলিয়ে দেয় !...বিনোদ অবাক হয়ে গেল—তার সেই চোখ-দুটিকে অত খুঁটিয়ে সে কখন্‌ দেখলে ! সে ত মাত্র একবার কি দু'বার পলকের তরে তার দিকে চেয়েছিল, তার মধ্যেই এতখানি দেখা হয়ে গেল কেমন কোরে ? বিনোদ নিমিলিত নেত্রে সেই ছল্‌ছল্‌ উজ্জ্বল চোখদুটিকে মনে-মনে দেখতে লাগলো। যতই দেখতে লাগলো, ততই যেন কেমন-একটা তন্ময়তা আসতে লাগলো। সেই তন্ময়তার আবেশে মনে হতে লাগলো। ঐ দুটি সুন্দর চোখের তুলনায় তার স্ত্রীর চোখ নিতান্তই নিষ্প্রভ ! সে চোখ খুবই টানা-টানা, বড়-বড় বটে এবং দেখতেও বেশ ভালো লাগে ; কিন্তু চোখের ভিতরকার যে সঞ্জীবনী প্রভা হৃদয়ে পুলক-স্পন্দন, আবেশ-শিহরণ জাগিয়ে তোলে, এই চোখে সেই প্রভাটুকুরই যেন অভাব ! যে-চোখের প্রশংসা এতদিন সে শত-মুখে করেছে, মনে হয়েছে যার মধ্যে একটা অত্যন্ত উন্মাদনা আছে, আজ বোধ হতে লাগলো ঐ লালসাড়ী-পরা মেয়েটির সেই উজ্জ্বল ছল্‌ছল চোখের কাছে তার স্ত্রীর সেই ড্যাব্‌ডেবে চোখ একেবারে মরা-চোখ ! না আছে তার শ্রী, না আছে তার শক্তি !

আর, অমন চোখ যার নেই, রূপ থেকেও সমস্ত রূপই তার ব্যর্থ ! বিনোদের চোখের সামনে তার রূপসী স্ত্রীর সমস্ত রূপ একে-একে ঝরে পড়তে লাগলো। মনে হতে লাগলো সে অত্যন্তই সাধারণ—কিইবা তার রূপ, কিইবা তার শ্রী ! ঐ মেয়েটির তুলনায় কুৎসিতই বলা চলে ! হাঁ, অত্যন্ত কুৎসিত !...

বিনোদ ধড়মড় কোরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পাশে বসে তার স্ত্রী তখনো এক-মনে কার্পেট বুনছিল। তার দিকে চেয়ে-চেয়ে বিনোদের বোধ হতে লাগলো—এতদিন সে যেন একটা মিথ্যা রূপের ফাঁকি দিয়ে তাকে ঠকিয়ে এসেছে।...হায়, সে কাকে পূজা কোরে এসেছে ? কোথায় সেই রূপ, যার পদ-তলে এতদিন সে হৃদয়ের প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি উজাড় কোরে ঢেলে দিয়ে এসেছে ? এই তো জীর্ণশীর্ণ কঙ্কাল মূর্ত্তি ;—এর উপর অনবদ্য রূপের সেই মনমোহিনী আবরণী কৈ ? ইচ্ছে হতে লাগলো স্ত্রীর হাত-দুটো ধোরে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কই গো রূপসী ! তোমার রূপ কৈ—যা দিয়ে আমায় এতদিন ভুলিয়েছ ? একটা চাপা-রাগে বিনোদের সমস্ত হৃদয়টা কাঁপতে লাগলো। সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।...

বিনোদ সারা দুপুর-বেলাটা স্ত্রীর কাছে আর এলোনা। আর যেন কিছুতেই তাকে ভালো লাগছিল না—সহ্য হচ্ছিল না। মনটা যেন কোথায় একটা অস্পষ্ট কল্পনা-লোকের উদ্দেশে উধাও হয়ে ঘুরছিল। যেন কত নূতনতর অনুভূতি হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে-দিয়ে চলে যাচ্ছিল। পৃথিবীর কত নূতন শোভা, কত নূতন আনন্দ, কে যেন এতদিন আড়াল-কোরে ঢেকে রেখেছিল, আজকের একটা ঝড়ে সেই পর্দ্দা যেন সরে গেছে—এখন সেই শোভা, সেই আনন্দ উপভোগের আহ্বান এসেছে। আর সেই আহ্বান-লিপি পাঠিয়েছে সেই লাল-রঙের সাড়ী-পরা মেয়েটি।...

বিনোদ কৌচের উপর শুয়ে-পড়ে ভাবতে-ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, আর সেই তন্দ্রার ঘোরে বার-বার চোখের সামনে সোনালী মেঘের মতো ভেসে আসছিল সেই লাল-সাড়ী পরা মেয়েটি—যে আজ সন্ধ্যাবেলা বার্চ্চ হিলের নির্জ্জন কুঞ্জটিতে এসে তার সমস্ত আশা ব্যর্থতায় বর্ষণে ঝরিয়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।...না-জানি সে কত আশা

করেই আসবে—আর কতখানি ব্যথা নিয়েই ফিরে যাবে !

কথাগুলো মনে করতে-করতে বিনোদের বুকের ভিতরটা আকুল হয়ে উঠলো। মেয়েটি যতক্ষণ না-জানার মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সে মাত্র একটা কৌতূহল ছিল ; কিন্তু যখন সে মনের মধ্যে একটি অখণ্ড রূপ নিয়ে প্রকাশিত হলো, তখন সে হৃদয়ের নানা অনুভূতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো—সে তখন দুর্দ্দমনীয় হতে লাগলো। এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিনোদের মনও এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে উঠলো যে এই নারীর আকুল আহ্বান প্রত্যাখ্যান কোরে তার কাছে না-যাওয়াটা নিতান্তই নির্দ্দয়তা হবে। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেলে সেই লাল সাড়ী-পরা মেয়েটি তার সেই ছল্‌ছল্ উজ্জ্বল চোখদুটি তুলে কি কাতর মিনতিই না জানাচ্ছে। বিনোদ সেই চোখের পানে চেয়ে মনে-মনে বোলে উঠলো—ওগো নারী, তোমার আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারব না—পারব না ; সে-আহ্বান আমি শিরোধার্য্য কোরে নিলুম। তুমি শান্ত হও।

বিকেল-বেলা চায়ের সময় বিনোদের মনে আর কিছুমাত্র দ্বিধা রইল না ;—সন্ধ্যাবেলা বার্চ্চ হিলে যাওয়া তখন একেবারে স্থির। এই যাওয়ার মধ্যে একটা অত্যন্ত অন্যায় আছে বোলে যে-খোঁচাটা সকালবেলা মনের মধ্যে কেবলই বিঁধছিল, দিনশেষের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই সেটা ভোঁতা হয়ে আসতে লাগলো। বরং ভিতরে-ভিতরে আজকের সন্ধ্যায় এই অভিসারের প্রতি একটা উৎসাহ দ্রুতগতিতে প্রবল হয়ে উঠছিল। একটা কেমন-তর অজানা আশা-আকাঙ্ক্ষা-আশঙ্কা মনটাকে দোলার পর দোলা দিতে লাগলো ; এবং সন্ধ্যার আগমন-প্রতীক্ষায় মনটা উন্মনা হয়ে উঠলো।

বিনোদের সেই সদা-শান্ত মুখের উপর নূতনতর চাঞ্চল্য দেখে তার স্ত্রী প্রশ্ন করল,—হ্যাঁগা, আজ অমন করছ কেন ? তোমার কি হয়েছে ?

স্ত্রীর এই প্রশ্ন বিনোদের মোটেই ভালো লাগলো না ; কারণ এর সত্য জবাব যা, তা স্ত্রীর কাছে দেওয়া যায় না। সে বিরক্ত হয়ে বল্লে—কি আবার হবে ?—আমার মাথা ধরেছে !

স্ত্রী বল্লে,—যাও তাহ'লে একটু খোলা-হাওয়ায় বেড়িয়ে-এসো।

বিনোদ একটু উসখুস্ কোরে গম্ভীরভাবে বোলে উঠলো—তুমি যাবে না ?

স্ত্রী বল্লে—না।

বিনোদের বুক থেকে যেন একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল। প্রতিদিন বৈকালিক ভ্রমণের সময় স্ত্রী তার সঙ্গে যায়—আজকের সেই ফাঁড়াটা কি কোরে কাটবে, এই নিয়ে এতক্ষণ সে একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি অনুভব করছিল। অন্যদিন স্ত্রী সঙ্গে যেতে না চাইলে সে অভিমান করত, কত স্তুতি-মিনতি জানাত, কিন্তু আজকে মনে হলো এ যেন মুক্তি। বিনোদ তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাতে চলে গেল, এবং প্রসাধনটা বেশ একটু ঘটা কোরেই সমাধা করলে।

অনেকক্ষণ একা এদিক-ওদিক ঘুরে, ঠিক সন্ধ্যার সময় বিনোদ বার্চ্চ হিলের সেই নির্জ্জন কুঞ্জটির কাছটিতে চুপি-চুপি এসে হাজির হলো। বায়ুবিহারীর দল তখন শীতের ভয়ে বাড়ীর পথে ফিরে চলেছে ; পাহাড়টা ক্রমেই জনশূন্য হয়ে এলো। বিনোদ নিশ্চিন্ত হ'লো বটে, কিন্তু তার বুকের ভিতরটা কেমন ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো—সেই কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করতে। বাইরে থেকে কুঞ্জের ভিতরটা দেখা যায় না ; কাজেই মেয়েটি ইতিমধ্যে সেখানে এসে বসেছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। কুঞ্জের মধ্যে গিয়ে কি

দেখবে, কাকে দেখবে, এবং কেমন-ভাবেই বা দেখবে—তারই একটা চিত্র অনুমান করতে-করতে বিনোদ মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। একটু অগ্রসর হতেই একটা মানুষের অস্পষ্ট চেহারা একটা ঘন গাছের পাশে সরে গেল বোলে মনে হলো। বিনোদের বুকটা কেঁপে উঠতেই সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর একটু বল সংগ্রহ কোরে এগিয়ে গিয়ে যে মূর্ত্তি দেখলে, তা সেই লালরঙের সাড়ী-পরা তন্বী মেয়েটির মূর্ত্তি নয়—একটি বলিষ্ঠ যুবকের।

মহিম, তুই এখানে কি করছিস রে ?—বোলে বিনোদ চেঁচিয়ে উঠলো।

মহিম্ আম্‌তা-আম্‌তা-কোরে বল্‌তে লাগলো—আজ্ঞে, আজ অনেকটা ঘুরেছি, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।

বিনোদ ক্রুদ্ধস্বরে বোলে উঠলো—যা, এখানে আর জিরুতে হবে না—এখন বাড়ি যা !

মহিম ধীরে-ধীরে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল।

মহিম বিনোদের মেজ-ভাই—বি-এ পাশ কোরে দাদার সঙ্গে দার্জ্জিলং বেড়াতে এসেছে। এখনো বিবাহ হয়নি।

বিনোদ বেঞ্চির উপর একা চুপটি কোরে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলো। মেয়েটির তখনো দেখা নেই। যতই দেরী হতে লাগলো, মহিমের উপর তার ততই রাগ হতে লাগলো। কারণ মেয়েটি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে কুঞ্জের ভিতর এসেই মহিমকে দেখে ফিরে গেছে। মহিম রাস্কেলটা কি আর জিরুবার জায়গা পেলেনা। একটা তীব্র হতাশার অবসাদে বিনোদের মন যেন ভেঙে পড়তে লাগলো—আর সঙ্গে-সঙ্গে মহিমের প্রতি একটা বিরক্তিতে তার সর্ব্বাঙ্গ তিক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু তবু সে চুপ-কোরে বসে রইলো ;—মনের ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ আশা প্রলোভন দিতে লাগলো—সে আসবে, আবার ফিরে আসবে, একটু অপেক্ষা কর।

বিনোদ অধীর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে রইলো ; তবু সে এলো না। তখন বিনোদের মনে হলো নিশ্চয় সে এসে ফিরে গেছে—আর হয়তো আসবে না ! মনের অধীরতায় অস্থির হয়ে বিনোদ বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তার পর একটু-একটু কোরে অগ্রসর হতে-হতে একেবারে কুঞ্জের বাইরে চলে গেল। তখন মেঘের গায়ে সূর্য্যাস্তের রাঙা আভা দিগ্বিদিকে রঙের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সেই লালিমার দিকে চেয়ে বিনোদের মনের মধ্যে ছবির মতো জাগতে লাগলো—সেই লালরঙের সাড়ি-পরা সুন্দর মেয়েটি ! সেও এমনি সুন্দর, এমনি মহান ! হয় তা বা সেও তার জীবনের পরে এমনিতর একটি রক্তিম শোভা শুধু ক্ষণিকের তরেই বিস্তার কোরে দিয়েছে ! ভাবতে-ভাবতে বিনোদের বুকের ভিতরটা একটা অসীম বেদনায় অবসন্ন হয়ে আসতে লাগলো।...

হঠাৎ কুঞ্জের মধ্যে যেন কার কোমল পদধ্বনি শোনা গেল। বিনোদ উদ্‌গ্রীব হয়ে সেই শব্দ একটুখানি আশা-উৎফুল্ল হৃদয়ে পুনরায় কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করলে। দেখলে মহিম বেঞ্চির উপর পা-ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে আছে—মেঘমুক্ত নীল আকাশের দিকে চেয়ে, যেন কোন্ রঙিন স্বপ্নাবেশে একেবারে বিভোর। এত তন্ময় যে দাদা সেখানে উপস্থিত, সে তা টেরই পেলে না। কিন্তু তার চোখে মুখে এ কিসের উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস ? মহিমের এমনতর চোখ-মুখের ভাব বিনোদ জীবনে কখনো দেখেনি—সে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ চমক-ভেঙে যখন মনে হলো মহিম এখনো বাড়ি যায়নি, এই আশে-পাশেই এতক্ষণ ছিল, তখন রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলতে লাগলো। সে চেঁচিয়ে বলে

উঠলো—"মহিম, এখনো বাড়ী যাস্‌নি যে ?"

মহিম দাদার গলা পেয়ে ধড়মড়-কোরে উঠে বস্‌লো, ফ্যাল্-ফ্যাল্-চোখে চেয়ে রইলো—কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বার হলো না।

বিনোদ গলার স্বর আরো চড়িয়ে বোলে উঠলো—"কি হয়েছে তোর ? এখনো বাড়ি যাস্‌নি কেন ?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—যে-মুহূর্ত্তে দাদার কথায় মহিম উঠে দাঁড়িয়েছে এবং বিনোদ তাকে আবার তিরস্কার করছে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিকে লাল-সাড়ি-পরা একটি মেয়ে আচম্‌কা কুঞ্জের মধ্যে একটিবার প্রবেশ কোরেই তখন বেরিয়ে গেল। বিনোদ এবং মহিম দুজনেই স্তব্ধ হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল।...

বিনোদের ইচ্ছা হতে লাগলো এখনই ছুটে গিয়ে ঐ লাল-সাড়ি-পরা মেয়েটির পায়ের উপর আছড়ে পড়ে...কিন্তু...রাস্কেল মহিমটা যে সামনে দাঁড়িয়ে। বিনোদ দুঃখে রাগে মনে-মনে ফুঁসতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি ?—উপায় কি ? কোনো উপায়ই নেই! বিনোদ রুদ্ধ আবেগে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মহিমের দিকে চেয়ে উঠলো—"বেরিয়ে যা এখান থেকে!"

মহিম মুখ নীচু কোরে ধীরে-ধীরে চলে যেতে লাগলো—এতই ধীর গতিতে সেই যাওয়া যে মনে হলো যেন তার সমস্ত মন-প্রাণ বুঝি এইখানেই সে ফেলে রেখে যাচ্ছে।

বিনোদ হতাশ হয়ে আবার বেঞ্চিতে বসে পড়লো। তবে সত্যিই কি সে চলে গেল ?...হায় অদৃষ্ট ! বিনোদ কুঞ্জের বাইরে গিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো ;—পাহাড়ের গায়ে কোথাও সেই লাল সাড়ীর লাল রঙের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশেও তখন লালের খেলা একেবারে শেষ হয়ে ধূসর বর্ণের যবনিকা পড়তে সুরু হয়েছে। বিনোদের মনে হতে লাগলো তাঁর হৃদয়ের উপর আজ সকালে যে লাল আভার স্পর্শটি এসে লেগেছিল, দিনান্তে তা সত্যিই মিলিয়ে গেল !

অত্যন্ত অবসন্ন হৃদয়ে বিনোদ যখন বাড়ি ফিরে এলো, তখন কারো সঙ্গে তার কথা কইবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। মহিমের উপর রাগটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সে কেবলই একটা বিরক্তিভরা দৃষ্টি দিয়ে তার ভাইকে বিদ্ধ করছিল। মহিমের মুখখানিও যেন অত্যন্ত বিশুদ্ধ মলিন দেখাচ্ছিল। রাত্রে দুই ভাইয়ে যখন পাশাপাশি খেতে বস্‌লো, তখনো পর্য্যন্ত ভাইয়ে-ভাইয়ের স্বাভাবিক হৃদ্যতা ফিরে আসেনি—একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরে তারা সেই ঘরটাকে যেন ঘোলাটে কোরে তুলছিল। কেবল বিনোদের স্ত্রী তার মুখের একটি কৌতুক-ভরা চপলতা দিয়ে সেই ভারি গুমোটটাকে যেন তরল কোরে আন্‌ছিল। সে দুই ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিল। বিনোদের মেজাজ ভালো ছিলনা ; হঠাৎ স্ত্রীর মুখের সেই হাসির দিকে দৃষ্টি পড়াতে তার সর্ব্বাঙ্গ রি রি কোরে উঠলো, সে মুখভঙ্গী কোরে বোলে উঠলো—"অমন পাগলের মতো হাসছ কেন ?"

বিনোদের স্ত্রী স্বামীর সেই অকারণ রাগের বিকৃত মুখভঙ্গী দেখে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে খিল্‌খিল্ কোরে হেসে উঠলো। তার পর কোনো রকমে হাসি চেপে প্রশ্ন করলে—"হ্যাঁগা, শুনছ, আজ সকালে ভুটিয়া ছেলেটা যে চিঠিখানা এনে দিলে, সে কে লিখেছিল তোমায় ?"

"চিঠি ?...আজ সকালে ?...আমাকে ?...কৈ কখন ?...কে লিখলে ?...কই পাইনি ত ?...

বিনোদ থতিয়ে গিয়ে আর যে কি বলবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

স্ত্রী গম্ভীরভাবে বল্লে—"সন্ধ্যাবেলা বার্চ্চ হিলে গিয়েছিলে ?" যাইনি—"বল্‌তে-বল্‌তে মহিমের চোখের উপর চোখ পড়তেই তার বাক্য একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিনোদের স্ত্রী আবার খিল্‌খিল্‌ কোরে হেসে উঠলো। বিনোদ থতমত খেয়ে বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো।

স্ত্রী বল্লে—"আর লুকোচ্ছ কেন ? আমি সব জানি !"

বিনোদ গলার স্বরটা পরিষ্কার কোরে নিয়ে বল্লে—"কি জান ? সে মিথ্যে !—সে মিথ্যা ! যা শুনেছ সব মিথ্যে—তোমায় মিথ্যে কোরে লাগিয়েছে।" বোলে বক্রদৃষ্টিতে সে একবার মহিমের দিকে চেয়ে নিলে। মহিম একেবারে হতভম্বের মতো হয়ে, তার বৌদির দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনোদের স্ত্রী বল্লে—"মিথ্যে নয় গো, মিথ্যে নয়।"

"কেমন কোরে জান্‌লে তুমি মিথ্যে নয় ?"

"কারণ সে চিঠি যে আমারই হাতের রচনা।"

শুনেই পাশা-পাশি দুই ভাই এক-সঙ্গে চম্‌কে উঠলো।

বিনোদ খানিকটা সজোরে মাথা-নেড়ে ক্রুদ্ধ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—"অ্যাঁ, তোমার লেখা ? জান, এরকম ঠাট্টা অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত বিশ্রী—অত্যন্ত অভদ্র !" বল্‌তে বল্‌তে খাবার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

বিনোদের স্ত্রী ছুটে গিয়ে তার হাত ধোরে বল্লে—"পায়ে পড়ি, তুমি রাগ কোরোনা—খেতে বোসো। আমি ঠাট্টা করিনি। ঐ পাশের বাড়ির বৌয়েরা আজ সন্ধ্যাবেলা এখানে বেড়াতে আসতে চাইলে ; বল্লে, বাড়িতে পুরুষ থাকলে ওরা আসবে না ; আমি বাড়ি থাকলে তুমি তো নড়তে চাইবে না কিছুতেই, তাই বুদ্ধি কোরে ঐ চিঠি দিয়েছিলুম—তোমাকে একখানা, ঠাকুরপোকে একখানা ; দুজনেই যাতে আজ সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে যাও।"

বিনোদ বল্লে—"তুমি কি মনে করেছ—তোমার ঐ চিঠি পেয়েই আমি ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলুম ? আজ বিকেলে যদি মাথাটা না ধরতো, আর তার জন্যে মেজাজটা যদি খিট্‌খিটে না হতো, তাহ'লে আমি কখনোই আজ তোমায় ছেড়ে একলা বেড়াতে যেতুম না—যতই অমন চিঠি আসুক না !"

বিনোদের স্ত্রী একটুখানি হাসি চেপে বল্লে—"তা কি আর আমি জানি না ?"

ইতিমধ্যে মহিম ঘর থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বিনোদ তার স্ত্রীর হাত দুটি ধরে গদগদকণ্ঠে বল্লে—"ছি, তুমি কি মনে করলে বল দিকিন ! আমি বুঝি—"

বিনোদের স্ত্রী বাধা দিয়ে বল্লে—"তাতে কি হয়েছে ? সত্যিই তো কোনো অপরিচিতা তোমায় ডাকেনি ! তবে তাতে দোষের কি হয়েছে ?"

বিনোদের বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। সত্যিই তো কোনো মেয়ে তাকে আহ্বান করেনি—সে আহ্বানবাণী মায়া, সে মিথ্যা, সে স্বপ্ন ! সে-স্বপ্নের সন্ধানে যে যাওয়া সেও তো মিথ্যা !

বিনোদের স্ত্রী স্বামীর পাশটিতে বসে অতি কোমল সুরে বল্লে—"বল, তুমি রাগ করনি। আমার যদি দোষ হয়ে থাকে, ক্ষমা কর।"

বিনোদ তাড়াতাড়ি তার স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে বলে উঠালো—"দোষ তো তোমার

হয়নি ; ভ্রম হয়েছে আমার। আমার বোঝা উচিত ছিল, এ চিঠি তুমি আছাড়া আমায় কে লিখবে ?" বোলে স্ত্রীর মুখে সে একটি চুমু খেলে।

ঠিক এমনি সময় পাশের ঘরে মহিম আজকের সকালে-পাওয়া অপরিচিতার চিঠিখানা ফার্ণের বাহারি পাতা এবং পাহাড়ী ফুলের রঙিন সজ্জার ভিতর থেকে বার কোরে টুকরো-টুকরো কোরে ছিঁড়ে ফেলছিল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বাপকা বেটী

১

বৈশাখ মাস। আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়ীতে, মিষ্টার জি, লাহিড়ী, বার-এট্-ল, (পূরা নাম গিরীন্দ্রনাথ লাহিড়ী) সন্ধ্যার পর পায়জামা সুট পরিধান করিয়া, দ্বিতলের খোলা বারান্দায় ঈজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। একটা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে, দুই এ পেগ হুইস্কি পান করিয়া ডিনারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার বেয়ারা একটা কলাই করা ট্রের উপর একখানা চিঠি আনিয়া, টেবিলের উপর তাঁহার সামনে রাখিয়া প্রস্থান করিল। চিঠিখানি পড়িয়া লাহিড়ী সাহেব ডাকিলেন, "সরযূ—ও সরযূ—শোন !"

তাঁর পত্নী মিসেস লাহিড়ী এই আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন ?"

"সুরেশের মুহুরি কি চিঠি লিখেছে দেখ।"—বলিয়া লাহিড়ী সাহেব পত্রখানি পত্নীর হস্তে দিলেন।

সরযূ পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন, "তাই ত ! সুরেশ বাবুর এমন অবস্থা ? পর্শুও ত তুমি তাঁকে দেখে এসে বল্লে, অনেকটা ভাল।—তা তুমি কি এখনই বেরুতে চাও ? ডিনার খেয়ে গেলে হত না ? তৈরী প্রায়। সেখানে গিয়ে কি অবস্থা দেখবে, ফিরতে কত রাত হবে, বলা ত যায় না !"

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "না, দেরী ক'রে দরকার নেই। দেখছ না, লিখেছে, এখন তখন অবস্থা। আমি এখনই যাই, ফিরে এসেই ডিনার খাব। তোমরা বরং খাওয়া দাওয়া

সেরে আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিও। এই বেয়ারা—একঠো ট্যাক্সি বোলাও—জল্‌দি।"

"বহুৎখু"—বলিয়া বেয়ারা ট্যাক্সি আনিতে গেল।

মিসেস লাহিড়ী নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "আহা, সুষমা ছুঁড়ির অদৃষ্টটা দেখ একবার! বিয়ের পর দু'বছর যেতে না যেতেই স্বামী গেল, মা ত আগেই গিয়েছিল, বাপও চল্ল! কি যে দশা হবে মেয়েটার কে জানে! আত্মীয় স্বজন কে কে আছে?"

"বাগবাজারে সুষমার মামারা আছে। সুরেশ তার শ্বশুর বাড়ীতে থেকেই কলেজে পড়তো কিনা। তারপর, আমি গেলাম বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে, সুরেশ ল-কলেজ জয়েন কল্লে।"

"ওর শ্বশুর বাড়ীতে?"

"শ্বশুর-শাশুড়ী ত আগে থেকেই ছিল না। দেওর ভাসুর টাসুর আছে বোধ হয়। কিন্তু সে কি এখানে? মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর গ্রামে। তাদের সংসারে গিয়ে পড়লে বউকে তারা ফেল্‌তে পারবে না বটে। কিন্তু সুষমা লেখাপড়া গান বাজনা নব্যতন্ত্রের মেয়ে, সেখানে বাস করা কি ওর পোষাবে? বিশেষ তারা গরীব গৃহস্থ। ও সেখানে গিয়ে তাদের ঘরও নিকোতে পারবে না, ধানও সিদ্ধ করতে পারবে না।"

মিসেস্ লাহিড়ী বলিলেন, "দেখ, এইগুলো কিন্তু বাপ মায়েদের ভারি অন্যায়। মেয়েকে যদি কলেজে পড়িয়ে মেমই ক'রে তুল্লি, তা হলে সেই রকম ঘর বরে তাকে দে—গরিবের ঘরে দিস্ কেন?"

"গরীবের ঘরে কি আর সাধে লোকে মেয়ে দেয়?—টাকায় জোর না থাকলে কাজেই দিতে হয়।

ওকালতী ব্যবসাতে কোনওদিন তেমন সুবিধে ত করতে পারেনি! তবে বাঙ্গালী ষ্টাইলে থাকে, খরচাপত্র কম, এই যা সুবিধে। নইলে ব্যবস্থা ত সুরেশের আমারই মত! তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে বৈত নয়!"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল ট্যাক্সি আসিয়াছে। লাহিড়ী সাহেব বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়াই, সেই পায়জামা সুটের উপরেই একটা ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া, বাহির হইয়া পড়িলেন। ট্যাক্সির নিকট গিয়া দেখিলেন, পত্রবাহক ভৃত্য সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুই এখনও রয়েছিস? আচ্ছা গাড়ীতে ওঠ, ড্রাইভারের পাশে বোস্।"—বলিয়া নিজেও আরোহণ করিয়া আদেশ দিলেন, "বৌবাজার।"

ট্যাক্সি ছুটিল। এই সময় লাহিড়ী সাহেবের ঘর গৃহস্থালীর কথা কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখি। আজ প্রায় বিশ বছর তিনি ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। তাঁহার নিজমুখেই প্রকাশ, তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে রিসিভারি কর্ম্ম পান। ব্রীফও মাঝে মাঝে দুই চারিটা যে পান, এমন নহে, কিন্তু পুরা দস্তুর সাহেবিয়ানার খরচ তাহাতে পোষায় না। বাড়িখানি তাঁহার নিজের নহে,—ভাড়ার। মোটর কিনিতে পারেন নাই, ট্যাক্সিতে আদালত যান। গৃহে তাঁহার স্ত্রী মাত্র। কোনও সন্তানাদি জীবিত নাই। একটা বাসনমাজা জলতোলা চাকর এবং একটা বেয়ারা আছে। ঝিকে ঘাগরা পরাইয়া তাহাকে আয়া বানাইয়াছেন। বাবুর্চ্চি আছে কিন্তু রাঁধে সে দিনের বেলায় ভাত, দাল, "ছেঁচকি কারি", মাছের ঝোল—বাঙ্গালীর খাদ্য সবই রাঁধে—তবে সব ব্যঞ্জনেই পেয়াঁজ দেয়, মায় মাছের ঝোলে পর্য্যন্ত। রাত্রে লুচি ভাজে, বেগুন ভাজে, কোনও দিন বা মাছের, কোনও

দিন বা পাঠার কালিয়া রাঁধে, ফাউল কারিও মাঝে মাঝে রাঁধে। সে সকল রান্না, ডিশের ভিতর ভরিয়াই টেবিলে আসে,—ছুরি কাঁটা চামচের সাহায্যেই ভক্ষিত হয়। মৃত্যুপথযাত্রী বাল্যবন্ধু সুরেশ বাবুও মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া খাইয়া যাইতেন। সুরেশ বাবু কুসংস্কার বর্জ্জিত আধুনিক হিন্দু। ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লেখান নাই সে হিসাবে লাহিড়ী সাহেবও হিন্দু। তবে তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়া, রাঢ়ী শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন—অবশ্য হিন্দুমতেই। আজকাল ত অনেকেই বলিতেছেন, ইহাতে জাতি যায় না এবং না যাওয়াই উচিত।

২

বৌবাজারে বন্ধুগৃহে পৌঁছিয়া লাহিড়ী সাহেব দেখিলেন, সুরেশ বাবুর দেহ যেন শয্যার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। কন্যা সুষমা পিতার পদতলে পাষাণ প্রতিমার মত বসিয়া। শয্যাপার্শ্বে চেয়ারের উপর একজন ডাক্তার এবং দুইজন বন্ধু—ইঁহারাও হাইকোর্টের উকিল, লাহিড়ী সাহেবেরও পরিচিত। কিয়দ্দূরে, মাদুর পাতিয়া বসিয়া সুরেশ বাবুর মুহুরী প্রৌঢ়বয়স্ক হরনাথ চক্রবর্ত্তী। ভৃত্য তাড়াতাড়ি লাহিড়ী সাহেবের জন্য একখানি চেয়ার আনিয়া দিল।

লাহিড়ী নিম্নস্বরে একজন উকীল বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুচ্চেন ?"

"হ্যাঁ—একটু আগেও জিজ্ঞাসা করছিলেন, লাহিড়ী এখনও এল না ? উইল করেছেন, আপনাকেই তার একজিকিউটার করেছেন। মুখে আপনাকে কিছু বলে যাবেন, সেই জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন।"

"ডাক্তার কি বলছেন ?"

নিদ্রিত বন্ধুর মুখ পানে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে লাহিড়ী সাহেব উঠিলেন। ইঙ্গিতে সুষমাকে ডাকিয়া, তাহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেলেন।

সোফার উপর নিজ পার্শ্বে সুষমাকে বসাইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "মা, সব বুঝছ ত ?"

সুষমা এবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "কি হবে জেঠামশাই ?"

লাহিড়ী সাহেব সুষমার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কেঁদ না মা, চুপ কর। ঈশ্বর যা করবেন, তাই হবে। তোমার মামাদের খবর দেওয়া হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, বড় মামার কাছে মুহুরী বাবুকে পাঠিয়েছিলাম।"

"কবে ?"

"আজ বেলা দুটোর পর। তার আগে ত বিশেষ কোনও ভয় আছে বলে জানতে পারিনি।"

"মামারা কি বলেছেন ? এখনও এলেন না ?"

"সন্ধ্যার পর আসবেন বলে দিয়েছেন।"

এই সময় একজন উকিল বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "আসুন মিষ্টার লাহিড়ী, সুরেশ বাবু জেগেছেন।"

লাহিড়ী তাড়াতাড়ি রোগীর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। চেয়ারে বসিয়া, বন্ধুর একখানি হাত

নিজ দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিলেন, "কেমন আছ ভাই, এখন ?"

সুরেশ বাবু কোনও উত্তর না করিয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া লাহিড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লাহিড়ী আবার বলিলেন, "কোনও কষ্ট হচ্চে কি ?"

রোগী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কষ্ট ? কৈ ? হ্যাঁ। গিরীন্, ভাই, আমি ত চল্লাম। একটা বিশেষ কথা—কি একটা কথা ছিল! হ্যাঁ তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।"

একজন উকিল বন্ধু দাঁড়াইয়া উঠিয়া অপর সকলকে বলিলেন, "চলুন না, আমরা একটু ও ঘরে যাই।"

রোগী ধীরে ধীরে একটি শীর্ণ হস্ত তুলিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "না—না—কেউ যেও না। থাক।"

উকিল বাবু আবার বসিলেন।

রোগী তখন কন্যার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "জল।"

সুষমা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া, ফীডিং কাপের সাহায্যে পিতাকে পান করাইয়া দিল।

জল পান করিয়া, রোগী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "গিরীন, ভাই, আমার সুষীকে আমি তোমার জিম্মায় দিয়ে যেতে চাই। ওর ভার তুমি নিতে পারবে ভাই ?"

লাহিড়ী বলিলেন, "নিশ্চয় ! ও যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমারও মেয়ে। আমার ত কোনও সন্তানাদি নেই, আমি ওকে নিজের মেয়ের মতন করেই পালন করবো, তার জন্যে তুমিত কিচ্ছু ভেবনা ভাই।"

রোগী বলিলেন, "তুমিই নাও। ও যেমন লেখাপড়া শিখ্ছে, তেমনি শিখতে থাকুক। ওর মার পনরো হাজার টাকা ছিল, সেই টাকাটা ওর জন্যে রেখে যাচ্চি। তাই থেকে ওর খরচ পড়া চালিও। একটি ভাল পাত্র দেখে ওর আবার বিয়ে দিও ভাই। ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়েছে—পুরো দুটি বছরও স্বামীর ঘর করতে পায়নি। ওর জীবনের কোনও সাধ আহ্লাদ ত মেটেনি। সেই জন্যেই ওকে আমি তোমার হাতেই দিয়ে যেতে চাই। ওর মামারা বড়লোক হলেও, গোঁড়া হিন্দু—তারা ওর বিয়ে দেবে না। ওর ভাশুর দেওররা, তাদের ত কথাই নেই ! তুমিই আমার মেয়েটিকে নিয়ে যেও ভাই,—নিয়ে গিয়ে, যাতে ওর ভাল হয়, যাতে ও সুখে থাকে, তাই কোরো—তা হলে পরলোকে আমি শান্তি পাব।"

কথাগুলি শেষ করিয়া, সুরেশ বাবু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং হাঁফাইতে লাগিলেন। একটু সামলাইয়া উঠিলে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, একটু বেদানার রস খাবেন ?"

ইঙ্গিতে সুরেশ বাবু সম্মতি জানাইলেন। দুই চামচ বেদানার রস পান করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এই সময় সংবাদ আসিল, বাগবাজার হইতে সুষমার মামারা আসিয়াছেন। সুরেশ বাবু ইঁহাদের আনিতে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। সুষমার দুই মামা ও তিন মামী উপরে উঠিয়া আসিলেন। সিঁড়িতে উঁহাদের পদশব্দ পাইয়া, ডাক্তারবাবু প্রভৃতিকে লইয়া লাহিড়ী সাহেব পাশ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুষমার বড় মামা অবিনাশ বাবু সেই কক্ষে আসিয়া বলিলেন, "হাঁহে গিরীন, সুরেশের এ রকম অসুখটা হয়েছিল, আগে আমাদের খবর দিতে নেই ?"

লাহিড়ী বলিলেন, "আগে কি আমারাই জানতে পেরেছিলাম ? পর্শুও ত আমি দেখে

গেছি, তখনও কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়নি।"

কিয়ৎক্ষণ কথবার্ত্তার পর, কল্য প্রাতেই আবার আসিবেন বলিয়া লাহিড়ী সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবিনাশ বাবুরা সকলেই রাত্রে এখানে থাকিবেন।

ভোর রাত্রে সুরেশ বাবুর আত্মা, দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া অনন্তের পথে উধাও হইল। লাহিড়ী সাহেব বেলা ৮টার সময় আসিয়া দেখিলেন, "বল হরি, হরিবোল" শব্দে শবাধার সিঁড়ি বাহিয়া নামান হইতেছে।

৩

সুষমার বয়স যখন ১১ বছর, সেই সময় তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। সুরেশ বাবুর বয়স তখন ৩৫ বৎসর মাত্র। বন্ধু বান্ধব সকলেই তখন পুনরায় বিবাহ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কয়েকজন "ডাগর" মেয়ের পিতাও তাঁহাকে এজন্য বিলক্ষণ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশ বাবু সম্মত হন নাই। ইতিপূর্ব্বে মেয়েকে তিনি বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখাইতেন। চাকর বামুন লইয়া বাসা,—তিনি আদালতে চলিয়া গেলে দীর্ঘ দিন মেয়েকে দেখে কে, তাই সুষমাকে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিন বৎসর পরে, গরীব গৃহস্থ ঘরের একটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র সুদর্শন যুবাকে পাইয়া, তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন।. মেয়েকে তখন অবশ্য স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইয়াছিল। ষোল বৎসর বয়সে সুষমার কপাল পুড়িল। মেয়েকে সুরেশ বাবু শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসিলেন। আবার তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সুষমা এখনও সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্রী, আগামী বৎসর তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার কথা .

বিধবা হইয়া, থান কাপড় পরিয়া রিক্ত প্রকোষ্ঠেই সুষমা শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়াছিল। কিন্তু মেয়ের সে বেশ দেখিয়া বাপের বুকে খড় বাজিল, তাই পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সুষমা সরু পাড় ধুতি, গলায় একটি সরু গোট হার এবং দুই হাতে দুই গাছি করিয়া চারিগাছি সোনার চুড়ি পরিল। হিন্দু বিধবার নিরম্বু একাদশী পিতা তাহাকে করিতে দিলেন না ;—বলিলেন, "তুই যদি মা নিরম্বু উপবাস করিস, তবে আমিই বা কোন্ লজ্জায় খাব ?" পিতা পুত্রী উভয়েই একাদশীর দিন ফল ও মিষ্টান্ন মাত্র গ্রহণ করিতেন। মাছ খাওয়াইবার জন্য কন্যাকে তিনি পীড়াপীড়ি করেন নাই, বিপত্নীক হইবার হইতে নিজে তিনি মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুঁৎমার্গের পথিক তিনি ছিলেন না। দুই তিন মাস পূর্ব্বেও তিনি লাহিড়ী-গৃহিণী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, কন্যা সহ তাঁহার টেবিলে বসিয়া নিরামিষ আহার করিয়া আসিয়াছিলেন।

মামা মামীরা উপস্থিত থাকিয়া, বৌবাজারের বাসাতেই সুষমাকে দিয়া তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইলেন। সুষমা লাহিড়ী সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই পরিবারভুক্ত হইয়া অতঃপর বাস করিবে, একথা উইলেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল। ইহা অবগত হইয়া মামারা কিন্তু বড়ই বিরক্ত হইলেন। একে ত ভাগিনেয়ীর কপালদোষে ইহকালটি তাহার নষ্ট হইয়াই গিয়াছে, তদুপরি, ম্লেচ্ছাচার-সম্পন্ন বিলাত ফেরৎ লাহিড়ী সাহেবের গৃহে অবস্থান করিয়া এবং সম্ভবতঃ পুনরায় বিবাহ (তাঁহারা বলিয়াছেন 'নিকা') করিয়া পরকালটিও তাহার নষ্ট হইয়া যায় ইহা তাঁহাদের অসহ্য বোধ হইল। কিন্তু তাঁহাদের গৃহিণীরা এক বাক্যে বলিলেন, "সেই ভাল, সেই ভাল। নিকুনে পড়ুনে গাইয়ে বাজিয়ে ঐ আগুনের খাপরা

কড়ে রাঁড়িকে আগলে থাকা কি সোজা কথা ? ও দায় যে আমাদের ঘাড় থেকে নেমেছে সে আমাদের ভাগ্যিই বলতে হবে।"

শ্রাদ্ধ শান্তি হইয়া গেলে, লাহিড়ী সাহেব উদ্যোগী হইয়া মৃত বন্ধুর জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া, দেনা পাওনা মিটাইয়া সুষমাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। মিসেস লাহিড়ী স্নেহ ও সমাদরে তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

৪

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুষমা বেথুন স্কুলে পড়িতেছে, স্কুলের গাড়ীতে যাতায়াত করে। তবে এখন পূজার ছুটি—সারাদিন সে বাড়ীতেই থাকে। তাহার বড় মামা অবিনাশ বাবু, মাঝে একদিন মাত্র আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন।

লাহিড়ী সাহেব সুষমার সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া তাহারই নামে হিসাব খোলাইয়া দিয়াছেন। তবে চেক-বহি খানি তিনি নিজের কাছে রাখেন। তাহার খরচ পত্রের হিসাবে প্রতিমাসে একখানি করিয়া চেক তিনি তাহাকে দিয়া সহি করাইয়া লন।

সুষমা যে হাজার পনেরো টাকার মালিক, ইহা হাইকোর্টে বার লাইব্রেরী ও উকীল লাইব্রেরীতে প্রচার হইতে দেরী লাগে নাই। সুষমার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্যই যে তাহার পিতা মৃত্যুকালে কন্যাকে লাহিড়ী সাহেবের জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেকে শুনিয়াছে। কিছু দিন হইতে হাইকোর্টের দুই চারি জন জুনিয়র ব্যারিষ্টার লাহিড়ী সাহেবের গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সুষমার নিকট তাহারা কেহই আমল পায় না। লাহিড়ী সাহেব তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তিনিও তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেন না। কারণ তিনি জানেন, এই যুবকগণের অবস্থা কাহারও তেমন ভাল নয় এবং সুষমার টাকার গন্ধেই তাহাদের এই ঘন ঘন যাতায়াত।

একদিন বিকালে স্বামী স্ত্রী।তে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সুষমা তখন তাহার সখী ললিতার গৃহে চা পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। সুষমা ও ললিতা এক ক্লাসে পড়ে। মিসেস্ লাহিড়ী বলিলেন, "হ্যাঁগা, সুষীর বিয়ের কি করছ ?"

লাহিড়ী বলিলেন "তেমন মনের মত পাত্র কৈ ?"

"চেষ্টা করলে পাত্র কি আর মেলে না ?"

"এ ত সাধারণ হিন্দু ঘরের মেয়ের বিয়ে নয় যে ঘটক লাগিয়ে পাত্র স্থির করব। লভ্ ম্যারেজ (প্রেমের বিবাহ) ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে ? কোনও ছেলের সঙ্গে যদি ওর ভালবাসা জন্মে যায়,—সে ছেলে নিজেই তখন বিয়ের প্রস্তাব করবে—তাই গুণাগুণ তার সাংসারিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে, আমরা যদি ভাল বুঝি, তখন মত করবো।"

"ঐ যে কুমুদ চ্যাটার্জ্জি আসে, ও ছেলেটি ত মন্দ নয়। সুষীর সঙ্গে ওর একটু মেলামেশায় একটু উৎসাহ দিলে হয় না ?"

"ও তো এই সবে বছর তিনেক হল ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। এখনও কিছুই করতে পারেনি। বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। বিয়ে ক'রে সংসার চালাবে কোথা থেকে ?"

"আর, বিনয় সেন ?"

"বাপের বিষয়" সম্পত্তি কিছু পেয়েছিল বটে, কিন্তু শুনি, তার বেশীর ভাগই উড়িয়েছে। পাঁড় মাতাল !"

"আর ঐ যোগেশ মজুমদার ?"

"ওর মা বাপ মহা হিন্দু। বিষয় আশয় বেশ আছে বটে ; কিন্তু ছোঁড়াট বড় অলস, কিছু করতে চায় না। বাপের কাছে মাসহারা পায়, তাইতে সাহেবিয়ানা চলে। ওর বাপের চেষ্টা, খাঁটী হিন্দু মতে ওর বিয়ে দেয়। তাঁর অমতে যদি বিধবা বিবাহ করে, বাপ হয় ত মাসহারাটি বন্ধ ক'রে দেবে, তখন খাবেন কি ?

শুনিয়া লাহিড়ী-গৃহিণী নীরবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ তেমন মনের মতন পাত্র একটি পাওয়াই যায় যদি, সুষী আবার বিয়ে করতে রাজি হবে ত ? এত চেষ্টা করেও একে মাছ মাংস খাওয়াতে পারা গেল না। তারপর তোমারই কাছে ত শুনেছি, আয়াকে দিয়ে ফুল আনায়, রোজ ঘরের দোর বন্ধ ক'রে ঠাকুর পুজো করে। ওইক ফের বিয়ে করতে রাজি হবে ? তুমি বরঞ্চ আগে, ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, ওর মনটী বুঝে দেখ। এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কয়েছিলে কোনও দিন ?

"না, তা কইনি বটে। কিন্তু মনের মত বর গেলে বিয়ে করতে ওর আপত্তি হবে ব'লে ত বোধ হয় না। এত লেখা পড়া করেছে, জুতো মোজা পোরে বেড়াচ্চে, টেবিলে ব'সে বাবুর্চ্চির রান্না খাচ্চে—তা মাছ মাংস নাই খাক্, বিলেতেও ত কত ভেজিটেরিয়ন (নিরামিষাশী) আছে—বিধবার বিয়ে করাকে নিশ্চয়ই ও দূষ্য ব'লে মনে করবে না।"

লাহিড়ী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ওটা মনে করা কিন্তু তোমার ভুল। জুতো মোজা প'রে বেড়ায়, বাবুর্চ্চির রান্না খায়, ওগুলো সব বাইরের জিনিষ। কোন্‌টা কর্ত্তব্য, কোন্‌টা অকর্ত্তব্য, কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম,—এ সব হল অন্তরের জিনিষ। বাইরের আচারের সঙ্গে তার যে বড় বেশী যোগ আছে তা নয়। যা হোক, কথায় বার্ত্তায় তুমি ওর মনটি বুঝে দেখবার চেষ্টা কোরো।"

"আচ্ছা তা আমি করবো।"

এই সময় সুষমা ফিরিয়া আসিল। তাহার হাতে ফিকা নীল ফিতায় বাঁধা সুন্দর একটি বাক্স। আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জেঠাইমা, তোমার জন্যে আমি একটি গন্ধ এনেছি।"—বলিয়া বাক্সটি মিসেস্ লাহিড়ীর হাতে দিল।"

মিসেস্ লাহিড়ী উহা খুলিয়া বলিলেন, "বাঃ, শিশিটি কি সুন্দর ! কোথায় কিনলি মা ?"

"আমরা যে মার্কেটে গিয়েছিলাম।"

"তোরা কারা ? কে কে গিয়েছিলি ?"

"ললিতা, আমি, আর ললিতার দাদা ডক্টর ঘোষ।"

"কত দাম নিলে ?"

"সাত টাকা। গন্ধ অবশ্য কেমন হবে জানিনে, কিন্তু বাক্সটী দেখে আমার ভারি পছন্দ হ'ল, কিনে ফেল্লাম। আমার সঙ্গে টাকা ছিল, দাম দিতে গেলাম, কিন্তু ডক্টর ঘোষ কিছুতেই আমায় দিতে দিলেন না। মনে করলাম তা হ'লে ফিরিয়ে দিই, নেবো না। কিন্তু হয়ত সেটা অভদ্রতা হবে, তাই অগত্যা নিতে হ'ল। আমাকেও এটা কিনে দিলেন, ললিতাকেও ঠিক এই রকম একটা কিনে দিলেন। আচ্ছা জেঠামশাই, নিয়ে অন্যায় ক'রেছি কি ?"

লাহিড়ী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ফিরিয়ে দিলে অসৌজন্য হ'ত বৈকি !"

গৃহিণী বলিলেন, "ওরাই তোকে নামিয়ে দিয়ে গেল বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"ওদের উপরে আনলিনে কেন, চা টা খেয়ে যেত।"

"চা আমরা ওঁদের বাড়ী থেকেই খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তবু আমি বল্লাম চলুন, উপরে চলুন, জেঠাইমা জেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না? ডক্টর ঘোষ বল্লেন, "তোমার জেঠাইমা জেঠামশাইকে আমার নমস্কার দিও। আমি আর একদিন এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রব।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমরা এখনও চা খাইনি। যাও ত মা, আমাদের চা দিতে বল; আর গন্ধটীও আমার ঘরে রেখে এস।"

সুষমা চলিয়া গেল, মিসেস লাহিড়ী স্বামীর প্রতি কুটিল চাহনি হানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিনেল, "কি গো? হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, কিছু বুঝতে পারছ?"

লাহিড়ী সাহেব উত্তর করিলেন, "কিছু না। ঐ ঘোষ ছোকরা কি রকম ডাক্তার? পুরো নাম কি?"

"সুষীর কাছে শুনেছি, তার নাম সরোজনাথ—সে বিলেত ফেরৎ ডাক্তার।"

"বয়স কত?"

"তা শুনিনি।"

অল্পক্ষণ পরে সুষমা ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাদের নিকট বসিল।

৫

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলিতে লাগিল।

ইহারা দেখিলেন, সরোজ ছেলেটি ভাল। তায় বাপ মা জীবিত নাই। ঐ বোন্ ললিতা, আর, একটি ছোট ভাইও আছে। লাহিড়ী সাহেব খবর লইয়া জানিলেন, সরোজ যদিও তিন চারি বৎসর মাত্র বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, তথাপি ইহারই মধ্যে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে। ক্রমে ইহাও লক্ষ্য করিলেন, সরোজের পক্ষে সুষমা একটা আকর্ষণের বস্তু।

মাস দুই পরে, একদিন সরোজ আসিয়া লাহিড়ী-গৃহিণীর নিকট বলিল, "আপনারা কি সুষমার আর বিয়ে দেবেন না?"

গৃহিণী বলিলেন, "দেবারই ত ইচ্ছে। ওর বাবা এই জন্যেই ত ওকে আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। নইলে ওর মামারা অবস্থাপন্ন লোক,—সেইখানেই ত ওর থাকবার কথা। কিন্তু তাঁরা আবার গোঁড়া হিন্দু কিনা! এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ, বাবা? তোমার সন্ধানে কি কোনও ভাল পাত্র আছে?"

সরোজ বলিল, "পাত্র একটি আছে—তবে ভাল কি মন্দ সেটা অবশ্য আপনাদেরই বিচার্য্য।"

"কে বল দেখি?"

সরোজ একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে কি আপনি সুষমার যোগ্য পাত্র মনে করবেন?"

গৃহিণী, খুব বিস্মিত হইয়াছেন এইরূপ ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি? তুমি সুষীকে বিয়ে করবে? সে ত তার পরম সৌভাগ্য, বাবা! কিন্তু সুষীর মন কি তুমি বুঝেছ?"

"না, সে চেষ্টাই আমি এখনও করিনি মিসেস্ লাহিড়ী। আপনাদের অনুমতি না পেলে—"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত ঠিক। তুমি যেমন ভদ্র ছেলে, তার উপযুক্ত কাজই করেছ। আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি। উনি যে রকম বলেন, তোমায় জানাবো।"

"তাহ'লে, দয়া ক'রে আজ কি মিষ্টার লাহিড়ীর মতটা জেনে রাখবেন ? কাল আবার এ সময় আমি আস্বো কি ?"

মিসেস লাহিড়ী মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, "বাবাজীর যে আর তর্ সইছে না দেখছি ! প্রকাশ্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ ত, আমি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাখবো এখন, কাল আবার তুমি এস।"

সরোজ আশান্বিত হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

রাত্রে নিভৃতে গৃহিণী স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িলেন। লাহিড়ী বলিলেন, "সরোজ যে সুষীর দিকে খুব ঝুঁকেছে, তা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত বটেই। কেমন তোমার কোনও অমত নেই ত !"

লাহিড়ী বলিলেন, "ছেলেটি ত বেশ ভালই। ডাক্তারীতে এরই মধ্যে বেশ পশারও ক'রে নিয়েছে। সুশিক্ষিত—সচ্চরিত্র—কিন্তু সুষী বেটী কি রাজী হবে ?"

"কেন রাজি হবে না ? এর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথায় পাবেন শুনি !"

"ভাল মন্দর কথা আমি বলছিনে। আমার কিন্তু মনে হয় ওর কেবল বাইরেটাই আধুনিক, কিন্তু ভিতরটা নিতান্ত সেকেলে ; বিধবার আবার বিয়ে করা, ও হয়ত মহাপাপ ব'লে মনে করে। তা যদি না হত, তবে ও মাছ মাংসও ছাড়তো না, একাদশীতে ফলমূলও খেত না, আর লুকিয়ে ঠাকুর পুজোও করত না।"

"বেশ ত, সরোজ চেষ্টাই করুক না।"

"হ্যাঁ—সরোজকে বোলো, সে আগে বেশ ক'রে ওর মন বুঝে দেখুক। সরোজ যেমন ওকে ভালবেসেছে, সুষীও যদি তাকে সেই রকম ভালবেসে থাকে, তাহলে আর কথা কি ?"

"তা হলে ঐ কথাই সরোজকে বলি ?"

"হ্যাঁ, বোলো।"

দিন পনেরো পরে সুষমা একদিন মিসেস্ লাহিড়ীকে বলিল, "পর্শু রবিবার বিকেলে ললিতার দাদা ললিতাকে আর তার ছোট ভাইকে আলিপুরে ফ্লাওয়ার শো (পুষ্প-প্রদর্শনী) দেখাতে নিয়ে যাবেন। ললিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুই যাবি ভাই, তাহলে তোকে আমরা তুলে নিয়ে যাই। আমি বলেছি, আচ্ছা, জেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা করে কাল বলবো।"

গৃহিণী সস্নেহে সুষমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বেশ ত। তা যেও মা। আর, ওদের দু'জনকে নেমন্তন্ন কোরো, শো থেকে ফিরে, রাত্রে এখানে এসে খাওয়া দাওয়া ক'রে যাবে।"

রবিবার বিকালে সরোজ আসিল, কিন্তু ললিতা কিংবা তার ছোট ভাই আসে নাই। বলিল, ললিতাকে এবং ছোট ভাইকে মাসীমা নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন, আজ রাত্রে সেখানে তারা থাকিবে।

মিসেস্ লাহিড়ী বলিলেন, "তা হ'লে আর কি হবে ?"

সরোজ বলিল, "সুষমাকে নিয়ে যেতে পারি ?"

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "বেশত নিয়ে যাও।"

সুষমা বলিল, "আজ থাক্‌না জেঠাইমা। অন্য একদিন গেলেই ত হবে।"

সরোজ বলিল, "আজ কিন্তু বিশেষ ক'রে গোলাপ ফুলেরই এগ্‌জিবিশন। এটা মিস্ করা উচিত নয়।"

সুষমা বলিল, "তা হলে তুমিও চল জেঠাইমা।"

"আমার কি সময় আছে মা ? কত কাজ আমার পড়ে রয়েছে, তাছাড়া উনিও বাড়ী নেই। যাও না, সরোজবাবুর সঙ্গে গিয়ে তুমি ফুল দেখে এস। সরোজ, ফিরে এসে এইখানেই খাবে ত তুমি ?"

"হ্যাঁ খাব বৈকি মিসেস্ লাহিড়ী।"

সুষমা নিতান্ত অনিচ্ছায় বেশ পরিবর্ত্তন জন্য উঠিয়া গেল।

এই সুযোগে, সরোজ বলিল, "দেখুন, অনেক চেষ্টা করেও ওর মনের কথা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারলাম না।"

গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তারপর বলিলেন, "ওঁর পরামর্শে চলতে গিয়েই ত এ রকম হল। নইলে এতদিন কোন্‌কালে যাহোক একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত।"

"আমার প্রতি ওর যে মন আছে, তার কোনও লক্ষণ আপনি কি বুঝতে পারেন ?"

"ও বড় চাপা মেয়ে। ও সবে আর দরকার নেই। আমি নিজে বরং আজ রাত্রে খোলাখুলি ওকে জিজ্ঞাসা করি।"

সরোজ মিনতির স্বরে বলিল, "আমি চলে গেলে, তারপর জিজ্ঞাসা করবেন।"

"বেশ, তাই হবে।"

৬

লাহিড়ী সাহেব সস্ত্রীক ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পর সুষমাকে লইয়া সরোজ ফিরিয়া আসিল। সুষমার হস্তে গোলাপ ফুলের মস্ত বড় একটা সাজি, তাহাতে নানা আকার ও বর্ণের ফুল, ফার্ণ-পাতা সহযোগে সজ্জিত। লাহিড়ী সাহেব ও তাঁহার গৃহিণী পর্য্যায়ক্রমে সাজিটি হাতে লইয়া পরীক্ষা ও আঘ্রাণ করিয়া, উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "সরোজ, তুমি মুখ হাত ধোবে না ?"

"হ্যাঁ, ধোব।"

লাহিড়ী সাহেব বেয়ারাকে ডাকিয়া সরোজকে গোসলখানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। সরোজ চলিয়া গেল।

লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত নিলে ফুলগুলো রে সুষী ?"

"সাত টাকা। কিনে, আমি দাম দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সরোজবাবু কিছুতেই আমায় দাম দিতে দিলেন না। একবার ভাবলাম, তবে থাক্—নিয়ে কাজ নেই। আমার মনে হল, সেটা হয়ত একটু অভদ্রতা হয়, তাই অগত্যা নিলাম। অন্যায় করেছি জেঠামশাই ?"

"না, অন্যায় করনি মা !"—বলিয়া লাহিড়ী সাহেব পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি

কি বল গো ?"

গৃহিণী বলিলেন, "না নিলেই অন্যায় হত।" যাও মা তুমি কাপড় চোপড় বদলাওগে—তারপর ফুলগুলি, কয়েকটা ফুলদানীতে জল দিয়ে বেশ ক'রে সাজিয়ে ফেলো।"

পনেরো মিনিট পরে সরোজ ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিল। আর কিছুক্ষণ পরে সুষমাও আসিল—তার হাতে দুটি গোলাপ। একটি জেঠাইমার চুলে পরাইয়া দিল, একটি জেঠামহাশয়ের কোটে বট্‌ন-হোল করিয়া দিতে লাগিল।

লাহিড়ী সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি বুড়ো মানুষ আমার কি সাজে রে বেটী ? সরোজের কোটে পরিয়ে দে।"

সুষমা কিন্তু শুনিল না, জেঠামহাশয়ের কোটেই ফুলটি পিন দিয়া আটকাইয়া দিল।

লাহিড়ী সাহেব উহা খুলিয়া, হাসিতে হাসিতে সরোজের কোটে লাগাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া গৃহিণী নিজের খোঁপার ফুলটি সুষমার চুলে গুঁজিয়া দিলেন।

"বাঃ—একি ?"—বলিয়া সুষমা আর দুইটি ফুল লইয়া, জেঠামহাশয় ও জেঠাইমাকে অলঙ্কৃত করিল।

* * *

আহারান্তে, রাত্রি ১০টার সময় সরোজ বিদায় গ্রহণ করিল। লাহিড়ী সাহেবও রাতকাপড় পরিবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সুষী বলিল, "আমিও তা হলে শুইগে জেঠাইমা !"

"হ্যাঁ মা। চল্—আমিও তোর ঘরে যাচ্ছি,—একটু কথা আছে।"

সুষমার শয়ন কক্ষে গিয়া, একটা চেয়ারে বসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সরোজ ত মা মহা বায়না নিয়েছে।"

নিজ শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সুষমা বলিল, "কি বায়না জেঠাইমা ?"

"তোকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছে !"

কথাটা শুনিবামাত্র সুষমা চক্ষু অবনত করিল। গৃহিণী দেখিলেন, তাহার মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। ক্ষণপরে সুষমা বলিল, "তা হলে, তিনি ক্ষ্যাপার মত কাযই করেছেন জেঠাইমা !"

"কেন ?"

"কারণ, বিয়ে ত আমি করবো না ?"

"কেন করবে না বাছা ? তোমার এই কাঁচা বয়স ; ভাল ঘর বর পেলে বিয়ে ত করাই উচিত। কেন, সরোজকে কি তোমার পছন্দ হয় না ? বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, দেখতেও ভাল, নিজে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করছে। এর চেয়ে ভাল পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে মা ?"

সুষমা বলিল, "সে কথা নয় জেঠাইমা। কিন্তু আমি যে—বিধবা !"

"কেন, বিধবা বিবাহ কি তুমি তবে ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত মনে কর না ? লেখাপড়া শেখার ফল কি হল তবে ?"

"সকল বিধবার পক্ষে আবার বিবাহ করা অধর্ম্ম বা অন্যায় বলে আমিও মনে করিনে জেঠাইমা।"

"তবে কেন তুমি বিয়ে করতে চাও না বাছা ?"

সুষমার মুখে আসিয়াছিল, "কারণ, আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি, আর যতদিন বেঁচে থাক্‌বো, বাস্‌বো।"—কিন্তু একথা বলিতে তাহার লজ্জা করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "আপনি ত জানেন জেঠাইমা, আমার মা যখন চ'লে গেলেন, কতলোক ত বাবাকে ফের বিয়ে করার জন্যে বলেছিলেন। বাবার তখন মাত্র ৩৫ বৎসর বয়স—পুরুষ মানুষের পক্ষে সেটা পূর্ণ যৌবন-কাল। কিন্তু বাবা ত বিয়ে করেন নি। বাবার ঘরে, মার যে অয়েলপেন্টিং ছবিখানি টাঙ্গানো থাকতো, বাবা রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে, মার সেই ছবিখানি ফুল দিয়ে সাজাতেন—ব্যারাম হবার পরও কয়েকদিন তার অন্যথা হয় নি। বাবা যদি আবার বিয়ে করতেন, তা হলে কেউ ত তাঁকে বলতে পারতো না যে তিনি অন্যায় বা অধর্ম্ম করলেন।"

লাহিড়ী-গৃহিণী অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ সুষমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার কথাগুলির তাৎপর্য্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "তোমার বাবা, তোমার মাকে নিয়ে কত বচ্ছর ঘরকন্না করেছিলেন—কিন্তু তুমি ত বাছা, তোমার স্বামীর সঙ্গ পুরো দুটি বছরও পাওনি !"

সুষমা, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। কোনও উত্তর করিল না।

গৃহিণী আরও কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিলেন। সুষমার প্রতি তাঁহার মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বলিলেন, "তোমার বাবা, তোমার মাকে বড্ড ভালবাসতেন তা আমরা জানতাম। তেমার মার মৃত্যুর পর কিছুদিন অবধি তিনি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, একটা কথা আজ তোমায় জিজ্ঞাসা করি। তুমি রোজ আয়াকে দিয়ে ফুল আনাও, আমরা মনে করতাম, লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ঠাকুর পুজো করে হিঁদুয়ানী বজায় রাখ। তুমিও কি তোমার বাবার মতন—"

সুষমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমার স্বামীর একখানি ফোটোগ্রাফ আমার কাছে আছে।"

গৃহিণী আরও কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "আচ্ছা মা রাত হল, শোও এখন। এ বিষয়ে আর কখনও আমি তোমায় অনুরোধ করবো না। তুমি আমার উপর রাগ কোরো না মা !"

"না জেঠাইমা, রাগ করবো কেন ? আপনি ত ভাল ভেবেই বলেছিলেন। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না, জেঠাইমা।"—বলিয়া সুষমা গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

জেঠাইমা চলিয়া গেলে সুষমা দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া, যে দেরাজে তার মৃত স্বামীর ছবি থাকিত, উহা খুলিল। ছবিখানির চারিদিকে অদ্য প্রাপ্ত তাজা গোলাপ ফুল সাজানো রহিয়াছে। ফুলগুলি সমস্ত তুলিয়া লইয়া সুষমা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল। বস্ত্রাঞ্চলে ছবিখানি বেশ করিয়া মুছিয়া, উহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—আমি ত জানতাম না যে ফুলগুলোর সঙ্গে অলক্ষ্যে একজনের বাসনার কালি মাখানো আছে।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পাদবিকের পাদুকা

বছর-কয়েক আগে পশ্চিম থেকে কলকাতায় ফিরছিলুম।

মধ্যম-শ্রেণীর কামরা। ভিতরে অসম্ভব ভিড়। সকলে গলাগলি, জড়াজড়ি ক'রে ব'সে আছি—বিড়াল-কুকুরের ছানার মত।

কোন্ একটা ষ্টেশনে—নাম মনে নেই—গাড়ী এসে থামল।

একটি মোটাসোটা ভদ্রলোক, তাড়াতাড়ি নিজের চেয়েও মোটাসোটা পোঁটলার পর পোঁটলা এবং দুটো প্যাঁটরা নিয়ে ষ্টেশনে নামতে না নামতেই ইঞ্জিনের 'কু' শোনা গেল।

'প্ল্যাটফর্ম্মে' নেমেই মোটা ভদ্রলোকটি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কি, আমি কার জুতো পরেচি ?"

গাড়ীসুদ্ধ লোক আঁৎকে উঠে আপন আপন পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কার শ্রীচরণ আভরণ-শূন্য হয়েছে !

গাড়ী খুব ধীরে ধীরে চলতে সুরু করল। মোটা ভদ্রলোক যথাসাধ্য লাফ মেরে পা-দানের উপরে উঠে মহা ব্যস্তভাবে করুণ স্বরে বললেন, "আমার জুতো, আমার নতুন জুতো ! দিন মশাই, শীগ্‌গির দিন !"

কামরার ভিতর থেকে হঠাৎ একটি যুবক লাফিয়ে উঠে মোটা ভদ্রলোককে প্রাণপণে টানতে টানতে উপরে তুলে ফেললেন।

ভদ্রলোক বললেন, "আরে, আরে, গাড়ী ছেড়ে দিয়েচে যে ! আমার মাল !...আমার জুতো !"

যুবকটি বললেন, "আমার জুতো প'রে আপনি নেমে যাচ্ছিলেন যে মশায় ? বেড়ে মজার লোক তো আপনি ? খুলুন আমার জুতো !"

ভদ্রলোক পা থেকে তাড়াতাড়ি পরের জুতো খুললেন, এবং নিজের জুতোও খুঁজে পেলেন, কিন্তু গাড়ী থেকে তাঁর নামা আর অসম্ভব। কারণ ট্রেন তখন মাঠের ভিতর দিয়ে হু-হু ক'রে ছুটছে।

তার মাল-পত্তর অসহায় অবস্থায় ষ্টেশনেই প'ড়ে রইল। ভদ্রলোকের কাঁদো-কাঁদো মুখ আজও আমি ভুলি নি।....

একটিমাত্র গল্প বললুম। কিন্তু এমন পাদুকা 'ট্রাজেডি' আছে অসংখ্য।

আমরা সকলেই নিমন্ত্রণ খেতে ভালোবাসি। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে লুচি-তরকারি যে পেটের ভিতরে রাখতে হয়, সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু পায়ের জুতো যে ঠিক কোথায় রাখা উচিত, আজও তার মীমাংসা হয় নি। মহা মহা হিন্দুদের অনেকেই চামড়ার জুতো সঙ্গে নিয়েই নির্ব্বিকার চিত্তে উদরদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা 'ধর্ম্মে'র চেয়েও বড় মনে

করেন পাদুকাকে। কারণ জুতোহীন পায়ে জামা-কাপড় প'রে পথে চলা নাকি ভদ্রলোকের কাছে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক।

জুতোকে এক জায়গায় ত্যাগ ক'রে দূরে গিয়ে যদি খেতে বসা হয়, তাহলে সামনে রাজার ভোগ থাকলেও প্রাণের মধ্যে আরামটি আর থাকে না। লুচি-কালিয়া খেতে-খেতেই মন পড়ে থাকে সেই অনিচ্ছায় পরিত্যক্ত পাদুকাযুগলের প্রতি। কারণ প্রত্যেক ভোজ-স্থানেই এমন কয়েকজন সন্দেহজনক ভদ্রবেশধারীর আবির্ভাব হয়, যাঁরা বিনা নিমন্ত্রণেই পরের বাড়ীতে পাত পাততে আসেন এবং যাবার সময়ে পরম অসঙ্কোচেই নিজেদের ছেঁড়া জুতা ফেলে অপরের নতুন জুতা অনুগ্রহ ক'রে পায়ে প'রে বিনা-সমারোহে অদৃশ্য হন।

এ-সম্বন্ধে একটি গল্প শুনুন।

কলকাতার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাড়ীতে উৎসব হচ্ছে। নিমন্ত্রিতরা খেতে ব'সেছেন।

আহারের শেষে এক ভদ্রলোক কিছুতেই আর নিজের জুতা খুঁজে পেলেন না।

তিনি শেষটা হতাশ ভাবে বললেন, "এখন উপায় ? খালি পায়ে কেমন ক'রে বাড়ী যাই।"

কর্ম্মকর্ত্তা তাঁকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, "ভাবচেন কেন ? ওখানে তো আরো অনেক জুতো রয়েচে, যে-জোড়া পাগে লাগে চুপিচুপি প'রে চ'লে যান !"

ভদ্রলোক অগত্যা তাঁরই কথামত কাজ করলেন।

সর্ব্বশেষে দেখা গেল একজোড়া ছেঁড়া জুতার মালিক নেই।

ইতিমধ্যে কর্ম্মকর্ত্তার নূতন জামাই এসে নিজের জুতা খুঁজতে লাগলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা বললেন, "জুতা পাচ্চ না, বাবাজী ?"

—"আজ্ঞে না। আপনি যে পাম্পস্ু দিয়েছিলেন, তাই প'রেই এসেছিলুম।"

কর্ম্মকর্ত্তার চক্ষু স্থির ! কারণ, তিনি বুঝলেন যে, তাঁরই পরামর্শের ফলে তাঁর জামাইয়ের জুতো অদৃশ্য হয়েছে। সে কথা বুদ্ধিমানের মতন চেপে গিয়ে তিনি বললেন, "আচ্ছা বাবাজী, এখন তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও, কাল সকালেই আমি আবার বিলিতি দোকান থেকে নতুন জুতো আনিয়ে দেব।"

এখানে একজন অপ্রকাশ্যে নিজের ছেঁড়া জুতো ফেলে পরের ভালো জুতো প'রে চ'লে গেল, সে ঠকল না। আর একজন প্রকাশ্যে জামাইয়ের নতুন 'পাম্পপ সু' প'রে চ'লে গেলেন, তিনিও ঠকলেন না। পরামর্শ দিতে গিয়ে ঠকলেন কর্ম্মকর্ত্তা নিজেই। এমন বিভ্রাম বড়-একটা ঘটে না।

কিন্তু এর চেয়েও চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, আর এক নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে।

সেখানে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে আহারাদি শেষ ক'রে উঠে, বরযাত্রীদের কেউই আর নিজেদের পাদুকা আবিষ্কার করতে পারেন নি !

কোন্ এক লব্ধ সুযোগে চোর একসঙ্গে সমস্ত জুতাই সরিয়ে ফেল্‌তে পেরেছিল ! এমন আশ্চর্য্য চুরির কথা শোনা যায় না।

কিন্তু বরযাত্রীদের চেয়েও মুস্কিলে পড়লেন, বেচারী কন্যাকর্ত্তা ; কারণ এদেশী বরযাত্রীদের প্রত্যেকেই এক-একটি মস্ত 'অটোক্রাট' ; সুতরাং কন্যাকর্ত্তার এত বড় অসাবধানতা তাঁরা কিছুতেই ক্ষমা করতে রাজি হলেন না।

আপনারা শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে, কন্যাকর্ত্তাকে সেই রাত্রেই প্রত্যেক

বরযাত্রীর শ্রীচরণের পাদুকা যোগাতে হয়েছিল। তবে সেগুলি চামড়ার নয়, রবারের জুতো। বরযাত্রীরাও অগত্যা পণ্ডিতের মতন অর্দ্ধেক ত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করেছিলেন।

জুতা-চোরেরা অনেক সময়ে রীতিমত মস্তিষ্ক পরিচালনাও করে। চুরি যে সত্যসত্যই একটা আর্ট এবং "বড় বিদ্যা" নীচের কাহিনীটি পড়লে সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকে না।

আমাদের এক পরিচিত ব্যক্তির বৈঠকখানায় প্রায়ই গান-বাজনার আয়োজন হ'ত। পাড়ার ভদ্রলোকরা নিয়মিতভাবে সেখানে আসতেন এবং আসর জমিয়ে তুলতেন।

হঠাৎ এক বিপদ উপস্থিত হ'ল। আসর থেকে উঠে অনেকেই দেখতেন, তাঁদের পাদুকা অন্তর্হিত হয়েছে।

রাস্তার ধারে বৈঠকখানা। গান-বাজনার সময়ে অনেক অচেনা লোক অনাহুত বা রবাহুত হয়ে ঘরের ভিতরে এসে বা দরজার কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে গান-বাজনা শুনতেন। তাঁদের তাড়িয়েও দেওয়াও চলে না, অথচ সেই দলের ভিতরেই যে "বড় বিদ্যা"য় ওস্তাদ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আত্মগোপন ক'রে থাকেন, তাও একরকম নিশ্চিত ব্যাপার।

প্রথম কয়েক দিন অপরিচিত ব্যক্তিদের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেও কোন ফল হ'ল না,—পাদুকা ঠিক নিয়মিত ভাবেই অন্তর্হিত হ'তে লাগল।

শেষটা একটি ভদ্রলোক দৈবগতিকে চোরকে পাকড়াও ক'রে ফেললেন।

একটি লোক নিয়ম করে গান শুনতে আসত—হাতে একে কাপড়-ঢাকা বড় খাঁচা নিয়ে।

খাঁচাটিকে সামনে রেখে দরজার কাছে ব'সে একমনে সে গান শুনত এবং মাঝে মাঝে খাঁচার পাখীর উদ্দেশে সস্নেহে বলত—"পড় বাবা আত্মারাম! কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!"—প্রভৃতি।

তার উপরে সন্দেহ করবার কোনই কারণ ছিল না। কারণ ভদ্রলোকদের পাদুকার কাছ থেকে সে অনেক তফাতেই ব'সে থাকত।

একদিন গান খুব জ'মে উঠেছে এবং সকলে গায়কের মুখের পানে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বাহবা দিচ্ছেন। এমন সময়ে দৈবগতিকে হঠাৎ একজনের চোখে পড়ল, একপাটি জুতা আপনি 'সজীব' হয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে!...ভদ্রলোক বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন, জুতাটি সেই খাঁচার কাছে গিয়ে অদৃশ্য হ'ল।

—সঙ্গে সঙ্গে চোর ধরা পড়ল। পাখীর খাঁচার আবরণ সরিয়ে দেখা গেল, তার ভেতরে পাখী নেই, কিন্তু পাদুকা রয়েছে একাধিক!

চোর এখানে হাত-সূতোর মুখে বঁড়শী লাগিয়ে পাদুকা 'শীকার' করত।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটি চায়ের দোকানে চেয়ারের উপরে পা তুলে ব'সে ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে, হঠাৎ একদিন পা নামিয়ে দেখলেন, তাঁর জুতা-জোড়া নিশ্চয়ই মালিকের অন্যমনস্ক অবস্থায় কাজ হাঁসিল ক'রে স'রে প'ড়েছিল। কিন্তু বন্ধুবর মণিলালের জুতা-চুরির রহস্য আজ-পর্য্যন্ত বুঝতে পারা গেল না।

'ইন্ডিয়ান পাবলিসিং হাউসে' আগে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক একত্র হয়ে গল্পগুজব করতেন।

শ্রীযুক্ত মণিলালও একদিন চেয়ারের উপর থেকে পা নামিয়ে আর নিজের জুতা খুঁজে পেলেন না।

অথচ সেই বন্ধু-সভার মাঝখান থেকে জুতা চুরি যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ চোর যে রাস্তা থেকে দোকানে উঠে, সামনে খোলা জায়গাটা পার হয়ে, সকলের সুমুখ দিয়ে মালিকের চক্ষে বেমালুম ধূলি নিক্ষেপ ক'রে পাদুকা নিয়ে প্রস্থান করেছে, কোনমতেই তা মনে করা চলে না। কিন্তু মণিলালকে সেদিন যে শূন্যপদে গৃহে ফিরতে হয়েছিল, এটা একেবারে ডাহা সত্যকথা।

ছেলেবেলায় যাত্রা শুনতে গিয়ে একাধিক-বার জুতা হারিয়েছি এবং পিতামাতার কাছে নির্দ্দয় ভাবে শাসিত হয়েছি। আমার এক বাল্যবন্ধু এই ভাবে পাদুকা থেকে বঞ্চিত হয়ে বড়ই মুস্কিলে প'ড়েছিল, তাও মনে আছে। নগ্নপদে বাড়ীতে ফিরলে পিতার বেত্র কি-রকম সশব্দে আস্ফালন করবে, কল্পনানেত্রে তা নিরীক্ষণ ক'রে তিন চার দিন সে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল। এ-রকম জুতা হারানো খুব সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এম্নি সাধারণ ঘটনা সময়ে সময়ে কি-রকম অসাধারণ প্রহসনের উৎপত্তি হয়, তারই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়ীতে আগে "বিচিত্রা" নামে একটি বিখ্যাত সাহিত্য-সভা ছিল। প্রতি সপ্তাহেই সেখানে গান-বাজনা, আলাপ (Conversation), সাহিত্য-আলোচনা বা অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন হ'ত। এবং এই সব অনুষ্ঠানে কলকাতা সহরের অধিকাংশ গুণী, সাহিত্যিক ও রসিকরা নিয়মিত রূপে আমন্ত্রিত হতেন।

দেশী প্রথা অনুসারে গালিচার উপর আসর বসত। কাজেই আসরের বাইরে, দরজার কাছে সকলকে জুতো খুলে রেখে যেতে হ'ত।

এমন সভাতেও হঠাৎ চোরের আবির্ভাব হ'ল! একে একে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের পাদুকা চুরি গেল!

আমরা ছিলুম নিয়মিত সভ্য। চোরের উপদ্রবে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলুম। এমন লোভনীয় সভায় আসা বন্ধ করাও চলে না, অথচ প্রতিদিন দরজার কাছে পা থেকে জুতা খুলে রাখবার সময়ে এ-কথাও মনে হয় না যে, সে জুতার ভিতরে আবার পা ঢুকাবার সৌভাগ্য লাভ করা যাবে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ দু-চারজন ভদ্রলোক তো আসরে বসাই ছেড়ে দিলেন। তাঁরা জুতা প'রেই পাশের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে সভার আলোচনা শ্রবণ করতে লাগলেন।

সে-সময়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে "বিচিত্রা"য় আসতেন। জুতা-চুরির কথা শুনে তিনিও যে চিন্তিত হয়েছিলেন, সে-কথা বলা বাহুল্য। কারণ তাঁকে যেতে হ'ত অনেক দূরে--শিবপুরে।

সভার মাঝখানে ব'সে একদিন কি-প্রসঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন। সভায় তিলধারণের ঠাঁই নেই। শরৎচন্দ্র ঠিক রবীন্দ্রনাথের সামনে ব'সেই তাঁর কথা শুনছেন। তাঁর হাতে কাগজে-মোড়া পুঁথির মতন কি-একটা জিনিষ রয়েছে।

জিনিষটা যে কি, রবীন্দ্রনাথ কোনগতিকে তা জানতে পেরেছিলেন কি না জানি না,

কিন্তু হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "শরৎ, তোমার হাতে ওটা কি ?"

শরৎচন্দ্র বেশ একটু চঞ্চল ভাবেই বললেন, "আজ্ঞে,—আজ্ঞে—ও-একটা জিনিষ !"

রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, জিনিষটার নাম কি ?

শরৎবাবু আর জবাব দিতে পারেন না। তাঁর হয়ে আর একজন জবাব দিলেন, "আজ্ঞে, চুরি যাবার ভয়ে শরৎবাবু জুতোজোড়া কাগজে মুড়ে নিয়ে এসেচেন !"

সভার মধ্যে সৃষ্টি হ'ল অট্টহাস্য। শরৎবাবু মহা-অপ্রস্তুত।

কিন্তু পাদুকা সম্বন্ধে এত-বেশী সাবধান হয়েও শরৎবাবুকে আর একবার যে কি দায়ে ঠেকতে হয়েছিল, সে কাহিনী পরে বলব।

এইবারে নিজের একটি কীর্ত্তির কথা বলি। বছর সাত-আট আগেকার কথা। সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে ব'সে গল্প করছি।

সে রাত্রে কলকাতার এক রঙ্গালয়ে আমার 'রিহার্সাল' দেখবার নিমন্ত্রণ ছিল।

সন্ধ্যার পরেই গল্পের আসর ছেড়ে আমি রঙ্গালয়ে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে তখন একখানি ঐতিহাসিক নাটকের মহলা চলছিল।

রঙ্গমঞ্চের উপরে আরো অনেক লোকের সঙ্গে চেয়ারে ব'সে মহলা দেখছি, এমন সময়ে লক্ষ্য করলুম, অভিনেতাদের অনেকেই আমার দিকে তাকিয়ে, পরস্পরের গা টিপে চাপা হাসি হাসছেন।

নিজের জামা-কাপড়ের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে দেখলুম, অস্বাভাবিক কিছুই পেলুম না। তবে আমি আমারি চোখের ভ্রম ?

না, ভ্রম নয়। তখনো সকলের মুখে কৌতুকের হাসি এবং সে হাসির লক্ষ্য যে আমিই, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। মহলা আর ভালো লাগল না। রঙ্গালয় থেকে উঠে বেরিয়ে এলুম।

কেন আমি হাস্যাস্পদ হয়েছি, এই ভাবতে ভাবতে দু পা এগুতে-না-এগুতেই কারণ আবিষ্কার ক'রে ফেললুম।

গ্যাসের আলোয় চোখে পড়ল, আমার দুই পায়ে দুই রঙের 'সেলিম সু'—একটি কালো, আর একপাটির রং 'ব্রাউন' !... বন্ধু-সভা থেকে ওঠবার সময়ে নিশ্চয়ই অদল-বদল হয়ে গেছে।

রাস্তার লোক পাছে আমাকে পাগল মনে করে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ভাড়া করে বাড়ী ফিরলুম।

পরদিন আড্ডায় যেতেই বন্ধু প্রেমাঙ্কুর একেবারে মারমুখো হয়ে উঠলেন। বললেন, "দেখ দেখি এ কি কেলেঙ্কারি ! তোমার জন্যে কাল আমাকে একপাটি জুতো বগলে ক'রে খালি পায়ে পথ দিয়ে বাড়ী যেতে হয়েছিল—" ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'র গল্প অবলম্বনে এক চিত্রনাট্য 'মনোমোহন থিয়েটারে' সবে খোলা হয়েছে। শরৎবাবু, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও আমি (এবং আরো কয়েকজন ভদ্রলোক) একখানা বিছানাওয়ালা 'বক্সে' ব'সে ছবিখানি দেখছি।

ছবি শেষ হ'ল। তারপরের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের তালতলার একপাটি চটি জুতার অন্তর্ধান !

সম্ভব-অসম্ভব স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি হ'ল, কিন্তু হায়, চটির পাটি মিলল না।

শরৎবাবু কাতরভাবে 'বক্সের' বিছানার তলায় নিজের দেহখানিকে ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে দেখলেন—কিন্তু জুতোর বদলে মিলল খালি অন্ধকার।

অত্যন্ত অসময়ে পাদুকা অপহরণপূর্ব্বক যারা নিরীহ ভদ্রলোকদের এমন অন্যায় ভাবে বিপদগ্রস্ত করে, সেই-সব দুষ্ট চোরের উদ্দেশে শরৎবাবু অনেকগুলো কঠিন বিশেষণ ব্যবহার করলেন, তবু কিন্তু জুতো ফিরে পাওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

হতাশ ভাবে শরৎবাবু খালি পায়েই 'ট্যাক্সি'তে গিয়ে উঠলেন—একপাটি চটিজুতো হাতে ক'রে।

আমি বললুম, "শরৎবাবু, ও-একপাটি জুতো নিয়ে আর কি করবেন, এখানেই ফেলে দিয়ে যান।"

শরৎবাবু বললেন,—না হেমেন্দ্র, তুমি বুঝচ না! রাস্কেল চোর একপাটি জুতো নিয়ে এইখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে! এ পাটি এখানে ফেলে গেলেই সে আবার এসে নিয়ে যাবে। আমি শিবপুরে যাবার পথে এ পাটিটাকে গঙ্গায় ফেলে দেব। জুতো যখন আমার গেলই, চোরকেও তা দেব না।"

কথা সঙ্গত বটে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের সেই অবিখ্যাত চটির পাটি এখনো বোধ হয় গঙ্গাগর্ভেই বিশ্রাম করছে।

কিন্তু রঙ্গালয় থেকে অদৃশ্য সেই পাদুকাকে পরদিনই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। অন্য পাটিকে তখন আর উদ্ধার করবার কোন উপায়ই ছিল না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাইজি

মোতিয়া বাইজি যখন আসরে গাইতে যেত, তখন সঙ্গে থাকতো এক সারেঙ্গি—নাম চন্দন।

এই সারেঙ্গির একটি ইতিহাস আছে। মোতিয়া যখন সবেমাত্র বাইজির ব্যবসা গ্রহণ করেছে, যখন তার এত নাম-ডাক হয় নি, তখন এই চন্দন, তার রূপের আগুনে এসে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চন্দন ছিল বড় মানুষের ছেলে ; অগাধ পয়সা। সেই পয়সা বদখেয়ালিতে সে ওড়াবার সূচনা করেছে মাত্র, এমন সময় মোতিয়ার দিকে তার দৃষ্টি পড়ে। তারপর একে-একে চন্দনের সিন্ধুকের টাকা কেমন কোরে মোতিয়ার গায়ে এবং সিন্ধুকে গিয়ে উঠলো, সে কাহিনী বলবার বিশেষ কোনো দরকার নেই। কারণ সে নিতান্তই একঘেঁয়ে। তিন বছরের মধ্যে বাপের সমস্ত বিষয় ফুঁকে দিয়ে চন্দন যেদিন শুধু-হাতে মোতিয়ার কাছে এসে দাঁড়ালো, মোতিয়া তার দিক থেকে মুখ বেঁকিয়ে নিলে। চন্দন অত্যন্ত দীনভাবে বললে—মোতিয়া আজ আর আমার কিছু নেই যা দিয়ে তোমা ঐ বাঁকা মন খুশি করি।

মোতিয়া বিরক্তি দেখিয়ে বললে,—তবে এখানে মরতে এসেছো কি করতে ?

চন্দন বললে—তোমায় আমি ভালো বাসি মোতিয়া।

মোতিয়া বাধা দিয়ে নাক-মুখ সিঁট্‌কে বললো—থাক্, থাক্, আর তোমার ঐ মুখে ভালোবাসা জানাতে হবে না।

চন্দনের মনে পড়লো, এই মোতিয়া একদিন তাকে বার-বার জিগ্‌গেস করে হয়রাণ করেছিল, চন্দন তাকে সত্যি ভালোবাসে কি-না। সেদিন তার চোখে-মুখে সর্ব্বাঙ্গে কি ব্যাকুল প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, এর জবাবের উপর বুঝি মোতিয়ার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। চন্দনের ভালোবাসা না পেলে, সে বলেছিল, ইহজীবন রাখবে না। চন্দন বলে—মোতিয়া তুমি তো একদিন আমায় ভালোবাসতে।

মোতিয়া বললে—সে একদিনের কথা একদিন হয়ে গেছে—এখন তো সেদিন নেই।

চন্দন বললে—তবে কি তুমি আমায় ভালোবাসবে না ?

মোতিয়া আরো বিরক্ত হয়ে বললে—তোমার মত বোকাকে বোঝাবো কত ? ভালোবাসা কি আমাদের ব্যবসা ! চন্দন শুনে ক্ষণেকের জন্য চুপ করে গেল। কিন্তু মন তার বুঝতে চাইলে না। মোতিয়া তাকে ত্যাগ করেছে স্পষ্ট করে, কিন্তু সে-ত্যাগ সে কিছুতেই অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতো পারলে না। সে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো—তুমি

এত নিষ্ঠুর মোতিয়া—তোমার জন্যে সর্ব্বস্ব খোওয়ালুম।

মোতিয়া হাসতে হাসতে বল্‌লে—এ যে তোমার থিয়েটারের নাটক অভিনয় হয়ে উঠলো গো!

হায় কপাল! চন্দন মনে মনে বল্‌লে, নাটক অভিনয় আমিই করলুম বটে।

তারই অর্থে স্ফীত হয়ে আজ মোতিয়া তাকে তুচ্ছ করছে, অপমান করছে—তবু চন্দন তার উপর রাগ করতে পারলে না। একদিন ছিল যখন রাগ করলে তার সাজতো, যখন মোতিয়া অন্তত বিশ-বার তার পায়ে ধরে সাধতো—হায় সে দিন! চন্দন মনে-মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে! সে অপমানে একবার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরে দাঁড়ালো। কিন্তু মন যে আজ তার ভিক্ষুক,—মোতিয়ার প্রসাদ-কামী হয়ে তার মন যে আজ দীন ভিক্ষুকের মতো তার পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে—ভিক্ষুকের মান-অপমান কোথায়? সে ফিরতে পারলে না। সে মনে-মনে বুঝলে—মোতিয়া যে ইহজীবন ত্যাগ করবে—সে মিথ্যা। কিন্তু চন্দন মোতিয়াকে ছেড়ে থাকতে পারবে না—সে সত্য—অতি সত্য! চন্দন কাতর স্বরে বললে,—মোতিয়া আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার কাছে আমায় থাকতে দাও।

মোতিয়া কঠিন স্বরে বল্‌লে—টাকা আনো, তবে।

চন্দন বল্‌লে—তোমার টাকার অভাব কি মোতিয়া?

মোতিয়া হেসে বল্‌লে—অভাবের অভাব কি বাবুসায়েব? এখনো আমার অনেক সাধ পূর্ণ হয়নি।

চন্দন তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইলে—এখনো মোতিয়ার টাকার অভাব। এ রাক্ষসী কত চায়? কত পেলে এর ক্ষুধা মেটে? কিন্তু হায়, চন্দন যে আজ পথের ভিখারী। সে কেমন কোরে এক অর্থের এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবে? সে হতাশ হয়ে বল্‌লে—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোমার সকল সাধ পূর্ণ হোক্‌, মোতিয়া!—আমি আর কিছু চাই না, আমায় তোমার চাকর কোরে রাখো, তোমার কাছে শুধু থাকতে দাও।

মোতিয়া ভাবলে, চন্দন মস্করা করছে! সে একটা ঠাট্টার ভ্রূকুটি কোরে বলে উঠলো—ইস্‌, তাই না কি? এত প্রেম!

চন্দন এ শ্লেষকে সত্যের দৃঢ়তা দিয়ে আঘাত করে বল্‌লে—হাঁ মোতিয়া, আমি তোমার চাকরই হবো—আমায় অনুগ্রহ করো।

মন্দ কি! মোতিয়া ভাবলে, এত তো অনেক দিন দাসীবৃত্তি করেছি, মনিবের একবার প্রভু হয়ে দেখি না। আমোদ হবে মন্দ না।

চন্দন বল্‌লে—তুমি তো জানো মোতিয়া, আমি সারেং ধরতে জানি, কত দিন তোমার সঙ্গে সারেং বাজিয়েছি। আমি তোমার সারেঙ্গি হবো।

মোতিয়া বল্‌লে—আচ্ছা!

সেই অবধি চন্দন মোতিয়ার সারেঙ্গি।

মোতিয়া গান গায়, চন্দন সারেং বাজায় সঙ্গে সঙ্গে, মোতিয়ার খেয়াল-মতো, যখন খুসি তখন। চন্দন আগেও সখ কোরে মোতিয়ার গানের সঙ্গে সারেং বাজিয়েছে, তখন গান চলতো সারেঙ্গির খুসি-মতো; এখন সারেং চলে গানের তাঁবেদার হয়ে। এতে প্রথম প্রথম চন্দনের ভারি কষ্ট হতো, তার সারেং চাইতো যে-সময় যে-সুরটি বাজিয়ে চল্‌তে,

মোতিয়া হয়তো তখন অন্য সুরে গান ধরতো, চন্দনকে তার অনুগমন করতে হতো—হাত চলতো বটে ঠিক সুরে, নিজ মন তাতে খুসি হতো না। কিন্তু উপায় কি? সে যে এখন চাকর! হাজার ইচ্ছা হলেও সে একবার সাহস কোরে বলতে পারতো না—মোতিয়া এই গানটি গাও, একবার শুনি! মনের ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে যেত—অথচ কিছুদিন আগে সে একই গান একশো বার মোতিয়াকে দিয়ে গাইয়েছে!

এ-সব দুঃখ সয়েও ধনীর ছেলে চন্দন সেই মোতিয়া-বাইজির চাকর হয়ে রইলো—যে একদিন তারই সেবার-দাসী ছিল—এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! অন্যে পরে কা কথা—চন্দন নিজেই এক-এক সময় আশ্চর্য্য হতো, কি করে এ সম্ভব হলো। সে ভেবে এর কোন সদুত্তর দিতে পারতো না; এবং এর লজ্জা তার সর্ব্ব দেহে-মনে বিঁধতে থাকলেও সে এই হেয় দাস্যবৃত্তি পরিত্যাগ করবার কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারতো না। কারণ মোতিয়াকে না দেখে বেঁচে থাকা,—তার মনে হতো, অসম্ভব! টাকার অনটন হতে সে মোতিয়ার কাছে যাওয়া দিন-দুচারের জন্য বন্ধ করেছিল, না-আসার কারণ জেনে মোতিয়াও তাকে ডাকেনি। চন্দনের তাতে অভিমান হয়েছিল, রাগ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে তার মন মোতিয়ার উপর এতটুকু বিরূপ হয়নি। বরং এই দুদিনের অদর্শনেই বিষম ব্যথার আঘাতে সে বুঝতে পেরেছিল যে মোতিয়ার অনাদর-অপমান সব সহ্য যায়, কিন্তু তাকে না-দেখে থাকায় যে দুঃখ, তা বলা যায় না। সমস্ত লজ্জা ঠেলে সে শুধু তাকে দেখবার জন্য সেদিন ছুটে গিয়েছিল। দেখার নেশা তাকে মদের নেশার মতো পেয়ে বসেছিল!

কিন্তু চন্দন যে দেখতো, সে কি শুধু মোতিয়াকেই দেখতো? এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আর যা দেখতে হতো, তা না দেখাই তার ছিল ভালো! এই যে দেখার আসক্তি, এর যে-প্রায়শ্চিত্ত চন্দনকে ভোগ করতে হতো, সে বড় ভয়ানক! চন্দন যে সে কেমন কোরে সহ্য করতো, তা সেই জানে।

মোতিয়ার দোতলার ঘরে ওঠবার সিঁড়ির নীচে যে ছোট্ট কামরাটি ছিল, চন্দন সেইটি নিজের ব্যবহারের জন্য পেয়েছিল। সে সেই ঘরে বসে বসে শুনতো পদধ্বনি—কাদের? যারা চলেছে মোতিয়ার ঘরে; কেউ গান শুনতে, কেউ আলাপ করতে, কেউ প্রেম-সম্ভাষণ করতে! এই সব পদশব্দ তার বুকে এসে হাতুড়ির ঘায়ের মতো পড়তো, কিন্তু তবু কাণ পেতে থাকবার জন্য ভিতর থেকে কেমন একটা আগ্রহ সে দমন করতে পারতো না। হয়তো তার মন ভিতরে-ভিতরে আশা করতো, এ শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে! এই সব নতুন অভ্যাগতের চলাচল থেমে যাবে! কখন সেই অঘটন ঘটে, তার প্রতীক্ষায় বোধ হয় চন্দনের কাণ সজাগ হয়ে থাকতো! কিন্তু হায়, সে অঘটন ঘটতো না। বুকের উপর হাতুড়ির ঘা সহাই তার সার হতো।

কোনো-কোনো দিন সে দেখতো, মোতিয়া ঘর থেকে সিঁড়ি অবধি ছুটে এসেছে ব্যাকুল হয়ে তার নতুন অতিথিকে আদর কোরে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে। মোতিয়ার সে কী আগ্রহ—তার চোখে-মুখে সে কী আনন্দের লীলা! যেন এরই জন্যে সে চির জীবন অপেক্ষা করে আছে! কী আদর-মাখানো মমতার সঙ্গে সে অতিথির হাতটি নিজের হাতে তুলে নিত। চন্দন নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতো। তার বুকটা কেমন হাহাকার করে উঠতো, সে কিছু বলতে পারতো না—দেখতে তার কষ্ট হতো,—এতে আনন্দ নেই, আছে বিষম জ্বালা, তবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতো। কে তাকে দেখতে বলে? তবু সে দেখতো!—তারা চলে গেলে অনেকক্ষণ সেই শূন্য স্থানটার দিকে শূন্য

দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকতো।

আবার যখন বিদায়ের সময়, তারা দুজনে সিঁড়ির শেষ ধাপটিতে এসে দাঁড়াতো—বিদায় দিতে দিতেও মোতিয়া তার অতিথিকে বিদায় দিত না, হাবে-ভাবে-কটাক্ষে হাসিতে কথায় অতিথির মনকে বিদায়-ব্যথায় কাতর কোরে তুলতো, তখনও চন্দন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতো, মনে-মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো—হায়, তারও একদিন এমনি গেছে! এত দুঃখের মধ্যেও চন্দন অপেক্ষা করে থাকতো মোতিয়ার মুখের সেই প্রচলিত চুম্বনটি কতক্ষণে এই বিদায়-দৃশ্যের সমাপ্তি এনে দেবে! চুম্বনের শব্দ শুনে তবে চন্দন নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়তো।

মোতিয়া জানতোও না যে চন্দন তার এই সব প্রণয়লীলা গোপনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। যদি সে জানতো, তাতেও তার কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ চন্দনের সঙ্গে তার সমস্ত হিসাব চুকে গেছে—সে এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এমন কি চন্দনকে এখন তার মনেই পড়ে না, যদি নিতান্ত তাকে দরকার না হয়।

চন্দনের ডাক পড়তো গানের আসরে মোতিয়ার বাবুর যেদিন সখ হতো গান শোনবার, মোতিয়া দাসীর মারফত ডেকে পাঠাতো তার সাবেকী চন্দনকে নিজের ঘরে, নইলে এখানে তার আসবার হুকুম ছিল না। চন্দন তার সারেংটি নিয়ে আস্তে আস্তে তারই টাকা দিয়ে কেনা ফরাসের নীচে তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় হেঁট-মুখে এসে বস্‌তো। মোতিয়া গান ধরতো, চন্দন বাজিয়ে চলতো; মাঝে-মাঝে বাবুর মুখের বিকট বাহবায় তার ছড়িটা একবার কেঁপে উঠে আবার সিধে চলতে থাকতো। মোতিয়া প্রেমের গান গাইত, তার সুর ও কথাগুলোকে সে নিজের চোখের কটাক্ষ ও হাতের ভঙ্গী দিয়ে যথাসাধ্য বাবুর দিকেই ছুঁড়ে মারতো কিন্তু সময় সময় চন্দন এমন তন্ময় হয়ে থাকতো যে তার মনে হতো যে মোতিয়া আগের মতো তারই হৃদয়ের দুয়ারে যেন প্রেমের নিবেদন জানাতে এসেছে! শুনতে শুনতে আবেশে তার চোখের পাতা ঠিক আগের মতোই ঢুলে আসতো, দেহের সমস্ত শিরার মধ্য দিয়ে কেমন একটা অলস অনুভূতির কম্পন বহে যেত, যাতে ছড়ির টান সূক্ষ্ম হতে আরো সূক্ষ্ম হয়ে সুরগুলো কথার মতো ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকতো। তখন আর বোঝা যেত না মোতিয়া গাইছে, কি কাঠের যন্ত্র সারেং গাইছে! মোতিয়া চমকে উঠে বাবুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাজিয়ের বাজনার দিকে আবাক হয়ে চাইতো। দেখতে দেখতে বিস্ময়ে তার গলার সুর কখন্ থেমে যেত, সে জানতেও পারতো না! চন্দন বাজিয়েই চল্‌তো। তার সুরে তখন কথা ফুটেছে, কথার অভাব কেউ টেরও পেত না,—সে নয়, মোতিয়া নয়, মোতিয়ার বাবুও নয়! তার পর গানের কথা যখন আপনিই ফুরিয়ে এসে তার হাতের গতিকে থামিয়ে দিত, তখন সেই হঠাৎ-থেমে-যাওয়ার বিস্ময়ে অবাক মোতিয়ার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চোখ তুলে সে চেয়ে দেখতো—দুজনকার এই দুই বিস্ময়ের মিলন ঘরের মধ্যে কেমন-এক দুর্জ্ঞেয়তার সৃষ্টি কোরে তুলতো।

গান যতক্ষণ চলতো, চন্দনের ততক্ষণ কোনো দিকে কোনো জ্ঞান থাকতো না। গান থামলেই হতো তার মুস্কিল! পুনরায় গান হবার প্রতীক্ষায় তাকে বসে থাকতে হতো চুপ কোরে—তার মধ্যে মোতিয়ার সঙ্গে বাবুর হয়তো নানারকম প্রণয়-সম্ভাষণ, নানা-রকম রসিকতা চলতো! চন্দন যে সেখানে আছে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপই থাকতো না। এমন কি, সে একটা জীবিত প্রাণীর মধ্যেই গণ্য হতো না। চন্দন বেশীক্ষণ সে সব দৃশ্য দেখতে পারতো না, চোখ বুজে ফেল্‌তো—লজ্জায় নয়, বেদনায়।

চন্দন যদিও জানতো, মোতিয়া একটা বেশ্যা বই আর-কিছুই নয়, তবু সে এই সব নির্লজ্জ ব্যবহার দেখে আশ্চর্য্য হতো। আশ্চর্য্য হতো এই জন্যে যে তারই সাম্‌নে—যে একদিন তারই প্রণয়ী ছিল, যাকে সে প্রতিদিন প্রেম-গদগদ কণ্ঠে জানিয়েছে যে সে-ছাড়া আর-কাউকে সে জীবনে কখনো জানে না, জানবে না—তারই সাম্‌নে মোতিয়া কেমন কোরে অকুণ্ঠিত মনে সেই একই মিথ্যা কথার পুনরাবৃত্তি করছে ! চন্দনের সামনে এই সব মিথ্যা ধরা পড়ছে, এ জেনেও মোতিয়ার যে কোনো রকম লজ্জা হচ্ছে না, এতে চন্দন আরো অবাক হয়ে যেত ! এবং সেই সঙ্গে মোতিয়ার বাবুর অবস্থা ভেবে সে মনে-মনে হাসতো। আকের ছিবড়ের মতো তাকেও মোতিয়া একদিন পথের ধুলায় টেনে ফেলে দেবে। মোতিয়ার এই সব মিথ্যা প্রণয় ভাব সে একদিন যেমন ধ্রুব সত্য জ্ঞান করে তন্ময় হয়েছিল, আজ এই বাবুটির সেই তন্ময়তা লক্ষ্য করে সে মনে মনে একটা আমোদ অনুভব করতো। তার মতো না-জেনেও এত যে পদে-পদে ঠকছে, এবং সেই ঠকাটাকেই পরম লাভ জ্ঞান করে ঠকার জটের মধ্যে আরো জড়িয়ে পড়ছে, এটা চন্দন যত দেখতো ততই মনের মধ্যে মোতিয়ার বাবুর উপর যে একটা হিংসা ও ক্ষোভ জমে উঠছিল তার জায়গায় অনেকটা শান্তি সে অনুভব করতো। তাকে হঠিয়ে তার স্থান অধিকার কোরে এই লোকটা চন্দনের প্রতি যে অন্যায় করেছে—যার প্রতিশোধ নেবার শক্তি চন্দনের নেই, তার নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্তের এই অদূর নিশানা পেয়ে চন্দনের স্বার্থহত ক্ষুব্ধ মন অসহায়তার পীড়নের মধ্যে থেকে আরো উল্লসিত হয়ে উঠতো। এত দুঃখের মধ্যেও এই যেন তার একটা আরাম ছিল। বাবুর প্রতি মোতিয়ার এই প্রেম মিথ্যা, এ শুধু অভিনয় মাত্র—এটা চন্দনের মন বুঝেছিল বলেই অপরকে মোতিয়ার এই যে আত্মসমর্পণ, এর দুঃখ চন্দনের কাছে তত তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি। ঐ হাসি ? ও মিথ্যা ! ঐ আলিঙ্গন ? ও মিথ্যা ! ঐ চুম্বন ! ও আরো মিথ্যা। এ যদি সত্য হতো, চন্দন ভাবতো, তাহলে সে কি তা এমন কোরে সহ্য করতে পারতো ? কখনো না ! তার মনে এই হিংসা ছিল, মোতিয়ার কাছ থেকে সে যা পায়নি অন্যে তা পাবে কেন ? কেউ তা পায়নি, কেউ পাচ্ছে না এই কথা বার বার বলে তার মনকে সে অনেকটা শান্ত কোরে আনতো। কিন্তু তাতে—শুধু এই শান্তিটুকুতেই কি হৃদয়ের তৃপ্তি হতো ? সে যে আরো চায়, মোতিয়াকে চায়। তাকে সে পাবে না জেনেও হৃদয় তবু তাকে আঁকড়ে থাকে ! সামান্য পয়সার লোভে সে অনেকের কাছে অনায়াসে দেহ বিক্রয় করছে, স্বচক্ষে দেখেও হৃদয় তাকে ছাড়তে চায় না। মোতিয়া মিথ্যায় তাকে ভুলিয়েছে, মিথ্যা করে বলেছে, তোমায় ভালোবাসি ! মিথ্যার আলিঙ্গন দিয়ে তাকে বেঁধেছে, এতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু মিথ্যার বন্ধন তো কাটে না ! হোক মিথ্যা, তবু তার সেই হাসি, তার বাহুর সেই পরশ, তার চোখের সেই চাহনি, তার মুখের সেই চুম্বন যে বিপুল আনন্দ তাকে দিয়েছে, তাতো মিথ্যে নয়, সে যে অতি সত্য ! দেহের প্রতি শিরা, প্রতি লোমকূপ যে তার সাক্ষী আছে—তাকে তো না বলে উড়িয়ে দেবার যো নেই ! এত মিথ্যার ভিতরে-ভিতরে এই আনন্দের সত্যটুকুও ছিল বলেই বোধ হয় মোতিয়াকে চন্দন হৃদয় থেকে কিছুতেই সরাতে পারছিল না। মোতিয়াকে সে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছে, তার বদলে পেয়েছে কি ?—এর হিসাব তো সে কোনো দিন করেনি। তার দেবার উৎসাহ যে একদিনের জন্যেও কখনো পাবার অঙ্ককে খতিয়ে দেখতে চায়নি—এবং এখনো কি চাইছে ? তা যদি চাইত, তাহলে কি এত দুঃখ সহে সে মোতিয়ার চাকর হয়ে তার বাড়ীতে পড়ে থাকতে পারতো ?

মোতিয়ার এতদিন শুধু রূপের কদর ছিল, একটু একটু কোরে গুণের খ্যাতি তার ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আগে সে গান গাইত চলনসই রকমের, চন্দন তার সারেঙ্গি হবার পর থেকে তার গলার অসম্ভব উন্নতি দেখা যেতে লাগলো। এত দিন তার গলার কোথায় যেন যাদু লুকোনো ছিল, এইবার তা প্রকাশ হয়ে লোককে মোহিত করতে লাগলো। যে শোনে, সেই বাহবা দেয়—গুণীরা আরো তারিফ করে। সময় সময় তার সুরের মধ্যে এমন একটা মাদকতার রস উৎসারিত হয়ে উঠতো, যে তার টান শ্রোতাকে কোথায় কোন্ অজানায় নিয়ে গিয়ে ফেলতো, তার কূল-কিনারা পাওয়া যেত না। মোতিয়া গাইতে-গাইতে নিজেই অবাক হয়ে যেত—কোথা থেকে এলো তার গলার সুরে এ আশ্চর্য্য মোহিনী মায়া! এ যে তাকেও পাগল কোরে তোলে। নিজের কণ্ঠের যতগুলি কড়ি কোমল মোটা সূক্ষ্ম সুর তার চেনা, যত রকম কায়দা তার জানা তার মধ্যে তো এ যাদু নাই,—সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো, দেখে কোথাও খুঁজে পেত না। তবে কোথা থেকে এ এলো? খুঁজতে খুঁজতে এক একবার তার দৃষ্টি গিয়ে পড়তো চন্দনের উপর! তার অবাক স্তম্ভিত দৃষ্টি সারেঙ্গীর হাতের কাছে এসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তো। হঠাৎ একবার চেতন পেয়ে তার বোধ হতো যেন চন্দনের সমস্ত হৃদয় থেকে একটি সুর চুঁইয়ে এসে তার আঙুলের শেষ কিনারা থেকে মুক্তি পেয়ে মহা আনন্দে দিকে-দিকে রস ছড়িয়ে ছুটে চলেছে। তার মধ্যে মোতিয়ার গলার সামান্য সুর কোথায় তলিয়ে গেছে, আছে কি নেই বলাই যায় না। মোতিয়া ঠিক বুঝতে পারতো না, তবু ভিতরে ভিতরে তার মনে হতো সে যেন উপলক্ষমাত্র, চন্দনই সর্ব্বস্ব! নামমাত্র তার গলার সুর, তাকেই বিচিত্র রূপে-রসে-আনন্দে পরিপূর্ণ কোরে চন্দন গানের সভাকে মোহিত কোরে তুলছে! নিজেকে মোতিয়ার তখন অতি তুচ্ছ, অতি হীন মনে হতো! কিন্তু তার পর যখন অজস্র প্রশংসা তারই উপর বর্ষিত হয়ে তাকে একেবারে ডুবিয়ে দিত, তার গলা শোনবার জন্যে বড় বড় ধনীরা যখন তাকে তোষামোদ কোরে কৃতার্থ জ্ঞান করতো, তখন সে নিজের গর্ব্বে নিজে স্ফীত হয়ে উঠতো। তখন মনে হতো, চন্দন কে? সামান্য বাজিয়ে মাত্র, তার সুরের তাঁবেদার, চাকর—তাকে আবার খাতির কি? সমস্ত প্রশংসা নিজে আত্মসাৎ কোরে মোতিয়া দয়ার্দ্র চোখে একবার চন্দনের দিকে চাইতো মাত্র, চন্দন তাতেই খুসি হয়ে যেত।...

টাকার নেশা দিয়ে মোতিয়া জীবন আরম্ভ করে ছিল; খ্যাতির নেশা তার জানা ছিল না। এই খ্যাতি যখন তাকে পেয়ে বসলো, তখন টাকা তার কাছে তুলনায় হীন মনে হতো লাগলো। টাকা সে যেমন কোরে জমিয়েছিল, তেমনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সে খ্যাতি জমাবার চেষ্টা আরম্ভ করলে। রূপের চর্চ্চায় এখন সে যতটা মন দেয়, তার ঢের বেশী মন পড়লো এই খ্যাতি তার বাড়ে কিসে সেই দিকে। সে দিন-রাত গানের চর্চ্চায় মন দিলে। ঘন-ঘন তার ঘরে চন্দনের ডাক পড়তে লাগলো। প্রয়োজনের খাতিরে মোতিয়ার কাছে তার আদরও বেড়ে উঠতে লাগলো। মোতিয়া এতদিন তাকে একেবারে মনের বাইরে ঠেলে রেখেছিল, এখন তাকে ভিতরে এনে বসাতে হলো। কারণ চন্দনই হচ্ছে তার গানের সহচর, অন্তরঙ্গ। তারই মুখের গান শুনে মোহিত হয়ে সে গান শিখতে আরম্ভ করে; গানে যে মন ভোলানো যায়, নিজের মন-ভোলা হয়ে চন্দনের কাছে সে তা শিক্ষা করেছিল। সে মনে মনে বুঝেছিল চন্দন একজন রীতিমত ওস্তাদ। তার যা-কিছু শিক্ষা, সে তো তারই কাছে। সেই আদর কোরে মোতিয়াকে নিজের গলার সুর দিয়ে গান

শিখিয়েছিল—কত যত্নে, কত আগ্রহে। নইলে হয়তো তার শিক্ষাই হতো না। যখন শ্রোতা ছিল মাত্র একজন—যে শিক্ষক, সেই শ্রোতা। তখন মোতিয়া গান গেয়ে খুস হতো, চন্দন গান শুনে খুসি হতো—এই জন্যই গানের আসরের সমাপ্তি হতো। এখন বাইরের শ্রোতা বিস্তর, আসরের ব্যাপ্তিও অনেকখানি—বড়-বড় মজলিসে মোতিয়ার ডাক পড়তে আরম্ভ করেছে, তার গান শোনবার জন্যে চারিদিক থেকে এখন তাগিদ আসে, মুখে মুখে তার নাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসাও বেড়ে চলেছে—এতে চন্দনের সেই একলা ঘরে একলা গান শোনার আনন্দ নেই বটে, কিন্তু মোতিয়ার এই নতুন নেশার নতুন স্ফুর্তি দেখে সে খুসি হতো। সে আগে যেমন যত্নে গান শেখাতো, তেমনি দরদ দিয়ে তাকে নতুন-নতুন গান শেখাতে লাগলো। মোতিয়া পূর্ণ আগ্রহে শিখতে লাগলো। মোতিয়ার এই সুবিধা ছিল যে শেখার মধ্যে তার যে সমস্ত ত্রুটি ঘটতো, তার জন্যে চন্দনের কাছে তাঁর কোনো লজ্জা ছিল না—কারণ তার যত ক্রটি, অসমর্থতা—তার কিছুই তো চন্দনের কাছে গোপন নেই! শিক্ষার পদে-পদে যে তা বহুবার প্রকাশ হয়ে গেছে। কাজেই অচেনা কোনো ওস্তাদের চেয়ে তার খ্যাতির পক্ষে চন্দনই নিরাপদ—এই মনে কোরে মোতিয়াকে আবার নতুন কোরে চন্দনের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হলো।

আবার সেই পুরোনো দিনের মতো চন্দনের খুব কাছে ঘেঁষে মোতিয়া এসে বসতো, চন্দন তার মুখের দিকে চেয়ে তাকে গানের সুর শেখাতো—তারই কণ্ঠ থেকে সুর নিয়ে মোতিয়া সেই সুর নিজের গলায় খেলাতো, যেখানে যে-সুর ভ্রষ্ট হয়ে ছিন্ন হয়ে পড়তো, নিজের গলা থেকে সুর দিয়ে চন্দন তা পূরণ করে দিত। মোতিয়া তার সেই পুরোনো দিনের হাসি দিয়ে এর মূল্য শোধ করতো। চন্দনের হৃদয়ের দু-কূল ভরে উঠতো।

কিন্তু এই হাসিতে চন্দনের এক একদিন এমন বিভ্রম ঘটতো যে তার মনে হতো যেন সেই পুরোনো দিনেরই আনন্দ-স্রোত এখনো বহে চলেছে। মোতিয়া বোধ হয় একেবারে ভুলে যেত যে তার জীবনে নতুন শাখা আরম্ভ হয়েছে, চন্দনের সঙ্গে তার প্রেমের সম্বন্ধ ঘুচে গেছে। চন্দন যখন এই বিস্মৃতির মুহূর্ত্তে আগ্রহ-ভরে মোতিয়াকে নিজের বুকের দিকে টেনে নিত, তখন মোতিয়াও কোন্ বিস্মৃতির মোহে আপত্তি করতে ভুলে যেত, তার সমস্ত অঙ্গ যেন নিজের খুসিতেই চন্দনের দিকে ঢলে পড়তো। তারপর চন্দনের তৃষিত ওষ্ঠ মোতিয়ার মুখের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতো, মোতিয়ার বাহুদুটি নিজে থেকে চন্দনের গলাটিকে আদরে জড়িয়ে ধরে তার ওষ্ঠপ্রান্তে একটি চুম্বন এঁকে দিত। এমনি তারা ভুলে থাকতো যে এ কথা দুজনের কারো খেয়ালে আসতো না যে মোতিয়া মনিব এবং চন্দন তার চাকর। এবং এই চুম্বনের কি মূল্য আদায় করতে হবে, তাই নিয়ে আগের মতো মোতিয়ার মন হিসেব করতেও বসে যেত না। কি কোরে যে এই অসম্ভব কাণ্ড ঘটতো, তা কে জানে? এর মধ্যে মোতিয়ার যে কোনো ছল-চাতুরী ছিল, তা নয়! প্রলোভন নিয়ে সে যে চন্দনের কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে নেবে, এ মতলব তার মাথায় আসেনি। কারণ সে জানতো, চন্দন যা দান করে খোলা মনে সর্ব্বস্ব উবুড় কোরে দেয়—রেখে-ঢেকে দেওয়া তার স্বভাব নয়। তবু সে বিনা মূল্যে কেন যে চন্দনকে তার ঐ মহামূল্য চুম্বন বিলিয়ে দিত, তা সে নিজেই ঠাহর করতে পারতো না—এর জন্যে তার কোনো দুঃখ বোধ হতো না।

এই নতুন পরিবর্ত্তনে চন্দনের দিন আনন্দে কাটতে লাগলো বটে, কিন্তু এই আনন্দের

পাশাপাশি একটা হিংসার জ্বালা আগের চেয়ে যেন আরো জ্বলে উঠলো। এতদিন মোতিয়া তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে রেখেছিল, তাতে জ্বালা যেন কম ছিল! কিন্তু তবু ঐ জ্বালার জন্যে মোতিয়ার দেওয়া আনন্দ তো তুচ্ছ করা যায় না—কাজেই ও-দুটোই তাকে নিতে হবে!

চন্দন সবই সইয়ে আনছিল, কিন্তু গোল হতে লাগলো মোতিয়ার বাবুকে নিয়ে। চন্দনের বাজনায় খুসি হয়ে মোতিয়ার বাবু যখন আদর কোরে তাকে বখশিস দিতে আসতো, তখন চন্দনের সর্ব্বশরীর কেমন একটা রাগে জ্বলে উঠতো। সে কি তার মতো কুকুরকে খুসি দেবার জন্যে বাজায় না কি? কে তার বখশিসের প্রত্যাশা করে? তার সেই বখশিস দেবার স্পর্দ্ধাকে ঘাড় ধোরে মাটিতে গুঁজড়ে দেবার জন্যে তার হাত দুটো শক্ত হয়ে উঠতো, সে ভিতরে-ভিতরে ফুলতে থাকতো। বাবুর কাছ থেকে বখশিস নেবার জন্যে চন্দনের হাতখানা আগ্রহে এগিয়ে আসছে না দেখে মোতিয়া মিষ্টি গলায় বলে উঠতো—বাবু বখশিস দিচ্ছেন—নাও।

চন্দন ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে দিত, হাতে যা এসে পড়তো তার দিকে চেয়েও দেখতো না, এবং দাতাকে একটা সেলামও দিত না। এই বেয়াদবির জন্যে মোতিয়া তার বাবুর অসাক্ষাতে মাঝে-মাঝে চন্দনকে মৃদু তিরস্কার করতো। চন্দন ধীরভাবে হাসতে-হাসতে বল্‌তো যে সেলাম দেওয়া এখনো তার অভ্যাস হয়নি, ভুল হয়ে যায়।

বাজনা শেষ হলে চন্দন যখন উঠে চলে যেত, তার বখশিসের টাকা সেইখানেই পড়ে থাকতো। মোতিয়া তার দাসীকে দিয়ে সেটা চন্দনের ঘরে পাঠিয়ে দিত, চন্দন সেটা হাতে না নিয়ে সেই দাসীকেই সেটা পুরস্কার দিয়ে দিত। মোতিয়া সে কথা জানতে পেরে একদিন চন্দনকে তিরস্কার কোরে বলেছিল,—তুমি গরীব মানুষ, পয়সাগুলো এমন কোরে নষ্ট করছো কেন?

চন্দন সে কথার কোনো জবাব দেয়নি শুধু একটু ম্লান হাসি হেসেছিল মাত্র। মোতিয়া বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল, যে পয়সা নষ্ট করাই চন্দনের স্বভাব।

মোতিয়ার কাছে চন্দন চাকরের মতো থাকতো বটে কিন্তু বাবুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ চাকর-মনিবের সম্বন্ধের মতো হীন কোরে তুলতে তার মন বেঁকে দাঁড়াতো। সে বাবুকে কোন রকমে মানতে চাইতো না এবং তাকে মানতে দিত না। সে মনে-মনে রেগে বলতো, ওকে মান্য দিতে যাবো কেন? ও তো আমারই একজন, এক ধাপ উপরে আছে মাত্র, দুদিন বাদে আমারো নীচে তলিয়ে যাবে।

প্রথম প্রথম বাবু চন্দনের এই ব্যবহার হেসে উড়িয়ে দিত, কিন্তু শেষে চন্দনের ভাব-গতিক দেখে তার রাগ হতো—সে বুঝতো পারতো, চন্দন ইচ্ছে করেই ঔদ্ধত্যের দ্বারা তাকে অপমান করছে। এর মধ্যে মোতিয়ার হয়তো প্রশ্রয় দেওয়া আছে মনে কোরে সে মোতিয়ার উপর একদিন বিষম বিরক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু বিরক্ত মনকে খুসি করবার যে অব্যর্থ মন্ত্র, মোতিয়ার তা জানা ছিল। তাতে বাবুর সে বিরক্তি বেশীক্ষণ টিকল না বটে কিন্তু চন্দনের উপর মনের অপ্রসন্নতা বেড়েই গেল। আরো কঠোর হয়ে চন্দনকে সে যখন তখন যা-তা হুকুম সুরু করলে। চন্দনও তেমনি জোরে সে সমস্ত প্রত্যাখ্যান করে চলতে লাগলো। বাবু যখন তাকে কোনো রকম অপমান করতো, তখন সে অপমান ফিরিয়ে দিতে চন্দন এতটুকু ইতস্তত করতো না। বাবুর এমন রাগ হয়ে ছিল যে এতদিন কোন্ কালে সে চন্দনকে মেরে দূর কোরে তাড়িয়ে দিত, পাছে মোতিয়া বিবি কিছু মনে

করে, এই সংশয়ে সে চুপ করে ছিল।

কিন্তু ক্রমেই ব্যাপার অসহ্য হয়ে উঠতো লাগলো। মোতিয়া একদিন রেগে বললে,—চন্দন, এমন করলে তোমার এখানে থাকা চলবে না।

চন্দন গম্ভীর ভাবে বললে—মোতিয়া, আমি তোমার চাকর বটে কিন্তু তোমার ঐ ষণ্ডামার্কা বাবুর চাকর হতে পারবো না।

মোতিয়া কি বল্‌তে যাচ্ছিল, বাবু বোধ হয় পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল, সে রেগে কাঁপতে কাঁপতে এসে বল্লে,—বেরো ব্যাটা, এখান থেকে বেরো।

চন্দন খানিক কাঠ হয়ে মোতিয়ার কঠোর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ঝড়ের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল!

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

উপসর্গ

তারানাথ বি-এ পাশ করিয়া গৃহে বসিয়া ছিল। লেক-রোডের কাছে নূতন বাড়ী; বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে; কাজেই ল' পড়ার প্রয়োজন ছিল না। তবে সুবিধা পাইলে কোনো রকম ব্যবসা খুলিয়া বসিবে, ইহাই ছিল তার সঙ্কল্প।

সুদীর্ঘ অবসর। গৃহে বসিয়া সে খবরের কাগজ এবং রাজ্যের কাব্য-উপন্যাস পড়ে। ভোরের দিকে ও সন্ধ্যায় নূতন পল্লীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাই তার দিনের কাজ।

কাব্য-উপন্যাস সে পড়ে বটে, কিন্তু তারি একটা পৃষ্ঠায় কোনো দিন ঢুকিয়া পড়িবে, এমন কল্পনা তার মনে কোনোদিন স্থান পায় নাই। অর্থাৎ কাব্য পড়িলেও তার চিত্তটুকু ঠিক কবিজনোচিত ছিল না।

কিন্তু দৈবাৎ একদিন ঘটনা যা ঘটিল, উপন্যাসের পাতায় তেমন ঘটনার কথা সে বহুবার পড়িয়াছে। কাল—সন্ধ্যার অব্যবহিত পর-ক্ষণ; শ্রাবণ মাস। আকাশে কালো

মেঘের ঘন-ঘটা—মাঝে মাঝে দু'চার পশলা বৃষ্টি হইতেছে ; দিনের বেলায় সূর্য্য একবারো দেখা দিবার অবসর পায় নাই। তারানাথ নিত্যকার মত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পথে জল-কাদা তেমন নাই। এধারটায় কাদা এখনো জমিতে পারে না। হালের তৈরী পথ। অনেক পয়সা খরচ করিয়া পথ তৈরী হইয়াছে—বোধ হয় সেজন্য কাদা জমাইতে পথের চক্ষুলজ্জা হয় ! কিন্তু সে কথা যাক্।

তারানাথ বেড়াইয়া ফিরিতেছিল। একটা গলির মুখ। ধাঁ করিয়া একখানা ট্যাক্সি পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া গলিতে ঢুকিল। পিছল পথ। ট্যাক্সির টায়ার সে পিছলে কেমন বেটক্করে গড়াইতে গাড়ী গিয়া ধাক্কা দিল পাশের একটা বড় শিশুগাছে— গাছটা মড় মড় করিয়া উঠিল, এবং ট্যাক্সিখানা গাছে ঠেকিয়া আরো পিছলাইয়া একটা খানার ধারে কাৎ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ উঠিল।

তারানাথ চকিতে চমকিয়া উঠিল, স্বপ্ন ? না... ? চেতনা যেন তার নিমেষের জন্য বিলুপ্ত হইল। চমকের ভাব কাটিতে সে চাহিয়া দেখে, আলো-আঁধারের মধ্যে ট্যাক্সিটা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, আর তার মধ্যে বস্ত্রাবৃত...

ছুটিয়া সে সেখানে গেল। তখন তার দুই হাতে কোথা হইতে এমন প্রচুর শক্তি আসিয়া জমিল, যে প্রচণ্ড বিক্রমে ট্যাক্সির হুড্ ঠেলিয়া সে হাত ধরিয়া দুটী প্রাণীকে টানিয়া বাহির করিল। একজন পুরুষ, প্রৌঢ় ; আর একজন নারী, তরুণী। তাঁদের বেশ ছিন্ন, কলেবর কর্দ্দমাক্ত। দু'জনেরই চোট্ লাগিয়াছে—তবে চোটের চেয়ে আতঙ্ক বেশী। তরুণী কাঁপিতেছিল। প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া ডাকিলেন,—নীরু...

তরুণী কহিল,—এই যে আমি, বাবা।

প্রৌঢ় তার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলেন, তরুণীর হাত ধরিয়া কহিলেন—হাত-পা ভাঙ্গেনি তো ? লাগেনি বেশী ? প্রৌঢ় সস্নেহে তরুণীর গায়ে হাত বুলাইলেন।

তরুণী কহিল—না বাবা। তবে পা বেশী নাড়তে পারচি না। তোমার লেগেচে খুব—না ?

প্রৌঢ় কহিলেন—বিশেষ কিছু হয়নি।

তরুণী কহিল,—তোমার জন্যেই আমার ভয়, বাবা...

প্রৌঢ় কহিলেন—মস্ত ফাঁড়া কেটেচে। প্রাণটা যে...

তারানাথ চুপ করিয়া ছিল না। সে ততক্ষণে ড্রাইভারকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। ড্রাইভারের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে মূর্চ্ছিত। ...

প্রৌঢ় অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন—ভগবান তোমায় পাঠিয়েছিলেন, বাবা। তা, ড্রাইভারটি বেঁচে আছে তো ?

তারানাথ কহিল—বেঁচে আছে। তবে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জল চাই।

তরুণী কহিল—এই যে একটা কল আছে, জল পাবো না ?

প্রৌঢ় কহিলেন—রাত্রে কি জল থাকে মা ?

উদ্বিগ্নভাবে তরুণী কহিল—তবে কি হবে ?

তারানাথ কহিল—আপনাদের তেমন চোট্ লাগেনি তো ?

প্রৌঢ় কহিলেন,—না।

তারানাথ কহিল—এই কাছেই কারো বাড়ী থেকে আমি টেলিফোন করি আম্বুলান্সের জন্য। যদি আঘাত গুরুতর হয়ে থাকে, কি জানি—

প্রৌঢ় কহিলেন,—খুব ভালো কথা, বাবা। আমরা এখানে দাঁড়াই ততক্ষণ।

তারানাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ...এবং টেলিফোন করিয়া দশ-বারো মিনিট পরেই ফিরিল। ফিরিয়া দেখে, ড্রাইভার শুইয়া আছে, আর পাশের ডোবার জলে বসন-প্রান্ত ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া সেই জল তরুণী ড্রাইভারের মাথায় কপালে দিতেছে। পথের গ্যাসের ম্লান আলো তরুণীর মুখে পড়িয়াছে। সে আলোয় তরুণীর মুখে উদ্বেগের কাতরতাটুকু তারানাথের দৃষ্টি এড়াইল না। স্কটের সেই লাইনগুলো চট্ করিয়া তারানাথের মনে জাগিল,—

When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel, thou!

ঠিক কথা! নিভৃত কুঞ্জে প্রণয়ীর বাহু-বন্ধনে, কিম্বা বাতায়নে-প্রতীক্ষমানা নায়িকার বেশে নারীকে তেমন মানায় না, যেমন মানায় আর্ত্তের শিয়রে এই শুশ্রূষা-রতার বেশে!

প্রৌঢ় কহিলেন—টেলিফোন করলে বাবা ?

তারানাথ কহিল—আজ্ঞে, করেচি। আম্বুলান্স এখনি আসবে।

প্রৌঢ় ডাকিলেন—নীরু...

নীরু কহিল—বাবা...

প্রৌঢ় কহিলেন—ওর মূর্চ্ছা ভাঙলো ?

নীরু কহিল—না।

প্রৌঢ় কহিলেন—একে আঘাত, তায় shock...

নীরু কহিল—কপালটা ছেঁচে গেছে। বাঁচবে তো ?

তারানাথ কহিল—বাঁচবে বৈ কি। দেখি...

নীরু কহিল—আপনি ডাক্তার ?

তারানাথ কহিল—না।

নীরু কহিল—কাছে কোনো ডাক্তার নেই ?

তারানাথ কহিল—কাছাকাছি...কৈ, খেয়াল তো হচ্ছে না। অনর্থক দৌড়োদৌড়ি করার চেয়ে আম্বুলান্স ডাকাই ভালো নয় ?

নীরু কহিল—আম্বুলান্সের জন্যই আপনি গেছলেন বুঝি ?

তারানাথ কহিল—হাঁ। এখনি আসবে।

নীরু কহিল—আঃ, বাঁচলুম। বেচারী !

করুণ নয়নে নীরু ড্রাইভারের পানে চাহিল। শিখ ড্রাইভার। রং ফর্শা, বয়স অল্প। বেচারীরা কি বিপদই না মাথায় করিয়া ছোটে!...নীরু একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর কহিল—এক কাজ করা যাক...যতক্ষণ না আম্বুলান্স আসে, ততক্ষণ আপনি বরং এর মাথাটা ধরে বসুন, আমি ঐ ডোবা থেকে জল এনে মুখে-চোখে দি...কপালের রক্তটা...আচ্ছা, দুর্ব্বো ঘাস ছেঁচে দিলে রক্ত বন্ধ হয় না ? শুনেছিলুম...

তারানাথ কহিল—তা আমি জানি না। তবে গাঁদা ফুলের পাতার রসে...শীতকাল...ঠিক কথা! কিন্তু গাঁদা পাতা এখানে কোথায় পাবো... ? তার চেয়ে আপনি ওকে ধরুন—আমি জলের ঝাপ্টা দি মুখে-চোখে...

তাই হইল। অনেকক্ষণ...

আম্বুলান্স গাড়ী আসিল। এবং তারা আহত ড্রাইভারকে গাড়ীতে তুলিয়া হাসপাতালে

লইয়া গেল। নীরু কহিল—একটু খবর পাবো তো ?

আম্বুলান্সের ড্রাইভার কহিল—ফোন্ করবেন। আমরা একে শম্ভুনাথ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।...

আম্বুলান্স চলিয়া গেলে নীরু কহিল—বেচারীর গাড়ীখানা ?

প্রৌঢ় কহিলেন—থানায় ফোন্ করে দেবো 'খন। তারা গাড়ীর খবরদারীর ব্যবস্থা করবে।

তারানাথ কহিল—আপনাদের বাড়ী ?

প্রৌঢ় কহিলেন—কাছেই।

তারানাথ কহিল—চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রৌঢ় কহিলেন—তোমার বাড়ী বুঝি এধারেই ?

তারানাথ কহিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

প্রৌঢ় কহিলেন—এসো বাবা, সঙ্গেই এসো। তোমার ঋণ কখনো শুধতে পারবো না। ভগবান তোমায় পাঠিয়েছিলেন। তোমার নাম ?

তারানাথ কহিল—শ্রীতারানাথ মিত্র।

প্রৌঢ় কহিলেন—আমার নাম কেশবনাথ ঘোষ। রিটায়ার হয়েচি ! এটি আমার মেয়ে...বলিয়া তিনি ডাকিলেন—নীরু—

নীরু কহি,—বাবা—

প্রৌঢ় কহিলেন—হেঁটে যেতে পারবি ?

নীরু কহিল—পারবো। কতদূরই বা...

প্রৌঢ় কহিলেন—পায়ে লাগছিল, বললি যে ! তা, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল্ বরং।

নীরু কহিল—দরকার নেই বাবা। তোমারই বরং চলতে কষ্ট হবে।

তারানাথ কহিল—আমার কাঁধে আপনি ভর দিন...

প্রৌঢ় কহিলেন—কোনো দরকার নেই। আমার জীবনে এর চেয়ে অনেক বড় বড় accident গেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েচি পাহাড়ের নীচে, খাদে...কিছু হয়নি। বড় মজবুৎ গড়া আমার এ শরীর, বুঝলে কি না ! বলিয়া প্রৌঢ় উচ্চহাস্য করিলেন।

২

পরের দিন সকালে তারানাথের ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া সে দেখে, আকাশে মেঘ নাই ! চমৎকার রৌদ্র ফুটিয়াছে। এই রৌদ্রের কিরণে সমস্ত দুনিয়ার চেহারাখানাই যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে ! সে আসিয়া খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইল। ওধারে বড় রাস্তায় ট্রাম চলার দরুণ একটা ঘড়ঘড়... শব্দ পথে লোকজন চলিতেছে। ওই পথ কাল বৃষ্টির জলে ঝাপ্‌সা ছিল—গাছগুলার ওধারে সমস্ত চরাচর মেঘে ঢাকা, অস্পষ্ট, দৃষ্টি আর চলে না ! দুনিয়া কতটুকু হইয়া গিয়াছিল, ছোট সীমারেখায় ঘেরা ! আর মেঘ নাই, রৌদ্রের কিরণে কতদূর আকাশ, কত দীর্ঘ পথ ঐ দেখা যাইতেছে ! চারিদিকে আলো ! দুনিয়ার মুখে হাসি একেবারে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে।

দাঁড়াইয়া একবার সে কালিকার কথা, ভাবিল... সেই ট্যাক্সি-দুর্ঘটনা...সত্যই তা ঘটিয়াছিল ? না, মেঘে-ঢাকা আঁধার রাত্রির স্বপ্নের আবছায়া সেটা ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, সকালে কেশব ঘোষের গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। ছোট্ট পরিবার, কেমন সজ্জিত গৃহ...পারিপাট্যের কোনো অভাব নাই। রিটায়ার্ড ডিস্ট্রীক্ট জজ। পয়সাওয়ালা মানুষই শুধু নন, উদার মন! খাশা ভদ্রলোক! আর তার মেয়ে নীরু! নীরজা ? না, নিরুপমা ? নিরুপমাই। সে যেন কোন্ কল্প-লোকের জীব! চমৎকার!

মুখ-হাত ধুইয়া পরিষ্কার বেশভূষায় সাজিয়া তারানাথ বাহির হইয়া পড়িল। দিদি কাল শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিয়াছে। দিদি কহিল,—চা খাবিনে ?

তারানাথ কহিল—না, এক বন্ধুর বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ আছে।...

সেই পথ—নিত্যকার পায়ে চলা, পরিচিত। আজ এ পথও যেন পরম রমণীয় কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে!

ঐ গলি। গলির শেষে ফটকের গায়ে দোদুল মালতী-লতার ঝাড়। তার ফুল-পাতাগুলো পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—পথে কে আসে, তাই দেখিবার আগ্রহে তারা যেন কঞ্চির মাথায় মুখ গুঁজিয়া থাকিতে চায় না! ফিরাইয়া দিলেও আবার লাফাইয়া ঘুরিয়া দুলিয়া এদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে! ফটকের সামনে টুলে দরোয়ান বসিয়াছিল, তারানাথকে দেখিয় সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারানাথ ফটকে ঢুকিল...

—আসুন—ললিত কণ্ঠে কি সুমধুর অভ্যর্থনা! তারানাথ বিহ্বলের মত চোখ তুলিয়া চাহিল—চাহিতেই দেখে, গাড়ী-বারান্দার উপর সে লম্বা দালান, সেই দালানে চেয়ারে বসিয়া নীরু। তার পায়ের কাছে তুলার বাণ্ডিলের মত লোমে-ঢাকা একটা কুকুর। তাকে দেখিয়া কুকুরটা ডাকিয়া উঠিল। তার আদরে ব্যাঘাত ঘটিল, তাই তার বিরক্তি! নীরু তাকে ধমক দিয়া কহিল—চুপ!

কুকুরটা চুপ করিয়া এক ধারে সরিয়া বসিল।

নীরু তারানাথকে লইয়া গিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইল, কহিল—বাবাকে খবর দি...

নীরু চলিয়া গেল। সামনে মস্ত আয়না তারানাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আয়নায় দেখিয়া নিজের জামা-কাপড় ঝাড়িয়া লইল, মাথার বিস্রস্ত চুলগুলাকে হাত দিয়া নাড়িয়া সুবিন্যস্ত করিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কেশব ঘোষ আসিলেন। তাঁর হাতে এক গোছা ক্যানা ফুল। তিনি কহিলেন,—এসেচো! নীরু বয়কে বলো, আমরা তৈরী।

সঙ্গে সঙ্গে নীরুও ঘরে ঢুকিল। সে কহিল—বয় আসচে নিয়ে...

চা আসিল, এবং টোষ্ট-রুটী, ডিমের পোচ, ফল, স্বদেশী মিষ্টান্ন।

চায়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল, কালিকার ঘটনা লইয়া। কেশব ঘোষ কহিলেন, আমার এক বেয়ারাকে পাঠিয়েচি শম্ভুনাথ হাসপাতালে ড্রাইভারের খবর নেবার জন্য।

চমৎকার সুযোগ! তারানাথ এ সুযোগ ত্যাগ করিল না, কহিল—আমিও চা খেয়ে যাবো, ভেবেচি।

কেশব ঘোষ কহিলেন—যাবে ? বেশ—চলো, আমরাও যাই। নীরু যাবি ?

নীরু কহিল—যাবো, বাবা। কাল রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারিনি। চোখের সামনে কেবলি সে বেচারার সেই মুখ ভেসে বেড়িয়েচে!

কেশব ঘোষ কহিলেন—বেশ, খেয়ে সকলে যাই, চলো...আবদুল আছে তো ? গাড়ী বার করুক।

তারপর নানা কথাবার্ত্তা। তারানাথ কি করে ? গৃহে তার কে আছে ? কেশব ঘোষ

কহিলেন—আমার একটি ছেলে—সে এখন বিলাতে। বারে ঢুকবে, তার সাধ। আর এই মেয়ে,—বি-এ পড়ছিল, এগ্‌জামিনটা দিলে না—হঠাৎ কি যে খেয়াল হলো। মানে আমার স্ত্রী ইন্‌ভ্যালিড হলেন,—তাঁকে কে দেখে, এই ওজুহাতে পড়া ছেড়ে দিলে। আমার ইচ্ছা ছিল, বি-এটা দেয়। তবে ঘরের কাজে খুব পটু। এই যে মিষ্টান্ন দেখচো, ও ওর নিজের হাতে তৈরী। একটা না একটা খাবার প্রত্যহ ওর নিজের হাতে তৈরী করা চাই। তাছাড়া আমার স্ত্রীকে সঙ্গ দিয়ে, তাঁর সঙ্গে নানা গল্প করে তাঁকে এমন যত্নে রেখেচে...

তারানাথ কহিল—তাঁর কি অসুখ ?

কেশব ঘোষ কহিলেন—মানসিক অবসাদ— mental derangement। থেকে থেকে কেমন হয়ে যান—যেন পাগলের মত ভাব ! তবে সে-ভাব দু'চার দিনের বেশী থাকে না, তাই রক্ষা। নাহলে—কেশব ঘোষ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—এই মনের জন্যই মানুষ মানুষ—তার বিকার ঘটলে অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অনেক জায়গায় ঘুরেচি—ওদিকে কাশ্মীর, এদিকে সিলোন। তা কোথাও কিছু হলো না। তাই ঘরে ফিরে চুপচাপ এসে বসেচি।

তারানাথ করুন ম্লান দৃষ্টিতে কেশব ঘোষের পানে চাহিল।

কেশব ঘোষ কহিলেন—মানে, সেবার দার্জ্জিলিংয়ে ল্যান্ড শ্লিপ হয়ে আমার বড় মেয়ে আর জামাই একসঙ্গে প্রাণ হারান—সেই shock-টার পর থেকেই...

কেশব ঘোষ চুপ করিলেন। তারানাথের চোখের সামনে পাহাড়ের ধ্বংস-স্তুপের উপর হত্যালীলার এক ভয়ঙ্কর ছবি ফুটিয়া উঠিল ! শিহরিয়া সে চক্ষু মুদিল।

যথাসময়ে বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিল। কেশব ঘোষ কহিলেন—চলো, বাবা।

তিনজনে হাসপাতালে আসিলেন। ড্রাইভার ভালো আছে। জ্ঞান হইয়াছে, ভয়ের কোন কারণ নাই। নীরু কহিল—বাঁচলুম। যে ভাবনা হয়েছিল !

৩

কেশব ঘোষের সমাদর-স্নেহে তাঁর গৃহে তারানাথের গতি বেশ সঘন অব্যাহত হইয়া উঠিল। তারানাথ ভাবিত, উপন্যাসে যেমন পড়া যায়—সেই চায়ের টেবিল ; লেসের পর্দ্দা ; স্নেহ-সমুদার চিত্ত প্রৌঢ় অভিভাবক ; তাঁর আদরের তরুণী কন্যা, এবং সে কন্যা রূপসী ও শিক্ষিতা ; রুগ্না গৃহিণী ; চায়ের টেবিলের অদূরে পিয়ানো এবং সে পিয়ানোর ধারে বসিয়া তরুণীর গান ; ক্ষণে ক্ষণে সমাজ ও সাহিত্য লইয়া সরস আলোচনা...তার জীবনেও অকস্মাৎ যখন সে সব আয়োজন এমন পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—এবং এতগুলি আয়োজনের সমষ্টি উপন্যাসে যে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়, তেমনি সম্ভাবনা তার জীবনেও...

এ কথা ভাবিতে বসিলে তার বুকের মধ্যটা বিষম বেগে দুলিয়া ওঠে...অথচ ভবিষ্যতের কোনো কূল-কিনারাও সে খুঁজিয়া পায় না।...

সেদিন তারানাথ মাথায় ব্রশ চালাইতেছিল, নীরুদের ওখানে যাইবার জন্য। মা বলিলেন—আজ বেরুস নি রে...

তারানাথ কহিল,—কেন ?

মা কহিলেন—বিমলার মামাশ্বশুরের একটি মেয়ে আছে না—তা, ওর মামাশ্বশুর আজ তোকে দেখতে আসবেন...

বিমলা তারানাথের দিদি। ক'দিন মায়েতে-মেয়েতে এই পরামর্শই চলিতেছিল।

তারানাথ কহিল,—কেন ?

মা কহিলেন,—বিয়ের জন্যে—আবার কেন ?

তারানাথ কহিল—কে বললে তোমাদের যে আমি বিয়ে করবো ?

মা কহিলেন—শোনো ছেলের কথা ! তুই বলবি, তবে তোর বিয়ের কথা পাড়বো ! কেন—তোর আপত্তি কিসের, শুনি ? এ মেয়ে, এ, বি, সি, ডি পড়চে, ইংরিজি শিখচে...বাপ কাটোয়ার উকিল, বেশ দু'পয়সা রোজগার করে...

তারানাথ কহিল—আমি তোমাদের এ, বি, সি, ডি মেয়ে বিয়ে করচি কি না...জানোয়ার, জড়ভরত ! ফার্ষ্ট বুক খুলে পড়াতে হবে... A sly fox met a hen... ও-সব হবে না। আমার সাফ্ কথা !

মা কহিলেন—তুই যে অবাক করলি রে ! এ্যাঁ, ইংরিজি শিখচে মেয়ে—এ'ও পছন্দ নয় ?

তারানাথ কহিল—না।

না কহিলেন—না তো বাড়ীতে একটু থাকতে হানি কি ! ভদ্দর লোক আসচে কত দূর থেকে...

তারানাথ কহিল—আসে, জলটল খেয়ে বাড়ী যাবে। আমায় বলোনি কেন আগে ? আমার কাজ আছে, আমি থাকতে পারবো না।

মা কহিলেন—কি তোমার কাজ, তাও বুঝি না ! বাড়ীতে তো একদণ্ড থাকো না—কোথায় কি কাজকর্ম্মে ঘুরচো, তুমিই জানো। তা, দাঁড়িয়ে অপমান করাবি... ?

তারানাথ সে কথার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল।

পথে বাহির হইয়া তারানাথ মনে মনে গর্জ্জন করিতেছিল— Impudence। স্পর্দ্ধার সীমা নেই ! ...কাটোয়ার মেয়ে বিয়ে করতে হবে ! মোটরের হর্ণ শুনলে যে মূর্চ্ছা যাবে...না জানে শাড়ী পরতে, না জানে জুতো পায়ে হাঁটতে..ছ্যা...এ-বি-সি-ডি পড়চেন—তবেই আর কি, আমার মাথা কিনে ফেলেচেন একেবারে—ওঃ !

সহসা পাশ হইতে ললিত কণ্ঠের আহ্বান—তারানাথ বাবু. .

চমকিয়া তারানাথ চাহিয়া দেখে, নীরু। তার সঙ্গে একটা বেয়ারা। তারানাথ কহিল—আপনি... ?

নীরু কহিল—আপনাকে চমকে দেবো, ভেবেছিলুম। বাবাকে বললুম, তারানাথবাবুর রোজ আসেন, তাঁর বাড়ীতে আমরা একদিনও যাই না, এ ভারী অন্যায় হচ্ছে। বাবা বললেন, চলো, আজ আমরা তাকে ডেকে আনি। তা আমার ত্বর সইলো না, বেয়ারাকে নিয়ে অম্‌নি বেরিয়ে পড়লুম—ও বললে, বাড়ী ও চেনে।

তারানাথ ভাবিল, সর্ব্বনাশ ! আজ কাটোয়ার সেইকে উকিল আসিতেছে—গায়ে পিরাণ আঁটা, কোথাকার জংলী ! আর আজই... ? তা ছাড়া তার বাড়ীর যা হাল...

সে কহিল,—আজ আমার বাড়ীতে কেউ নেই যে...আপনারা আসবেন, এ তো ভালো কথাই। আমি নিজেই ভাবছিলুম, একদিন নিয়ে আসবো আপনাদের। মাকেও বলেছিলুম...

নীরু কহিল—তাইতো, কেউ নেই! তা বেশ, আর একদিন—আজ তা হলে বরং লেকে যাওয়া যাক...

তারানাথ কহিল—বেশ।

নীরজা বেয়ারার দিকে চাহিয়া কহিল—তুই বাবাকে গিয়ে বল্‌বি—আজ আর তারানাথ বাবুর বাড়ী যাওয়া হবে না—আমরা লেকে চললুম। বাবা যদি আস্‌তে চান তো আসতে বলিস্। ... বুঝলি?

বেয়ারা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে—এবং পরক্ষণে বিদায় লইল।

নীরজা কহিল—চলুন...

তারানাথ চলিল। নীরজা কহিল—চমৎকার। জায়গা হয়েচে ঐ লেক, না?

তারানাথ কহিল—হ্যাঁ।

পথিকের দল দুজনের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, এমনি, অলস কৌতূহলে! তাদের সে দৃষ্টির স্পর্শে তারানাথের গা ছম্‌ছম্ করিতেছিল।...

দুজনে লেকে আসিয়া বসিল। নীরজা কহিল—আপনি সাঁতার জানেন?

তারানাথ কহিল—জানি।

নীরজা কহিল—আমিও জানি। তবে অভ্যাস নেই...একদিন এই লেকে সাঁতার দেবেন? দেখুন, আমি রাজী আছি।

তারানাথ কহিল—বেশ।

নীরজা কহিল—ঐ দ্বীপটা চমৎকার...ওখানে একদিন গিয়ে বসলে হয়।

তারানাথ অন্যমনস্কভাবে কহিল—হ্যাঁ। ...সে কি-সব ভাবিতেছিল।

নীরজা তো কথা কহিতেছে বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবেই—তারানাথের জবাব কিন্তু ছোট হইতেছে! তারানাথ তা লক্ষ্য করিল। কিন্তু কি লইয়া বড় কথা সে সুরু করে? কি এমন কথাই বা নিজে হইতে কহিবে? কহিবার মত একটা কথা আজ শুধু প্রকাণ্ড সুদীর্ঘ পরিসরে ফাঁপিয়া উঠিতেছে—সে কথার আড়ালে বিশ্বের আর সব কথা কোথায় তলাইয়া যায়! কিন্তু কখন্? কখন্ সে সে-কথা বলিবে?... খুব সংক্ষেপে সে বলিতে চায়, তোমায় আমি ভালোবাসি, নীরু! তারপর আরো-ছোট একটি মাত্র প্রশ্ন—তুমি আমায় ভালোবাসো?

তারানাথ নীরজার পানে চাহিল, নীরজার স্থির দৃষ্টি জলের উপর ন্যস্ত। নীরজা কি ভাবিতেছে? ...তার বুকে যে-কথা বাজে... তাই কি? কিন্তু কি বলিয়া ডাকিবে? নীরু? কখনো নাম ধরিয়া ডাকে নাই। ডাকটুকু ছাড়িয়াই এতদিন যা-কিছু কথা কহিয়া আসিয়াছে...সহসা নীরু বলিয়া সম্বোধন কেমন যেন বাধিতে ছিল! কাশিয়া সে কহিল—কি ভাবচেন?

নীরজা কহিল,—কত কথা যে মনে আসচে! কত দূর-দূরান্তে আমার মন ভেসে চলেছে...নীরজা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারানাথের বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! মনের এ দূর-দূরান্তে ভাসিয়া চলা...কত কথার আনাগোনা? তবে তো...আনন্দে তার মন দুলিয়া উঠিল! এইবার...

নীরজা কহিল,—একটা গান গাই—কেমন?

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার পাৎলা ছাই-রঙা চাদরের পর্দা বিছাইতেছিল।

তারানাথ কহিল—গান্।

নীরজা গাহিল—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে ;
আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে !
...	...	....	...
তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা—
কেমন করে কাটবে আমার এমন বাদল-বেলা ?

একবার দু'বার তিনবার নীরজা গানটি গাহিল। তারানাথের বুকের মধ্যটা ব্যথায় ভরিয়া আকুল ভারী হইয়া উঠিল। এ কি তাকে লক্ষ্য করিয়াই গাহিতেছে ? তার কেবলি মনে হইতে লাগিল, নীরজার দুই হাত ধরিয়া বলে,—থামাও, থামাও, তোমার ও গান, নীরজা...তোমার বাদল-বেলা আরামে কাটিবে—আমি তোমায় হেলা করি নাই, হেলা করি নাই...

গান থামিল। তারপর দুজনেই চুপ...ওই দূরে দূরে ক'টা আলোর রশ্মি ছুটিয়া চলিয়াছে—ও মোটরের আলো ! ওপারে ও আবার কে গান গায়... ?.. কি গায় ?

ওরে বল্, তারে বল্
প্রাণ কি সে চায়,...
বেলা যে ফুরায়।

ঠিক কথা ! বেলা ফুরায়—বেদনা বাড়িয়া চলে ! প্রাণের কথা বলিয়া ফেল্—আর দেরী নয় !

তারানাথ ডাকিল...নীরজা...দেবী...

নীরজা কহিল—আমায় ডাকচেন ?

তারানাথ কহিল—হ্যাঁ।

নীরজা ফিরিয়া চাহিল, কহিল—কি ?

নীরজার স্বর বেশ সহজ ! তারানাথ কাশিল ! তার কথা বাধিয়া গেল। নীরজা কহিল—কি বলচেন ? উঠতে চান ?

তাররানাথের সব কথা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। সে কোনো মতে বলিল,—হাঁ। তারপর আবার কাশি...কাশিয়া কহিল—রাত হয়ে যাচ্ছে, না ?

—বেশ, উঠুন। নীরজা উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারানাথের মনে হইল, কাছের ঐ গাছে নিজের মাথাটাকে ঠুকিয়া ছেঁচিয়া সে চূর্ণ করিয়া দেয় ! কাপুরুষ—এটুকু সাহস যদি তোর না থাকে তবে তরুণীর প্রেম কামনা করে কি বলিয়া !

উঠিয়া একটু অগ্রসর হইতেই কেশব ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি কহিলেন—এর মধ্যে উঠলে তোমরা ?

নীরজা কহিল—তারানাথবাবু বললেন, রাত হয়ে গেছে।

কেশব ঘোষ কহিলেন—কাজ আছে বুঝি বাড়ীতে ?

তারানাথ কহিল—না।

কেশব ঘোষ কহিলেন—তবে চলো আমার ওখানে ! একটা নতুন বই এনেচি দেখাবো তোমাদের।...

আরো আট-দশ দিন পরের কথা।

দুপুরে আহারাদি সারিয়া তারানাথ একখানা বাঙলা উপন্যাস পড়িতেছিল। পড়ায় মন লাগিতেছিল না। মন ঘুরিতেছিল সেই মালতী-লতার ঝাড়ঘেরা গৃহের আশে-পাশে। কিন্তু দু'ঘণ্টা পূর্ব্বে সেখান হইতে আসিয়াছে, এখনি আবার যাওয়া ? কি বলিয়া যায় ? কাজেই...

ভৃত্য পঞ্চা আসিয়া একটা চিঠি হাতে দিল। ডাকের চিঠি নয়। তারানাথ কহিল—কে আনলে এ চিঠি ?

পঞ্চা কহিল—ঘোষ সাহেবের বাড়ীর বেয়ারা...

ওঃ ! তারানাথ খুলিয়া দেখে—নীরজা লিখিয়াছে ! বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে চিঠি পড়িল। লেখা আছে,—

তারানাথবাবু,

আজ ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আসা চাই। বেড়াতে যাবো। কোনো আপত্তি শুনবো না। ঠিক আসচেন তো ? না এলে ভারী রাগ করবো।

নীরজা...

সাধ হইল, চিঠিখানা সে বুকে চাপিয়া ধরে ! এ যেন পাখীর গান, ঝর্ণার জল, ফুলের গন্ধ ! কি আরাম এই কটী ছত্রে ! প্রণয়ের কোনো লীলা কোথাও নাই—তবু এই যে কথাটুকু...না এলে ভারী রাগ করবো। আঃ ! লক্ষ্মীছাড়া পঞ্চাটা রহিয়াছে ! নহিলে...

সে তার নাম-ছাপা চিঠির কাগজে পরিষ্কার অক্ষরে লিখিল—

নীরজা দেবী

নিশ্চয় যাবো। রোষের বা অভিমানের কোনো হেতু থাকবে না। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ধন্যবাদ নিন।

তারানাথ

খামে পুরিয়া চিঠিখানা পঞ্চার হাতে দিয়া তারানাথ কহিল—দিগে যা...আর আট আনা বখশিসও বেয়ারাটাকে দিবি, বুঝলি ?

ঘাড় নাড়িয়া পঞ্চা চলিয়া গেল। ....

কিন্তু বেলা এখন একটা ...সাড়ে চার ঘণ্টা... কি করিয়া এ দীর্ঘ সময় কাটানো যায় !

আয়নার সামনে গিয়া সে দাঁড়াইল। আর একবার কামাইয়া লইলে হয়...দাঁড়িগুলো...হুঁ ! খুর-ব্রাশ-সাবান বাহির করিল। সকালের কামানোর উপর আবার দাড়ি-গোঁফ চাঁছিল। তারপর কাপড় জামা ! আলমারি খুলিয়া ঘাঁটিয়া টানিয়া বাছিয়া একপ্রস্থ পোষাক বাহির করিল। এই সঙ্গে... ঠিক ! সে পঞ্চাকে ডাকিল।

পঞ্চা আসিলে তাকে র্ভৎসনা করিয়া করিল,— পাম্প-শুটায় ক্রীম্ লাগাতে পারো না রোজ ?... বার কর্ জুতো, কালো পাম্প—লাগা ক্রীম।

পঞ্চা কহিল,—আজ্ঞে খেয়ে উঠে. .

তরানাথ কহিল—না, আগে ক্রীম দে, দিয়ে তারপর খেতে যাবি...

তবু অনেকখানি সময় এখনো বাকী...

সে গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপাইল। ... অসহ্য ! গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া

পড়িল।...

কথায় বলে, কণ্টকশয্যা ! ভারী ছোট কথা... শয্যা নয়, এ কণ্টক-গৃহ। না হয় একটু আগেই যাই...ক্ষতি কি ! যদি... ?

কি আর ভাবিবেন ? নয়, কেশব ঘোষের সঙ্গে খানিকটা ফিলজফির চর্চা হইবে।...

সুবাসিত সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া জামায় সেন্ট ঢালিয়া সজ্জিত বেশে তারানাথ বাহির হইল...

নীরজা কহিল,—বাবা বাড়ী নেই। এক মুশকিল বেধেচে।

মুশকিল ! তারানাথ কহিল,—কি হয়েচে ?

নীরজা কহিল—মানে, আমার এক মাসিমা তাঁর দ্যাওরের মেয়ের বিয়েয় কেষ্টনগর গেছেন। দুটী ছেলেমেয়ে—সে পাড়াগাঁয়ে তাদের এত আগে থেকে নিয়ে যাবেন না বলে আমাদের এখানে রেখে গেছেন। ছেলেরা খুঁতখুঁৎ করচে। বাবা কি কাজে বেরিয়ে গেলেন। ...সেই ছেলেমেয়েদের একটু ভোলাবার জন্য আমায় বলে গেছেন, ওদের নিয়ে বায়োস্কোপে যেতে হবে। কি একটা কমিক্ ছবি আছে পিক্‌চার প্যালেশে। তাই আপনার শরণ নিতে হলো...

—তার আর কি ! বলিয়া তারানাথ একটা কৌচে বসিয়া পড়িল। নীরজা ডাকিল—দিবু...

দশ বছরের একটি ছেলে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া হাজির। হাফ্-প্যান্ট পরা, গায়ে টুইল সার্ট, পায়ে একজোড়া গিদ্ধড় বুট। ছেলেটির এক হাতে ব্যাট, অপর হাতে বল, বগলে এক-রাশ কাঠি আর ছেঁড়া কাগজ। একটু আগে লজেঞ্জেস খাইয়াছে, দু'গালে তার রস একেবারে ন্যাবড়ানো রহিয়াছে।

নীরজা কহিল—টুনি কোথায় ? এবার তৈরী হবে দুজনে।

দিবু কহিল—টুনি, ঐ চায়ের কেট্‌লি নিয়ে চা তৈরী করচে...

নীরজা দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—চা তৈরী করচে !...

পরক্ষণেই ওদিকে ঝন্-ঝন্ শব্দ ! নীরজা ছুটিয়া গেল এবং পরমুহূর্তে ছ' বছরের একটি মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। মেয়েটার হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে—ফ্রকে চা লাগাইয়াছে—মুখে চায়ের ভিজা পাতা ও চিনির রস ! ব্যাপার দেখিয়া তারানাথের চক্ষু-স্থির ! এই পরিচ্ছন্ন স্বর্গলোকে এ দুটো ছেলেমেয়ে যেন বিপ্লবের মত !

নীরজা টুনিকে বকিল, পরে বেয়ারাকে ডাকিয়া আদেশ দিল,—এর হাত মুখ ধুইয়ে একটা ফ্রক পরিয়ে দে। আর দিবু, তুমি মুখ-হাত সাফ করে ফেলো...নাহলে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যাবো না।...

স-পাঁচটায় বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিল। দিব্যনাথ এবং টুনিকে লইয়া তারানাথ ও নীরজা আসিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল। বিশ মিনিটে পিকচার প্যালেশ।

নীরজা একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া কহিল—টিকিট কিনুন্...

তারানাথ কাতর দৃষ্টিতে নীরজার পানে চাহিল, কহিল—আমি কি এ সামান্য অধিকারটুকু... ?

হাসিয়া নীরজা কহিল—মাপ করবেন। বেশ, তাই হোক্।

তারানাথ গিয়া টিকিট কিনিল—চারখানা ফার্ষ্টক্লাশ।

টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া নীরজার পানে চাহিল। নীরজা তখন সাহেবী-পোষাক-পরা

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তীব্র আগ্রহে কথা কহিতেছে। তার মুখে-চোখে হাসির কি দীপ্তি! আনন্দের কি হিল্লোল!

তারানাথ ডাকিল—আসুন...

নীরজা কহিল—যাচ্ছি। আপনি এগোন এ-দুটোকে নিয়ে...

দু'হাতে দিবু ও টুনির হাত ধরিয়া তারানাথ গিয়া শীটে বসিল—নিজের এক পাশে জায়গা খালি রাখিল নীরজার জন্য।

ভিতরে দর্শকের দলে হাসি, কৌতুক ও কলরবের যেমন অন্ত নাই, পোষাকের বৈচিত্র্য, বর্ণের বৈচিত্র্য—বৈচিত্র্যেরো তেমনি অন্ত নাই!...

ঘণ্টাধ্বনি...আলো নিবিল। তারানাথ অধীর হইল—নীরজা? ছবি সুরু হইয়া গেল। প্রথমেই গেজেট। টুনি এবং দিবুর বকুনিও সেই সঙ্গে সুরু। ওটা? গাড়ীর পিছনে লোক নেই কেন? কামানের শব্দ কৈ? বা রে!...মেমটা ও কি করচে?...প্রশ্নের জ্বালায় তারানাথ অতিষ্ঠ! ওদিকে নীরজারও দেখা নাই।

ড্রামাও আরম্ভ হইয়া গেল—কমেডি, হ্যারল্ড লয়েডের। ছবির দিকে তারানাথের মন নাই এতটুকু...নীরজা? মনের মধ্যে সহস্র প্রশ্ন জাগিতেছিল। নীরজা? বাহিরে দিবু ও টুনির তেমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন! বুঝাইলে থামে না, বকিলে আরো প্রশ্ন তোলে। এক তিল বিরাম নাই। তারানাথের মনের অবস্থা ভালো ছিল না। তার উপর এই প্রশ্ন, আর নানান্ বায়না! তার মনে হইতেছিল, ছেলে-মেয়েদুটোর মাথা ঠকাঠক্ ঠুকিয়া দেয়! এ সন্দেহও তার মনে একবার জাগিল, ছেলে-মেয়ের জ্বালায় জ্বলিয়া নীরজার মাসিমা এদের এখানে ফেলিয়া হরিদ্বারের ওদিকে পলাইয়া যান্ নাই তো? বাপ, কি ছেলে-মেয়ে! জীবন্ত বর্গীর হাঙ্গামা!

অবেশেযে Interval. .আঃ!

আলো জ্বলিতে তারানাথ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে,—নীরজা? না, সে কোথাও নাই। তার ভাবনা হইল। দুশ্চিন্তার রাশি আসিয়া একেবারে অক্ষৌহিণী সেনার মত মনটাকে ছাইয়া ফেলিল।

দিবু কহিল—ডাল ভাজা খাবো।

টুনি কহিল,—ঐ চকোলেট...

মৃদু বায়না ক্রমে তীব্র বিরক্তির সহিত মিশিয়া সশব্দ হইয়া উঠিল। পাশের দর্শকের দল কৌতুকে মাতিয়া তাদের পানে চাহিতে লাগিল।

রোষে ক্ষোভে নৈরাশ্যে জ্বলিয়া ছেলেমেয়ে দুটার হাত ধরিয়া টানিয়া তারানাথ বাহিরে আসিল।...চকোলেট কিনিল; ডাল-ভাজাও। টুনি ও দিবু কতদিনকার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত যে-ভঙ্গীতে সেগুলার সদ্ব্যবহার করিতেছিল, দেখিয়া তারানাথের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। বায়নার তখনো অন্ত নাই! একটা বাঁশী... দিবু কহিল—আমার একটা ফুটবল চাই—কিনে দিন। তারানাথ ভাবিল, এদের এখানে ফেলিয়া পলাইতে পারিলে সে বাঁচে...কি আশা লইয়া আসিয়াছিল, আর...

ভিতরে ছবি চলিতেছে। তারানাথ গেল না; ভাবিল, গাড়ীখানা?

পথে বাহির হইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে...কেশব ঘোষের মোটরের চিহ্নও নাই! তবে কি...? না, অসম্ভব! কিন্তু গেল কোথায়? সেই লোকটা কোনো ছলে...? সে চমকিয়া উঠিল। elopement? সর্ব্বনাশ! গিয়া কেশব ঘোষের কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে?

কোন্ মুখেই বা ফিরিবে সে ?... না, ফেরা হইবে না ! এখান হইতে সটান... ! কিন্তু ছেলেমেয়েদুটো ? তাদের নয় থানায় জিম্মা করিয়া যাইবে !...

তারানাথ কি পাগল হইবে ? তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল ।... চেতন নাই... বুকে শুধু ঐ এক প্রশ্ন মস্ত কাঁটার মত সর্ব্বক্ষণ বিঁধিতেছে... নীরজা, নীরজা... ?...

বায়োস্কোপ ভাঙ্গিল। দলে-দলে লোক গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। টুনি ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাকে বুকে তুলিয়া দিবুর হাত ধরিয়া তারানাথ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া। মুখের চেহারা যা হইয়াছে...যেন সে সদ্য খুন করিয়া আসিয়াছে ! উদ্বিগ্ন আকুল দৃষ্টিতে বেচারী সকলের মুখের পানে তাকাইতেছে...এদের মধ্যে যদি নীরজাকে খুঁজিয়া পায় ! কিন্তু...

—মাপ করুন তারানাথ বাবু...সেই পরিচিত স্বর ! আঃ !

তারানাথ চাহিয়া দেখে, নীরজা—হাসি-ভরা মুখ, আর তার পাশে সাহেবী পোষাক-পরা সেই ভদ্রলোক !...পাজী, শয়তান—তার সন্ধ্যাটাই আজ মাটী করিয়া দিয়াছে !

একটা সংশয়...ক্রূর দৃষ্টি...চকিতেব জন্য ! না, নীরজার ওই হাসি-মুখ...কিন্তু আশ্চর্য্য !

নীরজা কহিল—আপনাকে বড় কষ্ট দিয়েচি, মাপ করবেন। এঁর দোষে শুধু...

বলিয়া নীরজা পাশেব ভদ্র লোকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। তারানাথ রাগে গুম্...মেয়েটা তখনো বুকের উপর ঝুলিতেছে। চকোলেট, আর টুনির লাল-রসে তার সিল্কের দামী শার্টটার শ্রী যা হইয়াছে...

নীরজা কহিল—আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত তারানাথ মিত্র, বি-এ, আর...

নীরজার মুখে মৃদু হাসি, লজ্জার ঈষৎ আভায় সে হাসিতে অপরূপ মাধুরী ! নীরজা বলিল,—এঁর নাম নিশীথচন্দ্র বোস...

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন—এঁর পাণিগ্রহণের জন্য নির্ব্বাচিত পাত্র...বাঙলা ভাষাটুকু ঠিক হলো তো ...? বলিয়া তিনি নীরজার পানে চাহিলেন।

নীরজা কহিল—উনি থাকেন শিলঙে...সেখানে কারবার করেন।

ভদ্রলোক কহিলেন—এবং সামনের অঘ্রাণ মাসে ইনিও শিলঙ যাবেন। যেহেতু অঘ্রাণে আমাদের বিবাহ হবে।...

কথাগুলা বাজের মত তারানাথের কাণে বাজিল।...নীরজা বলিতেছিল—আজ সকালে ইনি কলকাতায় এসেচেন। আমাদের ওখানে গেছলেন সন্ধ্যার আগে—আমার দেখা পাননি। সেখান থেকে খবর পেয়ে এখানে আসেন...এম্পায়ারে মহিলারা মিলে 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' প্লে করচেন আজ—চ্যারিটিতে। তার দু'খানা টিকিট ওঁকে গচিয়েছিল। তাই আমায় নিয়ে যাবেন বলে আমাদের ওখানে গেছলেন...তাছাড়া ওঁর দিদিও এম্পায়ারে এসেছিলেন কি না, আমায় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। কাজেই যেতে হলো। ভেবে ছিলুম, শীগগির ফিরে আসবো, আপনাকে একলা রেখে গেছি..., তা, কথায় কথায়...

তারানাথ কোনো জবাব দিল না। নিশীথ কহিল—ভদ্দর লোক লগেজ ঘাড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ! চলো, তোমাদের গাড়ীতে তুলে দি। কাল সকালে তোমারে ওখানে যাবো। আমি আবার পরশু চলে যাচ্ছি....

গাড়ীতে চড়া এবং বাড়ী আসা...সে যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের আবছায়া ! গাড়ীতে নীরু কি সব বকিতেছিল, বহু কথা ! এবং তারানাথ তার উত্তরে যে কি বলিয়াছে, সেদিকে তার

কোনো চেতনা ছিল না...

পরের দিন সকালে খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ কি-একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া তারানাথ কোথায় একখানা চিঠি লিখিল ; এবং দিন পনেরো পরে ভগ্নীপতি নিকুঞ্জ আসিয়া বলিল—ব্যাপার কি হে ! তুমি শেষ চেৎলা হাই স্কুলে হেডমাষ্টারি করতে ঢুকলে যে !

হাসিয়া তারানাথ কহিল—চুপ করে এ বয়সে বসে থাকা ঠিক নয়। নিষ্কর্ম্মা বেকার বসে থাকলে...

নিকুঞ্জ কহিল—মাথায় বোল্‌তার চাক বাঁধে। না ?

হাসিয়া তারানাথ কহিল—যা বলেচো। বোল্‌তার চাকই বটে। চম্পক-বর্ণের মোহ, সেই সঙ্গে বিকট জ্বলুনি ! ওঃ !

মা আসিলেন, আসিয়া কহিলেন—এমন খেয়ালী ছেলে যদি বাপের জন্মে দেখে থাকি ! কাজই যদি কিছু করবি তো একটা ব্যবসা-ট্যবসার ইচ্ছা, তাই না হয় কর্ ! তা না, কোথায় ছেলে-ঠ্যাঙানির চাক্‌রী করতে ছুটলো ! নব্বই টাকা মাইনে ! এ টাকায় তোর এমন কি দরকার, বাপু !

তারানাথ কহিল—টাকার জন্য নয়, মা। একটা কাজ নিয়ে থাকা—

মা কহিলেন—তারপর এই বিয়ে...

মা জামাতার দিকে চাহিলেন, সখেদে জানাইলেন—তোমার মামা অত ধরলেন...ভাগ্যে সেদিন আসতে পারলেন না, তাই। নাহলে কি ভাবতেন। দিব্যি লেখাপড়া জানা মেয়ে—

তারানাথ কহিল—লেখাপড়া-জানা মেয়ের আর নাম করো না, মা। লেখাপড়া-জানা মেয়ের নামে আমার প্রাণে কেমন আতঙ্ক জাগে।

মা কহিলেন—শোনো...একদিন বলবে, লেখা-পড়া-জানা মেয়ে চাই—পোঁটা ঝরা মুখ্যু মেয়ে বিয়ে করবো না ! আবার আজ বল্‌চে, লেখাপড়া জানা মেয়ের নাম করো না !... তা নিকুঞ্জ, তুমি এসেচো বাবা, ও কি চায়—তুমি বুঝে তার একটা বিহিত করে যেয়ো। আমার যেন গোলোক-ধাঁধায় বাস হয়েচে !...

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দৈবাৎ

—এক—

মৃণাল !

কি ভাই লতি ?

তুই কি ভয়ানক মেয়ে !

কেন ?

নয়ত কি ? বরাবর আমাকে চিঠিতে লিখে এসেছিস যে বরের সঙ্গে তোর একতিল বনে না। মানুষটির স্বভাব-চরিত্র নাকি মোটেই ভাল নয়। কিন্তু, এসে তো দেখছি ঠিক তার উল্টো ! মণিবাবুকে তো আমার একটুও মন্দ বলে মনে হচ্ছে না। বরং লোকটিকে বেশ ভালই লাগছে ! আমার তো মনে হয় তোর বরকে এ যুগের আদর্শ-স্বামী বলা চলে !

তুই আর আমাকে জ্বালাস্ নে লতি ! দিনরাত যে পুরুষ মানুষ স্ত্রীর আঁচল ধ'রে থাকতে চায় আমি তাদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না। উনি হয়ত তোমার কাছে আদর্শ হ'তে পারেন, কিন্তু আমার আদর্শ অন্য রকম।

আচ্ছা, ওঁর অপরাধটা কি শুনি ? উনি যে তোমার গান শুনতে ভালবাসেন বা তোমায় কবিতা পড়ে শোনাতে চান—সেটা কি ওঁর একটা অপরাধ ? জ্যোৎস্নারাত্রে তোমাকে ছাদে টেনে নিয়ে গিয়ে যে আপন-মনে বাঁশী বাজিয়ে শোনান, কিম্বা—শ্রাবণের মেঘলা দিনে তোমাকে পাশটিতে নিয়ে 'ঝর-ঝর-বাদল-ধারায়' তোমার এস্রাজের সুরটি মিশিয়ে দিতে অনুরোধ করেন—সে কি তাঁর একটা অন্যায় উৎপীড়ন ? তোমাকে সঙ্গে না নিলে তাঁর নিত্য অপরাহ্নে বেড়াতে যাওয়া হয় না। তুমি সঙ্গে না থাকলে, তাঁর থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখতে ভাল লাগে না। ঘরময় তোমার নানাবেশের, নানারকমের ফটোগ্রাফ ঝুলিয়ে রেখেছেন। তোমাকে নিত্য নতুন নতুন উপহার এনে দিচ্ছেন—এ সব কি তুমি তাঁর অত্যাচার বা অসহ্য আচরণ বলে মনে করো না কি ? আশ্চর্য্য বটে ! এর চেয়ে মেয়ে মানুষের জীবনের বড় সার্থকতা আর যে কি হ'তে পারে আমি তো জানি নে। তোমার মতো স্বামী সোহাগিনী হওয়ার সৌভাগ্য তো স্ত্রীলোক মাত্রেরই কাম্য।

মৃণাল গম্ভীর ভাবে বললে—কোনও জিনিষের বাড়বাড়ি যে ঠিক তার স্বাভাবিক অবস্থা নয় এটা যদি তুমি জানতে লতি, তাহ'লে আমারই মতো ভবিষ্যতের ভাবনায় অস্থির হ'য়ে উঠতে ! আজকে যে-স্ত্রীর নানাভঙ্গীতে ছবি তুলিয়ে ওঁর সাধ মিটছে না, আমার ভয় হয়, একদিন হয়ত তার ছায়া পর্য্যন্ত উনি কখন ভুলেও মাড়াবেন না !

তোর যত সব উদ্ভট কল্পনা ! এমন সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যেও দুর্দ্দিনের সম্ভাবনা অনুমান ক'রে নিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ছিস্ ! রাগ করিস্‌নি মৃণাল, কিন্তু, আমার কি মনে হয় জানিস্ ? তোর মতো মেয়েরা বোধ হয় স্বর্গে গিয়েও সুখী হ'তে পারে না !

সহাস্যমুখে মৃণাল জানতে চাইলে—কেন ? আমরা কি তোমার বিবেচনায় এতই পাপী ?

পাপ-পুণ্যের কথা নয় মিনু, যারা কোনো অনিশ্চিত দুঃখের সুদূর আশঙ্কায় আজকের এই উচ্ছ্বসিত আনন্দের মুহূর্তেও ম্লান ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ে—বোধ করি তাদের চেয়ে অভাগী আর পৃথিবীতে কেউ নেই।

ঈষৎ একটু মৃদু বিবর্ণ হাসি মৃণালের মেদুর অধরে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

বিদ্যুৎ-দীপ্তির পলকের চমকে বর্ষারাতে আকাশব্যাপী ঘন-ঘটার নিবিড় তমোরূপ যেমন নিমেষের জন্য পথিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়, তেমনি করেই যেন মৃণালের মুখের এই হাসিটুকুর ক্ষণিক আলোয় অকস্মাৎ লতিকার চ'খে পড়ে গেল তার অন্তরাকাশের বেদনা-গুণ্ঠিত ঘন-অন্ধকার !

কিন্তু লতিকা সেটাকে তার নিজেরই দেখার ভুল ভেবে নিলে এই মনে করে যে,—যার এই অগাধ ঐশ্বর্য্য কত রাণীর সম্পদকেও লজ্জা দেয়—স্বামী যার এমন নিশিদিন অনুরাগে চরণে শরণাগত—দুনিয়ার সে স্ত্রীলোকের আবার দুঃখ কি থাকতে পারে ?...সন্তান ? তা'...সে সম্ভাবনা তো এখনো সুদুর হ'য়ে ওঠেনি।

এমনিতর সৌভাগ্যই তো এদেশের সকল মেয়েই চিরদিন কামনা করে এসেছে। লতিকাও তো কায়মনে এই রকমই সুখ-সম্পদ চেয়েছিল। কিন্তু মৃণালের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল, তাই সে এই নারী-জীবনের চরম-প্রার্থিত যা—তাই লাভ ক'রে ধন্য হয়েছে। লতিকায় অদৃষ্ট মন্দ—সে তা থেকে বঞ্চিত আছে।

মৃণালের হাত'দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তার মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে লতিকা বললে—সত্যি বলছি মিণু, তোর সৌভাগ্য দেখে আমার ঈর্ষা হয় !

স্মিত-মধুর-মুখে মৃণাল বললে—তোমার যদি অমন দেবগুরু বৃহস্পতির তুল্য স্বামী না থাক্‌তো—তাহ'লে আমার এ অভিশপ্ত সৌভাগ্যকে আমি হাসিমুখে তোমার হাতে তুলে দিয়ে চলে যেতুম।

লতিকা কলকণ্ঠে হেসে বললে—আমার যেটিকে তুমি দেবগুরু বৃহস্পতি ব'লে মস্ত খাতির করলে, আমার কিন্তু সেটির উপর এতটুকুও লোভ নেই মিণু। যদি বদল ক'রে নিতে চাও আমি সানন্দে সম্মত আছি।

মৃণাল এ কথা শুনে বিস্মিত হ'য়ে ক্ষণকাল লতিকার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে—তুমি কি স্বামীকে ভালোবাসতে পারোনি লতি ?

লতিকা এ প্রশ্নের উত্তরে কোন দ্বিধা না ক'রেই ব'লে ফেললে—ভালো আমি তাঁকে খুবই বেসেছিলুম, কিন্তু, কোনও ফল হ'ল না মিণু। আমার ভালোবাসার সাধ অতৃপ্তই রয়ে গেল।

মৃণালের দুই চোখে বিপুল বিস্ময় জেগে উঠেছে দেখে লতিকা বললে—এতে বিস্মিত হবার তো কিছু নেই ভাই। পাথরের প্রতিমূর্ত্তিকে তুমি যতই প্রগাঢ় অনুরাগে আলিঙ্গন করোনা কেন—তার পাষাণ অধরে তোমার তপ্ত ওষ্ঠ চেপে ধ'রে যতই আগ্রহে চুম্বন করোনা কেন—সেকি তোমাকে সাড়া দেবে ?

মৃণাল ঘাড় নেড়ে বললে—একথা তোর কেমন ক'রে আমি বিশ্বাস করবো লতি ? জগদীশ-দা'কে যে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি। তিনি তো হৃদয়হীন নন। অমন

স্নেহময়—সরল-উদার-সদা-প্রফুল্ল—প্রাণবান—

বাধা দিয়ে লতিকা বললে—থাম্ মিণু, তুই যে একেবারে সেই "জয় জগদীশ হরে!" ব'লে— রীতিমত জগদীশ স্তোত্র পাঠ ক'রতে সুরু ক'রে দিলি! পোড়ারমুখী, এটা বুঝিস্‌নি যে—আমার এ-জগদীশ আর তোমার দেখা সে-জগদীশ নেই! প্রাণবান তিনি একদিন ছিলেন বটে ; তাঁকে সজীব দেখেছিলুম আমার বিয়ের সেই প্রথম বছরে। কিন্তু সে দস্যু রত্নাকর আজ বিপুল জ্ঞানের বল্মীক স্তূপে চাপা প'ড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন! কবে যে তিনি ঋষি বাল্মীকি হ'য়ে বেরিয়ে এসে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের জন্য কবিতা আবৃত্তি করবেন সে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবার মতো আমার ধৈর্য্য নেই। আমি তো আর সর্ব্বংসহা বসুমতী নই, সে হ'লো মাটির, আর আমি রক্ত মাংসে গড়া মানুষ!—বড্ডই একা ঠেকছিল ভাই। এলাহাবাদে গিয়ে পর্য্যন্ত যেন একবার হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলুম—সেই স্তব্ধ নিঃশব্দ ঘরে দিনের পর দিন ; একলা কি কেউ টিক্‌তে পারে? তাই তো দিনকতকের জন্যে কলকাতায় পালিয়ে এলুম তোর কাছে।

জগদীশ-দা' কি তোকে' একটুও আদর যত্ন করেন না?

আমার দিকে কি তার ফিরে চেয়ে দেখবার একটুও সময় আছে? তিনি যে আজকাল চন্দ্রশেখরেরও উপর যাচ্ছেন! সে বেচারী তবু মাঝে মাঝে শৈবলিনীর দিকে তাকাতো আর ভাবতো—'এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পেতো!' কিন্তু, ইনি সে সব পাঠও রাখেননি। এঁর 'স্ত্রী' বলে' যে কোন রকম বালাই আছে সে খেয়ালই নেই একেবারে!

যাঃ! তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি! এ কখনও হ'তে পারে? এমন কী কাজে ব্যস্ত আছেন জগদীশদা'—যে, তোর দিকে একবার চেয়ে দেখবারও ফুরসুৎ পান না তিনি?—

কে জানে—আমার মাথা আর মুণ্ডু। কি কাজে যে তোমার জগদীশ-দা' ব্যস্ত আছেন তা' জগদীশ্বরই জানেন! আমি তো দেখি তিনি একমর বই খুলে সাজিয়ে—তাড়া-তাড়া কাগজ নিয়ে কেবলই লিখছেন আর পড়ছেন, পড়ছেন আব লিখছেন! একবার জিজ্ঞাসা করেছিলুম—তাতে বলেছিলেন—কি একটা নাকি সত্যযুগের প্রাচীন লুপ্ত শাস্ত্র তিনি পুনরুদ্ধার করছেন। এই বই নাকি তাঁকে বিশ্ব-বিখ্যাত করে তুলবে—আর জগতে অমর করে রাখবে।—

তুই কেন তাঁর পাশে থেকে সেই মৃত্যুঞ্জয়ের কাজে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করিসনে? স্ত্রীর পক্ষে সেটা করা তো একটা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে।

লতিকা মৃণালের এই উপদেশে বেশ একটু ঝেঁজে উঠেই বললে—আমি তো আর তোমার মতো অতো লেখাপড়া-জানা বিদুষী মেয়ে নই যে, তোমার সেই দেবগুরু বৃহস্পতির কাজে সাহায্য করতে পারবো.? তিনিও ত জানেন। তাই, সে ঘরে আমাদের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছেন।... এক একদিন ইচ্ছে করে,—দিই ওই বইয়ের গাদা আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে ছাই করে!

ছিঃ। অমন কাজ কি করতে আছে? ও কথা মনেও আনিস্‌নে লতি।—তাঁর এতদিনের পরিশ্রম সব যে তাহলে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে!—

আর আমি যে এদিকে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছি, সেটা বুঝি তোমাদের ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়?—

কাজটা তাঁর কতদূর এগিয়েছে কিছু জানিস? কবে নাগাদ শেষ হবে বলতে পারিস?

আমার জীবদ্দশায় শেষ হবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে! সে যা বইয়ের পাহাড় সাজিয়ে বসেছেন!

মৃণাল একটু হেসে বললে—তুমি কেন সেই পাহাড়ের একপাশে ব'সে জগদীশ-দা'র ধ্যানভঙ্গের জন্য উমার মতো তপস্যা করোগে না ?—

আমার ব'য়ে গেছে ! সে তপস্যায় বসলে ভোলানাথের ধ্যান হয়ত' ভাঙবে একদিন, কিন্তু, আমি যে দেবতার পূজার অঞ্জলি হ'য়ে পৌঁছবার আগেই ম'রে শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে যাবো !

মৃণালের দাসী এসে জানালে—বাবু একবার আপনাকে এখনি ডাকছেন !

মৃণাল বললে—বলোগে তিনি একটু পরে আসছেন—

দাসী চলে গেল। লতিকা বললে—যাওনা, বাবু কেন ডাকছেন একবার শুনেই এসো না। আবার 'একটু পরে' কেন ? এক সেকেণ্ড দেরী হ'লেই তো মণিবাবু তৎক্ষণাৎ তোমার জন্য হেদিয়ে উঠবেন !

এমন সময় মণির গলা পাওয়া গেল—মিণু। মিণু ডিয়ার ! একবার শুনে যাও তো ! লক্ষ্মীটি ! শীগগির—খবর আছে—

লতিকার দুই চোখে পরিহাসের রামধনু ফুটে উঠলো !—সে হাসতে হাসতে মৃণালকে কি একটা ঠাট্টা ক'রতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ মৃণালের একান্ত বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সে কেমন যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল !

জ্বালাতন ! একদণ্ডও কি নিজেকে নিয়ে থাকবার অবকাশ পাবো না ?—এ যেন ক্রীতদাসীরও অধম করে তুলেছে— !

ব'লতে ব'লতে বেশ যেন রোষ-ভরেই মৃণাল স্বামীর উদ্দেশে চলে গেল !

লতিকা সেখানে বসে অপার বিস্ময়ে ভাবতে লাগলো— মৃণালের এ-সব কথার অর্থ কি ? যে সৌভাগ্য কায়-মনে আমি কামনা করি—যা পাবার জন্য আমি জীবন পণ রাখতেও কাতর নই—মৃণাল সেই কাম্যই এমন সর্ব্বরকমে লাভ ক'রেও সুখী নয় কেন ? স্বামীসোহাগের এই আতিশয্য, তাঁর প্রেম ও প্রীতির এই প্রাচুর্য্য—তাকে সার্থকতার আনন্দ না দিয়ে বেদনায় পীড়িত ক'রে তুলছে কেন ? লতিকা অনেক ভেবেও এর কোনও কিছু কিনারা খুঁজে পেলো না। এ রহস্য যেন তার কাছে দুর্ভেদ্য বলেই মনে হ'তে লাগলো !—

একটু পরেই অত্যন্ত খুশী হয়ে হাসিমুখে মৃণাল ফিরে এসে বললে—কৈলাসে যে তোমার শিবের টনক নড়েছে তার পার্ব্বতীর জন্যে ! গৌরীকে এখনি নিয়ে যাবার পরওয়ানা-হাতে ভৃত্য নন্দী এসে হাজির ! এই চিঠি নাও—পড়ে দেখে সব গোছগাছ করো—আমি তোমার যাত্রার উদ্যোগ করে দিতে চললুম—

মৃণাল চলে গেল। লতিকা স্বামীর পত্রখানি খুলে দেখলে, জগদীশ লিখেছে—

এলাহাবাদ

কল্যাণীয়াসু—

গণেশকে পাঠালুম। পত্রপাঠ তার সঙ্গে চলে এসে আমাকে বাঁচাও। ভারী বিপদে পড়েছি ! কলকাতা থেকে শিল্পী-বন্ধু চন্দ্রকান্ত এসে এখানে অতিথি হ'য়েছে ! তুমি তার তুলির আঁচড়ের একজন মস্ত ভক্ত বলে তাকে আসতে বলেছিলুম এখানে, তোমাব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য ! হতভাগা এমন সময় এসে হাজির হলো—যখন তুমি এখানে নেই, আর আমি বইখানার উপসংহার লিখতে ভয়ানক ব্যস্ত ! এসময়ে তুমি এসে না রক্ষা করলে তো আর কোনও উপায়ই

দেখছি না প্রিয়তমে ! এ বাড়ীতে অতিথির অমর্য্যাদা হবে, আশা করি তুমি তা' কখনই চাইবে না' প্রাণাধিক !

আমার স্নেহশীষ ও ভালবাসা নাও। মিণুর কি আমাকে মনে আছে ? তাঁর স্বামীকে আমার প্রীতি-অভিবাদন জানিও। ইতি—

তোমার জগদীশ

দুই

জগদীশ তোমার ছবি দেখে কি ব'ললে লতি ?

তিনি এখনও দেখবার সময় পাননি।

ব্রুট্ ! যাকগে, সে না দেখুক্, তাতে কিছু এসে যায় না। যার সন্তোষের জন্য আমি এতদিন ধরে পরিশ্রম করলুম, তার পছন্দ হ'য়েছে কিনা জানতে পারলেই ধন্য হবো !

লতিকা চুপ করে নতমুখে ব'সেছিল।

শিল্পী চন্দ্রকান্ত উঠে সেই সোফারই একপাশে গিয়ে ব'সলো। লতিকার হাতে দু'খানি ধ'রে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—বলো না লতি ! ছবি তোমার ভালো লেগেছে ?

কি ক'রে বলবো বলুন ? আমাকে কি আমি দেখতে পাই ?—ব'লে লতিকা চন্দ্রকান্তর মুখের দিকে চেয়ে একটু মুখ টিপে হাসলে।

চন্দ্রকান্ত উঠে ড্রয়িংরুমের একখানা প্রকাণ্ড আয়না পেড়ে লতিকার সামনে ধ'রে বললেন—এইবার ব'লো !

লতিকা হেসে উঠে ব'ললে—হাঁ ; এর চেয়ে আপনার ছবি অনেক ভালো হয়েছে স্বীকার করছি।

আয়নাখানা দেওয়ালের গায়ে আবার ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে চন্দ্রকান্ত বললে—তুমি যা ব'ললে তা সত্য নয় লতি। আয়নার মধ্যে যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি সে আমার ছবির চেয়েও ঢের-ঢের ভালো !

আচ্ছা, ঐ যে পশ্চিমের দেওয়ালে ঝুলছে—ওখানা কার ছবি বলুন ত ?

কি জানি !

সত্যি জানেন না ? চিনতে পারছেন না বুঝি ?

একটুও না ! কার বলো তো ?

আপনারই তো !

সত্যি নাকি ?

হ্যাঁ, সেবার এলাহাবাদ একজিবিশন থেকে আপনার ওই 'বাসবদত্তা' ছবিখানা আমি দেড়শ' টাকা দিয়ে কিনে এনেছিলুম। উনি আমায় বড্ড বকেছিলেন। সেই দিন প্রথম শুনি ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে। আমি জানতুম আপনি শুধু ছবিই আঁকেন। এখন দেখছি আপনার অনেক গুণ !—

দেখো, তুমি এমন করে অতিথির অপমান কোরো না কিন্তু ! আমি জগদীশকে বলে দেবো !

বারে ! এ বুঝি অপমান করো হ'লো ? পরশু দিন আপনি কত গান শোনালেন ; তার আগের দিন কত কবিতা পড়লেন, তার আগের দিন রাত্রে বাঁশী শোনালেন—এগুলো বুঝি মানুষের গুণ নয় ? না, নিজগুণ অস্বীকার করে আপনি নিজের আর একটা অতিরিক্ত

গুণেরই পরিচয় দিচ্ছেন ?—বিনয় ! এইবার বুঝেছি ! কি বলেন ? ধরা প'ড়ে গেছেন তো ?

তুমি ভারী দুষ্টু ! আমার ইচ্ছে ক'রছে তোমার খোঁপাটা টেনে খুলে দিই ! তুমি বুঝি কোনও গুণের পরিচয় দাওনি ?—কাল রাত্রে জ্যোৎস্নায় ছাদে বসে এস্রাজ শোনাচ্ছিল কে ?

আপনি তো কই শু'নলেন না !

শুনলুম না !—উঃ ! কী মিথ্যেই যে বলো তুমি ? তোমার বাজনা শুনতে শুনতে কাল আমার চোখে যেন কোন্ স্বর্গের ঘুম নেমে এসেছিল। কখন যে তুমি পালিয়ে এসেছিলে কিচ্ছু টের পাইনি ! হঠাৎ ঘুম-ভেঙে চেয়ে দেখি পাশে তুমি নেই !—চাঁদের সমস্ত আলোটুকু যেন আমার চোখ থেকে দপ্ করে নিবে গেল ! সারা রাত আর ঘুমুতে পারলুম না। শেষে, উঠে গিয়ে—তোমার নামে একটা কবিতা লিখে ফেললুম !

ওমা ! আপনি বুঝি কবিতাও লিখতে পারেন ?—কী আশ্চর্য্য ! কই, দেখি না—কি লিখেছেন ? না না—আপনি পড়ুন, প'ড়ে আমাকে শোনান। আপনার গলা ভারী মিষ্টি ! ভারী চমৎকার আবৃত্তি করতে পারেন আপনি !

না,—আমি সে কবিতা পড়বোও না,—দেখাবোও না,—তোমাকে শোনাবোও না !—

সে কি ! আপনি কি তবে আমার উপরে ক্রুদ্ধ হয়েছেন ?—অতিথি-সেবার কি আমার কিছু ত্রুটি হয়েছে ? কোনও অপরাধ করেছি কি শ্রীচরণে ?

দেখো, আমি সব রকম শিষ্টাচার ও বিনয় সম্ভাষণ ছেড়ে দিয়ে তোমাকে 'নাম' ধরে ডাকছি, 'তুমি-তামি' করছি—তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কামনা করে ' আর, তুমি কিনা এখনও আমাকে 'আপনি মশাই' বলে কেবলই দূর ও পর ক'রে রাখছো !

'তুমি' বললে যে আপনার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব বোঝাবে ! অতিথির অপমান করা হবে !

একটুও না ! ভগবানের চেয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা ত' আমরা আর কাউকেই করিনি লতু ? কিন্তু, সেই বিশ্বপিতাকে আমরা 'তুমি' বলেই সম্বোধন করি ? সাধকেরা আবার তাঁদের ইষ্টদেবীকে 'তুইতোকারী'ও করেছেন দেখি—যেমন ধরো দ্বিজ রামপ্রসাদ— !

নাঃ ! আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই দেখছি ! সকল বিষয়েই আপনি আমাকে তর্কে হারিয়ে দেন।

তোমাকে যে আমি সকল দিক দিয়েই জয় ক'রে নিয়ে যেতে চাই ! তোমার ওই হার-মানা-হার আমার গলায় বিজয়-মালা ক'রে পরতে চাই !

লতিকার মুখখানি নব-বধূর মতো সরমে রাঙা হয়ে উঠলো !—

লুব্ধদৃষ্টিতে চন্দ্রকান্ত সে-মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—কি সুন্দর ! লজ্জা তোমার এই অনিন্দ্য রূপকে যেমন অপরূপ করে তোলে—এমন আর আমি কোনও নারীর মধ্যে দেখিনি ! এ যেন অরুণের অসীম অনুরাগে তরুণী ঊষার আরক্ত মধুর সুষমা !

যান্ ! আপনারা বড় মিছে কথা ব'লে আমাদের তোষামোদ করেন !

সত্য কথা অধিকাংশ সময়েই যে তোষামোদের মতোই শোনায় লতু ! তা'ছাড়া, আর একটা কথা কি জানো—মানুষ যাকে ভালবেসে ফেলে তার সকলই সে গুণ দেখে ! তোমার সব কিছুই ভালো—এ না-বলে যে আমার আর উপায় নেই লতু !—তোমার কোনও দোষ তো আর এখন হাজার চেষ্টা করলেও আমার চোখে পড়বে না !...অখণ্ড

সুন্দরের পরিপূর্ণরূপ আমি আজীবন সন্ধান ক'রে ফিরেছি, এই অনুপমের অনুসন্ধিৎসাই আজ আমাকে শিল্পী ক'রে গড়ে তুলেছে! ওগো! এত দিনে আমি তাকে পেয়েছি!—তোমারই মধ্যে আমার সেই ধ্যানের প্রিয়াকে দেখেছি!—আমি তাকে নিয়ে যাবো, আমার পথ-হারা অন্তর-লক্ষ্মীকে আমি তার স্বস্থানে নিয়ে গিয়ে আমার গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করবো!—শাশ্বত কালের শিল্পীর প্রিয়া তুমি! রূপদক্ষের রূপসী মানসী! এখানে এমন অবহেলায় লাঞ্ছিত হয়ে প'ড়ে থাকবার তোমার কোন অধিকার নেই—! ওগো, তুমি কে আমাদের—আমাদের তুমি। আমরা তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের মাথার মুকুটমণি ক'রে রাখবো।

চন্দ্রকান্তর কথা শুনতে শুনতে লতিকা তার সমস্ত দেহে কি যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব পুলক শিহরণ—কি যেন একটা আবেগের তড়িৎস্পন্দন অনুভব করছিল!

এমন ক'রে কেউ তো তার কাছে কোনও দিন তার অন্তরের নিবিড় প্রেম নিবেদন ক'রে দেয়নি! এমন ক'রে কেউ তো তাকে কোনও দিন সঙ্গে যাবার ডাক দেয়নি! এ মধুচ্ছন্দ ভাষা—এ মর্ম্ম-ছোঁয়া সুর—তার প্রাণের তারে তারে যেন এক স্বপ্ন-মধুর ঐক্যতান জুড়ে দিলে। কোথায় কে যেন তাকে আজ হাত ধ'রে কোন কল্পলোকের রহস্যময় নন্দনবনে—কোন্ স্বপ্নময় অমরাবতী উজ্জ্বল আনন্দভবনে টেনে নিয়ে চলেছিল—

তিন

চেওকী ষ্টেশনে চন্দ্রকান্তর হাত ধরে যখন লতিকা গাড়ী থেকে নামলো—তখনও তার পা কাঁপছে, গা ছম্ ছম্ করছে!

রাত্রি খুব বেশী হয়নি, কিন্তু, লতিকার মনে হচ্ছিল যেন অনেক রাত হয়ে গেছে। ষ্টেশনে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দ্রকান্ত তাকে সেই গাড়ীর একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় তুলে দিয়ে ব'লে গেল—গাড়ী ছাড়তে এখনও দেরী আছে, তুমি বসো লতি, আমি এখনি আসছি। কোনও ভয় নেই।

ষ্টেশনে সেদিন খুব বেশী ভীড় ছিল না। লতিকা গাড়ীর জানালা থেকে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিল বটে, কিন্তু, মন তার ব্যস্ত ছিল তার। আজকের এই দুঃসাহসিকতার কথা ভাবতে।

এমন কাজ যে সে কখনও করতে পারে এ কথা সে কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবেনি! হঠাৎ তার মনে হলো—মৃণাল শুনে কি ভাববে?—তারপরই তার স্নেহময় অগ্রজের কথা মনে পড়লো। দাদা কি আর এরপর ঘৃণায় তার মুখদর্শন করবেন? আর তার স্বামী! সেই সদাশিব আত্মভোলা সরল সোজা মানুষটি—! যে লতিকার উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন ক'রে নিজের সর্ব্বস্ব তার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আপন কাজের মধ্যে ডুবে আছে! তিনি কি মনে করবেন?

গৃহত্যাগ করে চলে আসবার সময় সে তার স্বামীকে একখানা পত্র লিখে, সকল কথা জানিয়ে, গণেশের হাতে দিয়ে এসেছে তাঁকে দেবার জন্যে। গণেশকে সে ব'লে এসেছে—বাবু বড় কাজে ব্যস্ত, তাঁকে কিছু বলে যেতে পারলুম না; আমি চন্দ্রকান্তবাবুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি, কলকাতা থেকে খুব ভালো বাংলা থিয়েটারের দল এসেছে এখানে; ফিরতে আমার একটু রাত হবে!—

গণেশ বলেছিল,—আজ তো আর থিয়েটার নেই মা ! কাল যে তাদের শেষ পালা হ'য়ে গেছে। আজ তারা সব কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে ! আমি একটু আগেই রাস্তায় দেখেছি নাচওয়ালীরা গাড়ী করে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছে, গাড়ীর ছাদে তাদের সব মোটঘাট বাঁধা।

চন্দ্রকান্ত তাকে ধমক দিয়ে বলেছিল—তুই বেটা দেখছি সবজান্তা হয়েছিস ! একদল আজ চলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু আর একদল আছে, তারা আজ গাইবে।

গণেশ ভাবলে—হবেও বুঝি বা ! সে হয়ত ঠিক জানে না কাজে কাজেই চন্দ্রকান্তর সঙ্গে সে আর এই নিয়ে অধিক বাক্‌বিতণ্ডা করেনি।

লতিকা ভাবছিল—চিঠিখানি পড়ে জগদীশ হয়ত আঘাত পাবে। পত্রে যে সে স্পষ্টই লিখে দিয়ে এসেছিল—জগদীশ তাকে সুখী করতে পারেনি ! তার জীবন ব্যর্থ মনে হচ্ছিল। চন্দ্রকান্তবাবুর ভালবাসা পেয়ে সে ধন্য হ'য়েছে। চন্দ্রকান্তর গুণে মুগ্ধ হ'য়ে, তাকে সে ভালো না বেসে থাকতে পারেনি। সে তার জীবন ও প্রেম সার্থক করে তুলবার জন্য শিল্পী চন্দ্রকান্তর সঙ্গে আজ গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।

ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ একজন চেনা লোকের মতো কাকে দেখতে পেয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালার দিকে পিছন করে ব'সল। এতক্ষণে তার গাড়ীর ভিতর-দিকে নজর পড়লো। দেখলে আরও দুটি স্ত্রীলোক সেই কামরায় বসে রয়েছে। তারা লতিকাকে লক্ষ্য করে পরস্পরের সঙ্গে খুব উচ্ছ্বসিত হাস্য-পরিহাস ক'রছে। তাদের মুখে সে দু'একবার চন্দ্রকান্তর নাম শুনে একটু বিস্মিত ও কৌতূহলী হ'য়ে উঠলো, এবং ভাল করে তাদের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ঘৃণায় একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো ! তাদের মুখের চেহারা, তাদের হাবভাব, চাল-চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে এরা কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোক !

লতিকার মনে পড়লো—আসবার আগে গণেশ যে নাচওয়ালীদের কথা বলেছিল তারাই হয়ত এরা,—কিন্তু একটা ব্যাপারের সে কিছুতেই মীমাংসা করতে পারছিল না যে, এরা চন্দ্রকান্তকে জানলে কেমন করে ? এই বদ্ মেয়েগুলো...

স্ত্রীলোকদুটির মধ্যে একজন তখন আর একজনকে বলছে—চন্দ্রকান্ত খুড়ো নিশ্চয় একে এখান থেকে ভুলিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে ! কিছুদিন আগে এই রকম আর একটি মেয়েকে নিয়ে আমার বাসায় এসে উঠেছিল।

লতিকার সর্ব্বাঙ্গ এক ভীষণ ভয়ে শিউরে উঠলো !

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ব'ললে—ওর কাজই ওই ! কত ঘরের যে সর্ব্বনাশ করেছে ! এবার কিন্তু শীকারটি জুটিয়েছে বেশ। কি বলো হেমন্তদিদি ? লোকটা গুণী কি না ! গুণ সত্যিই আছে, গাইতে বাজাতে পারে ! চেহারা ভালো, কিন্তু এক মদেই ওর সর্ব্বনাশ ক'রলে। আমাদের থিয়েটারে ও সীন আঁকার কাজ পেয়েছিল—মোটা মাইনেও হ'য়েছিল। কিন্তু হ'লে কি হবে—ওই মদ ! খায়না, ত' খায় না অমন দু'মাস। কিন্তু যখন সুরু করে তখন আর বিরাম নেই ! কাজ-কর্ম্ম, মান-অপমান, ন্যায়-অন্যায়, কিছু জ্ঞান থাকে না !'

চুলোয় যাক্ গে ! কিন্তু ওই মেয়েটিকে গাড়ীতে একলা বসিয়ে রেখে গেল কোথায় বল্‌তো ?—আমাদের যেন দেখতেই পেলে না ! কিম্বা হয়ত দেখতে পেয়েই স'রে পড়লো !

যা বলেছিস্... !

এদের কথা শুনতে শুনতে লতিকার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত বিবর্ণ হ'য়ে উঠছিল। চন্দ্রকান্ত-চরিত্রের এই কদর্য্য দিকটার পরিচয় তো আর কিছুই জানা ছিল না। এদের কথায় বুঝতে পারলে—কী সর্ব্বনাশই সে ক'রে বসেছে ! এত-বড় দুর্জ্জনকে বিশ্বাস করে সে এ কোথায় চলেছে !—এই লোককে আশ্রয় করে সে তার জীবন সার্থক করতে চায় ! নিজের প্রতি ধিক্কারে তার মন জর্জ্জরিত হয়ে উঠলো ! দুদিন পরে তার অবস্থাও...

ক্ষণেকের জন্য একবার তাব সন্দেহ হ'লো যে এরা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মিছে কথা ব'লছে না তো ? কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হ'লো—এটা এমনিই বা কি অসম্ভব ? বন্ধুগৃহে অতিথি হ'য়ে যে-লোক এমন ক'রে তার বন্ধুপত্নীকে ভুলিয়ে স্বামীর কাছ থেকে গৃহ-ছাড়া ক'রে নিয়ে আসতে পারে, তার অসাধ্য হীন কাজ তো কিছুই নেই !

চন্দ্রকান্তর প্রতি প্রবল ঘৃণায় লতিকার মন যেন বিষাক্ত হ'য়ে উঠলো ! এই পশুর কথায় ভুলে সে তার সদাশিব স্বামীকে ত্যাগ ক'রে বিশ্বের ঘৃণা মাথায় তুলে নিতে চলেছে !

লতিকার সহযাত্রীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কটি তখন দ্বিতীয়াকে জিজ্ঞাসা করছিল—আচ্ছা হেমন্তদি, সে মেয়েটির খবর জানো ?

কোন্ মেয়েটা ?

সেই যে চন্দ্রকান্তখুড়ো যাকে নিয়ে একদিন রাত দুপুরে তোমার ওখানে এসে উঠেছিল ?

ও ! তাকে দুদিন বাদেই ফেলে পালিয়েছিল। আহা !—মেয়েটা কেঁদে মরে ! ভাগ্যে মণিমিত্তির ছিল, মেয়েটা এখন মণিমিত্তিরের কাছেই রয়েছে।

কোন্ মণিমিত্তির হেমন্তদি ?

মণিমিত্তিরকে চিন্‌তে পারছো না ? সেই টালার বাগান—মনে নেই ?

ও ! সেই মণিমিত্তির ?—যিনি পরিবারকে নিয়ে রোজ মোটরে ক'রে হাওয়া খেতে যান—বায়োস্কোপ দেখতে যান ?—শুনেছি তিনি স্ত্রীর ভারী অনুগত ! এদিকে আবার...ভণ্ড আর কাকে বলে ?

বাগবাজারের মণি মিত্তিরের নাম শুনে লতিকা আর একবার চম্‌কে উঠেছিল। এ যে তারই বাল্য-বন্ধু মৃণালের স্বামী সেই মণিবাবু এ কথা বুঝতে আর তার বেশী বিলম্ব হ'লো না। সমস্ত পুরুষ জাতটার উপর ঘৃণা জন্মে গেল !—

হঠাৎ রেলের ঘণ্টা বেজে উঠলো। বাঁশীও শোনা গেল, এবং দেখতে দেখতে হুস্ হুস্ করে আর একখানা ট্রেন এসে চেউকী ষ্টেশনে দাঁড়ালো। যাত্রী উঠা-নামার ভীড় পড়ে গেল ! ফিরিওয়ালাদের ডাক-হাঁক সুরু হ'ল। লতিকার কামরার স্ত্রীলোক দুটি একজন ফিরিওয়ালাকে ডেকে তার জিনিষপত্র দেখা, পছন্দ, বাছাই ও দর-দস্তুর করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

লতিকা সেই অবকাশে সন্তর্পণে উঠে নিঃশব্দে রেলের দরজা খুলে তাদের অলক্ষ্যে কামরা থেকে নেমে চলে গেল।

চার

রাত্রি তখন প্রায় নিশুতি হ'য়ে এসেছে।

লতিকা তাদের বাড়ীর দরজায় উঠে কড়া-নাড়া দিলে। তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তখনও থর্-থর্ ক'রে কাঁপছে।

ট্যাক্সীওয়ালা তার ন্যায্য ভাড়ার অতিরিক্ত মূল্য পেয়ে লতিকাকে মস্ত একটা সেলাম ঠুকলে। তারপর গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে উল্লাসে 'হর্ণ' বাজাতে বাজাতে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কম্পিত হস্তে লতিকা তাদের বহির্দ্বারের কড়া নাড়তে নাড়তে ভাবছিল—স্বামীকে সে কি বলবে ? তার সে চিঠির কি কৈফিয়ৎ সে দেবে ? অকপটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা স্বামীর কাছে স্বীকার করে সে তাঁর পায়ে ধরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করবে। তার শিবতুল্য সদাশয় স্বামী কি তাকে ক্ষমা করবেন না ? স্বামী যদি তাকে ক্ষমা করতে না পারেন তাহ'লে লতিকা নিশ্চয় বিষ খেয়ে মরবে স্থির করলে—

সদর দরজার খিল খোলার শব্দ হ'লো। লতিকা সেই শব্দে চমকে উঠলো !

একটি হ্যারিকান লণ্ঠন হাতে ক'রে স্বয়ং জগদীশচন্দ্র এসে তাকে দরজা খুলে দিলেন। ভৃত্য গণেশের পরিবর্ত্তে স্বয়ং জগদীশকে তার তপস্যা ছেড়ে উঠে এসে দরজা খুলে দিতে দেখে লতিকা একেবারে ভয়ে ও দুর্ভাবনায় মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে গেল ! বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করতে আর তার সাহসে কুলিয়ে উঠল না। অপরাধিনীর মতো নতমুখে বহির্দ্বারেই সে দাঁড়িয়ে রইল।

জগদীশ হাতের আলোটা একবার তুলে ধরে লতিকাকে দেখেই উল্লসিত হ'য়ে উঠে ব'ললেন—আরে ; এসো এসো, লতি এসো। এইমাত্র তোমার কথাই মনে হ'চ্ছিল। নাম করতেই এসে হাজির ! অনেকদিন বাঁচবে দেখছি। তা' এর মধ্যেই ফিরে এলে যে ! থিয়েটার কি সকাল সকাল ভেঙে গেল ?—

জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে, শুষ্কমুখে, ধীরে ধীরে লতিকা বললে—আমি থিয়েটার দেখতে যাইনি।

মহা উৎসাহে জগদীশ ব'লে উঠলেন—এই দেখো ! আমি তো ঠিক্ বলেছি—লতি কখনই থিয়েটারে যায়নি। নিশ্চয় চন্দরকে গাড়ীতে তুলে দিতে ষ্টেশনে গেছে। গণশা বেটা কেবল বলে—না, মাঠাক্‌রুণ চন্দর বাবুর সঙ্গে থিয়েটারে গেছে ! বেটার বড় তর্ক করা স্বভাব ! জেগে থাকলে এখনি কান ধ'রে বেটাকে শুনিয়ে দিতুম। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি বারান্দায় চারপাই পেতে বেটা অগাধে ঘুমুচ্ছে ! আহা, সারাদিন খেটে পরিশ্রম করে ক্লান্ত হ'য়ে শুয়েছে কিনা ! আমি আর তাকে ডেকে তুললুম না। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে নিজেই নেমে এলুম। এসো —এসো, উপরে চলো।—না, দাঁড়াও, আসল কথাটা তোমায় এখনও বলা হয় নি !—ভুলে গেছি ! আমার সে বইখানা আজ শেষ হয়ে গেল লতি !—তাইত তোমায় অনেকক্ষণ থেকেই আজ খুঁজছিলুম !—হ্যাঁ, দেখো, ওই চন্দরটা—ও ভারী হতভাগা, বুঝ্‌লে ?—কিন্তু,...

লতিকার বুক কেঁপে উঠ্‌লো।

কিন্তু, আঁকে ভালো ! হ্যাঁ, শুনেছিলুম, আজকাল নাকি ওটা বেজায় মাতাল হ'য়ে পড়েছে। তা' আমার তো বেজায় ভুলো-মন জানোই, সে কথা একদম মনে ছিল না।

নইলে ওকে আমি আমার বাড়ীতে কিছুতেই রাখতুম না,—হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতুম। আমি বাঘকে ভয় করিনে লতি, কিন্তু মাতালকে বড় ডরাই !...

বলতে বলতে জগদীশচন্দ্র খুব খানিকটা উচ্চকণ্ঠে হাস্য ক'রে উঠলেন ! তারপর লতিকার হাত ধ'রে তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—যাক্ ! চলে গেছে ত' ? বাঁচা গেছে—কি বলো ?—যাবার সময় একবার দেখা করা উচিত ছিল আমার, কিন্তু কিই বা কি ক'রে বলো ? তখন মনে করো সবে গোটা দুই তিন পৃষ্ঠা আর লিখতে বাকী—সে সময় কি বই ফেলে ওঠা যায় ? তা' ছাড়া, ভাবলুম—তুমি যখন রয়েছো স্বয়ং তার কাছে হাজির, তখন আমার সাত খুন মাপ্ ! কি বলো ?

লতিকা দ্বিধা ও সন্দেহে দোলায়মান হ'য়ে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আমি তোমাকে একখানা চিঠি লিখে গণেশের হাতে দিয়ে গেছলুম—পেয়েছো বোধ হয় !

অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে উঠে জগদীশ বললে—চিঠি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিঠি তো পেয়েছি একটা ! গণেশ গিয়ে দিয়ে এসেছিল বটে ! কিন্তু, সে যে তোমার চিঠি, গণেশ বেশ তো' সে কথা কিছু বলেনি ! আমি অন্য কারুর বাজে চিঠি হবে মনে ক'রে ফেলে রেখে দিয়েছি—আজ আর খুলে দেখিনি ! কাল সকালে দেখবো ভেবেছিলাম। তা' তোমার চিঠি ব'লে দিলে তো তখনি আমি সব কাজ ফেলে রেখে দেখতে পারতুম ! গণ্শা বেটার ওই বড় দোষ ! সব কথা ওর মনে থাকে না ! ব'লতে ভুলে যায় !

লতিকা যেন এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকে সদর দরজায় খিল দিয়ে জগদীশকে উপরে আসতে বলে প্রায় ছুটতে ছুটতে জগদীশের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুক্লো এবং চিঠিখানা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জানালা দিয়ে গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে।

জগদীশ তখনও সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ব'লছেন শোনা গেল—ও লতি ! কোথায় চললে ? অন্ধকারে আছাড় খেয়ে কি হাত-পা ভাঙ্বে ? দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি আগে তোমাকে আলো দেখাই !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সাথী

দত্তদের বাগানের পূব্‌দিকে যে একটা প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়ে পুষ্করিণী-তীরে নিবিড় স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে আকাশ-পানে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, সন্ধ্যাবেলায় তারই অন্তরালে চুপি চুপি এসে দাঁড়াতো এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা, অবগুণ্ঠিতা কিশোরী। এক দিন নয়; নিত্য।

শাশুড়ীর শাসন, ননদের মৃদু ভর্ৎসনা, জায়েদের হাসি-টিট্‌কারী উপেক্ষা করে সাঁঝের আবছায়ার আঁধারে গা ঢেকে মৃদু-মন্থর সতর্ক-চরণে সে নিত্য সেখানে আসতো। এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতো; কি জানি, কার প্রতীক্ষায়!

সেই বাঁশঝাড়ের মাথার উপর আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যার ধূসর গগনে মৃদু স্নিগ্ধ দ্যুতি বিকীর্ণ করে নীরবে ফুটে থাকতো একটী শুভ্র সুন্দর সন্ধ্যা-তারা—কোন্ স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূতের মত! সে যেন কোন্ অচিন্, সুদূর মায়াপুরীর মণিদীপের জ্যোতি-কণা, রুদ্ধ বাতায়নের স্বল্প অবকাশ পেয়ে হঠাৎ ছিট্‌কে ঝরে পড়েছে আকাশের গায়ে!

মুখের গুণ্ঠন অপসারিত করে, স্নিগ্ধ কালো আঁখি দুটী নিষ্পলকে মেলে কিশোরী শুধু চেয়ে থাকতো, সেই তারাটীর দিকে! তার মৌন ম্লান করুণ দৃষ্টিতে তখন কি গভীর মর্ম্মব্যথা, কি আকুল আবেগ যে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তো! তারাটীও বুঝি নিমেষ-হারা হয়ে যেত—তার দিকে চেয়ে! কিশোরীর মর্ম্মব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেই সে যেন এক একবার কেঁপে শিউরে উঠতো!

তাদের দুজনের সে-চাহনির ভাষা, নীরব সান্ত্বনার বাণী শুধু তারাই বুঝতো, আর কেউ নয়।

বর্ষা-সন্ধ্যায় যেদিন মেঘ-মেদুর আকাশে অদৃশ্য হয়ে তারাটি কোথায় হারিয়ে যেত, কিশোরী সেদিনও তেমনি স্তব্ধ ভাবে সেইখানটীতে দাঁড়িয়ে থাকতো—সোৎসুক ঊর্দ্ধমুখী হয়ে।

তার পিয়াসী আঁখি দুটীর ব্যগ্র, ব্যাকুল দৃষ্টি উধাও হয়ে ছুটে যেত, সেই সীমাহারা, আকাশ-ছাওয়া ঘন বাদল-মেঘের বুকে তার সেই ক্ষুদ্র, অতি-ক্ষুদ্র, মৌন, সুদূরের সাথীটির সন্ধানে।

কিন্তু সেই পুঞ্জীভূত মেঘের নীরব যবনিকা ভেদ করে কিশোরী তার হারানো সাথীটিকে খুঁজে পেতো না। ঊর্দ্ধে চেয়ে চেয়ে দৃষ্টি তার আকুল শ্রান্ত হয়ে নেমে আসতো, বেদনায় তার অশ্রুধারা নিয়ে। ঘোমটায় মুখ ঢেকে, চোখের জল গোপনে মুছতে মুছতে সে ফিরে আসতো। তখন নিদারুণ ব্যাকুলতায়, নিষ্ফলতার গভীর ব্যথায় তার ক্ষুদ্র কোমল বুকখানি যেন শতধারে ভেঙ্গে পড়তো।

হায় ! অভাগিনীর সর্ব্বহারা বঞ্চিত জীবনে যে ঐ একটীই ভালোবাসার, সাধনার রত্ন ছিল ! এই নিভৃত মধুর মিলন-ক্ষণটুকুর আশায় সে যে সারাক্ষণ ব্যগ্র উন্মুখ হয়ে থাকে—তাতেও বাধা !

কিন্তু তার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা—সেখানে কেউ বুঝতো না। তার এই নীরব প্রতীক্ষার অর্থ অন্যভাবে গ্রহণ করে পাড়ার মেয়েরা বেশ একটু ঘোঁট পাকিয়ে তুলেছিল।

সেদিন ঘোষেদের পুকুরে জাল ফেলা হয়েছিল বলে চাটুয্যে-গৃহিণী দত্তদের পুকুরে কাপড় কাচতে এসেছিলেন—অসময়ে। তখন ভর সন্ধ্যা ; ঝোপে-ঝাপে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। চাটুয্যে-গিন্নী অবাক হয়ে দেখলেন, দত্তদের ছোট-বউ, কল্যাণী পুকুর-পাড়ে কলসী কাপড়-গামছা রেখে, বাঁশঝাড়ের আড়ালে মাথার কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে—কি জানি, কার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে ! এমন সময়ে বন-বাদাড় ভেঙ্গে কোনো অল্প-বয়সী মেয়েই এ পুকুর-ঘাটে আসে না। তাই—হ্যাঁগা বউ-মা, এই ভর সন্ধ্যেবেলা একলাটী ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে তোমার ?—বলে চাটুয্যে গিন্নী যেই ধমক দিয়েছেন, অমনি কল্যাণী ভয়ানক চম্‌কে উঠে থতমত খেয়ে বলে—কিচ্ছু না, মাসি-মা !—এখানটীতে বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল,—চোপর দিন ঘোমটা দিয়ে দিয়ে—

ডাহা মিথ্যে কথা ! ও-সব ছুতো ! কেন না, তখনই বাঁশঝাড়ের পিছনে কার চাপা সতর্ক পদবিক্ষেপের খুস্-খুস্ শব্দ চাটুয্যে-গিন্নী স্বকর্ণে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন !

বুদ্ধিমতী চাটুয্যে-গিন্নী কথাটা গোপন রাখা উচিত বিবেচনা করলেন না। প্রাচীন বনিয়াদী দত্ত-বংশে কলঙ্কের কালি পড়ছে, এ অসৈরণ তিনি মুখ বুজে সহ্য করেন কেমন করে ?

তাই পরদিন কল্যাণীর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সমক্ষে ঘটনাটি সালঙ্কারে বিবৃত করে তিনি বারম্বার সাবধান করে দিয়ে গেলেন,—খবর্দ্দার দিদি, খবর্দ্দার ! এখন থেকে সাবধান না হলে তোমাকে আখেরে পস্তাতে হবে। উঃ ! কম কথাটী তো নয় ! বুকের উপর বিধবা সোমত্ত বউ,—আগুনের খাপরা !

সহৃদয়া চাটুয্যে-গিন্নীর এই আন্তরিকতাপূর্ণ কথাগুলি শুনে কল্যাণীর শাশুড়ীর গম্ভীর মুখ শ্রাবণের বারিগর্ভ মেঘের মত অন্ধকার থম্‌থমে হয়ে উঠলো। আহা ! তাঁর কত সাধের কোল-পোঁছা ধন প্রকাশ... তার বউ কল্যাণী ! যখন তাকে কল্যাণী লক্ষ্মীরূপে সাদরে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন, তখন কে জান্‌তো, সেই লক্ষ্মী-প্রতিমা বধূ গৃহস্থের ধনে-ধান্যে ভরা সুখের সংসারে অকল্যাণের কালো ছায়া ফেলে একদিন মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী হয়ে দাঁড়াবে !

নববধূর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে যখন একটী নয়, পর-পর দু-দুটী অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটে গেল, গৃহিণী তখনি বুঝেছিলেন, রূপসী হলেও বধূর আয়-পয় মোটেই ভালো নয়, তা-ছাড়া সে কুলক্ষণা।

প্রথমতঃ কর্ত্তার আকস্মিক মৃত্যু ! বয়স একটু হলেও মরবার বয়স তো হয় নি তাঁর ! অমন গ্যাটাগোঁটা হাতীর মত মোটা শরীর দুদিনের জ্বরে কর্পূরের মত উবে গেলেন ! উক্ত ঘটনার পর ছ'মাস না যেতেই বড় মেয়ে অমলা, ছেলেপিলের মা, ঘরণী গৃহিণী, তারো কপাল ভেঙ্গে গেল তেমনি অতর্কিতে !

তার পরই দুহিতার অকাল-বৈধব্য-শোকে কাতরা জননীর দগ্ধ বুকে, জ্বালার উপর জ্বালা দিয়ে বালিকা বধূর সিঁথির সিঁদুর, জীবনের সুখ-সাধ-আশা নিঃশেষে মুছে ফেলে,

বিনা-মেঘে বজ্রপাত করে চলে গেল প্রকাশ,—বড় সহসা, বড় অপ্রত্যাশিতভাবে ! মাত্র তিন ঘন্টার বিসূচিকা রোগে—চিকিৎসা বা প্রতিকারের অবকাশটুকুও সে দিলে না !

বিয়ের বছর না ফিরতেই এত কাণ্ড ঘটে গেল ! এমন যার ভাগ্য, সে যে সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী ! তাই কি অভাগীর বাপের কুলে এমন কেউ আছে—ছাই, যার কাছে দুটো দিন রেখে একটু শান্তির নিশ্বাস ফেলবেন !

এই আগুনের খাপ্‌রা বুকে রেখে অষ্টপ্রহর দগ্ধ হতে হচ্ছে, তার উপর আবার এ-সব কি কাণ্ড ? এ যে মরার উপর খাঁড়ার ঘা !

অপরাধিনী বধূকে নিরিবিলিতে ডেকে শাশুড়ী মৃদু কঠিন তিরস্কারে বল্লেন—হ্যাগা ছোট-বউমা, এ সব কি শুনি ?

বধূ চাটুয্যে-গিন্নীর অনুযোগ সমস্তই শুনেছিল। সে মুখখানি নীচু করে ছল-ছল চক্ষে বল্লে,—ও সব মিথ্যে কথা, মা ! আমি যখন কাপড় কাচতে যাই, তখন সেখানে জন-প্রাণীও ছিল না।

—তা অমন সময় তোমার একলাটী যাবার দরকারই বা কি ? কাপড় কাচ্‌তে জায়েদেব সঙ্গে গেলেই তো পারো।

—সবাই এক সঙ্গ গেলে বাড়ীতে কাজের যে অব্যবস্থা হয়, মা !

—তবে একটু বেলাবেলি অমলাকে সঙ্গে নিয়ে যাও না, কেন ? ভর্ সন্ধ্যে-বেলা পুকুর-ঘাটে একলাটী—তোমার প্রাণে কি একটু ভয়-ডরও নেই, বাছা !—একে তো পোড়া কপাল পুড়িয়েছো, তার পর আবার এই অপযশ কলঙ্ক—

ছি ! ছি ! কি লজ্জা !—কি ঘৃণা !—কথাগুলো কল্যাণীর কাতুর প্রাণে যেন বিষাক্ত তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধে গেল। উপ্‌চে-পড়া চোখের জল আর চেপে রাখতে না পেরে সে আড়ালে এসে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল্লো। হায় ! অভাগিনী বাল-বিধবার মর্ম্মবেদনা কে বুঝবে ! কে জানবে, একলাটী ভর সন্ধ্যেবেলা ভয়-ডর না রেখে সে নির্জ্জনে পুকুর-ঘাটে ছুটে যায় কিসের মোহে, কিসের আকর্ষণে !

সেই দিন থেকে কল্যাণীর উপর কড়া হুকুম জারি হলো,—সে আর একলা কোনো সময়েই পুকুর ঘাটে যেতে পাবে না। ননদ কিম্বা জায়েদের সঙ্গে সন্ধ্যার আগেই কাপড় কেচে চলে আসবে।

নক্ষত্র ! সে বাড়ী থেকেও অনেক দেখতে পায়। ছোট বড়, চিক্‌মিকে, জ্বল্-জ্বলে, কিন্তু আকাশ-ভরা তারার মধ্যে সে নির্ণয় করতে পারে না, তার সেই ব্যথার ব্যথী সাথী কোন্‌টী ? তার উদাস আকুল মন সারাক্ষণই পড়ে থাকে সেই বাঁশ-ঝাড়টীর পাশে—যেখানে সেই সন্ধ্যার তরুণ স্নিগ্ধ তারাটী ফুটে তাকে একবার দেখবার আশায় ব্যাকুল আগ্রহে চেয়ে আছে ঝিক্-ঝিক্ করে !—চেয়ে চেয়ে সে নিভে যাবে, হতাশার দারুণ ব্যথা বুকে নিয়ে।—হায়, দেখা বুঝি তাদের আর এ জন্মে হবে না।

—উঃ, দিদি গো,—একবারটী আমায় সেখানে নিয়ে চলো না ভাই ! তোমার দুটী পায়ে পড়ি !

—কোথায় যাবি ভাই, অসুখ শরীরে।

—সেই যে পুকুর-পাড়ে, সেই বাঁশঝাড়ের পাশটীতে আমায় খানিক শুয়ে থাকতে দাও দিদিমণি ! আমি একবার সাধ মিটিয়ে তাকে দেখে নি, না দেখে প্রাণ যে আর বাঁচে না।

কল্যাণী আজ তেরো দিন সাংঘাতিক টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়িনী এবং তার জীবনের আশা অল্প। অভাগী বিধবার তুচ্ছ জীবন রক্ষার জন্য বাড়ীতে কারো তেমন যত্ন বা আগ্রহ ছিল না। বরং অনেকেই করুণা জানিয়ে বল্‌ছেন,—আহা, ওর এখন যাওয়াই ভালো! সংসারে থেকে ও কি সুখ বা ভোগ করবে? বরং, যদি মান-ইজ্জৎ নিয়ে এই বেলা...।

যত্ন-সেবা যেটুকু কবছিল, তা' তার বিধবা ননদ অমলা। অত বড় সংসারে শুধু এই একটী নারীই ভাগ্য-হতা কল্যাণীর দুঃখ-বেদনা কতক বুঝেছিল। কারণ সে নিজেও একজন কম ভুক্তভোগী নয়। কিন্তু কল্যাণীর শেষ কথাটুকু শুনে অমলা চমকে শিউরে উঠলো! তা হলে জনরব কি সত্য? বিধবা ভ্রাতৃবধূর কি সত্যই পতন আরম্ভ হয়েছে?

তা হতেও পারে,—ছেলে-মানুষ, অল্পবুদ্ধি, এ পাড়াগাঁয়ের দেশে নিষ্কর্মা কুচরিত্র ছোঁড়ারও অভাব নেই তো! একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অমলা অপ্রসন্নভাবে বল্লে,—ছি, ও সব পাপ কথা কি মুখে আনতে আছে, ছোট বউ!

কল্যাণীর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে রক্তের আভাস জেগে উঠলো। দুটী চোখে জল ভরে করুণ সুরে আত্মবিস্মৃতভাবে সে বলতে লাগলো—কি পাপ কথা! না না, ভুল! তোমরা ভুল বুঝচো দিদিমণি!—সে তো মানুষ নয়—তারা, একটী সন্ধ্যা-তারা। কত দূরে, আকাশে সে থাকে—মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, তবু তাকে একবার চোখের দেখা দেখবো বলেই রোজ ছুটে যেতুম।

তারা? নক্ষত্র?—তাকে দেখবার জন্য অভাগী এত গঞ্জনা সহ্য করে?—না, না, কল্যাণী হয়তো জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে? পীড়িতা বধূর মাথায় বাতাস দিতে দিতে অমলা সস্নেহ কোমল কণ্ঠে বল্লে—আহা। তাবা দেখতে তুই এত ভালোবাসিস্, ছোট বউ, তা এইখান থেকেই দ্যাখ না। ঐ যে জান্‌লা দিয়ে দ্যাখা যায়! আকাশে একটী দুটী করে মেলাই তারা ছড়িয়ে পড়েছে—

কল্যাণী আশা-আগ্রহ-ভরে আকুল দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে রইলো খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, সন্ধ্যার ম্লান আকাশের দিকে—সেখানে ছোট বড় কত তারাই ফুটে আছে—কিন্তু এর মধ্যে সেটি কোথায়? সেই সবার-আগে ফোটা কল্যাণীর চির-পরিচিত স্নিগ্ধ-দীপ্তি সন্ধ্যা তারাটা? সে তো নেই!...সে যে সেই নিরিবিলিতে ফোটে, নিভৃতেই দেখা দেয়!

ব্যথিতা কল্যাণীর ক্লান্ত আঁখি অবসাদে মুদে এলো। পাশ ফিরে শুয়ে সে চুপটি করে ভাবতে লাগলো—তার সেই না পেতে-হারিয়ে-যাওয়া জীবনের সাথীর কথা।

ভাগ্যহীনা কল্যাণী যে ক'টী দিন তাকে কাছে পেয়েছিল, প্রাণ-ভরে আদর-যত্ন করতে পারেনি—নয়ন-ভরে দেখতেও পারেনি—পোড়া লজ্জা তাকে পদে পদে বাধা দিয়েছে! কিশোরী বধূর অতিরিক্ত লজ্জা-সঙ্কোচ দেখে প্রকাশ কত বিরক্ত ক্ষুণ্ণ হতো। একদিন সে কত পীড়াপীড়ি করে ধরেছিল তার লাজময়ী প্রিয়াকে নিজের মুখে বলবার জন্য—সে প্রকাশকে কতখানি ভালবাসে!

—তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। এই সংক্ষেপ কথাটী বলতে কল্যাণী তখন কত চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু পারে নি। বুক ফেটে গেলেও মুখ তার ফোটে নি, পোড়া সরমের এমন শাসন!

সে কথার উত্তর না পেয়ে প্রকাশ সেদিন কত রাগ, কত অভিমান, করেছিল, তার সেই অভিমান-ক্ষুব্ধ ব্যথিত মুখখানি আজও কল্যাণীর মনে-প্রাণে আঁকা আছে! অনুতপ্তা

কল্যাণীর আজ মনে হলো, সে তখনই আদর-সোহাগের অজস্র প্লাবনে সেই অভিমান-ছল-ছল মুখখানির সফল ব্যথা সকল গ্লানি নিঃশেষে কেন মুছে দেয়নি ?

মনে পড়লো কল্যাণীর অকারণে-লজ্জাকে প্রেম-হীনতা মনে করে প্রকাশ একদিন অভিমান-ভরে বলেছিল—আমাকে তুমি একটুও ভালোবাসো না, জানি ;—আমি যদি মরে যাই, তাহলে কি এককোঁটা চোখের জলও তুমি ফেলবে না ?...

উঃ ! সেই নিষ্ঠুর মর্ম্মঘাতী বাক্যবাণী সহ্য করতে না পেরে কল্যাণী কেঁদে ফেলেছিল। সে কান্না আর থামে না ! প্রকাশ তখন মহা অপ্রতিভ হয়ে ব্যথিতা বধূকে বুকে টেনে নিয়ে উচ্ছ্বসিত গভীর অনুরাগে কত আদর, কত সোহাগ করে বলেছিল,—পাগলী ! আমি কি সত্যি সত্যি মরচি নাকি ? এই তেইশ বছর বয়সে ?—আর যদি,...যদি মরতেই হয়, তাহলেও তোমাকে একবারটী না দেখে আমি থাকতে পারবো না। রোজ আস্‌বো আমি চুপিচুপি তোমায় দেখতে, আকাশের তারা হয়ে,...যে-তারাটী সন্ধ্যাবেলা সব্বার আগে ফোটে...

হায় রে ! অভাগী কল্যাণী কি তখন ঘুণাক্ষরেও জান্‌তো, প্রকাশের সেই ভালোবাসা-দেখানোর ছলে বলা কথাটাই শেষে এমন কঠিন নির্ম্মম সত্য হয়ে দাঁড়াবে।

তার জীবন-সর্ব্বস্ব দয়িতকে শেষে দূর, সুদুর আকাশের নক্ষত্র-রূপে শুধু চোখের দেখা দেখেই তাকে তৃপ্ত থাকতে হবে ! কিন্তু, তাতেও এত বাধা !

আজ সেই সব্বার-আগে-ফোটা সাঁঝের তারাটীকে যদি সে অনিমেষ অপলক হয়ে দেখতে পেতো ! কে দেখাবে ?—কে নিয়ে যাবে তাকে সেখানে ? দুর্ব্বল, অসহায়, শক্তিহীন সে—

আর আশা নেই ! কল্যাণীর ক্ষীয়মান জীবনী-শক্তিটুকু তৈলহীন দীপের মত দ্রুত, দ্রুততর নিভে আসছিল।

মোহ-ঘোরে আচ্ছন্ন কল্যাণী শেষ রাত্রে যেন স্বপ্ন দেখছিল, তার ভালোবাসার সেই সন্ধ্যা-তারাটী সেই বাঁশঝাড়ের মাথায় ফুটে আছে, আজ কত বড় আর জ্বল্-জ্বলে হয়ে ! তত বড়, তেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র কল্যাণী জীবনে কখনো দেখেনি ! বিস্মিত, উদভ্রান্ত হয়ে সে তারাটীর দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলো, চেয়ে চেয়ে চোখ দুটী তার জলে ভরে এলো, দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে গেল—আর বুঝি সে দেখতে পারে না !

তখন অধীর হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে কল্যাণী আকুলভাবে ডাকতে লাগলো—ওগো, এসো, এসো !—আর দূরে নয়, কাছে, আমার কাছে এসো ! ও আমার জীবন-দেবতা, আজ এই মরণকালেও তোমাকে একবারটী কাছে পাবো না কি ?...

নক্ষত্রটী যেন সেই বুকফাটা কাতর আহ্বান শুনতে পেয়েই টলমল করে উঠলো ! তার পর ধীরে,—ধীরে ধীরে দূর বিমান থেকে সে নেমে এলো—আরো বৃহৎ, আরো উজ্জ্বল হয়ে...কাছে, আরো কাছে,—কল্যাণীর শিয়রে এসে তার গতি স্থির নিষ্কম্প নিশ্চল হয়ে গেল।

কল্যাণী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে দেখল সেই দীপ্তিময় বৃহৎ জ্যোতিষ্কের মধ্যে আঁকা, সেই মূর্ত্তি ! সেই তার চিরপ্রিয়, চির-আরাধনার ধন, হারানো সাথী !

আঃ ! এতদিনে,—এতদিনে দেখার মত দেখা দিলে, প্রিয়তম !

নিশান্তের শিশির-সিক্ত সমীর মুমূর্ষুর শীতল দীর্ঘশ্বাসের মত ধীরে ধীরে এসে সেই

মরণাহতার সুখময় মোহস্বপ্নটুকু অবিচ্ছিন্ন অফুরন্ত করে দিলে,—সে স্বপ্ন আর ভাঙ্গলো না! কিন্তু হায়, সংসারে চির-অজানিত রয়ে গেল কল্যাণীর তারা-দেখার এই রহস্যময় কারণটুকু!

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

টোপ্

কালী-পুজোর পর। পাটনা থেকে রজনীনাথ কলকাতায় আসছিলেন। রজনীনাথ অম্বালায় থাকেন। পাটনায় বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। পথে মেয়ে-জামাইকে একবার দেখে আসবেন, তাই পাটনায় নেমেছিলেন।

পঞ্জাব মেলে কি প্রচণ্ড ভিড়। বার্থ রিজার্ভ পাওয়া যায় নি : তা বলে যাওয়া বন্ধ হতে পারে না। ঠাশাঠাশি করে কোনমতে রাত্রিটা কাটানো।

গায়ে চায়না শিল্কের কোট, কাঁচি ধুতি পরা, পায়ে পেটেন্ট-লেদারের আলবার্ট সু...সুশ্রী চেহারা, হাবে-ভাবে সম্ভ্রমের পরিচয় জ্বল্‌জ্বল্ করচে। কথাবার্ত্তায় তেমনি অমায়িকতা। সহযাত্রীরা সমাদরে তাঁকে কামরায় স্থান দিলেন।

যাঁরা অভ্যর্থনা করে স্থান দিলেন, তাঁরা প্রচণ্ড সৌখীন—পোষাকে-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্ত্তায় ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণকিরণ ঝলসে উঠচে। তাঁদের মধ্যে এমনি কথাবার্ত্তা চলেছিল—

—আপনার সে রেশের ঘোড়াটা কি বেচে ফেললেন, মনোরঞ্জনবাবু? আর নাম দেখি না। বুঝলে হে লালগোপাল, সেবার অমন যে তেজী ঘোড়া 'ইয়ংপ্রিন্স', তাকে কলকাতা আর বোম্বাই, দু'জায়গাতেই হারিয়ে দিলে।

লালগোপাল বললে,—বটে! তা সে ঘোড়া... ?

মনোরঞ্জন বললেন—বেচেছি। কি দর পেলুম, জানো?...বিশ্বাস করবে? নগদ সাড়ে তিন লাখ টাকা।

—সাড়ে তিন লাখ ! বলেন কি...

মনোরঞ্জন একটু বক্র হাসি হেসে একবার চারিধারে চাইলেন, তারপর বললেন,—ওর একটি পয়সা কম নয়। লর্ড জুলিসবেরি কলকাতায় এসেছিলেন—ঘোড়া দেখে তিনি একেবারে পাগল। আমায় মহা পীড়াপীড়ি—শেষ, লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির সুপারিশ অবধি। দিলুম ঘোড়া ছেড়ে। টাকার জন্যই তো রেশে ঘোড়া দেওয়া। তা, সেই টাকাই যখন পাওয়া গেল !...আমি তো ও ঘোড়া কিনেছিলুম—সেই পাগলা জকির কাছ থেকে মোটে দশ হাজারে। তার মেম মরে যেতে সে বিলেত চলে গেল না... ?

কথাটা শেষ করে মনোরঞ্জন ডাকলেন—ওহে ও পল্টু...কাগজে কি এমন মহাখপর বেরুলো যে তন্ময় হয়ে গেলে ! দু-চারটে কথা কও...বলেই তিনি পল্টুনামা সহযাত্রীর হাত থেকে খপরের কাগজখানা টেনে নিলেন। পল্টু ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলো—আহা, দাও ভাই...আমি ওই প্রাইড প্রস্‌পার লিমিটেডের পাটের দর দেখছিলুম...ডিভিডেন্ট কমাচ্ছে, অথচ আমার বিস্তর টাকা ওদের শেয়ারে আটকে আছে !...

মনোরঞ্জন একটা সিগার ধরিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাবে বললেন,—তুমি পাগল...তাই অমন কাঙ্কিনাড়া কামারহাটীর শেয়ারগুলো বেচে কোথাকার কি প্রাইড প্রসপারে শেয়ার নিলে...

পল্টু বললে,—কোটালির মহারাজ দু'হাত ধরে অনুরোধ করলেন—তিনি ঐ মেম বিয়ে করে এসেচেন না বিলাত থেকে—সে মেম হলো আবার ল্যাঙ্কাশায়ারের এক মস্ত মিলের ডিরেক্টবের বোন্...তা সেই মেমের ভাই নিজে মহারাজকে মুরুব্বি পাকড়েছিল...

পল্টুর কথায় বাধা দিয়ে মনোরঞ্জন বললেন,—ঐটে তোমবা ভারী ভুল করো। পয়সা-কড়ির ব্যাপারে পরের গরজ দেখতে যাওয়া মস্ত মূর্খতা। আমি কি-টাকাটা নিয়েই না ছিনিমিনি খেলি ! কখনো ঠকতে দেখেচো ?

লালগোপাল বললে,—কৈ, না।

সনাতন বিশ্বাস মস্ত রূপার ডিবে খুলে সাম্‌নে ধরে বললে,—পাণ...

সকলে একটা পাণ তুলে নিলেন।... জর্দ্দা, সুর্ত্তি সেই সঙ্গে। তারপর কথাবার্ত্তা সুরু হলো হালিশপুরের নবাবের নতুন জার্মানি হাউন্ড নিয়ে। কুকুরের জন্য এক জার্মান খানশামা রাখা হয়েচে ; তার মাহিনা, মাসে পাঁচশো টাকা। তাছাড়া কুকুর ছ'মাস সিমলের পাহাড়ে থাকবে...ঐ কুকুরের সঙ্গে সেন-সাহেবও। লালগোপাল বললে,—কুকুরের দাম পড়েচে বারো হাজার টাকা, না ?

পল্টু বললে,—না, এগারো হাজার।

মনোরঞ্জন বললেন,—এই সব ফোতো চালেই এখানকার রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশাগুলো গেল ! ...ওই যে, বগাবাজের রাজা...হুঁঃ, এরোপ্লেন কিনলে না একখানা ! আমার কাছেই তো তাঁর ধার রয়েচে তিন লাখ, ওই জুয়োমারি আর নশীবগঞ্জ পরগণা বাঁধা রেখে। ...তাছাড়া দ্বারভাঙ্গার কাছে আছে সাতান্ন হাজার, বুড়ো মুঢোলকারের কাছে এক লাখ, দিল্লীর রাম্পানি ব্রাদার্সের কাছে ছত্রিশ হাজার...এমনি খুচরো দেনা যে কত, তার আর সংখ্যা নেই ! নবাবি কি কমচে কিছু ? কোথা থেকে যে শোধ দেবে, জানি না !...রাণী সেদিন কালীঘাটে গিয়ে দশ হাজার টাকা দান করে এলেন, নকুলেশ্বরতলায় ধর্ম্মশালা তৈরি করার জন্য !...ও সব জানা আছে ভাই...উপরে তাজামাজা যত দ্যাখো, ভিতর একদম ফোঁপরা !...

রজনীনাথ চুপ করে বসে এই সরস আলোচনা শুনছিলেন। তাঁর রোমাঞ্চ হচ্ছিল—টাকার কুমীর লোকটা...আর ভারতবর্ষের কারো হাঁড়ির খপর অবিদিত নয়, দেখচি ! কে এই মনোরঞ্জন বাবু... ? বড় গড়গড়ায় অম্বুরী তামাক চলেছে, গড়গড়ার সঙ্গে আঁটা প্রচুর আভরণ, যেন গোটা তাজমহলকে রংচং করে সামনে বসিয়ে তার চূড়োয় কলকে চড়িয়ে দিয়েচে !...

ট্রেণ হুশ হুশ শব্দে চলেছে...হাওয়ার বেগে...মাঝে মাঝে কয়লার গুঁড়ো কামরার মধ্যে ছড়িয়ে, বিরাট উল্লাসে, উৎসাহে...আবছায়ার মত ছোট ছোট ষ্টেশনগুলোকে টকাটক্ পার হয়ে...এবং রজনীনাথ স্তম্ভিত চিত্তে রুদ্ধ নিশ্বাসে এই ধনী সমাজের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে চলেছেন...

মোগলসরাই ! একটা হৈ-হৈ কলরব। প্লাটফর্ম্মে যাত্রীর ছুটোছুটি...ওপাশে লোহার রেলিঙয়ের ওধারে দাঁড়িয়ে অসংখ্যা থার্ড-ক্লাসের যাত্রী...পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে যেন চোর হয়ে আছে ! বেচারার দল !...পাছে তারা ছিট্‌কে প্লাটফর্ম্মে এসে মেলের কামরার দ্বারে হানা দেয়, তাই লৌহদ্বার বন্ধ, আর তার সামনে সতর্ক পাহারা মোতায়েন !...

হাফ-প্যান্ট-পরা কোট-গায়ে, মাথায় শোলার টুপি এক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রৌঢ় বাঙালী-সাহেব রজনীনাথের কামরায় ঢুকলেন—ঢুকেই উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন—Ah me! মনোরঞ্জনবাবু ! ট্রেনেই দেখা...বাঃ, ভারী সুলক্ষণ তো।

এক গাল হেসে মনোরঞ্জন বললেন,—কেন ? ব্যাপার কি, পল ?

পল-সাহেব বললেন,—আপনার ওখানেই যাচ্ছিলুম...আপনাকে পাবো কি পাবো না ভেবেও। কোথায় আছেন, ঠিকানা তো ঝট্ করে পাবার উপায় নেই...অথচ দরকার খুব...

মনোরঞ্জন বললেন—তা, গেলেও পেতে না ! হঠাৎ বাড়ী থেকে এক টেলিগ্রাম পেলুম...অষ্ট্রেলিয়া থেকে এক সাহেব এসেচেন,—আঁশফল আর করম্‌চার সন্ধানে। মস্ত কারবার ফাঁদচে তারা সেখানে—জ্যাম্ করবে, জেলি করবে। এখান থেকে আঁশফল আর করম্‌চা চালান দিতে হবে, তারি বন্দোবস্তর জন্য এসেচে। তা, বেচারীর শরীর খারাপ—কলকাতা থেকে নড়তে পারবে না, কাকুতি জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল, তাই আসতে হলো ! ছিলুম বহুদূরে। জিয়োগ্রাফি পড়েচো ? ডেরা-গাজী-খাঁ জানো ? সেখানে গেছলুম।...

পল দুই চোখ কপালে তুলে বললেন—ডেরা গাজী খাঁ ! তা, সেখানে হঠাৎ... ?

মনোরঞ্জন বললেন—সেখানে নতুন রেল-লাইন পাতা হচ্ছে—সিধে আফগানিস্থান অবধি। তা, মজুরলোক ষ্ট্রাইক করেচে...তাই। মানে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আর আফগান গবর্ণমেন্ট দু' গবর্ণমেন্ট মিলে লাইন পাতচেন কি না...এদিকে লাটসাহেবের অনুরোধ, ওদিকে কাবুলের বড় উজীর তিরদী বেগের করুণ মিনতি—কাজেই যেতে হলো...

পল সাহেব বললেন,—ষ্ট্রাইক চুকেছে ?

একটা ভ্রূভঙ্গী করে মনোঞ্জন বললেন—নিশ্চয়। শর্ম্মাকে কি কোনো কাজে নিষ্ফল হতে দেখেচো ?...

পল বললেন—তা বটে ! তা, আমার কাজটা...

মনোরঞ্জন বললেন—কি তোমার কাজ, শুনি ?

পল বললেন—জানেন তো এখন আমি ম্যায়নুমিয়ার নবাব-এষ্টেটে শাহজাদাদের গার্জ্জেন-টিউটর...বড় শাহজাদা বিলাত গেছলেন বেড়াতে। সেখানে এক বে-এক্তিয়ারী

কাজ করে ফেলেচেন। এক বড় ঘরের মেয়ের ব্যাপার...ফৌজদারী মর্কদ্দমা অবধি...এক-লক্ষ টাকা না হলে মিটবে না। এষ্টেটে এবার আদায়-পত্র কম...কাজেই এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। নবাব-সাহেব কাছাকাছি কারো কাছে হাত পাতবেন না—ইজ্জৎ যাবে। তাই কাল আমায় সন্ধ্যার পর ডেকে চুপিচুপি বললেন, পল, তোমরা'পর মেরা ইজ্জৎ...আমি মাথা চুলকে বললুম—ঠিক্ বলতে পারি না—তবে চেষ্টা দেখবো...যদি আমাদের কর্ত্তা থাকেন ! নবাব বললেন, কালই তুমি বেরিয়ে পড়ো—যদি পারো তো এই যে নতুন ইশলামিয়া কলেজ খুলচি, এর প্রিন্সিপাল হবে তুমি—মাহিনা মাসে সাড়ে তিন হাজার...তাছাড়া এই লোনের দালালীর দরুণও, পঁচিশ হাজার টাকা পাবে !

হেসে মনোরঞ্জন বললেন—চলো। তার আর কি ! তোমরা যদি এমন উপকার হয়—আচ্ছা ! কিন্তু শুধু জুয়েলারিতে হবে না। এষ্টেটটি বন্ধক দিতে হবে। তবে সুদ কমিয়ে দেবো—তুমি চার পারশেন্টই দিয়ো...কতকগুলো টাকা বাক্সয় বন্ধ রেখে কি হবে ? যদি কারো উপকার হয়, হোক্, সেই সঙ্গে নিজের একদম না লোকসান হয়...বুঝলে কি না !...

পল একেবারে অনুগ্রহার্থীর লুটিয়ে-পড়া ভঙ্গীতে বললেন—আজ্ঞে, আপনার এই দয়াতেই তো ও চরণে গোলাম হয়ে আছি।...

রজনীনাথ অবাক ! এমন মহাপুরুষ ইনি... ? পরার্থে এমন আগ্রহ—এ যে কলিকালে দুর্লভ বস্তু ! মনোরঞ্জনের উপর শ্রদ্ধাও যে না হলো, এমন নয়। তবে, এত বড় ধনী—মনে করলে একটা সেলুন রিজার্ভ করে অনায়াসে যাত্রা সমাধা করতে পারেন, তা না করে সকলের সঙ্গে মিলে এই সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় বহু অসুবিধার মধ্যে... ?

মনোরঞ্জন তাঁর এ সম্ভ্রমের ভাব লক্ষ্য করলেন,—করে বললেন,—আপনি ভালো করে বসতে পারচেন না—না ? ওহে পল্টু, ওঁকে ঐ বেঞ্চটা ছেড়ে দাও। উনি একটু আরামে বসুন—উঁচুদরের লোক—চেহারা দেখে বুঝতে পারচো না ?

পল্টু তখনি সসম্ভ্রমে বেঞ্চ খালি করে দিলে মনোরঞ্জন বললেন—আপনি ঐ বেঞ্চে বসুন। রাত্রে একটু নিদ্রারও প্রয়োজন আছে তো...

রজনীনাথ অপ্রতিভ... ! না, না, বেশ আছি। মনোরঞ্জনের বার-বার অনুরোধ...অগত্যা রজনীনাথকে সে বেঞ্চ দখল করতে হলো। তিনি ধন্যবাদ জানালে মনোরঞ্জন বললেন,—আহাহা—নিজেদের মধ্যে ওগুলো আর কেন ! আমরা বাঙালী,...মিশুক জাত। বাঙালী হয়ে যদি না বাঙালীর সুখ-দুঃখ বুঝবো তো বাঙালী বলে পরিচয় দিয়ে লাভ ? এই আমায় সকলে বলে, ফার্ষ্টক্লাশ কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করে যান্ না কেন ! আমি বলি, ইংরেজ কোম্পানিকে অনর্থক কতকগুলো পয়সা দিয়ে ফল ? তাছাড়া এ পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে গল্প করে যাবো, তার আনন্দ...

তারপর পরিচয়...আপনার নাম ? কোথায় থাকা হয় ?

রজনীনাথ পরিচয় দিলেন।

—বিষয়-কর্ম্ম ?

রজনীনাথ বললেন,—তিন পুরুষ ঐ অম্বালাতেই বাস। কাঠের কারবার আছে, তাছাড়া জমিজমা। আর রেলোয়ে কন্ট্রাক্ট...

—ও ! তাহলে পয়সা বেশ করেচেন !

—আজ্ঞে না, অমনি দিন চলে যাচ্ছে কোনো মতে।
—কোথায় যাওয়া হচ্ছে আপাততঃ ?
—কলকাতায়।
—কোথায় থাকা হবে ?
—হরতকী বাগানে এক আত্মীয় থাকেন ; তাঁর ওখানে।
—হরতকী বাগানে ! আত্মীয়টি কে, নাম কি, বলুন তো ?
—মৃত্যুঞ্জয় ঘোষাল...তিনি সামান্য চাকরি করেন—এক মার্চেন্ট অফিসের বড় বাবু।
—ওঃ !...তা আসবেন দয়া করে আমার ওখানে...যখন আলাপ-পরিচয় হলো। অম্বালায় আমাকে বোধ হয় একবার যেতে হবে। একটা জমি বাঁধা আছে। সেটা দেখে-শুনে বন্দোবস্ত করার জন্য ! ...গাণ্ডার সিংকে জানেন ? তারা দু'পুরুষ ধরে বাস করচে সুরাটে। ঐ বাড়ীই আছে অম্বালায়। শুনেচি, মস্ত বাড়ী। দেখিনি কখনো...

২

হরীতকী বাগানে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষালের ছোট্ট দোতলা বাড়ী। বাহিরের ঘরে বসে রজনীনাথ কাকে চিঠি লিখছিলেন...ঘরের সজ্জায় কোনো বৈচিত্র্য নেই। একখানা তক্তাপোষ, তার উপর সতরঞ্জ পাতা ; দু' পাশে দুটো তাকিয়া, তার ওয়াড় ময়লা। একধারে একটা টেবিল, তার উপর দোয়াত-দান, কলম, পেন্সিল, ছেলেদের খাতা-বই, ভাঙ্গা একটা চায়ের পেয়ালা, কাঠিশূন্য দিয়াশলাইয়ের বাক্স একটা, আর একরাশ পুরানো ফরোয়ার্ড কাগজ।

বাড়ীর সামনে একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো। প্রাইভেট কার্। গাড়ীর দ্বার খুলে পরক্ষণেই রজনীনাথের সামনে এসে দাঁড়ালেন, সেই পাঞ্জাব মেলের মনোরঞ্জন বাবু।

রজনীনাথ চিঠি লেখা বন্ধ করে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—আসুন...

হেসে মনোরঞ্জন বললেন—এলুম। ...মানে, এসেছিলুম ঐ বীডন্ ষ্ট্রীটে। এক বন্ধুর অসুখ, তাঁকে দেখতে। ফেরবার মুখে দেখলুম, হরতকী-বাগান লেন...ভাবলুম, পরিচয়টা একবার নয় ঝালিয়ে যাই।

রজনীনাথ বললেন—আপনার অনুগ্রহ।

—তা, মৃত্যুঞ্জয় বাবু কোথায় ? তাঁর সঙ্গেও আলাপ...

রজনীনাথ বললেন—আপিসের বাবু—তাঁর কি আলাপের অবসর আছে ? খেতে বসেচেন, এখনি বেরুতে হবে। ...

—বটে ! তা ভালোই হলো। আমাদের ওখানে সন্ধ্যার পর চলুন না...একটু গান-বাজনা আছে। এলুম বহুদিন পরে কি না—সকলের সাধ। তা কি বলেন ?

—বেশ, যাবো।

—ঠিকানা মনে নেই নিশ্চয়। ...তা, আমার গাড়ী পাঠাবো'খন। ড্রাইভার তো বাড়ী দেখে গেল ! কি বলেন ?

—বেশ।

—কখন আপনার সুবিধে হবে ? আটটা ?

—হাঁ, তাহলে ঐ আটটাতেই গাড়ী পাঠাবেন।

—তেমন কিছু জরুরি কাজ তো নেই... ? দেখুন, কোনো ক্ষতি হবে না ?

—না, না।

—তাহলে আর বসবো না। বলেই মনোরঞ্জন পকেট থেকে ঘড়ি বার করলেন। বেশ দামী ঘড়ি—রঙচঙে পাথর বসানো। ঘড়ি খুলতেই নানা রঙের জ্যোতি চিক্‌মিক করে ঠিকরে পড়লো !...মনোরঞ্জন বললেন,—মানে, বেলা ঠিক দশটায় বাবুসেরাইয়ের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। বাবু সেরাই কোথায়, জানেন ? নেপালের কাছে—সেখানকার কাঠের নাকি ভারী নাম !...

রজনীনাথ বললেন—নেপালের কাঠ তো খুবই ভালো বলে শুনি। তবে কখনো কারবার করিনি তার...

—বটে ! আচ্ছা, লাগে যদি তো আমিই জোগাড় করে দেবো...

মৃদু হাস্য বিলিয়ে মনোরঞ্জন বিদায় নিলেন। রজনীনাথ খানিক স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর আবার চিঠি লিখতে বসলেন।...

...বালিগঞ্জের এক নিরালা পল্লীতে মস্ত বাড়ী, সঙ্গে বাগান। মোটর থেকে রজনীনাথ নামবামাত্র দুটি ভদ্রলোক তাঁকে অভ্যর্থনা করে এনে ড্রয়িং রুমে বসালেন। মস্ত ঘর ; সোফা-কৌচে সজ্জিত। মাঝখানে জাজিম পাতা। জাজিমের উপর হারমোনিয়াম, বেহালা, বাঁয়া-তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য-যন্ত্র।...জাজিমের উপর দশ-বারো জন ভদ্রলোক বসে নিবিষ্ট চিত্তে গল্পগুজব করচেন। এক ধারে সাদা চাপকানের উপর কালো মখমলের ফতুয়া-আঁটা, মাথায় হিন্দুস্থানী টুপি, একটা সিড়িঙ্গে রোগা লোক তানপুরার তারে আঙুলের ঘা দিয়ে পিড়িং-পিড়িং আওয়াজ তুলচেন...ঘরে ইলেকট্রিক আলোর ঝাড় জ্বলছে।

রজনীনাথ জাজিমে বসতে যাচ্ছিলেন,—ট্রেনের কামরার সেই লালগোপাল বললেন—উহুঁহু—ঐ সোফায় দয়া করে—

পাণ এলো, রূপার গোলাপ-পাশে গোলাপ জলের ঝারা...তামাক, সিগার...প্রচণ্ড ধূম ! কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু...মনোরঞ্জন বাবু কোথায় ?

রজনীনাথ সারা ঘরে দৃষ্টি বুলিয়ে মনোরঞ্জনকে দেখতে পেলেন না।

পল্টু বললে,—মনোরঞ্জনবাবু একটু ব্যস্ত আছেন। বাবু-সেরাইয়ের মন্ত্রী এসেচেন...ভারী দরকারী কাজ...

লালগোপাল বললে—ওই পাশের ঘরেই উনি আছেন।...আমি বরং খপর দি...

রজনীনাথ বললেন—থাক্ থাক্। ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

পল্টু বললে—না, না, তিনি বলেচেন, আপনি এলেই যেন তাঁকে তা জানানো হয়।

লালগোপাল বললে—ধন্নুলাল এখনো আসেনি। মস্ত গাইয়ে। তার বাড়ী যোধপুর...এখানে এসেচে মুলৌরীর কুমার-সাহেবের সঙ্গে। তা, মনোরঞ্জন বাবুকে সেলাম না করে গেলে তার তৃপ্তি হবে না তো...

পল্টু বললে—এককালে অনেক পয়সা খেয়েচে কি না! মনোরঞ্জন বাবুর গান-বাজানার কি সখই না ছিল তখন ! তাছাড়া মুলৌরীর কুমার-সাহেবকে পেলে কার দৌলতে ? বেইমান নয় !

লালগোপাল বললে,—রাজপুত জাত, কখনো বেইমান হয় না। দেখলুমও তো ঢের এই মনোরঞ্জনবাবুর কাছে থেকে...। তাহলে আমি খপর দি...

লালগোপাল ছুটলো খপর দিতে। যে-লোকটি তানপুরোর তারে আঙুলের ঘা দিচ্ছিল, তাকে নির্দ্দেশ করে পল্টু বললে,—ওর নাম শোনেননি ? ফিরোজ খাঁ...লক্ষ্ণৌয়ের মস্ত ওস্তাদ...তবে এখন পড়ে গেছে বাঙলায় থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগে। তবু এক একখানি আলাপে এখনো নগদ পঞ্চাশ টাকা গুণে নেয়...

বাপ—বাদশাহী ব্যাপার ! রজনীনাথের চক্ষুস্থির ! এত বড় ধনীর সভায় তার মত পাড়াগেঁয়ে লোক। তা নয়তো কি ! অম্বালার এক সামান্য কাঠের কারবারী সে, আর মনোরঞ্জন বাবু ? রাজা-মহারাজ লাট-বেলাটের মান্য বন্ধু একজন !...

লালাগোপাল ফিরে এলো, এসে বললে—আপনি ঐ ঘরে চলুন...

রজনীনাথ সঙ্কুচিতভাবে বললেন—ও ঘরে কেন ! আমি এ বেশ আছি। ওঁদের দরকারী কথাবার্ত্তা হচ্ছে...

লালগোপাল বললে—তা হোক্ ! ওঁর ঐ স্বভাব...যাঁর উপর শ্রদ্ধা হয়, কি মন পড়ে তাঁকে একেবারে মাথায় করে রাখেন !...

ভাগ্য ! ভাগ্য ! এত বড় লোকের বন্ধুত্ব...ট্রেনের কামরায় আলাপ বৈ তো না ! অমন আলাপ কত হয়—ঐ জলের গায়ে আঁক কাটার মতই সে...এমন আর কবে ঘটেচে !—রজনীনাথ ভাবলেন, মহাপুরুষের বিশেষত্বই এইখানে !

তাঁকে উঠতে হলো—এক ধারের ঐ ঘর। ঘরে চেয়ার-টেবিল, কোণে একটা পিয়ানোও আছে !

মনোরঞ্জন বললেন—আসুন...বলেই তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন—মেরা দোস্ত বাবু রজনীনাথ ব্যানার্জী...বড়া ভারী টিম্বার-মার্চেন্ট...অম্বালা-রহনেওয়ালা...আর ইনি বাবুসেরাই এষ্টেটকা মন্ত্রী, সার্ গমভেরজঙ্গ মহারাজ-জী...

সেলাম-তসলিম্ প্রভৃতি হলো।... তার পর মনোরঞ্জন বাবু বললেন,—একটু মাপ করুন। হিসেবটা...আর অল্পই আছে।

হিসাব-পত্র কি চলতে লাগলো। হঠাৎ মনোরঞ্জন বাবু বললেন—বীরদী কাঠ কি, জানেন...রজনীবাবু ? আপনি তো কাঠের একজন জহুরী...

—আজ্ঞে না।

—মন্ত্রী-মহারাজ বলচেন, সে ভারী মজবুত কাঠ...এখানকার সেগুনের চেয়ে ভালো বই খারাপ হবে না।...

—আজ্ঞে না, জানি না। ও-নামও কখনো শুনিনি।

—আপনাকে তবে কথাটা বলি—যদি পরামর্শ দিতে পারেন ! মানে, এঁদের এষ্টেটে মস্ত সায়েন্স কলেজ খোলা হচ্ছে...স্যর জে, সি, বোস্‌কে পরে নিয়ে যাবার সংকল্পও আছে। তবে ফ্রান্স থেকে এক মস্ত বৈজ্ঞানিক এসেচেন। তিনি হিসাব দিয়েচেন, পনেরো লাখ টাকা নিয়ে নামতে হবে। তাই মহারাজ-জী আমার কাছে এসেচেন। টাকা আমি দিতে পারি—রাজীও আছি। এঁরা সাত পারসেন্ট্ সুদও দেবেন...ভালো কথা, বেশ ! তা, এঁরা বন্ধক দিতে চাইছেন কাজুয়া-জঙ্গল। মন্ত্রী মহারাজ বলচেন, সে-জঙ্গলে দু'লাখ ঐ বীরদী গাছ আছে। উনি বলচেন, সেই গাছেরই এক একটার দাম পাঁচশো টাকা হবে। তাহলে হলো দু' লাখ ইন্টু পাঁচশো...কত হয় হে নন্দলাল ?

নন্দলাল একটা কাগজ দেখিয়ে বললেন—এই যে আমি মাল্‌টিপ্লাই করেচি, এই...অর্থাৎ হলো গিয়ে দশকোটি টাকা...

মনোরঞ্জন বললেন—হুঁ। তাছাড়া শিশু, শাল, সেগুন—এ-সবও রাশি-রাশি...এ তো সব বুঝলুম। কিন্তু ঐ বীরদী গাছ...নাম শোনা নেই। তা, দেখে আসা যায় না?

মন্ত্রী মহারাজ বললেন,—আলবাৎ! মেহেরবানি হয় যদি? মহারাজ-বাহাদুর বহুৎ সেলাম জানিয়ে বলে দেছেন, তিনিও তাহলে ভারী আপ্যায়িত হবেন।

হাস্যমুখে মনোরঞ্জন বললেন—কি বলেন রজনীবাবু? দেখুন, যাবেন? জঙ্গলটাও দেখা হয়—আর হিঁদুর ছেলে, সেই সঙ্গে তীর্থযাত্রাও—হা-হা-হা... আপনার যদি মত থাকে, দেখুন—মহারাজ বাহাদুরের অতিথি হয়ে...

রজনীনাথ মৃদু হাস্য করলেন মাত্র, কিছু বললেন না।

মনোরঞ্জন বললেন,—আচ্ছা—হিসাব তো হলো। টাকাও মজুত। আপনাকে মোদ্দা দু-চারদিন দেরী করতে হবে, মহারাজ-জী। তার পরেই...

মন্ত্রী-মহারাজ কাকুতি জানালেন—দেরী হোয়, উস্‌মে ক্যা...লেকিন্ কামঠো হোনা চাহি, বাবু-সাব...

—আচ্ছা, আচ্ছা, আশ্বাস দিচ্ছি, কাম হয়ে যাবে। বলে মনোরঞ্জন মন্ত্রী-মহারাজের পিঠ চাপড়ে তাঁকে অভয় দিলেন। তার পর বললেন—এখন থোড়া গাহ্না-বাজনা হোক...

গান-বাজনা চুকলো রাত এগারোটায়। তারপর আহারাদি...সে এক রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার। রকমারি ডিশ্...পাত্রও তেমনি—সোনা-রূপার ছোট দোকান যেন!...

রাত্রে বিদায়-সম্ভাষণাদি হলো, তা'ও সুমধুর! তার পর রজনীনাথের হরতকীবাগানে যাত্রা—মানোরঞ্জনের সেই মোটরে।

৩

পর-পর চার-পাঁচ দিন মনোরঞ্জনের আদর-আপ্যায়নের ঘটায় রজনীনাথ যেন জর্জরিত হয়ে পড়লেন। রোজ বেড়ানো, থিয়েটার, বায়োস্কোপ...সমারোহের অন্ত নেই।

সে দিন বায়োস্কোপ থেকে রজনীনাথকে নিয়ে মনোরঞ্জন বালিগঞ্জের গৃহে ফিরলেন। সামনে একজন সাহেবী-পোষাক-পরা ছোকরা—তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাবা-মাত্র মনোরঞ্জন বললেন—কি হলো?

ছোকরা বাঙালী-সাহেবটি বললে,—ব্লকহেড সাহেব সমস্ত কাঠ ইজারা নিতে রাজী। আপনার ও বন্ধকী খতে সে সর্ত্ত আছে তো যে ঐ বীরদী কাঠ ইজারা নিতে পারবেন?

—নিশ্চয়।

—মাসে সে পাঁচ হাজার করে দিতে চায়।

—সেলামি?

—ঐটেই কিছু কম করতে বলচে,—বলচে, পনেরো হাজার নিন। ভাড়ার জন্য সে ভালো জামিন দিতে রাজী। জামিন দেবে ঐ আর্ম্মানি...

তার মুখের কথা লুফে মনোরঞ্জন বললেন—আর্ম্মানি মানে তো ঐ আপকার?

—হাঁ।

ঘাড় নেড়ে মনোরঞ্জন বললেন—না। সেলামি কম করা হবে না। করিমগঞ্জের নবাব সাহেব নিজে আজ সকালে এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন, সেলামি তিনি দেবেন পঁচিশ

হাজার—আর ইজারার ভাড়া মাসে সাত হাজার। ও গাছ তার দেখা আছে। তিনি বলে' গেছেন, ও-গাছের কম না হোক প্রত্যেকটার দাম ন'শো করে। আর কাঠ আনতে কোনো হাঙ্গামা নেই। জঙ্গলের নীচেই খরস্রোৎ নদী। সেই নদীতে কাঠ ভাসিয়ে দাও। সে নদী এসে ফরাক্কাবাদের কাছে গঙ্গার বুকে। ব্যস্—সেখানে ডিপো খুলে বসো, বসে কাঠ তুলে নাও।

ছোকরা প্রশ্ন করলে,—তাহলে ?

—না, না, না। পঁচিশ হাজার সেলামি দিচ্ছে, বলে, তাতেই রাজী হচ্ছি না। এখন বয়স হয়ে পড়চে হে, কাচ্ছা-বাচ্ছাগুলোর কথাও ভাবতে হবে তো। সেলামি আমার পঞ্চাশ হাজার চাই। তবে হ্যাঁ, একসঙ্গে দিতে না পারো, লেখাপড়ার সময় বিশ হাজার দাও—তার পর চার মাসে বাকী ত্রিশ হাজার। ভাড়া ঐ দশ হাজার। এ সর্ত্ত ছাড়া বিলি করবো না। নিজেই নয় লোক রেখে গাছ কাটিয়ে কাঠ আনাবো হে। এই আমার এক বন্ধু বসে আছেন, আম্বালায় কাঠের মস্ত কারবার। ওঁর ওখানে সে কাঠ পাঠিয়ে দেবো। উনি বেচে আমায় দাম দেবেন।

কথাটা বলে তিনি রজনীনাথের দিকে ফিরে বললেন—আসুন রজনীবাবু!

সেই ড্রয়িং রুম। রজনীনাথ বললেন—ওটা কি বন্ধক হয়ে গেছে ? ঐ বীরদী কাঠের জঙ্গল ?

—নিশ্চয়ই। ও কি ফেলে রাখতে আছে ? আমি সেদিন ডক্টর ফ্যাক্‌সিমিলির সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নিছি। তিনি ও-এষ্টেটে প্রায় সাত বছর ছিলেন, রয়েল সার্জ্জন...তিনি বললেন, ও ফরেষ্টের দাম বিশ কোটি টাকা, মনোরঞ্জন বাবু!

—বলেন কি ?

—তাই!. লোক আসচে কম ? মহারাজ ফশকরাঙ্গা, হুশেনবাদের নবাব, তোগড়ার রাজা, তাছাড়া একটা বর্ম্মিজ কোম্পানি অবধি ও-ফরেষ্ট ইজারা নেবার জন্য আকুল। বেশী কথা কি, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট অবধি দর দিচ্ছে।

রজনীনাথ বিস্ময়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়...তাঁর চোখের সামনে যেন নেপালের পার্ব্বত্য ভূমির নীচে কুবেরের ভাণ্ডার মুক্ত সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠলো—রাশি রাশি রত্ন—কি তার ঔজ্জ্বল্য!...ওঃ! রাত্রে ফেরবার সময় রজনীনাথ বললেন—আপনি পঞ্চাশ হাজার সেলামি পেলে ও-জঙ্গল ইজারা দেন ? আর দশ হাজার টাকা ভাড়া ?

—হাঁ, তো দি। রোজ এই লোকের পর লোক আসা। আর পারাও যায় না। ...আমায় শীগগির সেই ডেরা-গাজী-খাঁয় ফিরতে হবে টেলিগ্রাম এসেচে দু'খানা।...টাকার কাজ নয়, ব্যাগার! তবুও একটা জাতীয় ব্যাপার কি না! একদিকে ব্রিটিশ-রাজ অপর দিকে আফগান, তাদের এত বড় কাজে সামান্য একজন বাঙালীর নামটা যদি থাকে...হয়তো এ পথে একদিন বাঙালীর উন্নতিও ঘটতে পারে! শুধু সেইজন্যই। একটু স্বার্থহানি করেও যদি জাতের জন্য নিজের...

রজনীনাথ বললেন—আমায় দেবেন ও জঙ্গল ? তবে জামিন—

মনোরঞ্জন তাঁর হাত ধরে বললেন,—ছি, ছি, ছি, বন্ধুত্বের মধ্যে আবার জামিন কি ? আপনার কথাই সব। সেলামিও নয় পরেই দিতেন। কিন্তু আমায় চলে যেতে হচ্ছে কি না—এক মামাতো ভাইয়ের কন্যাদায়—আমায় ধরেচে, তার পঁচিশ হাজার টাকা দরকার। সাহায্য!...যাক্... পর তো নয়! একটা ইজ্জৎ-ওয়ালা ঘরে বরও পাচ্ছে—তবে কামড়

তাদের বেজায়। তা হোক্, মেয়েটা যদি সুখে থাকে! তাই সব চুকিয়ে যেতে চাই।...আম্বালায় ফিরে একবার নয় বেড়াতে চলুন না ডেরা-গাজী-খাঁয়। আমি আছি। কোনো কষ্ট হবে না। কখনো গেছেন ওদিকে?

—না।

—যাবেন, যাবেন। পাহাড়ের কি দৃশ্যই দেখবেন! আঃ! কালিদাস কি অমনি অমনি অত বড় কবি হয়েচেন? ঐ পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়েই না রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব লিখে গেছেন। না হলে এখানে এই সব ঘেঁটু-বন-দেখা কবি—তাদের দৌড় আর কতদূর হবে, বলুন?

আবার অবান্তর কথায় সময়ের অপব্যয়! রজনীনাথ বললেন,—বেশ, পাকা কথা রইলো তাহলে। সেলামি আমি দেবো। কালই। চেক নয়, নগদ। আপাততঃ বিশ হাজার। আমার সঙ্গেই আছে। পৈত্রিক বাড়ী একখানা আছে এই শাহানগরে, সেটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে। তার ঘর-দোর তোলা, মেরামতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করো যাবো, ভেবেছিলুম। তা, এটা তো ছাড়া উচিত নয়।

—কখনোই নয়। এমন লাভ...বিশেষ আপনার যখন এই কাঠের ব্যবসা আছে...

—ট্রেনে আপনার সঙ্গে ভারী শুভক্ষণে দেখা হয়েছিল। ট্রেনে তো কত যাতায়াত করচি—কিন্তু এমন? বিধাতার অভিপ্রেত...

—দেখুন, ভবিতব্য! আমার দ্বারা যদি সামান্য উপকারও আপনার হয়, তা হলে আমি নিজেকে খুব কৃতার্থ মনে করবো। ক'দিনের বা জীবন! এর মধ্যে যদি পরস্পরের কেউ কারো সাহায্য করতে পারি—এতটুকু কারো উপকারে লাগি...তাহলেই তো জীবনের সার্থকতা। নাহলে খাওয়া-দাওয়া,—সে তো পশুতেও করচে।

—কাল রাত্রে আমি টাকা নিয়ে আসবো।

—বেশ, আমার এটর্ণিকে থাকতে বলবো! তার পর পরশু রেজেস্ট্রী। আমিও তাহলে তার দু'দিন পরেই—মানে, এই হপ্তাতেই বেরিয়ে পড়তে পারবো।

পরের দিন, রাত আটটা। টাকা নিয়ে মনোরঞ্জনের মোটরেই রজনীনাথের প্রবেশ।

মোটর মনোরঞ্জনই পাঠিয়েছিল।...অনর্থক বন্ধুর ট্যাক্সি-ভাড়াটা কেন গচ্চা যায়!

মনোরঞ্জন বললেন—আসুন, বন্ধু। এটর্ণিও হাজির।

সাহেবী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক বললেন—ইনিই... ?

—হাঁ।

এটর্ণি বললেন,—দলিলখানা পড়ুন।

রজনীনাথ দলিল পড়তে লাগলেন। বাঁধি গৎ। বেশ পরিষ্কার, প্রাঞ্জল ভাষা! চৌহদ্দী দেওয়া, গাছের সংখ্যা অবধি..পাকা-পোক্ত দলিল!...

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ! চমকে রজনীনাথ চেয়ে দেখেন, চকিতে একরাশ কনষ্টেবল, সার্জ্জেন্ট, ইন্‌স্‌পেক্টর একেবারে ঘরের মধ্যে।

ব্যাপার কি?

মনোরঞ্জন নিঃশব্দে সরে পড়ছিলেন। সার্জ্জেন্ট লাফিয়ে এসে তাকে পাকড়ে গর্জ্জে উঠলো—ও ইউ রোগ্—

রজনীনাথ অবাক!

এটর্ণি গ্রেপ্তার হলেন। তার পর ভীষণ একটা সংগ্রাম। পাশাপাশি ঘরগুলো থেকে লালগোপাল, পল্টু প্রভৃতি সহচরবৃন্দ...মোগলসরাইয়ের পল্ সাহেব, বাবুসেরাইয়ের মন্ত্রী, সেই ছোকরা সাহেব-দেশী দালাল, মায় সেই লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদজী অবধি...তাঁর মাথায় সে টুপি নেই, সে ফতুয়া-চাপকান প্রভৃতিও অন্তর্হিত...মূর্ত্তি সেই। গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি মাত্র, ম্যালেরিয়া-জীর্ণ গুলিখোর বাঙালীর মূর্ত্তি। তা হোক, চিনতে বাধে না। ...সাজানোর অপূর্ব্ব কেরামতি ! বাঃ !

ব্যাপারও জানা গেল। এরা মস্ত জুয়াড়ি ; বেশ ভারী দল। নানা ফন্দীতে বহুলোককে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে। কর্ম্মক্ষেত্র শুধু ক্ষুদ্র কলকাতা বা বাঙলা দেশটুকুতেই নয়, বিস্তীর্ণ ভারত-ভূমি এঁদের লীলাক্ষেত্র ! কেউ রাজা সাজেন, কেউ মন্ত্রী...লাখ দু'লাখ ছাড়া মুখে কারো কথা নাই। ব্যবসা, বন্ধকী কারবার—এমনি। সদ্য দিল্লীতে গাঁজাবাদের নবাবী তখ্‌ত বন্ধক দিইয়ে এক লালচাঁদ ভাটিয়ার পঁয়ত্রিশ হাজার ঘাল করে এসেচেন। তারি গেফ্‌তারী ওয়ারেন্ট—বহু সন্ধানে এই আস্তানায় দলটিকে পাওয়া গেছে।

রজনীনাথ বললেন—এ্যাঁ ! বলেন কি ! আমিও যে বিশ হাজার দিতে এসেছিলুম। এই ড্রাফ্‌ট্ দলিল...

ইন্সপেক্টর বললেন—আপনাকে কি বলে লোভ দেখিয়েছিল ?

রজনীনাথ বললেন,—আমায় এঁরা মুখে কিছু বলেননি। তবে ওঁদের বড় বড় কথাবার্ত্তা শুনে আমিই লোভাতুর হয়ে...বীরদী কাঠের জঙ্গল জমা নিচ্ছিলুম, ঐ বাবুসেরাইয়ের মন্ত্রী-মহারাজ...

ইন্সপেক্টর বললেন—ঐ তো ওদের টোপ। এরা ঐ বড় বড় কথার টোপেই শীকার গাঁথে। তাহলে আপনার নালিশ... ?

রজনীনাথ বললেন—আমায় মাপ করুন। আমি অম্বালায় থাকি। ট্রেনে আলাপ। সাক্ষী দিতে হলে বহুদিন এখানে থেকে যেতে হবে। তাতে ক্ষতি হবে। টাকা এখনো ছাড়িনি—আমার কাছেই আছে। ...ভাগ্যে আপনারা এসে পড়লেন ! আর দশমিনিট দেরী হলেই গেছলুম...

ইন্‌সপেক্টর বললেন—টোপ গিলছিলেন ! ওঃ, খুব রক্ষা পেয়েচেন। একেই বলে ভগবানের লীলা !

রজনীনাথ শিউরে উঠলেন। এ কথা আর একবার তাঁর মনে উদয় হয়েছিল...কাল ঠিক এমনি সময়ে...টাকা দেবার জন্য যখন তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন...

তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হলো—ভগবানের লীলাই বটে ! ভগবান তাহলে মাথার উপর একজন আছেন, সত্যই !...

শ্রীশিবসুন্দর শর্ম্মা

বিশ্বাসের জোর

নব-বিবাহিত সুনীল যখন আবার তার মেসে ফিরে এলো, তখন তার বন্ধুরা চারিধারে ঘিরে বসে নববধূ সুষমার রূপ-গুণের বিবরণ শুনে নিয়ে বললে, "ভাই তোর তো রূপে-গুণে বেশ বৌ মিল্‌লো, কিন্তু ছুটির সময় বিয়ে হলো, আমাদের একবার বললি না !'

সুনীল হেসে বললে, "এই নাও, আমার মা তোমাদের জন্যে সন্দেশ দিয়েছেন, আপাততঃ তাই খাও। তারপর একদিন বড় রকমের ভোজ দেওয়া যাবে।"

বন্ধুরা শুনে মহা-উৎসাহে নব দম্পতীর শুভ কামনা করে, মিষ্টিগুলির সদ্ব্যবহার করলে। আর তার পরেই, ভোজের ব্যবস্থার ফর্দ্দও করতে বসে গেল।

দেখতে দেখতে সুনীলের বিয়ের পর দু বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সে অনেকবার শ্বশুর বাড়ীও ঘুরে এসেছে। সুনীল এখানে যতদিন থাকে, তার চিঠি লেখা বা চিঠি আসার কোনদিন ব্যতিক্রম হয় না। চিঠি তার একদিন অন্তর লেখা চাই, আর সে চিঠির উত্তরও একদিন অন্তর পাওয়া চাই। সুষমারও এ বিষয়ে আলস্য ছিল না। বন্ধুরা ঠাট্টা-তামাসা করতো, সুনীল শুনে হাসতো, কিছু বল্‌তো না।

সুনীলের ভালবাসার কথা শুনে শুনে হঠাৎ একদিন তার বন্ধু রমেশ ঠাট্টা করে বল্‌লে "আচ্ছা সুনীল, তুই যে বলিস্ তোর বৌ তোকে এত ভালবাসে, তা এ ভালবাসা, সত্যি না মৌখিক ?"

সুনীল চম্‌কে উঠে বললে, "কি রকম ?"

"কি রকম আবার কি, হয়তো সে তোকে যতটা ভালবাসা জানায়, ততখানি ভালবাসে না।"

"দূর, তাও বুঝি সম্ভব ?"

"অসম্ভবই বা কিসে ?"

সুনীল বললে, "অত খোঁজে আমার দরকার নেই ভাই। সে আমায় ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসি এই পর্য্যন্তই শেষ। তারপর সে ভালবাসা মৌখিক কি সত্যি, অত জানবার বা খোঁজ নেবার আমার কিছুমাত্র দরকার নেই। খোঁজ ক'রতে গিয়ে মিছে অশান্তি যেচে আনা, মনের সুখ নষ্ট। তার চেয়ে এই বিশ্বাসই ভাল। সে আমায় মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, আমি তাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, আর কি চাই ?"

"আরে ভাই, স্ত্রীদের অতটা বিশ্বাস করা ভাল নয়। জানতো চাণক্য কি বলেছেন ? সেই যে বলে—"

"আরে থামো থামো, রেখে দাও তোমার চাণক্যের শ্লোক। তাঁর বিশ্বাস তাঁরই থাক।"

রমেশ একটু হেসে বল্‌লে, "বেশ, বেশ, তোমার এ বিশ্বাস চিরদিন থাকলেই ভালো।"

সুনীল বললে, "থাক্‌বে হে থাক্‌বে ; সে জন্যে তুমি ভেবো না।"
রমেশ হেসে বললে, "আচ্ছা।"
এর কিছুদিন পরে হঠাৎ রমেশের বিয়ে হয়ে গেল, সুষমার সই সুষমার সঙ্গে। সুষমা আর তার সই সুষমার এক নাম বলে তারা দুজনে সই পাতিয়েছিল। সুষমার সই তার চেয়ে কিছু ছোট ছিল বলে লেখা-পড়া কিছু কম শিখেছিল। সুষমা তাকে গান-বাজনা, লেখা-পড়ার অনেক সাহায্য করতো।
দেখতে দেখতে বিয়ের দু' মাস কেটে গেল।
রমেশ সুনীলের একখানা বই পড়বার জন্য নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। সেটা সুনীলের দরকার পড়ায় সে রমেশের ঘরে গিয়ে বললে, "ভাই রমেশ, বইটা তোমার পড়া হয়েছে ? আমার দরকার পড়েছে। একবার নিয়ে চল্‌লুম।" এই ব'লে সে বইটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরে এসে চেয়ারে বসে বইটার পাতা উল্টোতে লাগলো। হঠাৎ দেখ্‌লে, তার স্ত্রী সুষমার লেখা চিঠি ! সে চমকে উঠলো ! ভাবলে, ছি, ছি, চিঠিখানা ভুলে এতে রেখেছি ! রমেশ কি ভাবলে কে জানে ! তারপর সে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলো।

বর্দ্ধমান

হে প্রিয় !
তুমি চলে যাওয়া অবধি আমার মন বড় খারাপ হয়েছে, তোমার চিঠি না পেয়েই আমি আবার চিঠি লিখছি। তোমাদের তো আমাদের মত কোমল মন নয়, তাই গিয়ে চিঠি দিতে পারলে না। তোমায় যে কত ভালবাসি তা তো তুমি জানো, তবে কেন এত ব্যথা দাও ? আবার কবে আসবে ? তোমার আসার পথ চেয়ে আছি। ইতি

তোমার চিরদিনের সুষমা

সুষমা ! সুষমারই তো লেখা চিঠি ! কিন্তু এ কাকে সে লিখেচে ? এ চিঠি তো সুনীল পায়নি ! আর কারো চিঠি নয় ? না, এ যে তারি সুষমা, চিঠিও লিখছে বর্দ্ধমান থেকে। সব ঠিক ! কিন্তু এ কাকে লিখেচে ? তার সদা-প্রসন্ন মুখ মলিন হয়ে উঠলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটলো। তবে কি এ রমেশের চিঠি ? কিন্তু রমেশকে সুষমা এ রকম চিঠি লিখবে কেন ? সে কিছু বুঝতে পারলে না !
সুনীল অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে লাগলো। এমন সময় রমেশ ঘরে ঢুকে বললে, "ভাই সুনীল, বইটাতে আমার একখানা চিঠি ছিল বের ক'রে নিতে ভুলে গেছি। পেয়ে থাকো যদি—দাও তো।"
সুনীল ভূতগ্রস্তের মত বইখানা-সুদ্ধ চিঠি তার হাতে তুলে দিলে, তার হাত থর-থর ক'রে কাঁপতে লাগলো।
রমেশ বললে, "কি হলো হে সুনীল, তোমার হাত অমন কাঁপছে কেন ?" সুনীল জোর করে একটু হেসে বললে, "না, ও কিছু নয় ! হ্যাঁ ভাই রমেশ, এ চিঠি তোমায় কে লিখেছে ?"
"কেন, আমার স্ত্রী লিখেছে।"
"তোমার স্ত্রী ?"
"হাঁ, আমি তো স্ত্রী বলেই জানি।"

"তার মানে ?"
"তার মানে মনে-প্রাণে এই পত্র-লেখিকাকে আমি স্ত্রী বলেই গ্রহণ করেছি, এবং চিরদিন তাই করবো।"
"তোমার বিবাহিতা স্ত্রী ?"
"আমি তো তাই মনে করি।" রমেশ মুখ টিপে একটু হাসলো, তারপর বললে, "আচ্ছা, তোমার আজ কি হয়েছে সুনীল ?"
"রমেশ, রমেশ, তুমি জানো না যে আমার কি হয়েছে !"
"সত্যি, হয়েছে কি ?"
"যে সুষমার লেখা এই চিঠি, সে আমার স্ত্রী সুষমা—এ আমি হলফ করে বল্‌তে পারি।"
রমেশ বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, "তোমার স্ত্রী সুষমার চিঠি এ ?"
"হ্যাঁ রমেশ। কিন্তু সে তোমায় চিঠি লেখে কেন ?"
একটা অভিসন্ধি রমেশের মাথায় উদয় হলো। সে গম্ভীরভাবে বল্‌লে, "তাই তো সেটা পরে বিবেচনা করে বল্‌বো, একটু সবুর করো।"
রমেশ দ্রুত পদে নিজের ঘরে চলে গেল। সে সব বুঝলে। তার স্ত্রী সুষমা যে বলেছিল তার সই সুষমাই তাকে চিঠি লেখায়। বুঝি...
সুনীল অস্থির হয়ে উঠলো, তার সুষমা এই ! এত ভালবাসা এত স্নেহ, এ সব কি মিথ্যা, ছলনা, কপটতা ! রমেশ আগে থেকে সব জান্‌তো, তাই সে সেদিন আমাকে ও কথা বলেছিল ? আমি বোকা, বুঝ্‌তে পারিনি। সুষমা হয়তো এই রমেশকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাসে ! তা আমায় কেন বলেনি, সে কথা ? আমার মনে এ ব্যথা কেন দিলে ? আমি যে সত্যই তাকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসি। চাণক্যের কথাই সত্য দেখছি, নারীকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। যাক, সব শেষ। সুষমাকে আর চিঠি লিখবো না। তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়।
সুনীল সুষমাকে চিঠি লেখা বন্ধ কর্‌লে। সুষমা চিঠি লিখলে, সে না পড়ে সেগুলি রেখে দিতো। ছুটিতে বাড়ী না গিয়ে সে দারজিলিং বেড়াতে চলে গেল।
রমেশ ছুটী হতে বাড়ী গেল, ও সেখান থেকে শ্বশুর-বাড়ী এসে সুষমার কাছে সব খবর জানলে। সত্যিই সে সুনীলের স্ত্রী সুষমার লেখা চিঠিই পাঠিয়েছিল।
রমেশকে সুষমা বল্‌লে যে, তার সই সুষমার স্বামী সুনীলবাবু সইকে আর চিঠি-পত্তর দেন না, আসেন না, হঠাৎ তাঁর কি হলো, সই কিছু বুঝতে পারছে না, সে জন্য সে বড় মনের কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তিনি তো তোমার বন্ধু হন, একবার খোঁজ নিয়ে দেখানো, লক্ষ্মীটি।
রমেশ বুঝ্‌লে সুনীলের মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। এম্‌নি হয় বটে। এই ভালবাসার গর্ব্ব ! হায়রে পুরুষ ! একটা চিঠি লিখেও খোঁজ নিতে পার্‌লে না, এই তোমার অত বিশ্বাসের পরিণাম ! আচ্ছা, দেখা যাক্ কত দূর কি হয় !
সে বললে, তোমরা তো শীগগিরই কল্‌কাতায় যাচ্ছো, মাও আস্‌ছেন, এই সূর্য্য-গ্রহণে গঙ্গাস্নান করতে। তা সেই সঙ্গে তোমার সইকেও নিয়ে চলো। আমি সুনীলবাবুকে তাঁর শ্রীচরণে হাজির করে দেবো। কিন্তু তাঁকে বলো, আমার পুরস্কার চাই।
রমেশ কলকাতায় ফিরে জান্‌লে সুনীল ফিরেছে। সে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে

বললে, "ভাই পরশু বিকেলে আমি আস্‌বো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

যথাসময়ে রমেশ এসে সুনীলকে ডেকে বললে, "চল, তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাই।"

"কোথায় ?"

"চলো না, গেলে দেখতেই পাবে। একদিন তোমাকে ঠাট্টা করে যা বলেছিলুম, তা দেখছি সত্যিই ঘটে গেল, আর আমিই তার নিমিত্তের ভাগী হলুম। আগে জান্‌লে এটা আর হোত না। যাই হোক্, তুমি একবার চলো—আজ এর একটা নিষ্পত্তি করা চাই। পত্রলেখিকা সুষমা দেবী এ বিষয়ে কি বলেন তাও জানা যাবে। তাঁর বিশ্বাসটা একবার পরখ করে দেখবো। তোমার বিশ্বাসের অত যে গর্ব্ব করেছিলে, তাকে এখন খর্ব্ব করে ফেলেছো দেখছি। এইবার সব ঘটনা সুষমা দেবীর মুখেই শোনা যাবে।"

"সুষমা ? আমার স্ত্রী সুষমা ? কোথায় সে ?"

"সে খবরও রাখোনি বুঝি ! সে যে কলকাতায় এসেচে। আমি যে বাড়ী ভাড়া করেছি সেই বাড়ীতে আছে।"

"কি বল্‌ছো তুমি, রমেশ ?"

"ঠিকই সব বল্‌ছি। এই যে বাড়ী চলো ভিতরে।" ব'লে, রমেশ হাত ধরে স্তম্ভিত সুনীলকে টেনে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌লো। একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে একটি ঘরে গেল ; সেই ঘরে বসে দুই সুষমা গল্প করছিল। তাদের ঢুকতে দেখে দুজনেই সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। রমেশ তখন হাসতে হাসতে সুনীলকে সুষমার কাছে ঠেলে দিয়ে বললে, "দিদি বা বৌদিদি যাই হোন আপনি, আমি আসামীকে আপনার শ্রীচরণে হাজির করে দিয়েছি। যা বিচার হয় করুন। পরে আমায় পুরস্কার দেবেন।" এই বলে সে চলে গেল। তার স্ত্রী সুষমাও দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে স্বামীর পশ্চাদানুসরণ করলে।

সুনীল ঘরে ঢুকতেই সুষমা তার পায়ে প্রণাম করে বললে, "কি দোষে আমায় ত্যাগ করেছিলে বলো ?" ব'লেই সে কেঁদে ফেল্‌লে। সুনীল তার হাত ধ'রে তুলে বল্‌লে, "সুষমা, এ কি ! ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সুষমা তখন চিঠি লেখা গোলমাল থেকে সব ব্যাখ্যা কর্‌লে। বল্‌লে, "সই পোড়ারমুখী আমার লেখা চিঠির নকল না করে সেইটা ডাকে দিয়েই তো যত গোল বাধিয়েছিল। তুমিই বা কোন খোঁজ নিয়েছিলে ?"

সুনীল সব শুনে আনন্দে সুষমার হাত দুটি ধরে বললে, "সুষমা আমায় ক্ষমা করো, না বুঝে তোমায় কষ্ট দিয়েছি। তা ছাড়া আমি তো আগে জান্‌তুম না, যে তোমার সই সুষমার সঙ্গে রমেশের বিয়ে হয়েছে। রমেশের তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার আমরা কোনো খবরই পাইনি।"

সুষমা হেসে ব'ল্‌লে, "তুমি ক্ষমা চেয়ে আর আমায় অপরাধী করছো কেন ? তোমার দোষ কি ? সবি আমার অদৃষ্টের ভোগ।"

সুনীল ও সুষমা তন্ময় হ'য়ে কথা কইছে, এমন সময় রমেশ এসে বল্‌লে, "কিহে সুনীল, গল্প যে তোমাদের ফুরোয়ই না। পরে গল্প কোরো, এখন কিছু খাবে এসো।"

লজ্জিত হয়ে সুনীল বেরিয়ে এসে রমেশের হাত ধরে বল্‌লে, "সব কথা খুলে এতদিন বলোনি কেন.রমেশ ?"

রমেশ হেসে বল্‌লে, "তোমার দেখা পেলে তো বল্‌বো। তুমি তো একেবারে মনের

দুঃখে দেশান্তরী হয়ে গেলে। তা'ছাড়া একটু মজা করাও গেল। বড় যে দর্প করেছিলে, সে বিশ্বাস গেল কোথা হে ?”

সুনীল মুখ নীচু করে বল্‌লে, “সত্যিই ভাই আমি বড় বোকা।”

“তাই তো আজ পয়লা এপ্রিলে তোমায় আরো বোকা বানিয়ে দিলুম। যাই হোক, আজ বৌদিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে ভাই। আর শুন্‌লুম, আমার ওঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আগে থেকেই হয়ে আছে। কই বৌদিদি কোথায় পালালেন ? আজ পুরস্কার না নিয়ে আর ছাড়ছি না। নিজের হাতে রেঁধে, কাছে বসে, আজ আমাদের দুজনকে খাওয়াতে হবে। আমি আপনার একটী পেটুক দেওর, সেটি যেন মনে থাকে।”

সুষমা মৃদু হাস্‌লে। এমন সময় রমেশের স্ত্রী সুষমা এসে সুনীলের সাম্‌নে জলখাবারের থালা রেখে বল্‌লে, “কি সুনীলবাবু, চিনতে পারেন ?”

সুনীল হেসে বল্‌লে, “পারি বৈ কি। বাস্‌রে ! বাসরঘরে যে কানমলা দিয়েছিলেন, তার ব্যথা এখনও যায় নি।”

“মনে আছে তো ? তবে দেখবেন আমার সইকে আর কখনো কষ্ট দেবেন না। তাহলে আবার নতুন করে, বুঝেচেন তো ?”

সুনীল মৃদুহাস্যে বল্‌লে, “খুব বুঝেচি।”

শ্রীতমাললতা বসু

বুড়ো-বুড়ী

আজকের শরত-রাত্রিটি কি স্নিগ্ধ শান্ত, যেন মায়ের স্নেহের কোল ! চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছো ? সন্ধ্যেবেলায় দেখেছিলুম লাউয়ের একটি সরু ফালির মত, অস্ত-রবির রাঙা আলোর সাগরে পাড়ি দিয়ে আসছে, এখন ডুবলো কোথায় ? হাঁ, চাঁদ খোঁজবার তোমার সময় কোথা ! ওগো গৃহকর্ম্মরতা, তোমার হাতের কাজের তো শেষ নেই ! আজকের আশ্বিন-নিশীথের বাতাসের স্পর্শটা তোমার হাতের ছোঁয়ার মতন ! কি, তাহলে তোমায়

দরকার কি ? বল্লুম ত, 'মতন'। তোমার ও মধুর করের স্পর্শের তুলনা কোথা ? এসো, এখন বাইরে বারান্দার এই কোণটিতে বোসো আমার পাশে—আজ হাতে হাত দিয়ে বসে থাকার রাত। খুকী ঘুমিয়েছে। তবে ত ফুরসৎ আছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে কঙ্কণটি, এই কচি কলাপাতা-রং-এর শাড়িটি পরে তোমার মনে হচ্ছে যেন মাতা ধরিত্রী সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে আঁচল মেলে দাঁড়ালো তারালোকের সঙ্গে মিতালি করবার জন্যে। হাঁ, একটা বড় সোফা কিনতে হবে। ইজিচেয়ারটা নিয়ে এসো না ! আমারই এনে দেওয়া উচিত বটে ! তা বেশ, পায়ের কাছে মেজেতেই বসো, ও ত তোমাদের কত জন্মের সংস্কার।

কি ? কবিত্ব-করা রেখে একটা গল্প বলবো ? এ তারালোকের আলো-ভরা রাতটা রূপকথা বলবার মত ! রূপকথা নয় ? তবে ? প্রেমের কোনো গল্প ? তা বলতে মুস্কিল আছে। তুমি ভাববে আমিই নিশ্চয় সে গল্পের নায়ক ছিলুম, আর যেহেতু তুমি তার নায়িকা ছিলে না, সুতরাং ফল হবে ঈর্ষা—তারপর অভিমান, তারপর অশ্রুবর্ষণ।

দেখো হঠাৎ সুরেশের দাদামশাই-দিদিমার কথা মনে পড়ছে ! সুরেশকে ত জানো ? সহসা তাদের কথা মনে হল কেন ? আশ্চর্য্য এ মনটা, এ যেন কোন্ বৃহৎ গভীর নদী—কত জন, কত ঘটনা, কত কথা এতে ভেসে এসে ডুবে যায়, তার কোন খোঁজ থাকে না, মন সামনে স্রোতে এগিয়ে চলেছে, সহসা কোনদিন সেই ডোবার মানুষেরা ভেসে ওঠে, মন চঞ্চল করে তোলে—না গো, না, তুমি ডোবোনি, তুমি আমার হৃদয়-নদীতে ভরা-পাল-তোলা তরী স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভেসে চলেছো !

সুরেশের দাদামশাই-দিদিমার গল্পটা বলি, শোনো। সে বছর ডাক্তারী পাশ করেছি, তোমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হতে হতে মাঝে পড়ে গেল ভাদ্র-আশ্বিন মাস, সুতরাং মন হল উদাসী, আর যেন অগ্রহায়ণের জন্য দেরী সয় না ! ঠিক করলুম পশ্চিমটা বেড়িয়ে আসা যাক—ঠিক, তুমি পুজোতে কাশী যাবো-যাবো করছো, তাই কথাটা মনে পড়লো। —ঠিক করলুম কাশী যাবো, যদি কিছু পুণ্যি করে তোমার মত লক্ষ্মীকে শীঘ্র লাভ করতে পারি—ঠাট্টা নয় গো !

সুরেশ তখন হাওড়া ষ্টেশনে কি একটা বড় কাজ পেয়েছে, তার আফিসে গিয়ে তার শরণাপন্ন হলুম, বল্লুম, একটা বার্থ তোমায় যে করে হোক রিজার্ভ করে দিতে হবে ৯ই, কাশী যাচ্ছি।

বল্লে, কাশী যাচ্ছো ? মুখটা প্রথমে তার একটু ম্লান হল, তার পরে উৎফুল্ল হয়ে বল্লে, বেশ, বেশ, নিশ্চয় করে দেবো, ক'টা বার্থ ? কিন্তু ভাই একটা কাজ কাশীতে গিয়ে তোমায় করতে হবে—এই যে দেখি হাতে ক্যামেরা, আমার একটা ফটো তুলে নাও দিকি শীগগির। ভাবি একটা ফটোগ্রাফারের কাছে যাবো, তা কি একটু সময় আছে !

সবে তখন ফটো তুলতে শিখছি, যেখানে যাই ক্যামেরা হাতে ঠিক আছে। কিন্তু আফিসে কাজ করার মধ্যে হঠাৎ ফটো তোলার সখ কেন সুরেশের হল, না বুঝতে পেরে অবাক হয়ে চাইলুম ; আর তার চেহারাটা এমন কিছু নয় যে দেখলেই ফটো তুলতে সাধ যায়।

ভাই, বেশী সময় নেই, শীগগির কর, বলে বাহিরের বারান্দায় আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। বল্লে, অবাক হচ্ছিস ? দেখ, কাশীতে আমার খুড়ো দাদামশাই আর দিদিমা আছেন, সাত বছর ধরে আমি তাঁদের লিখছি তাঁদের পায়ের ধুলো নিতে কাশী যাবো, তা

আমার আর কাজের তাড়ায় হয়ে উঠল না—এবার বুড়ী দিদিমা একটা ফটো পাঠাবার জন্যে অস্থির করে তুলেছে, চিঠির পর চিঠি—বয়স ত ত্রিশের ওপর হয়ে গেল, তাতে কি হয়, আমি সেই ছোট্ট নাতিটি আছি কি না ! এদিকে নাতি যে চার ছেলে-মেয়ের বাবা—

তিনখানা snap নিয়ে বল্লুম, এর মধ্যে একখানা নিশ্চয় ভালো হবে, আশা করি।

সুরেশ বল্লে, তা হলে ভাই কাল সকালে আমাদের বাড়ীতে একবার আসতে হচ্ছে, আমার ছেলেমেয়েগুলোরও একটা ফটো নিয়ে যা, বুড়ো-বুড়ী খুসি হবে।

বল্লুম, আমি ত তেমন ভালো তুলতে পারি না, সবে শিখছি—

বল্লে, আরে বুঝিস্ না, তাদের চাই একটা ফটো। তা ভালো তোলা কি মন্দ তোলা তাতে কিছুই আসে যায় না। তাদের নাতি, তাদের নাতির ছেলেমেয়েরা সুন্দর হবেই, তা খাঁদা নাকই হোক আর বোঁচা মুখই হোক—তাঁরা ত আর আর্টিষ্টের চোখ দিয়ে দেখবেন না, তাঁরা দেখবেন স্নেহের চোখ দিয়ে—

বল্লুম—তাহলে বৌদিদিরও ওই সঙ্গে—

বল্লে—না ভাই, ও হাঙ্গাম আর কোরো না, সারা সকাল তাহলে শাড়ী পরতে আর সাজ করতেই যাবে—আমাকে না খেয়েই আফিসে আসতে হবে।

যাবার রাতে ষ্টেশনে সুরেশ দুটো ঝুনো নারকেল, এক হাঁড়ি সন্দেশ ও একটা গরদের জোড় দিয়ে গেল। বল্লে, ভাই, বলিস, যাবার বড় ইচ্ছে কিন্তু আফিসের ছুটি নেই,—আর ফটোগুলি নিশ্চয় দিবি।

কাশীতে এসে একদিন বিকেলে সুরেশের দাদামশাইয়ের বাড়ীর সন্ধানে চল্লুম। গলির পর গলি, তার ভেতর গলি, এ যে বিশ কোটো—দুধারে বাড়ীগুলো ঝুঁকে পড়েছে—অনেক ঘুরে খুঁজে বাড়ী বার করা গেল। তে-তলায় তাঁরা থাকেন—উঁচু উঁচু পাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে তে-তলায় মোটা কাঠের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকলুম—দাদামশাই !

তলা থেকে বিধবা বুড়ীর দল চেঁচিয়ে বল্লেন, চলে যাও বাবা, ভেতরে চলে যাও।

দরজা খুলে ঢুকে সামনে ছোট ছাদ, তার ডাইনে গলির দিকে দুখানি ছোট ঘর—রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর ; আর বাঁদিকে দুখানা বড় ঘর শোবার ; একটিতে দাদামশাই তাঁর যৌবনে-পড়া বইয়ের রাশির আলমারী-ঘেরা হয়ে স্মৃতির রাজ্যে বাস করেন, আর একটিতে দিদিমা তাঁর গুরুর ছবি, গঙ্গাজলের ঘড়া, রামায়ণ-পুরাণের বই নিয়ে ধর্ম্মচর্চ্চা করেন।

ছাদে গিয়ে ডাকলুম—দাদামশাই !

—কে বাবা, কে ? এসো ঘরে।

ঘরের দরজা পেরিয়ে দাঁড়ালুম। মেজেতে মাদুরের ওপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে শুয়ে একটি বৃদ্ধ একটা খাতা খুলে কি পড়ছেন, পাকা আমটির মত মুখখানি, মাথায় ছোট টাক ঘিরে সাদা চুল বরফের ফেনার মত।

—দাদামশাই, আমি সুরেশের বন্ধু।

—কে বাবা ? বৃদ্ধ অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন, যেন কিছু বুঝতে পারছেন না !

চেঁচিয়ে বল্লাম,—আমি সুরেশের বন্ধু ! আপনাদের সঙ্গে—

সহসা বৃদ্ধের সমস্ত শরীর আবেগে আনন্দে কেঁপে উঠল, যেন কোন্ বৃদ্ধ বট ঝড়ের বাতাসে দুল্‌লো ! মোটা কালো ভ্রূর নীচে নিষ্প্রভ চোখদু'টি তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের

মত ছিল, হঠাৎ যেন ধোঁওয়ার আবরণ সরিয়ে অগ্নিশিখা নেচে জ্বলে উঠল। কতশত গ্রন্থপাঠ-ক্ষীণ কত দিনের কত আলোক কত জনস্রোত-দেখা শীর্ণ সেই চোখদু'টির চমকে-ওঠার দীপ্তিতে, আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হতেই,—সুরো, আমার সুরো—বলে তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, পাশের লাঠিটা তুলে তাতে ভর করে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে আধেক উঠে আমায় আলিঙ্গন করলে এলেন, পাকা আমের মত মুখখানি বুঝি রসে ফেটে পড়ে!

তাড়াতাড়ি বুড়োকে জড়িয়ে ধরে বসালুম, বুঝলুম বুড়ো বাতে পঙ্গু, তবে নাতির নাম শুনে সব পঙ্গুতা বুঝি চলে যায়! দাদামশাই বসে হাঁপাতে লাগলেন, আমার দিকে আনন্দ-দৃষ্টিতে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওগো, সুরো এসেছে, দেখে যাও!

ইচ্ছে হল বলি, আমি সুরেশ নই, তার বন্ধু। কিন্তু বুড়োর দীপ্ত-ভাব দেখে তা আর মুখে এল না।

দিদিমা পাশের ঘর থেকে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন। লাল পাড় তসরের শাড়ী-পরা তপ্তকাঞ্চনবর্ণের সেই বৃদ্ধার শুদ্ধ মূর্ত্তি স্বপ্নের মত লাগলো, শণের মত সাদা চুলের মাঝে সিঁদুরের টান যেন ছাইয়ের উপর অঙ্গার জ্বলছে। সুরেশ বলে দিয়েছিল, দেখিস দিদিমাকে পায়ে ছুঁয়ে প্রণাম করিস না, কেন বুড়ীকে আবার গঙ্গাস্নান করাবি! কিন্তু দাদামশাইয়ের উত্তেজনা, দিদিমার সেই তপঃ-ক্লিষ্ট অগ্নির আভার মত রূপ দেখে আমি তা ভুলে গেলুম। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে উঠতেই তিনি আমায় বুকে টেনে নিলেন, আয়, দাদা আয়! বুঝলুম, সে সন্ধ্যায় বুড়ীর ভাগ্যে গঙ্গাস্নান লেখা, আমি কি করে খণ্ডাবো! গরদের জোড় তাঁর পায়ের কাছে রেখে বল্লুম, আমি সুরেশের বন্ধু, নরেন।

ছানি-কাটা ডান চোখের ওপর চশমার মোটা কাঁচ দিয়ে আমার দিকে সস্নেহভাবে চেয়ে আমার চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেয়ে তিনি গরদের জোড়টি তুলে নিলেন। দেখি, দাদামশাই জ্বলজ্বল্ চোখে আমাদের দিকে চেয়ে। গরদের জোড় তাঁকে দেখিয়ে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দিদিমা বল্লেন, সুরো তোমার জন্যে কাপড় পাঠিয়েছে।

দাদামশাই হেসে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, সুরোটার এতদিনে সময় হল।

দিদিমা মুচকে হেসে বল্লেন, ও সুরো নয়, সুরোর বন্ধু নরেন।

দাদামশাই একটা হুঁ করে স্থির হয়ে বসলেন, যেন ভুলটা ভাঙ্গাতে চান না! দিদিমা কাপড়, সন্দেশের হাঁড়ি, নারকেল নিয়ে অন্তর্হিত হলে দাদামশাই হেসে বল্লেন, দেখ বাবা বরেন—

বল্লুম—আমার নাম নরেন—

একটু দীপ্তভাবে তিনি বলে উঠলেন, বুড়ো মানুষ, মনে থাকে না। তুমি আমার সুরেশের বন্ধু ত! কি করি বসে বসে এই ট্রিগনমেট্রির problems সব solve করছিলুম—

ষাট বছর পূর্ব্বে কলেজে যে সব আঁক কষেছিলেন, কখনও বা সেই সব আঁক-ভরা খাতা পড়ছেন, কখনও পুরানো আঁক আবার কষছেন।

বই-এর তিন আলমারি-ভরা ঘরখানির দিকে চেয়ে বল্লুম, দাদামশাই, এত বয়সেও খুব পড়াশোনা আছে ত! বল্লেন, এই বই বাঁচিয়ে রেখেছে বাবা। বাতে পঙ্গু, গঙ্গাস্নান করতে যেতেও পারি না, বিশ্বনাথ দেখতে যেতেও পারি না, তোমার দিদিমা বোধ হয় সেই জন্যেই দু'বার করে গঙ্গাস্নান করতে যান। দেখো বাবা, স্কটের ওয়েভারলি নভেলের প্রথম সংস্করণ, আর এই যে সেক্সপিয়ারের "টেম্পেষ্ট" দেখছো, রিচার্ডসনের নোট পাশে লেখা

রয়েছে,—আহা, কি, সাহেব ছিলো রিচার্ডসন ! আজকাল আর ও-রকম সাহেব আসে না। ঐ দেখো তাঁর ফটো—

দেওয়ালের ফটো দেখে সুরেশ ও তার ছেলেমেয়েদের যে ফটো এনেছি, তার কথা মনে পড়লো।

বল্লুম, দাদামশাই, আপনার নাতির ফটো এনেছি যে।

উৎসাহের সহিত তিনি বল্লেন, কৈ, দেখি, দাদাকে দেখি।

ফটো দিতে দিদিমাও এসে জুটলেন, বুড়ো-বুড়ী ফটোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

—ওমা, এত বড় হয়েছে সুরেশ।

—সুন্দর চেহারা !

—তা সুরেশ একবার বুড়ো-বুড়ীদের দেখতে আসবে না ?

—চোখে আবার চশমা ! আমি এত বড় হলুম, চশমা নিতে হয়েছে ?

দিদিমা চশমা খুলে কাপড়ে মুছতে লাগলেন। চশমার কাঁচ মুছে কি হবে, চোখ যে জলে ভেজা !

দ্বিতীয় ফটোখানি বের করে বল্লুম, দিদিমা, এই সুরেশের ছেলেমেয়েরা—

প্রদৌহিত্র-প্রদৌহিত্রীদের ফটোটি দাদামশাই আমার হাত হতে ছিনিয়ে নিলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ দিদিমা সেটি তাঁর হাত থেকে টেনে নিলেন। দু'জনের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ! দিদিমা ধমকে বলে উঠলেন, দেখাচ্ছি, রোসো না। তুমি কি চিনবে ? তার পর আর একবার চশমার কাঁচ মুছে, ফটোটী দাদামশাই-এর সামনে ধরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, এই দেখো, এইটি নক্ষত্র, আট বছর বয়স, eight ক্লাশে পড়ে, ক্লাশে ফার্ষ্ট হয়, অঙ্কেতে একশ' পেয়েছে,—এই হচ্ছে অনিলকুমার, কি মিষ্টি মুখখানি—এই হচ্ছে বুড়, আর এই মায়া—

দাদামশাই বলে উঠলেন, তুমি কি করে জানলে ? দেখেছ এদের ?

দিদিমা বলে উঠলেন, জানি গো, আমি জানি। এ কি পুরুষমানুষের চোখ ! আমরা দেখলেই ধরতে পারি। হাঁ বাবা, বলতো আমি ঠিক বলেছি কি না।

কার কি নাম আমি তা কিছুই জানতুম না। বল্লুম, আপনি ঠিকই বলেছেন। দিদিমার মুখ আরও দীপ্ত প্রফুল্ল হয়ে উঠল। দাদামশাই-এর চোখে দেখি, চোখের জলে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, আর ফটোর প্রদৌহিত্র-প্রদৌহিত্রীরদের কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরবার অদম্য আবেগ দমন করতে না পেরে দিদিমা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বিদায় নেবার সময় দিদিমা বল্লেন, বাবা, পরশুদিন দুপুরে আমার এখানে খাবে।

দাদামশাই কিন্তু কিছুই বল্লেন না, গম্ভীর হয়ে রইলেন। বুঝলুম, নিমন্ত্রণের প্রস্তাবে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন।

বল্লুম, কেন দিদিমা আপনি কষ্ট করবেন ?

বল্লেন, আমি কোন ওজর শুনতে চাই না। তুমি সুরোর বন্ধু।

বুড়ী নাছোড়বান্দা।

দুপুর বারোটা নাগদ নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম। ঘরে ঢুকতেই দাদামশাই হেঁকে বল্লেন, দেখ দেখি ভাই, কি কাণ্ড ! ভোর চারটে থেকে রান্না সুরু হয়েছে, এখনও শেষ হল না ! আজ তুমি খেতেই পাবে কি না জানি না—না,—বল্লুম, মাছ করার দরকার নেই ! বলে, আমি সধবা মানুষ, আমরা না হয় গুরুর আদেশে মাছ খাই না, তা বলে ও ছেলেমানুষ,

খাবে না ? সুরো যে মাছ না হলে এক-গরাস্ ভাত খেতে পারতো না ! কি বলি, বলো ?' তা আবার রাঁধবার জন্যে আলাদা উনুন হয়েছে ছাদের কোণে—

রান্নার জায়গায় গিয়ে বল্লুম, দিদিমা এ-সব কি কাণ্ড ! এমন জানলে আমি কখনো খেতে আসতুম না ।

দিদিমা প্রদীপ্তভাবে আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে সুরো, বকিসনি, আমার হাতের রান্না কতদিন খাস্নি, বল্ দেখি !

দিদিমা রান্নায় এত মত্ত যে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছেন ! সত্তর বছরের বুড়ীর আজ কাজেতে কি উদ্যম, খাটবার কি উৎসাহ !

হেসে বল্লুম, দিদিমা, যা হয়েছে, দিন । বড় ক্ষিধে পেয়েছে ।

বল্লেন, রোসো দাদা, এই পোলাওটা চড়িয়েছি, এটা হলেই হয়ে যায় ।

ঘরে ঢুকে দেখি, একদিকে পুরাতন কার্পেটের আসন পাতা হয়েছে, তার সামনে রূপোর থালা বাটি গেলাস ইত্যাদি সাজানো । এ রূপোর বাসন দাদামশাইয়ের বিবাহের যৌতুক ! নাতিকে খাওয়াবার জন্যে কত বছর পরে বার হয়েছে !

কিন্তু এর পরেই একটা বিষম কাণ্ড ঘটল । দিদিমা পোলওর ডেক্চি নামিয়ে ঘরে এলেন, কপোল দিয়ে ঘাম ঝরচে । বড় সিন্দুক খুলে কি নিতে গেলেন ; সিন্দুকের ডালাটা খুলে আর ধরতে পারলেন না, ডালাটা সশব্দে পড়ে গেল, তিনিও অর্দ্ধমূর্চ্ছিতভাবে টলে পড়লেন ; ভাগ্যিস আমি কাছে ছিলুম ! তাঁকে ধরে মেজেতে শুইয়ে দিলুম । দাদামশাই, কি হল, হায় হায়, বলে ছেলের মত কেঁদে উঠলেন । আমি তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে জল দিয়ে বাতাস করাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে সুস্থ হয়ে দিদিমা আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, ভয় নেই বাবা, আমি ঠিক আছি, শক্ত হাড় ।

দাদামশাই বলে উঠলেন, কাল সারাদিন উপোস গেছে, আজ এখনও জলগ্রহণ হয়নি—এই বয়সে—

আমি বড় অপ্রস্তুত লজ্জিত বোধ করলুম । গম্ভীর স্বরে বল্লুম, দিদিমা, আপনি যদি এখন কিছু না খান ত আমিও জলস্পর্শ করবো না, বলছি—

—কি বলছিস, সুরো ? বলে তিনি মৃদু হাসলেন । বার্দ্ধক্য-কুঞ্চিত ঠোঁটের ভেতর ভাঙা দাঁতের সে হাসি বড় সুন্দর লাগলো । বল্লুম, আপনাকে এখন কিছু খেতে হবে, তা না হলে আমিও খাবো না ।

দিদিমা ধীরে উঠে বসলেন, হেসে বল্লেন, তুই নাতি, তোর হাতে খেতে দোষ নেই, এক গেলাস জল নিয়ে আয় ।

দাদামশাই বল্লেন, দেখ দাদা, ওই ওখানে মিষ্টি চাপা দেওয়া আছে ।

মিষ্টি ও জল এনে দিলুম । দাদামশাই অবাক হয়ে দেখলেন, সমস্ত পাড়া সন্ধ্যেবেলা অবাক হয়ে শুনলো, দিদিমা দ্বিতীয়বার গঙ্গাস্নান করার আগে আমার ছোঁয়া খাবার ও জল খেয়েছেন ! সেদিন শুধু নাতিকে খাওয়ানোর আনন্দ নয়, নাতির হাতে খাওয়ার সুখও তিনি বোধ হয় কামনা করেছিলেন ।

খাবার খেয়ে দিদিমা আবার রান্নাঘরে গেলেন, আমাদের বারণ মানলেন না । বুঝলুম বৃথা চেষ্টা । দাদামশাই-এর সঙ্গে রিচার্ডসন সাহেবের গল্প আর জমল না, রান্নাঘরের দিকে চোখ রেখে বসে থাকতে হল ।

দু'টোর সময় খেতে বসা গেল । বুড়ো-বুড়ী কি আদর করেই খাওয়ালে । আর বুড়ী

রেঁধেছিলো চমৎকার ! পাকা হাত, তবে মাছের কালিয়াতে নুন দিতে ভুল ।

—দাদা, আর একটু পোলাও ।

—না দিদিমা, রান্না হয়েছে চমৎকার, তবে পেটে তো আর জায়গা নেই ।

—তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের বয়সে—

—জানো দাদা, একবার তোমার দাদামশাই—আমি তখন নতুন বৌ হয়ে এসেছি,—তোমার দাদামশাই বাড়ীতে ভরাপেট খেয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছেন, বৈঠকখানায় তাসের আড্ডায় খাবার খাওয়ার বাজি হচ্ছে, কে এখন ভরা পেটে চার সের রসগোল্লা খেতে পারে ? তোমার দাদামশাই বল্লেন, আমি খাবো । অন্দরমহলে আমরা শুনে ভয়ে বুক দুরু-দুরু, অথচ ও জেদি মানুষকে কে ঠেকাবে ? বড় বাবুরা সব আফিসে—মা ত দুর্গা নাম জপতে আরম্ভ করলেন—

দাদামশাই হেসে বলে উঠলেন, তা খেয়েছিলুম ত বাপু, কি হয়েছিল ?

—দাদা, আর একটু পোলাও । সুরো পোলাও বড় ভালবাসে ! বাড়ীতে যদি কোন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করলে ত পোলাও রান্না তার চাই-ই । ওই বড়ির অম্বলটুকু যে পড়ে রইল, সুরো বড়ির অম্বল কি ভালোবাসে—

শুক্তো হতে বেগুণ ভাজা, চচ্চড়ি, মাছের কালিয়া ইত্যাদি কোনটাই সুরোর ভালবাসার তালিকা হতে বাদ গেল না ।

—জানো বাবা, গেল বছর চিঠি পেলুম সুরো আসবে, তাই সাধ করে বড়ি দিয়েছিলুম, সুরো বড়ির অম্বল বড় ভালোবাসে—তা ওই বড়ি সুরোর জন্যেই তোলা রয়েছে ।

—দিদিমা, পায়েসটি হয়েছে যেন অমৃত, সত্যই পরমান্ন !

দিদিমার চোখে জল ভরে এল ।

খাওয়া শেষ হলে দিদিমা দু' শিশি বড়ি, দু' শিশি আমের আচার, দু' শিশি কাসুন্দি এনে বল্লেন, এ সব সুরোর নাম করে গেল বছর করেছিলুম, তাকে তুমি দিও দাদা ।

ভেবেছিলুম, বলবেন, প্রত্যেক জিনিষ আমার জন্যে এক শিশি আর সুরোর জন্যে এক শিশি ! কিন্তু ছ' শিশি সুরোর বৌকে দেবার হুকুম হল, আমার কথা আর মনেই পড়ল না ।

কাশী ছাড়বার আগের দিন রাত্তির বেলা বুড়ো-বুড়ীকে দেখতে গেলুম । জ্যোৎস্না রাত, ঘরের ভেতর দরজার কাছে তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে দাদামশাই শুয়ে আর বাইরে দিদিমা মেজেতে বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন । ওটা বোধ হয় জন্ম গত অভ্যাস হয়ে গেছে ! দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, দাদামশাই-এর বয়স তখন ছিল আঠারো—আর আমি যখন গেছলুম, তখন তাঁর বয়স হবে আটাত্তর, দীর্ঘ ষাট বছর জীবনের সুখে-দুঃখে তাঁরা একসঙ্গে চলে এসেছেন ।

চুপ চুপি ছাদে উঠলুম, বুড়ো-বুড়ীতে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল ।

—হ্যাঁগা, সুরোর বড় ছেলেটির নাম কি— ? মনে পড়ছে না ।

—তোমার কার নাম মনে থাকে ! নক্ষত্রকুমার, সে ত আট বছরের, eighth ক্লাসে পড়ে, ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়, অঙ্কতে একশ' পেয়েছে ।

—তা কি বলে, জানো ? নাতবৌ যে সেদিন চিঠিতে লিখেছে, সে বলে ওই যে উড়োজাহাজ হয়েছে না, তাতে করে বিলেতে যাবে । উড়ো-জাহাজ কি গা ?

—উড়ো জাহাজ গো । এই-জাহাজ যেমন জলে যায় না, ও তেম্নি আকাশ দিয়ে উড়ে যায়—

—তা তোমার বই-টইতে তার একখানা ছবি নেই ? দেখতুম।

—আমার বই সব যে সেকেলে। এই ভাবো না, যেমন একটা বড় জাহাজ—কলকাতার গঙ্গার ঘাটে জাহাজ দেখেছ ত ?

—বুঝেছি। ঐ পুষ্পক-রথ আর কি, যাতে করে রামচন্দর এসেছিলেন। শাস্ত্রে কি না আছে ?

—দেখো, ওই সুরোর বন্ধু বরেন ছেলেটি বেশ।

—বরেন নয়গো, নরেন।

—আমার সব নাম মনে থাকে না। হাঁ, নরেন।

বুঝলুম, এখন হতে বুড়োবুড়ীদের প্রতিদিনের সান্ধ্যসভায় তাঁদের নাতি-নাতনির ছেলেদের সঙ্গে আলোচনায় আনন্দ-লাভের আমিও একটি বিষয় হয়ে রইলুম। চেঁচিয়ে বল্লুম—এই যে আমি।

—হাঁ দাদা, তোমার কথাই হচ্ছিল। এসো দাদা, এসো।

বিদায় নেবার সময় বুড়ো-বুড়ীর কি কান্না ! আমিও কাঁদতে লাগলুম, যেন সত্যই আমি তাঁদের নাতি সুরো !

হাঁ, তাঁরা এখন বেঁচে আছেন। হাঁ, এবার যদি কাশী যাওয়া হয়, নিশ্চয় দেখা করবো। কি বল্লে ? আঙুলের নখগুলো বড় বড় হয়েছে— ? তোমার কেটে দেবার একটু সময়ও হয় না।

আমার কি মনে হচ্ছে, জানো ? কি জানি, মনটা বড় কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছে ! হয়ত তা শরৎ-রাতের মায়া—ভাবছি, আমরাও ত একদিন অম্নি বুড়োবুড়ী হবো ! আমার এ পায়ে ধরবে বাত, কিন্তু তোমার কল্যাণ-হস্তের পাখার হাওয়া চিরদিনই পাবো—আমার মাথা জুড়ে পড়বে টাক, আর তোমার কালো চুল চাঁদের আলোর মত সাদা হবে, তাতে জ্বল্‌জ্বল্ করবে সিঁদুরের টান শরৎ-প্রভাতের অরুণিমার মত—কোথায় থাকা যাবে বল দেখি ? না, কাশীতে নয়। কোথায়, জানো ? ইতালীর কোন হ্রদের ধারে, দ্রাক্ষাকুঞ্জঘেরা একটি ছোট ভিলাতে—তখন প্রতি সন্ধ্যায় অম্নি বসে গল্প করবার আমাদের অবসর হবে—তখন তোমার নাতি-নাতনীরা এরোপ্লেনে চড়ে পুজোর ছুটিতে তোমায় দেখতে যাবে—এম্নি জীবন-ধারা চলেছে ! আজ আমরা যুবা, প্রাণ-ভরা আশার স্বপ্নে মাতোয়ারা, চল্লিশ বছর পরে আমরা বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, বাতে পঙ্গু, আমরা নিজেদের জীবনে নয়, নাতি-নাতনীদের জীবনের স্বপ্নে বাঁচবো—আর পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে আমরা নেই—

ও কি ! কাঁদছ ? তোমার ও জল-ভরা টলটলে চোখদু'টি বড় মিষ্টি দেখাচ্ছে। কি বলছ, "তোমার কোলে মাথা রেখে এম্নি যেন—" আমার কোলেই ত তোমার মাথা রয়েছে।

ওগো, খুকী বুঝি কেঁদে উঠলো।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

তার পর

আকাশে মেঘ করিয়া আসিল দেখিয়া আর বাহির হইলাম না। এই আসন্ন দৃষ্টি প্রদোষকালে আমার ঘরে আসিয়া যদি দক্ষিণের খোলা দুয়ার দিয়া ক্ষণকালের জন্য বাহিরে তাকালে, দেখিবে কে একটি মমতাময়ী বন্ধু একটি শ্যামল সঙ্কেত প্রসারিত করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে অজস্র ভালোবাসার মত বৃষ্টিধারা নামিয়া পড়িবে, ধানক্ষেতগুলি প্রেয়সীর গভীর ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টির মত সুশীতল ও স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হাত পা নাড়িতে ইচ্ছা করে না, একটা যে সিগারেট ধরাইব দেহে ততটুকু চাঞ্চল্যও যেন সহিবে না, ইজি-চেয়ারটায় পড়িয়া বাহিরে চাহিয়া আছি। স্তিমিত মেদুর প্রদোষালোক কৈশোরের অস্পষ্ট রহস্য-গম্ভীর নব-অঙ্কুরিত প্রেমের মত আমাকে অতি নিঃশব্দে ঘিরিয়া ধরিতেছে।

কিন্তু না, এই আলস্যভোগ আমাকে মোটেও মানায় না। নতুন মুন্সেফ হইয়া মফঃস্বলে আসিয়াছি, রায় লিখিয়া লিখিয়া জীবন আমাকে ঝর্ঝরে করিয়া ফেলিতে হইবে, বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমিও একদা কঠিন কাঠ বনিয়া যাইব—আপাতত সে জন্যই আমাকে কোমর বাঁধিতে হইবে। তাহা ছাড়া, কলিকাতা হইতে বেকার সাহিত্যিক বন্ধুরা কি একটা highbrow কাগজ বাহির করিতেছে—তাহার জন্য আমার কাছে লেখা চাহিয়া পাঠাইয়াছে। হাতে মোটে একটা রবিবার আছে,—আজই রাত্রে শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলে শেষ রাত্রের দিকে নিশ্চিন্ত একটু ঘুম আসিতে পারে। গল্প লিখিবার মতলবটা মাথায় আসিতেই চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম, একটা সিগারেট ধরাইয়া প্লট্ ভাবিতে বসিলাম। কে একজন সাহিত্যিক নাকি বলিয়াছেন, গল্প বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহা একেবারেই প্লট্ নয়, আইডিয়া,—তাই আশ্বস্ত হইয়া তখুনিই ফাউন্টেন্ পেনে কালি ভরিয়া লইলাম। এক পেয়ালা চা খাইয়া লইলে ভাল হইত, কিন্তু শোভাকে ডাকিয়া আবার চা করিয়া খাইতে বসিলে উহার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে আসল গল্প লেখা আর হইয়া উঠিবে না। অতএব—

আলোটা নিজেই জ্বালিলাম। বিধাতা সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তাহার সমাপ্তির কথা কখনোই ভাবিয়া রাখেন নাই, তাই মহৎ জনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমিও আদ্যোপান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ শূন্য আকাশ হইতে তাহার আবির্ভাব সম্ভব হইলেও শূন্য মস্তিষ্ক হইতে ভাব-ভ্রূণের জন্মের আশা নাই,—এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া শোভাকে ডাকিতে যাইব ভাবিতেছি, আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

ভারি মিষ্ট করিয়া একটি গল্প লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে। শোভাকে আমি যেমন

ভালবাসি, তেমনি স্নেহ-সুধা নিয়া গল্পের প্রত্যেকটি ছত্র লিপ্ত করিয়া দিব। মনে হয় পৃথিবী যেন ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে আমার এই ছোট ঘরটির মধ্যে আসিয়া হারাইয়া গিয়াছে। আজিকার সন্ধ্যায় কোন নিরাশ্রয় গৃহহীন জীবিকার্জ্জনের জন্য পথে বাহির হইয়াছে এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না, পৃথিবীতে কয় কোটি লোক আয়ু ও প্রেমের জন্য তিলে তিলে আত্মহত্যা করিতেছে—তাহার খোঁজে আমার প্রয়োজন কি ? মাটির খুরির বদলে গল্পে সোণার বাটি চালাইলেই গল্পলেখক হিসাবে আমার সোণার সিংহাসন মিলিবে না এ যুক্তির কোন মানে নাই।

আমার নায়ককে ধনী করিব, মোটর কিনিবার মত অনেক পয়সা তাহার সম্প্রতি না থাকিলেও লোক-বিশেষের জন্য সে কিছু টাকা অপব্যয় করিতে পারে ; (সেদিন যেমন শোভার আব্দার রাখিতে গিয়া অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের যতগুলি বই ছাপা হইয়াছে সবগুলিই ভি.পি-তে গ্রহণ করিলাম) আমার নায়ক জীবনে প্রেম পাইবে, সে সুস্থ, সহজ, সামাজিক। সমাজের বিধি-অনুসারে, পৃথিবীর বহু কোটি অপরিচিত কিশোরীর মধ্যে যে একাকিনী মেয়েটি বিনা-দ্বিধায় তাহার প্রসারিত করতলে আপনার স্নেহস্বেদসিক্ত করতলটি উপুড় করিয়া রাখিবে—তাহার পরিচয়ে কী অসীম বিস্ময় তাহারই মধ্যে সে একটি রহস্যনিগূঢ় কবিতার আবিষ্কার করিবে। সে কাঙালের মত করুণাকণা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে না, বিবাহ তাহার কাছে শুধু বিশ্রাম নয়, নারীর অন্তর্নিষ্ঠ পাতিব্রত্যে সে বিশ্বাসবান। মোট কথা, গল্পের রজতের কথা ভাবিতে গিয়া জায়গায় জায়গায় খালি নিজেরই ফটো তুলিতেছি। শোভার কাছে গল্পটা ভালই লাগিবে। কিন্তু, যাহাই বল, নিজেকে মুছিয়া ফেলিবার মত ব্যক্তিত্ব এখনো লাভ করি নাই। শুনিয়াছি বিলিতি লেখক গল্‌সোয়ার্দি নাকি নিজের কথা মোটেই বলেন নাই ; তাঁহার মত আমি যদি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক গল্পেই তাহার বড়াই করিতাম। কিন্তু আমি ?—নেহাৎই goody-goody ভাল মানুষের মত মুন্সেফি করিতেছি।

যাহা হইক, বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরিতেই ঘড়িতে নজর পড়িল। আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ইহারি মধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিয়াছি দেখিয়া নিতান্তই আশ্চর্য্য হইলাম। দেখিতেছি সাহিত্য ও রায়ের মধ্যে আমি কোন তফাৎই রাখিতেছি না। মাসে মাসে সাহিত্যক বন্ধুদের কাগজের স্থায়িত্বের জন্য চাঁদা দিব বলিয়াই যদি গল্পটা অমনোনীত না হয়—তাহার মধ্যে কোন আত্মপ্রসাদ নাই। যাহা হউক আবার কলম ধরিলাম।

শোভা হাতে একটা কাঁসার বাটি লইয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া সব গোলমাল করিয়া দিল। শোভা আজ নতুন মাংস রাঁধিতেছে—তাই আমার ধ্যান ভাঙিবার মত পর্য্যাপ্ত সময় তাহার হাতে ছিল না। একটা উত্তপ্ত মাংসখণ্ড দুইটি সুকোমল আঙুলে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে শোভা বলিল—দয়া করে জিভ্‌টা বার কর ত, টুপ্ ক'রে ফেলে দি, চেখে দেখ ত, পেটের ভেতর নেবার উপযুক্ত হয়েছে কি না—

মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলাম—এখন আমাকে বিরক্ত করতে এস না শোভা। রান্না-ঘরে গিয়ে নিজেই চাখ' গে।

একটু অপ্রতিভ হইয়া শোভা আমার টেবিলের কাছে এত নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল যে তাহার খোলা চুলগুলি দুই মুঠিতে ধরিয়া ফেলিলাম। শোভা চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া বলিল—গল্প লিখ্‌ছ ? খুব ভাল কথা,—কিন্তু খবরদার, কারো থেকে টুকো না যেন। এমন গল্প লেখা চাই যা পড়লে মনে হবে মুহুর্ত্তমধ্যে বড়ো হ'য়ে গেছি। বলিয়াই

নির্লিপ্তের মত মাংস তুলিয়া তুলিয়া চিবাইতে চিবাইতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকালের যেন কঠিন মাটির উপর নামিয়া আসিয়াছিলাম,—আবার অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অন্ধকারে রাত্রিতে আকাশ ভাঙ্গিয়া যিনি তারার পর তারার স্ফুলিঙ্গ ফোটান আমি তাঁহারই সমকক্ষ,—কল্পনার প্রশস্ত রাজপথে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়া গেল ; দুইজনে কালসমুদ্রের কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যেন মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আর কোন বন্ধন নাই,—হৃদয়ে যাহার স্পর্শ লাভ করিয়া অন্তরে-বাহিরে সুশোভন হইলাম সেই শোভাকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি। শুধু মহাকাল আমার সঙ্গী—সুদূর বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ। আমি যে মুন্সেফি করিতে একটা জংলি জায়গায় আসিয়া রোজ সকালে কুইনিন্ খাইতেছি, কে বলিবে ; মাহিয়ানার আশায় মাসের প্রথম তারিখটির সঙ্গে যে আমি প্রেমে পড়িয়াছি আমাকে দেখিয়া তাহা জানিয়া ফেলে কাহার সাধ্য ? শত সূর্য্যের মহিমা-মুকুট আমার শিরোভূষণ,—লেখনী আমার নবেন্দুলেখা,—অমাবস্যার তিমিরলিপ্ত আকাশ আমার পাণ্ডুলিপি ! আর কথা-বস্তু ? এই সৃষ্টির হৃদয়পদ্ম—প্রেম !

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে,—তবু লিখিয়া চলিয়াছি ; এইরূপ মহৎ উত্তেজনার মধ্য দিয়া রাত্রি প্রভাত হইবে ভাবিতে শরীরটা বীণার তারের মত বাজিতেছে, বাজিতেছে। মনে হয়, আমার হৃদয়ের ভাষা শুনিবার জন্য নিশীথিনী কাণ পাতিয়া আছে, শোভার মত সে ঘুমাইয়া পড়ে নাই। প্রতিটি মুহূর্ত্তের লঘু অস্ফুট পদধ্বনি শুনিতেছি, আকাশের তারাগুলি যেন প্রতিটি অক্ষরের বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া দিতেছে,—কী অপরিমেয় সীমাশূন্যতা ! আশ্চর্য,—আমি আকাশচারী দেহহীন প্রাণ—যেন শেলির অস্তিত্বহীন ভাবময় স্কাইলার্ক ; শোভার সুকোমল পরশ-উত্তপ্ত সুখশয্যা আমার লোভনীয় নয়—শোভা ত শুধু একটি নম্র তুলসীমঞ্জরীর মত বাঙালি মেয়ে, ক্ষীণা, সচকিতা ভীরু হরিণী।

হঠাৎ পেছন হইতে সে চোখ টিপিয়া ধরিল। চম্‌কাইলাম বটে, কিন্তু চিনিলাম। তবু প্রশ্ন করিলাম—কে ?

নম্র কণ্ঠে উত্তর হইল—তোমার সাহিত্যলক্ষ্মী...আর্ট !

চোখের পাতার উপরে শোভার নরম ক্রমক্ষীণায়মান আঙুলগুলির স্পর্শ লইতে লাগিলাম। শোভা কাঁধের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধ করি লেখাটাই দেখিতেছিল, হঠাৎ আমার হাত হইতে কলমটা টানিয়া লইয়া চোখ ছাড়িয়া লেখার নীচে একটা সমাপ্তির রেখা টানিয়া দিতেই অসহায়ের মত বলিয়া উঠিলাম—এখনো যে শেষ হয় নি।

শোভা অভিভাবিকার মত মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল—রাত শেষ হ'য়ে এল, এখনো তোমার লেখা শেষ হয়নি ? স্বাস্থ্যটাকেও শেষ করতে চাও না কি ?

কোনো দিন এমন কথা বলি নাই, কিন্তু আজ বলিলাম—ছাই স্বাস্থ্য, ছাই আয়ু, ছাই তোমার বৈধব্য-ভয়,—একটা মহান্ সৃষ্টির কাছে—

শোভা বলিল—তা হ'লেই হয়েছে। নরোয়েজিয়ান্ সাহিত্য'র মত গল্পটাকে তা হ'লে নিতান্তই সেন্টিমেন্টাল্ করে' তুলেছ ! পড় ত, শুনি, কেমন হয়েছে। বলিয়াই শোভা ইজি-চেয়ারটায় বসিল, গা এলাইয়া দিল না।

বলিলাম—সাহিত্যলক্ষ্মী সাম্‌নে চোখ রাঙিয়ে বসে' থাক্‌লে কি করে চলে ? আর্ট ! মাথার ওপর তোমায় ঘোম্‌টা টেনে লও ! অস্পষ্টতাতেই তোমার শ্রী। কিন্তু আমার আর দেরি নেই, একটা প্যারা লিখে ফেল্‌তে পেলেই ইতি। তুমি যেখানে লাইন টেনে শেষ করে' দিয়েছিলে সেখানে থেমে গেলেও চল্‌ত। কিন্তু তখনো sentenceটা শেষ

হয়নি,—'তারপর' লিখে শুধু একটা ড্যাস দিয়েছিলাম। ওখানেই থেমে গেলে তোমার অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে গল্পের শেষটার বেশ সঙ্গতি থাক্‌ত বটে, কিন্তু আমি ঐ মুদ্রাদোষ পছন্দ করি না।

যাই হোক, শোভার উপস্থিতি উপেক্ষা করিয়াই আরো কতদূর অগ্রসর হইয়া নিশ্বাস ছাড়িলাম। কাগজের আল্‌গা টুক্‌রাগুলি সব কুড়াইয়া লইয়া একটা পেপার-ক্লিপ্‌ লাগাইয়া ঘাড় দুইটা একটু shrug করিয়া বলিলাম—হ'ল শেষ, শুনবে ? কিন্তু তার আগে ল্যাম্পটাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য দয়া করে' কিছু তেল খরচ কর !

ল্যাম্পে তেল ভরিতে ভরিতে শোভা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার গল্পটাকে কি করলে ?

প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝলাম, তবু বলিলাম—তার মানে ? গল্পের পরিণতির কথা বলছ ? আমার গল্প একটা কমেডি হয়েছে—একটা,—কি বল্‌ব ?—সুরসমন্বয়,—এই সৌরসৃষ্টির মতই পূর্ণাবয়ব !

কথাটাকে যতদূর সম্ভব গৌরবব্যঞ্জক করিয়াই উচ্চারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেন যে তাহা শুনিয়া শোভা হাসিয়া হাসিয়া কুটি-কুটি হইতে লাগিল, বুঝিলাম না। মনে হইল, কে যেন মুঠি ভরিয়া কতগুলি নক্ষত্রের গুঁড়ো লইয়া ঘরের মধ্যে ছিটাইয়া দিল। আপাতত ঘরে আলো ছিল না, কান পাতিয়া থাকিলে অন্ধকারের দীর্ঘ নিশ্বাস শোনা যায়, তাহারই মধ্য হইতে শোভার কণ্ঠস্বর যেন মৃত্যুর ওপার হইতে আসিতেছে মনে হইল।

—তুমি.এই রাত জেগে গভীর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বসে' কমেডি লিখেছ ?—ঠুন্‌কো, পলকা ! প্রেমের গল্প নিশ্চয়ই ? বিধাতা আমাকে যদি শুধু দেহশোভা না করে' মূর্ত্তিমতী কবি-প্রতিভা কর্‌তেন ও দু' চোখ ভরে' এত ঘুম না দিয়ে যদি আকাশের অশ্রু দিতেন, তা হ'লে এই রাত্রে আমি একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডি লিখ্‌তাম, তোমার এস্কাইলাস্‌ পর্য্যন্ত মাথা নোয়াতেন। হার্ডি যেমন Dynasts লিখেছিলেন,—নেপোলিয়নের ব্যর্থতা,—আমিও তেমনি গান্ধির ব্যর্থতা নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ড্রামা লিখ্‌তাম। এই কথা শুনে নিশ্চয়ই এবার হাস্‌বার পালা তোমার,—না ?

হাসা উচিত ছিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে আলো ফের জ্বালা হইয়াছে দেখিয়া উদ্‌গত হাসিটা রোধ করিলাম। বলিলাম, তোমার সেই অসম্ভব ঝাল্‌ওলা মাংস খাবার আগে তুমি খানিকটা শুনে গেছ্‌লে, তার পর থেকেই সুরু করছি। মনে আছে ত' গোড়াটা ?

শোভা বলিল—আছে বৈ কি, তোমার গল্পের নায়ক আধ-কবি রজতচন্দ্র একবিংশ শতাব্দীর একটি unreal মেয়ের সঙ্গে প্রেমের এরোপ্লেন্‌ চালিয়াছে—এই ত ? কি নাম জানি মেয়েটির ? অরুন্ধতী !—খাসা নাম।

শোভার কথা উপেক্ষা করিয়াই অগ্রসর হইলাম,—শ্রোতার এখানে কোনো ব্যক্তিগত সার্থকতা নাই, শোভা একটা উপলক্ষ মাত্র,—নিজেকেই যেন শোনাইতেছি এমনি ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

"পার্টি শেষ হয়ে গেছে,—ঘর প্রায় শূন্য। পদ্মের কুঁড়ির সঙ্গে পোড়া সিগারেটের টুক্‌রো সতরঞ্চির ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। রজত এখনো বাড়ি যায়নি,—কোথায়ই বা যাবে ?—একটা কৌচের ওপর হেলান্‌ দিয়ে পড়ে' ছিল।

অরুন্ধতী শাড়ি বদলে এল,—রাতের ঘনায়মান অন্ধকারের সঙ্গে কোমল নীলাম্বরীটি কবিতার একটা ভালো মিলের মতো ভারি সুন্দর খাপ খেয়েছে। খোঁপায় আর পদ্মকলিকা

গোঁজা নয়, অনাড়ম্বর একটি রজনীগন্ধা,—স্নিগ্ধ অন্ধকারে যার গুণ্ঠনোন্মোচন। অরুন্ধতী বল্‌লে জানি, তুমি এখনো যাওনি, কিন্তু যেতে ত তোমাকে হবে-ই।

রজত চঞ্চল হ'ল না ক্লান্ত সুরে বল্‌লে—তবু এই উৎসবাবসানের পরে এই নিঃশব্দতার মধ্যে একটু বিশ্রাম কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।

অরুন্ধতী আর একটা সোফায় বসে' পড়ে' যেন একটু বিরক্ত হ'য়েই বল্‌লে—এইখেনেই তোমার সঙ্গে আমার মেলে না। আধুনিকতা মানে বিশ্রাম নয়, স্পীড, ভেদ করে' চলে' যাবার মতো একটা দুর্দ্ধর্ষ বেগ। তুমি এমন ভীতু যে একটা সিগ্রেট পর্য্যন্ত খাও না,—তুমি একটা কী!

রজত কিছু একটা বল্‌তে যাবার আগেই অরুন্ধতী ফের বল্‌লে—জান আমি কী? আমি একটা আকারহীন নীহারিকা, এখনো রূপ নিতে পাচ্ছি না। কেউ দিতে চায় পৌরুষ, কেউ ঐশ্বর্য্য,—আর তুমি?

অল্প একটু হেসে রজত বল্লে—হৃদয়।

—হৃদয়? The grand piano? যে monoplane-এ আমি ছুটেছি, সেখানে হৃদয় নামক লাগেজটিরো স্থান-সঙ্কুলান্ হয় না। অতএব ওসবে হবে না রজত। Be a man!

অরুন্ধতীই ফের বল্‌লে—অম্‌নি বুঝি অভিমানে মুখ ভার কর্‌লে, অমনি বুঝি একটা ব্যর্থ প্রেমের নতুন কবিতা লেখ্‌বার জন্য মনে মনে লাইন কুড়োচ্ছে। দাঁড়াও পিয়ানোটা বাজাই। (পিয়ানোতে বসিয়া) কি বাজাচ্ছি বল ত? সেই যে—

What my lips can't say for me
My finger-tips will play for me.

আচ্ছা, এখন ঘরে 'ত' কেউ নেই, সব নীচে খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত, তুমি ইতিমধ্যে নেহাৎ ভালো মানুষটির মতো আমাকে চুমু খেতে পারো? ধর, আমি 'কেস্' কর্‌ব না,—পারো? আমি ত ইথাকার রাজপ্রাসাদে বন্দিনী পেনিলোপ, তুমি ইউলিসিসের মত আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পার শত পাণিপ্রার্থীর বূহ্যভেদ করে'? উত্তর দাও, রজত!"

ইজি-চেয়ারের প্রান্ত হইতে শাড়িটা খস্‌খস্ করিয়া উঠিতেই বুঝিলাম কি-একটা প্রতিবাদ করিবার জন্য শোভা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—সস্তা সমালোচনার কসরৎ দেখাতে আগে থেকেই ক্ষেপে যেও না,—পথ বা পাথেয়র চেয়ে গন্তব্য স্থানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর।

শোভা বলিল—আর কিছু না, একটু ঝিমুচ্ছি। যদি দয়া করে সঙ্ক্ষেপে সারো ত তোমার বেচারী সাহিত্যলক্ষ্মীর আর মশার কামড় সইতে হয় না। বিছানায় শুলে আমি কক্ষনো তোমার ঐ অরুন্ধতীর মতো বেয়াড়া প্রশ্ন করব না। রজতের মতো তোমার নার্ভস্ হবার কারণ নেই।

শোভার সকল টিপ্পনিই উপেক্ষণীয়, স্বামীর চাকুরী হইয়াছে দেখিয়া ও বেশ একটু ফাজিল হইয়া উঠিয়াছে, তাই আর একটা সিগারেট ধরাইয়া পাতা উল্টাইলাম:

"বাড়ী ফিরে এসে রজতের ইচ্ছা হয় বই খুলে বসে' রুপার্ট ব্রুকের সনেটগুলি ফের পড়ে' ফেলে,—হাতে কোনো কাজ নেই; কিম্বা ডাউসনের মত একটা langorous কবিতা লিখলেও মন্দ হয় না। অরুন্ধতীকে ও কিছুতেই ধর্‌তে পারে না, যেন প্রতিপদের চন্দ্রের ক্ষীণায়ু হাসিটি,—অরুন্ধতীই শেলির ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল বিউটি, ইয়েট্‌সের ছায়াময়ী প্রকৃতি,—এক কথায় Psyche এক যুবক কীট্‌সের। রজত বোঝে, অথচ বোঝা নামাতে

পারে না, দুই হাত পেতে মুক্তি ভিক্ষা করতে এসে সেই দুই হাত দিয়েই আঁক্‌ড়ে ধরতে চায়।"

শোভা আবার বাধা দিল, কহিল—মোটকথা, তোমার নায়কটি একটি মেরুদণ্ডহীন য়্যুনিমিক্‌—এক কথায় যাকে বলে ইডিয়ট্‌। অরুন্ধতী যে প্যাঁজের খোসা ছাড়ায়, কেরাসিন তেলে আঙুল ডুবিয়ে ল্যাম্প জ্বালে, ওর দেহটা যে একটা বীণাযন্ত্র না হ'য়ে শুধু যন্ত্র—এ বুঝি উনি বিশ্বাসই করতে চান্‌ না। তুমি এলিজাবেথান্‌ যুগে জন্মে' কেন সনেট রচনা করলে না?—নাম থাকত। By the by, কমেডিটা কোথায়? অরুন্ধতীর সঙ্গে রজতের বিয়ে দিলে? বলিহারি!

বলিলাম,—তা নয়; আচ্ছা বাদ দিয়েই পড়ছি—যদি দয়া ক'রে তোমার কাব্যি-করা ভাষাটা ছেড়ে মুখে মুখেই গল্পটা সারো তা হ'লে বসে'-বসে' না ঘামিয়ে আরো একটু ঘুমুনো যায়।

অসম্ভব। সুর চড়াইয়া দিলাম।

"***কিন্তু অরুন্ধতী যদি এম্‌নিই অদৃশ্য হ'য়ে যেত, সেই অদৃশ্যতার মধ্যেই রজতের কল্পনা রহস্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌ত হয় ত'। সে আশাও করেছিল তাই। যে ফুল ফুটে থাকে আর যে ফুল গন্ধ দিতে ভুলে গেছে—এ দুয়ের মধ্যে শেষেরটার প্রতি-ই রজতের পক্ষপাত! তাই অরুন্ধতী যদি হারিত সোম ডি-লিট্‌কে বিয়ে করত, তা হ'লেই রজত যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাব্যালোচনায় মন দিতে পারত, কিন্তু অরুন্ধতী হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে রজতকেই—"

গল্প বন্ধ করিয়া বলিলাম—শুন্‌ছ শোভা? তার পর কি হল জান?

শোভা বলিল—ভাগ্যিস্‌ জানি না। তুমি যদি তোমার পিরিলি বামুনের গলাটা থামিয়ে মুখে মুখেই বল তা হ'লে তাড়াতাড়িও হয়, বাঁচাও যায়!

অগত্যা তাহাই হইল; বলিলাম—রজত ভয় পেয়ে গেল। ওর ধাতে অরুন্ধতীকে বিয়ে করা সইবে কন? ওর কাছে অরুন্ধতী হচ্ছে ঠুন্‌কো অথচ বহুমূল্য 'ড্রেস্‌ডেন্‌ চায়না',—ওর হাত লাগলেই তা ভেঙে যাবে। রজত এই দায় থেকে খালাস পাবার জন্য সুদূর ডিব্রুগড় থেকে একটি গরীব ডাক্তারের মেয়ে বিয়ে করে' আন্‌লে। রজত বেঁচে গেল,—আমারেই মতন বউর সৌভাগ্যে খাট গদি না পেলেও একটি ছোট খাটো চাক্‌রী পেয়ে গেল, বেশ সরল গ্রাম্য জীবন নিয়ে সহজ কবিতা লিখ্‌তে লাগল, দিনে-দিনে বেশ গোলগালটি হ'য়ে গেল যা হোক্‌। দুর্দ্দমনীয় স্পীডের প্রাবল্যে অরুন্ধতী কোথায় ছিট্‌কে পড়ল কে জানে, একটি ভীরু মেয়ের সঙ্গে একটি সুখনীড় তৈরি করে' রজত—

শোভা বাধা দিয়া কহিল—সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে লাগ্‌লো এই তোমার কমেডি? বেশ, খাসা। তোমাকে ডেকে সবাই নোবেল প্রাইজ্‌ দেয় না কেন? বিলেতে জন্মালে নিদেন পক্ষে এই গল্পের জন্যই হয় ত O.M. পেতে—

গম্ভীর হইয়া কহিলাম—তোমারো তাই মনে হবে যদি বাকিটুকুও শোন। আমি পড়ছি। আর বেশি নেই।

এখন হইতেই অন্ধকার ধীরে ধীরে বিদায় বেলার প্রিয়া-চক্ষুর মত তরল হইয়া আসিবে, পূব আকাশে শুকতারাটি এখনো জাগিয়া রহিয়াছে, নদীর পারের ঝাউয়ের পারের পাতা দুলাইয়া বাতাস সামান্য একটু কথা কহিল। শোভাকে যে কী অপরূপ সুন্দর দেখাইতেছে তাহা কোথায় আঁকিয়া রাখিব। বাহুর ক্ষণিক বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া উহাকে ছন্দের মধ্যে

চিরবন্দিনী করিয়া রাখিবার মত যদি আমার কাব্যপ্রতিভা থাকিত, তাহা হইলে আর কথাই ছিল না। ব্রাউনিঙ-ও আমারই মত এমন স্নেহার্দ্র চক্ষু দিয়া শয়ানা ব্যারেট্‌কে দেখিয়াছিলেন কি না কে বলিবে ? এস্‌ক্লিপিয়াডিস, নাকি বলিয়াছেন—পিপাসার্ত্তের জন্য নিদাঘসন্ধ্যায় তুষার অত্যন্ত মধুর, সমুদ্রযাত্রী নাবিকের পক্ষে বিষণ্ণ শীতের পর বসন্তের ফুল-উৎসব ও উষ্ণতা লোভনীয়, কিন্তু একই শয্যায় একই আচ্ছাদনের নীচে দুইটি প্রেমিক-দেহের তুলনা কোথায় ? বিবাহের সম্বন্ধ আসিলে প্রথম যখন শোভাকে দেখিতে গিয়াছিলাম সেদিন-ও আজিকার মতই মনে সুমধুর ভাব-লাবণ্য ছিল, সেদিন-ও সেই অপরিচিতা মেয়েটিকে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ার মতই আত্মা দিয়া স্পর্শ করিয়াছিলাম ;—সৌভাগ্যক্রমে বিবাহ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই কথাটা ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। আমি তরঙ্গফেনসঙ্কুল নদী না হইয়া এই যে একটি প্রশান্ত স্বচ্ছনীর হ্রদ হইয়া আছি, এ-ই আমার কাছে ভারি ভালো লাগিতেছে। সাফল্যের জন্য ব্যস্ততা নাই, আশাভঙ্গের মহত্তর ব্যর্থতাও নাই,—ভারি সহজ ও স্বচ্ছন্দ ; ডেভিসের মত এই Sweet Stay-At-Home আমারও চোখে নেশা ধরিয়া দিয়াছে। ছোট সংসার, শোভার ছোট দুটি করতলে আকাশভরা স্নেহ,—শোভা তাহার প্রথম সন্তানটির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কি ভীরু অথচ কি উৎসুক এই প্রতীক্ষা ! একটি প্রতীক্ষা। একটি ভাবী শিশুর সুখকলহাস্যে গৃহাঙ্গন মুখর হইবে ভাবিতে আমার শরীরেও সুখাবেশসঞ্চার হইতেছে। বিধাতাকে নমস্কার,—আমি এই পরিমিত, সহজস্ফূর্ত জীবনযাপন ছাড়িয়া একটা আগ্নেয় পর্ব্বতের মত বাঁচিতে চাহি না।

আমার চেয়ারটা শোভার অত্যন্ত কাছে টানিয়া নিলাম। শোভা কহিল—একটা কথা জিগ্‌গেস করি। এত যে লিখ্‌ছ, রজত পয়সা পাচ্ছে কোথা থেকে, খায় কি, বিয়ে যে কর্‌ল তার সঙ্গে ওর বনে কি না, ওদের সংসারে ক'বার মৃত্যু ছায়া ফেল্‌ল, ক'বার আশার পাখী উড়ে গেল, মেয়েটি রজতের কাছে খালি মার্থা, না মেরি-ও—এই সব কিছুই ত ইঙ্গিত কর্‌ছ না ! খালি একটানা সুখের সন্দেশ খাইয়ে খাইয়ে মুখ ফিরিয়ে আন্‌লে। ওগো কবি, তোমার রচনায় একটু দুঃখের সুধা মেশাও,—যে দুঃখ সৃষ্টিকে সুন্দর করেছে, মহান করেছে। কিম্বা সংসারের ছোট-খাট দুঃখই, যা জীবনকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেয়—যে দুঃখ সয়ে' মানুষ না পায় তৃপ্তি না পায় অহঙ্কার !

আমার গলার স্বরটা স্বভাবতই যেন নামিয়া আসিল, যেন আমি কি একটা বেদনার খবর দিতেছি। কণ্ঠস্বরের অনুচ্চতার মধ্যেই বেদনার একটি রহস্য রহিয়াছে। বলিলাম—প্রভাতের পাখী ডেকে না উঠতেই রাতের এই পাখীর গান থাম্‌বে।

"অরুন্ধতী তার প্রেমের কন্‌ভেন্‌শ্যন্‌ বজায় রেখেই অবশেষে নীরদ গাঙ্গুলিকে বিয়ে কর্‌লে,—নীরদ ব্যারিষ্টার, বিলেতে থেকে স্ক্যাণ্ডেল করে' এসেছে বলে'ই যেন অর্দ্ধ-অবিশ্বাসের সঙ্গে অরুন্ধতী তার টু-সিটার মোটরে গিয়ে বসে' পড়্‌লে...

কে কার খোঁজ রাখে ? অতীত স্মৃতি ক্রমবিলীয়মমান ধূপসৌরভের মত—অরুন্ধতী ও রজতের হাত-ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। দু'জনে বন্‌তও না, অরুন্ধতী যদি হয় আকাশ, রজত নীড়—তাই কা'র কি দুঃখ হ'ল কে জানে, অরুন্ধতী হাতে মোটরের হুইল্‌ নিলে আর রজত নিলে একটি ভীরুকম্পিত প্রদীপ-শিখা !"

একটু থামিলাম। শোভা কহিল—ভারী শ্রান্ত উদাসীন সুর—তার মানে নীরদকে অরু

বিয়ে কর্‌লে যার প্র্যাক্‌টিস্ না থাক্‌লেও টাকা বাগাবার ট্যাক্‌টিক্‌স আছে, যে বিলেত থে'কে ঘুরে এসেও এখনো 'টাই' বাঁধাতে শেখেনি। তারপর ?

"...কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বুঝি অস্ত যাচ্ছে, পশ্চিমাকাশটা তপস্যানিরতা অপর্ণার দেহাবয়বের মত পাণ্ডুর হ'য়ে উঠেছে। তারিখটা ছিল উনিশে মাঘ, অরুন্ধতীর জন্মদিন। এই মধ্য রাত্রেই সে জন্মেছিল নিশীথ রাত্রের মর্ম্মোচ্ছ্বাসের মত—অরুন্ধতী, গ্রীক্‌দেবী জুনোর চেয়েও মহিমান্বিত, সিথেরিয়ার নিশ্বাসের চেয়েও লঘুচিত্ত। তোমরা হয় ত ভাব্‌ছ, রজতের বুঝি তাই ভেবে রাত জাগ্‌তে ইচ্ছে হয়েছিল। মোটেও নয়,—এমনিই একটু মনে পড়ে' গেছ্‌ল হয় ত। মনে করে' না রাখলেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে—এতে স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট মানুষের হাত কি ? কিন্তু সেই স্মৃতি রজতকে অস্থির করে' ছাড়ল না, রজত নুয়ে পড়ে' ধীরে ধীরে তার পার্শ্ব-শয়ানা শ্লথাবগুণ্ঠা মিনুর ক্ষুদ্র ললাটটি স্পর্শ কর্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই—"

শোভা যেন একটু চম্‌কাইল, মনে হইল। ধীরে আমারই দুইটি কথার পুনরাবৃত্তি করিল—কিন্তু পরক্ষণেই—হ্যাঁ, তার পর ?

অগ্রসর হইলাম।

"কিন্তু পরক্ষণেই দুয়ারে যেন কার করধ্বনি শোনা গেল, প্রথমে মৃদু, পরে স্পষ্টতর। রজত মিনুর ঘুম না ভাঙিয়েই খাট থেকে নেমে পড়ে নিঃশব্দে দুয়ার খুলে দিল। যেন সে বহু পরিচিত কোন্ প্রত্যাশিত বন্ধুর জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। মেঘের বিছানায় চাঁদ তখন 'প্রায় মরে' এসেছে, সমস্ত আকাশ শোকাশ্রুসঞ্চিত চক্ষুর মত নিষ্পলক নিরানন্দ হ'য়ে আছে।"

দুয়ার খুলে রজত কাকে দেখল, জান ?

শোভার চোখ বোজা, অতি ধীরে নিশ্বাস ফেল্‌ছে, যেন অতি কষ্টে বল্লে—জানি ; অরুকে ! কিন্তু তার পর ?

"অরুন্ধতীর সে কী চেহারা হয়ে গেছে, যেন আকাশ পারের ঐ মুমূর্ষু চাঁদটা,—হতশ্রী, লাবণ্যশূন্য। রজত ত' দেখে অবাক, প্রায় নিশ্চেতন। অরুন্ধতী যেন একটু এগিয়ে গেল ; মৃত্যু যদি কথা কইতে পারত এমনি সুরেই কইতে তা হ'লে : তুমি আমাকে একদিন বিনামূল্যে যে জিনিষ দিতে চেয়েছিলে, দেবে তা ? তাই নিয়ে আমি সব ছেড়ে এসেছি, ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি ও অফ্‌স্প্রিঙ্। দেবে ?

রজত ব্যাপারটা সব বুঝতে পার্‌লে, কিন্তু এত দূরে এই গভীর রাত্রে রজতের সুখশয্যাগৃহের রুদ্ধ দ্বারে এসে যে করাঘাত কর্‌তে পারে তার যে কি অপরিসীম দুঃখ কি ভয়াবহ ব্যর্থতা তা মেনে নিতে কি রজতের যথেষ্ট হৃদয়ানুভূতি ছিল না ? রজত বল্‌লে—না। বড় রাস্তায় পড়লেই ট্যাক্সি পাবেন, বাড়ী ফিরে যান্, নীরদবাবুর এখনো ঘুম ভাঙেনি হয়ত'—

বলে'ই রজত দরজা বন্ধ করে' দিলে। তার পর—'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আসিতেছিল বুঝি, অর্দ্ধ পথেই দুঁটি টিপিয়া ধরিলাম। বলিলাম—এই 'তাপরে'র পরেই তুমি শেষ কর্‌তে চেয়েছিলে। তুমি যাদেরকে চ্যাম্পিয়ান কর সেই অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের হাতে এই গল্পটা পড়লে তাঁরা কি করতেন ? রজতকে দিয়ে রুপার্ট ব্রুকের মত সেই কবিতা লেখাতেন,—কি জানি সে কবিতাটি—ঘরে ফিরে এসে তাকে দেখলাম, বসে' আছে চেয়ারে, সেই চুল, সেই নোয়ানো ঘর, সেই তার

দেহবঙ্কিমা,—তার পর ?—না, সব ছায়া, মৃগতৃষ্ণিকা। 'বল কেমন করে' আর রাত জানি, আর কি আমার আসে ঘুম ?'...হোপ্‌লেস্‌

শোভা কহিল—তোমার রজত কি কর্‌লেন ?

বাকিটুকু পড়িয়া ফেলিলাম :

"আজকাল শেষ রাত্রের দিকে বেশ একটু শীত করে' আসে বলে' পায়ের নীচে একটা চাদর থাকে। দরজা বন্ধ করে'ই রজত তাড়াতাড়ি মশারির নীচে ঢুকে চাদরটা গায়ের উদার টেনে দিলে। যেন ও একটি সুরক্ষিত মন্দিরের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে,—ও মিনুর দেহ স্পর্শ করে' ওর অত্যন্ত নিরাপদ ও অব্যাহত মনে হচ্ছিল।"

শোভা ক্লান্তস্বরে কহিল—গল্পের কি নাম রাখলে ?

—ছায়া। অরুন্ধতী ত' আর সত্যিই আসেনি।

—আসে নি নাকি ? খাসা গল্প ত' ? আচ্ছা, তার পর ?

শোভারই কাছটিতে সরিয়া আসিয়া একটু হেলান দিয়া বসিলাম। বলিলাম—এর আবার তার পর কি ?

—তার পর নেই ? যে মিনুর জন্য অরুন্ধতীকে তুমি রজতকে দিয়ে তাড়িয়ে দিলে, সেই মিনুর জীবনও অরুর মতই অতৃপ্ত কি না তার ইঙ্গিত কোথায় ? 'শেষের কবিতায়' বিবাহিত অমিত ও বিবাহিত লাবণ্যর বন্ধুতা না-হয় কবিতার খাতিরে মান্‌লাম, কিন্তু সেই বন্ধুতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কেন ? ঘটনার মুখোমুখি কেন দাঁড়াতে শেখনি ?

বলিলাম—ভোর হ'য়ে আস্‌ছে, না শোভা ? একটু বেড়াতে যাবে ?

আশ্চর্য্য, নিজেই বেড়াতে যাইবার প্রস্তাব করিয়া কখন যে ঐ অবস্থায়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; খেয়াল নেই—জাগিয়া দেখি আলোতে ঘর ভরিয়া রৌদ্রকে খুব ভেঙ্‌চাইতেছে। ল্যাম্প ও রৌদ্র নিয়া মনে মনে একটা রূপক রচনা করিব ভাবিতেছি, মাথায় একটা কঠিন কিছুর স্পর্শ পাইতেই চম্‌কাইয়া চাহিয়া দেখি শোভা ইজিচেয়ারটাতেই প্রায় উবু হইয়া চিরুণী দিয়া আবার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে,—কখন যে চা হইবে, কখন্‌ই বা যে রান্না হইলে কোর্টে যাইব তাহার কিছুই হদিস্‌ নাই। শোভা যে এমন করিয়া, আলস্যসম্ভোগ করিতে পারে ইহার আগে ধারণাই করিতে পারি না। উহার চক্ষু দুইটির নাগাল পাইবার জন্য মাথাটা উঁচু করিয়া ধরিলাম ; মনে হইল উহার চক্ষু দুইটি যেন তৃণাঙ্কুরলগ্ন শিশিরবিন্দুর মত টল্‌টল্‌ করিতেছে—তাহাতেই যেন একটি প্রশ্ন দুলিতেছে—তার পর ?

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এক আনার ডাক টিকিট

পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ঠিক মত হয় নাই, স্বীকার করিতেছি, তবু উদ্বাহকালে সহধর্ম্মিণীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যেত গুরুতর একটা কিছু প্রতিশ্রুতি দিতেছি, তাহা বুঝিয়াছিলাম। সাত বৎসরের অবিশ্রাম ব্যবহারে সেই সুবৃহৎ প্রতিজ্ঞাটি ক্ষইয়া ক্ষইয়া কি ভাবে এক আনার ডাক টিকিটে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, আমার এই গল্পটি তাহারই ইতিহাস। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে গল্পটি কেবলমাত্র আইবুড়ো ছেলে এবং মেয়েদের জন্য (যাহাদের 'কখনো বিবাহ করিব না' প্রতিজ্ঞা চিরদিন অটল থাকিবে বলিয়া এখনও বিশ্বাস আছে,) লিখিত, বিবাহকামী অনূঢ়া ও প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা যেন গল্পটি পাঠ না করেন, তাহাতে অকারণ অনেক দুঃখের হাত হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইবেন। বিরহকালের পত্রে বর্ণিত স্বামীদের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহারা মনে মনে যে গর্ব্ব ও সুখানুভব করিয়া থাকেন এই অধম লেখকের তাহা নষ্ট করিতে বাসনা নাই। তবু নেহাৎ গল্প যখন একটা লিখিতেই হইবে এবং হাতের কাছে তেমন সুরসাল কোনও প্লট দেখিতেছি না (একটা বিদেশী গল্পের বই কি ম্যাগাজিনও ছাই কাছে নাই যে মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়া প্লট চুরী করিয়া বাহবা লইব, বিদ্যাটা অবশ্য এখনও তেমন জুৎমত আয়ত্ত করিতে পারি নাই!) তখন অগত্যা বিবাহিত পুরুষ-জীবনের একটু গূঢ় রহস্যই না হয় উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলি, আর কিছু না হউক গল্পচ্ছলে সত্য প্রচারের পুণ্যটাও অর্জ্জন করা হইবে। বিবাহিত পুরুষদের কাছে আমার এই গল্পের কোনও মূল্য তো নাই-ই, সময়ের কিঞ্চিৎ অপব্যবহার করিয়া গল্পটা পড়িয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিবেন যে ইহা তাঁহাদেরও বিবাহিত জীবনের একটা সত্য ইতিবৃত্ত মাত্র। তাঁহাদের নিকট লেখকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন, য়্যাপ্রুভার হইয়া আত্মরক্ষা করা আমার কল্পনাতেও ছিল না, নেহাৎ বেগতিকে পড়িয়া এই অপ্রিয় কাম্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আষাঢ়মাসে বিবাহ হইয়াছিল, শ্রাবণের মাঝামাঝি প্রেয়সী পিত্রালয়ে গেলেন। অল্প কয়েক দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া প্রেয়সীর কিশোর চিত্ত পাড়ার বোকা ঠাকুরঝিদের এবং বুদ্ধিমান ঠাকুরপোদের কাছ হইতে এমন কয়েকটি সংবাদ আহরণ করিয়াছিল যাহা আমার পক্ষে মানহানিকর। শ্রাবণের প্রাবৃট্-জালে একদা যখন মধ্য রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে, আকাশের তারারাজি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত, মুহুর্মূহু বিদ্যুৎস্ফুরণে বাতায়ণপার্শ্বস্থ তরুশির চকিতে উদ্ভাসিত হইয়া নিবিড়তর তমিস্রায় বিলীন হইতেছে, বজ্র-নিনাদে আতঙ্কিত প্রেয়সী সদ্য বিবাহের লজ্জার মাথা খাইয়া কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ট হইয়া পাশে শয়ন করিয়াছেন, প্রেয়সীর ঠাকুরঝিদের আড়ি-পাতনের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছে এবং একটানা দদ্রু-কাকলীতে বৈষ্ণবকবিদের আঙুরের মতো টস্‌টসে পদগুলি মনের মধ্যে গুঞ্জন

তুলতে সুরু করিয়াছে, হঠাৎ প্রশ্ন করিলাম, সরি, (আমার সহধর্ম্মিণীর নাম সরমা) সেখানে গিয়ে আমাকে মনে থাক্‌বে তো ?

কোনও জবাব নাই। মেঘাবৃত শ্রাবণ-নিশীথের জবাব না-দেওয়া প্রেয়সীর বর্ণনা কোনো কাব্যে নাই, একটু আহত হইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, ঘুমুলে নাকি ?

প্রেয়সী তবুও নিরুত্তর। হঠাৎ বিদ্যুতালোকে দেখিলাম, সরমার দৃষ্টি আয়ত কিন্তু চোখে জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মতো সন্দেহ নিরসনার্থ 'বিদ্যুৎ আর একবার' বলিতে ইচ্ছা হইল না, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, সরি, তুমি কাঁদছ ? অনুর জন্য মন কেমন করছে ? অনু সরমার ছোট ভাই।

জবাব পাইলাম না বটে কিন্তু অনুভবে বুঝিলাম প্রেয়সী ও আমার মধ্যের ব্যবধান কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল। হাল ছাড়িয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িব কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ প্রেয়সীর অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ নিশীথ-নীরবতা ভঙ্গ করিল :

—এই বুঝি তুমি আমাকে ভালবাস ? তবে যে সবাই বল্‌লে ও বাড়ীর প্রতিভার সঙ্গে—

স্মরণ হইল স্ত্রীলোকের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছি। রাগ যে হয় নাই তাহা নহে। সদ্যবিবাহিতা পত্নীর মুখ হইতে এরূপ অপবাদ শুনিব ইহা আমার সুদূরবর্ত্তী কল্পনাতেও ছিল না। একবার ইচ্ছা হইল বলি, কন্যে, একদা সুতহিবুক যোগে তোমাকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছি বলিয়া বিবাহের পূর্ব্বজীবনও যে তোমাকে উইল করিয়া দিয়াছি এরূপ মনে করিও না। কিন্তু আকাশে মেঘ থমথম করিতেছিল এবং রাত্রি ছিল অন্ধকার। প্রেয়সীকে বাহুপাশে বাঁধিয়া কাছে টানিয়া বলিলাম, পাগলি, কে দুষ্টুমি ক'রে তোমাকে রাগাবার জন্যে এসব কথা বলেছে, ওই কালকিসিন্দে নেড়ীটার সঙ্গে আমি—ছিঃ তুমি একথা বিশ্বাস করতে পারলে ?

বুঝিলাম বিশ্বাস শিথিল হইতেছে, ব্যবধান কমিতেছে।

কেন, মেজ-দিও তো বল্‌লেন যে তোমাদের বিয়ের সব ঠিক হয়েছিল—তোমাকে দেখলে প্রতিভা ঘোমটা—

হাসিয়া বলিলাম, সরি, আজাপুরের চৌধুরীদের মেজছেলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়নি ? রামজীবনপুরের মেলায় তাকে দেখে তুমি জিভ্‌ কাটোনি ? তবে কি তুমি—

—য্যাঃ। মুখখানা বুকের কাছাকাছি আসিল। বলিলাম, মেজদি হচ্ছে একজন গেজেট, মিথ্যের চুপড়ি ! ওর কোনো কথা বিশ্বেস করো না। করলেই ঠকবে।

ব্যস, গোলযোগ চুকিয়া গেল। কিন্তু আসলে মেজদি মিথ্যা বলেন নাই। প্রতিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল কিন্তু সে ইতিহাস আমার বিবাহিত পত্নীর পক্ষে সত্য নয়।

এই হইল সুরু। তখনো কুড়িদিন বিবাহ হয় নাই।

সরমার বাবা বড় ডাক্তার, একদা কোনো বেকার মুহূর্ত্তে তিনি কন্যার নিকট ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে কোনও গবেষণা-মূলক কথা বলিয়া থাকিবেন, পিত্রালয় প্রত্যাবৃত প্রেয়সীর দ্বিতীয় চিঠিতেই প্রথম জানিতে পারিলাম যে, সিগারেট খাইলে নির্ঘাত যক্ষ্মারোগ হয়। সুতরাং সিগারেট খাওয়া আমাকে ছাড়িতে হইবে। এজন্য সে তাহার নিজের মস্তক-সংক্রান্ত একটা দিব্য দিয়া বসিয়াছিল। তের বৎসর বয়সে ইস্কুল গলাইয়া নতুন পুকুরের বাঁশ-ঝাড়ে গাঢাকা দিয়া বিড়ি খাইতে শিখিয়াছিলাম, চব্বিশ বৎসর বয়সে

প্রেয়সীর মাথাসম্বন্ধে এমন মমতা হইবার কথা নয় যে, সে অভ্যাস চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিব। সুতরাং ফেরত ডাকে দিব্য মানিয়া লইয়া লিখিলাম যে বহুকালের অভ্যাস ছাড়িয়া খুব কষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু যাহাকে ভালবাসি তাহার কথার জন্য সে কষ্ট সহিয়াও সুখ আছে। দিব্য বজায় রহিল এবং আমিও এদিকে দিব্য সিগারেট খাইতে লাগিলাম।

এই হইল দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি পালন। গোড়ার কয়েকটাই মনে আছে কিন্তু তার পর এত অধিকবার এই প্রতিশ্রুতি-পালন করিয়াছি যে স্মৃতিশক্তি ভারাক্রান্ত হওয়াতে অনেক কিছুই আর স্মরণে নাই।

সেবার ভাদ্র মাসের গুমোট গরমে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত, একদিনের বেশী দুই দিন এক জামা গায়ে দেওয়া অসম্ভব, আকাশ, বাতাস ও মাটি শুকাইয়া খট খট করিতেছে, প্রেয়সীকে বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া লিখিলাম—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—

সরমা, দরদী কবির এই অপরূপ শ্লোকটি আজ বার বার আমার মনে জাগছে। বর্ষাশেষের ধারাবর্ষণে আজ চারিদিক পরিপূর্ণ, আমার বুকই শূন্য শুধু। তাই এই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কবির সুরে সুর মিলিয়ে তোমাকে স্মরণ ক'রে গাইছি—

শূন্য মন্দির মোর।

সরি, আমার সমস্ত মন উদাস হ'য়ে গেছে, কোনো কাজে মন বসছে না। জানালার ধারে চুপচাপ বাইরের বহুরূপী আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছি। ঘরের বার হ'তে ইচ্ছে করে না। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, আমার মনের এই অবস্থার কথা বুঝবে না, হয়তো হৈ চৈ হট্টগোল ক'রে তাস খেলে তোমার দিন ভালই কাটছে—আমার দুঃখ জানিয়ে তোমার হাল্কা মনকে মুহূর্ত্তের জন্য ভারাক্রান্ত করতে ইচ্ছে করে না, তবু কেন জানি না আজ বারবার মনে হচ্ছে—

শূন্য মন্দির মোর।
ইত্যাদি—

চিঠিটা ভজার হাতে ডাক বাক্সে ফেলিতে পাঠাইয়া বৌদির নিকট এক কৌটা পান ও নিজের ড্রয়ার হইতে সিগারেটের টিনটা সংগ্রহ করিয়া তখনই যে দত্তবাড়ীর বৈঠকখানায় কর্ণার্জ্জুনের রিহার্সাল দিতে ছুটিয়াছিলাম, সহধর্ম্মিণীকে তাহা জানাইবার কি কোনো আবশ্যকতা ছিল? না, তাহা করিলেই বিবাহের মন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইত?

তারপর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। আজ কিশোরী প্রেয়সী full-fledged গৃহিণী-পদে প্রমোশন পাইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার অঙ্কে একটি শিশু-চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া যে বিবাহের প্রারম্ভে কথাবার্ত্তায় এবং চিঠি-পত্রে নানা মিথ্যাচারের আশ্রয় লইয়াছিলাম বলিয়াই জীবন আজ সহজ, সরল, অনাবিল শান্তিপূর্ণ। ছোট ছোট মিথ্যার সাহায্যেই অপরিচিতা পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, পরিচয় প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যদি একটি দিনের তরেও সহধর্ম্মিণীর সহিত ধর্ম্মাচরণের চেষ্টা করিয়া নিছক সত্যের পূজা করিতাম তাহা হইলে, প্রেয়সীর মুখাকাশের কালো মেঘ আজিও অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিত, সংসার-ধর্ম্ম পালনের ইচ্ছা বহুদিন বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাস লইয়া পণ্ডিচারী আশ্রমে পলাইয়া বাঁচিতে হইত। ভাবিতে ইচ্ছা হয় না বটে, কিন্তু একথাও কখনো কখনো চকিতে মনে হইয়াছে যে, আমার মতো আমার প্রেয়সীকেও

হয়তো আমার মুখ চাহিয়া অনেক মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। হয়তো কোনো দিন তাঁহার শরীরের এমন অবস্থা যে শয্যা-আশ্রয় না করিলেই শরীর-ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়, অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, নিয়মিত যত্ন সহকারে বৈকালিক আহার্য্য প্রস্তুত, প্রেয়সী পাশে বসিয়া নিত্যকার মতো পাখার বাতাস করিতে করিতে সহজ সুরে গল্প করিতেছেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক দেখাইতেছে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সেই চিরপরিচিত জবাব—তোমার যত বাড়াবাড়ি, তুমি রোজই আমার শরীর খারাপ দেখছ, কিন্তু মশাই নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখা হয় কি ? গলার হাড় বেরচ্চে যে ! মাসকাবারি টাকা না পাইয়া মুদী হয়তো প্রাতে তাঁহাকে কিছু কড়া কথা শুনাইয়া গিয়াছে কিন্তু আমার মুখ চাহিয়া তিনি নির্ব্বিবাদে তাঁহার হজম করিয়াছেন, আমাকে বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেন নাই ; মন্ত্র যাহাই বলুক, এখন দেখিতেছি মিথ্যাটাই সংসার-ধর্ম্ম পালনের মূল কথা।

পরস্পরের কাছে কিছু গোপন রাখিব না, বিবাহ রাত্রে এরূপ ধরনের কি একটা মন্ত্র আওড়াইতে হয় শুনিয়াছি। এই মন্ত্রটি বিবাহ-জীবনের সহজ বিকাশের যে কত বড় প্রতিবন্ধক তাহা বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। আমার পত্নীকে এ কথা জ্ঞাপন করিয়া কি কোনও লাভ আছে যে, আমারই কারণে পাশের বাড়ীর কোনো মেয়ের ঘন ঘন ফিট হয়, সংসার অচল হইলে কোনও বন্ধুপত্নী গোপনে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। এমন যদি হয়, যে আমার প্রেয়সীর প্রেমে পড়িয়া বাঁড়ুয্যেদের ননীগোপাল আজীবন কৌমার্য্য-ব্রতই গ্রহণ করিল, নিরুপায় প্রেয়সী তাহার মন ফিরাইতে পারিলেন না—কথাটার মধ্যে অন্যায় হয়তো কিছু নাই কিন্তু এরূপ কথা স্ত্রীর মুখে শুনিলে কোনও সুস্থ সবল স্বামী নিখিলেশের মতো কাব্য করিয়া 'তোমাকে ছুটি দিলাম' বলিয়া এমিয়েলের জার্ণাল খুলিয়া বসিবে না, ইহা অবগত হইয়া প্রেয়সী যদি সে সংবাদ চাপিয়া যান তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে ? আসলে আমি গল্প লিখিতেছি না, আমার মনে একটা সমস্যা জাগিয়াছে, পাঠক সাধারণের নিকট তাহাই উপস্থাপিত করিতেছি।

সমস্যা বলিতে আর একটা কথা মনে পড়িল, সরমা একবার তাহার মাসতুতো বোনের বিবাহে ধানবাদে গিয়াছিল ; কথা ছিল সে মাস ছয়েক সেখানে থাকিয়া শরীরটা একটু চাঙ্গা করিয়া আসিবে। তখন আমি কলিকাতায় চাকুরী লইয়াছি এবং তালতলা লেনে বাসা বাঁধিয়া নিরুপদ্রবে বাস করিতেছি। রাজভোগের মতো রসভরা ভারী ভারী চিঠি-পত্র লেখা চলিতেছে, মনে কবিতার বান ডাকিয়াছে, দুই একটি পত্র কবিতাতেও লিখিয়াছিলাম। একটার একটুখানি মনে আছে—

তুমি এখন ধানবাদে,
বিরহেতে প্রাণ কাঁদে
ব'সে ঘরের হাফ্-ছাদে
    চোখ রাখি দূর জান্‌লাতে,
শুনি পাশের বাড়ীর মেয়ে
বেসুরো গান যাচ্ছে গেয়ে,
আমার পানে কভু চেয়ে
    গুছায় কাপড় আন্‌লাতে।
সেদিক থেকে ফিরাই আঁখি
তোমার তরে ব্যাকুল থাকি—

মনে কতই ছবি আঁকি—
জেগেই দেখি স্বপ্ন যে,
তুমি এখন ছাঁদনাতলায়
ব্যস্ত যে কার কর্ণ মলায়,
গানের লহর খেলছে গলায়—
ভেবেই শুধু মন মজে
ইত্যাদি।

কিন্তু মানুষের মন এক অদ্ভুত পদার্থ, কি করিতে হইল, বলিতে পারি না, এক দিন সেই দূরের জানালার মেয়েটিকেই বেশ লাগিল। তারপর চোখাচোখি, পরিচয়, কিন্তু সে স্বতন্ত্র ইতিহাস। তারোপরে, পরিচয় জমাট বাঁধিয়াছে, অবস্থা উপহার-বিনিময় পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে এবং নিতান্ত বেকুবী করিয়া সেই নায়িকা সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়া মাসিকে ছাপাইয়াও দিয়াছি—এক দিন প্রাতে দেখিলাম, বলা নাই কহা নাই প্রেয়সী আসিয়া হাজির, আমার এক বেকার শ্যালককে সঙ্গে করিয়া। একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। জানালার নায়িকা-মূর্ত্তি গভীর ঔৎসুক্যের সহিত আমার পত্নীকে দেখিতে লাগিল, আমি দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম। শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, হঠাৎ এলে যে! একটা খবরও তো দিতে হয়! পত্নী হাসিমুখে গায়ের আলোয়ানখানা খুলিয়া বিছানার উপর রাখিয়া ভাঁজ করিতে করিতে বলিলেন, নিজের বাড়ীতে আস্‌ব তার জন্যে কি আবার আবার 'টুর-প্রোগ্রাম' ছাপাতে হবে নাকি? আহা, কি চেহারা বেরিয়েছে তোমার? বিরহের জ্বালায় খাওয়াদাওয়াও ছেড়ে দিয়েছ না কি?

কথাটা সহজ সুরে বলা, না ভিতরে কোনো তীব্র পরিহাস ছিল বুঝিতে পারিলাম না। হায় রে, প্রেমটা প্রায় দানা বাঁধিয়া আসিয়াছিল—এমন সময়—

প্রেয়সী অত্যন্ত সহজভাবে সংসারের ভার স্কন্ধে লইয়া যেন আজীবন সেখানেই বাস করিতেছেন এরূপ ভাবে চলিতে লাগিলেন। কোনও বিষয়ে একটি প্রশ্ন পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন না। একদিন হঠাৎ বলিলেন, তোমার অমুক গল্পটার সবাই প্রশংসা কচ্ছিলেন, ললিতবাবুর সেই ব্যাপারটা লিখেছ বুঝি? আহা বেচারা!

এমন cold-blood-এ খুন করিতে মেয়েরাই পারে! ইহার পরই তিনি বলিলেন, শ্যামবাবুর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে, আমাকে বলনি তো? আজ দুপুরে এসে তাঁরা তোমার কত প্রশংসা ক'রে গেলেন। মাধুরী মেয়েটি বেশ। আমার কাছে রোজ গান শিখতে আসবে বলছিল। কি বল, আসতে বলব? পাংশু-মুখে রক্ত আনিবার জন্য ধোপার হিসাবের খাতাটা লইয়া বসিলাম। বহু কষ্টে বলিলাম, তোমার কি সময় হবে?

—তা আর হবে না? আমার আবার কাজ কি? খাচ্ছি দাচ্ছি, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আছি। তবু পুরোনো গানগুলো ঝালিয়ে নেয়া হবে। সব ভুলে মেরে দিচ্ছি যে!

মাধুরী গান শিখিতে আসিতে লাগিল, কিন্তু আমার সঙ্গে তাহার সম্পর্কে একটা সুবৃহৎ দাঁড়ি পড়িয়া গেল।

ব্যাপারটা যত সহজে চুকিল ভাবিলাম, আসলে তত সহজে চুকে নাই। পরে সমস্তটা জানিয়ে যুগপৎ লজ্জিত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম। প্রেয়সী মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া নারীসুলভ ক্রোধে যদি সেদিন কোনো 'দিন' করিয়া বসিতেন তাহা হইলে আজো হয়তো

গোপনে মাধুরীর নামে কবিতা লিখিতে থাকিতাম।

ব্যাপারটা হইয়াছিল এই, মনোহারী দোকানে প্রেয়সীর ফর্দ্দমত চাকরে গিয়া জিনিস লইয়া আসিত, আমিও কালেভদ্রে এটা সেটা আনাইতাম। দোকানী মাসের শেষে তাঁহার নামেই ডাকে বিল পাঠাইত। প্রিয়ার অনুপস্থিতিতে আমি যে-সকল দ্রব্য খরিদ করিয়াছিলাম নিয়মমত তাহার ফর্দ্দ ও বিল প্রেয়সীর নামে আসিয়াছিল, খেয়াল না করিয়া আমি তাহা redirect করিয়াছিলাম। গল্প পড়িয়াও তিনি যাহা বুঝিতে পারেন নাই, দোকানের ফর্দ্দ দেখিয়া তাহাই তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল। বাড়ীতে কখনো 'কুন্তলীন' ছাড়া অন্য কোনো তেল আসিত না, মাধুরীর নির্দ্দেশ মত অন্য কি একটা তেলের নাম ফর্দ্দে করা হইয়াছে, ইহা ছাড়াও আরো দুই একটা কি অস্বাভাবিক জিনিসের দাম ফর্দ্দে ধরা ছিল। ব্যস, আর কোনো প্রশ্নের প্রয়োজন হয় নাই। প্রেয়সী বুঝিতে পারিলেন একটা গোলযোগ ঘটিতেছে, সুতরাং অবিলম্বে তিনি কলিকাতায় দর্শন দিলেন, এবং আমার বুদ্ধিমান চাকর ও পাড়াপ্রতিবেশীরা সংবাদ গোপন রাখিবার আবশ্যকতা অনুভব না করাতে তিনি অচিরাৎ অ-'কুন্তলীন' তৈলরহস্য আবিষ্কারে সক্ষম হইলেন।

তাই বলিতেছিলাম, একেবারে খাপ-খোলা তরবারীর মত সত্য লইয়া কারবার করিলে পৃথিবীতে বাস করা কঠিন, রক্তপাত অনিবার্য্য। সেই তরবারীকেই খাপে ঢাকিয়া প্রয়োজন মতো কৌশলে যাহারা ব্যবহার করিতে পারে তাহারই শান্তিতে রাজত্ব করিতে থাকে।

তারপর, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবন-স্রোতকে একটা বাঁধা খাতে প্রবাহিত করাইয়াছিল, বর্ষার জল সেই খাতে ঢুকিয়া মাঝে মাঝে যে কূল ছাপাইয়া দেয় নাই তাহা নহে কিন্তু যথাসময়ে জল নামিয়া গিয়াছে, সেই চিরন্তন খাতেই জীবনের স্রোত একটানা বহিয়া চলিতেছে। ইহাই হইল আমাদের জীবন, সুন্দরও বলা যায়, আবার কুৎসিৎও বলা যায়, যে যেভাবে গ্রহণ করে!

বয়স যত বাড়িতেছে প্রেয়সীর প্রতি প্রেমও তত গাঢ় হইতেছে, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষই নিজেদের Elixir of Life-এর একটা বাঁধা formula আবিষ্কার করিয়া নির্ব্বিবাদে কালাতিপাত করিতেছে ; আমার formulaও আমি পাইয়াছি। কিন্তু সেটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া কি ঠিক হইবে ? গল্প লিখিবার উদ্দেশ্যে অর্ব্বাচীনকে শিক্ষা দেওয়া ! সেই কাজের ভার যখন লইয়াছি তখন গোপন করিব না।

প্রারম্ভে যেমনই হৌক, বয়সে একটু পাক ধরিলেই প্রত্যেক বিবাহিতা বিবাহিতার জীবন দুটি ভাগে ভাগ হইয়া যায়, এক, পরস্পর যখন কাছে থাকে—

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে—

প্রথম অবস্থা লোকভেদে বিভিন্ন হইতে পারে, কোনও স্বামী দশটায় খাইয়া আফিস যায়, সাড়ে পাঁচটায় ফিরিয়া স্ত্রীর সযত্নরক্ষিত গাড়ু-গামছার সাহায্যে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, আবার রাত্রি আটটা-নটার সময় বাড়ী ফিরিয়া যেমন জোটে আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ও মাসিকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইয়া পড়ে, সাধ্বী পত্নী ও স্বামীর পাতে আহার করিয়া পরের দিন ভোরের রান্নার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া হাত পাখা লইয়া স্বামীকে ব্যজন করিতে করিতে সংসারের প্রয়োজনীয় দুই চারিটি কথা এবং ক্বচিৎ-কদাচিৎ মুখুয্যেবাড়ীর বউয়ের নূতন গলার হার

কিম্বা আর কাহারো জামার ছিটের বর্ণনা দিতে দিতে স্বামীর পাশে শুইয়া পড়ে। হাতের পাখা ক্রমশঃ ভারী হইয়া আসিতে থাকে। পরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কোনও স্বামীর জীবনে আহার্য্য ও আরামই বড় হইয়া উঠে, স্ত্রীর অন্য কোনও বিশেষ সত্তা নাই, ভাল আহার ও ভাল শয়নের ব্যবস্থা করিলেই স্বামী সন্তুষ্ট। লাউয়ের তরকারীতে নুন বেশী হইলেই কিম্বা বুটের ডালটা ধরিয়া গেলেই এই সকল স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্যহানির অনুযোগ করিয়া থাকে। প্রভাতে উঠিয়া গরম চায়ের সহিত ফুলকো লুচি ও কুমড়োর ছোকা পরিপাটি করিয়া আহার করিয়া ইহারা নিজেরাই বাজার করিতে ছোটে। বাজার করাটাই ইহাদের বিলাস। সস্তায় ভাল মাছ আনিতে পারিলে ইহারা যে আনন্দ পায় ভাল একটি কবিতা লিখিয়াও কবিরা সেরূপ আনন্দ পান না। কোথায় ভাল পাপর পাওয়া যায়, কোথাকার পাঁঠার মাংস কচি, গঙ্গার ইলিশ কিনিতে হইলে কোন বাজারে যাওয়া দরকার, ইহারা সে খবর ভাল করিয়াই রাখিয়া থাকে। রান্নাঘরের ভিতর দিয়াই স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম গাঢ় হইতে থাকে। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা যে হয় না তাহা নয়, জ্যোৎস্না-রাত্রে ছাদে দুজনে হয় তো মুখোমুখি বসিয়াও থাকে—স্বামী বলে, মেসের বাবুদের জ্বালায় কি কিছু কিন্‌বার জো আছে, আজ পাকা পোনামাছের দরটা এক টাকা দুআনায় নামিয়েছিলাম, মেসের এক নবাব-পুত্তুর এসে পাঁচসিকে সেরে পাঁচ সের মাছ নিয়ে চলে গেল। সংসার তো কর্‌তে হয় না, তাহ'লে বাছাধনরা টের পেতেন! স্ত্রী বলে, কাল কিছু মুগ ডাল এনো, ওবাড়ীর সেজ বউয়ের কাছে মুগডালের সন্দেশ কর্‌তে শিখেছি। ছাদে জ্যোৎস্না কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকে, খাঁচায় পোষা কোকিল শুধু ভুল করিয়া ডাকিয়া সারা হয়।

কোনো স্বামীস্ত্রী চাকর বামুন ও আয়ার হাতে খাওয়া শোওয়া ও সন্তান-প্রতিপালনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া সন্ধ্যার পর গ্রামোফোনে বা রেডিওতে গান শুনিয়া প্রেমচর্চ্চা করে, বায়স্কোপে গিয়া বায়োস্কোপের নায়কনায়িকাকে পরস্পর চুম্বন করিতে দেখিয়া চুমু খাইবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, ফিটনে চাপিয়া মোটরে চাপার স্বপ্ন দেখে এবং সপ্তাহে একদিন রেড রোডের ধারে বেড়াইয়া বিবাহিত জীবনের চরমতম সাধ মিটাইয়া লয়। ভাল কাপড় জামা পরা ফিটফাট ছেলে মেয়েকে মধ্যস্থ রাখিয়া ইহাদের প্রেম বিকশিত হয়, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলে তাহাদিগকে জানালার পরদা, দেয়ালের ছবি, চীনামাটির বাসন, বিলাতি পুতুল, বিছানা মশারী দেখাইয়া, নূতন রেকর্ড শুনাইয়া অথবা এলবামে সজ্জিত খোকার নূতন তোলা ফটোগ্রাফ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিবাহিত জীবনে যে ইহারা সুখী নানাভাবে তাহাই প্রকাশ করিয়া দেয়।

ইহারই ঊর্দ্ধতনস্তরের যারা তাদের কথা নাই বলিলাম। তাহাদের প্রেম ড্রইং রুমে, মোটরে, ফার্ষ্টক্লাস রিজার্ভ ট্রেনে, দার্জ্জিলিঙে, কারমাটারে অথবা জাহাজের কেবিনে। ইহাদের প্রেম নাইট গাউনে, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানে, পিয়ানোর টুংটাং-এ।

আমি ও আমার প্রেয়সী গৃহিণী পরস্পর একত্র থাকিয়া যখন সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করি তখন উপরোক্ত যে কোনো একটি শ্রেণীর জীবই হইয়া যাই—খুঁটিনাটিতে কিছু তফাৎ থাকিতে পারে। কবিতা গল্প উপন্যাস লিখি। মাসিকে ছাপাইয়াও থাকি কিন্তু সেগুলি মোটেই সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত নয়, আমি আমার গৃহিণীর এতই পরিচিত (অন্ততঃ তিনি তাহাই ভাবেন!) যে আমার লেখায় নূতন কিছু পাইবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি সেগুলি পড়িতে পারেন না। আমার স্ত্রী ভাল গাহিতে পারেন। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার গান শুনিয়া আমি

পাগল হইতাম, বিবাহের পরে তাঁহার গানে সে উন্মাদনা অনুভব করি নাই। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আমার অবর্ত্তমানে তিনি হয়ত মনের আবেগে

ওরে সাবধানী পথিক বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে—

গাহিয়া পাড়ার বাতাস করুণ করিয়া তোলেন, কিন্তু আমার কাছে তাঁহার সেই আবেগ রুদ্ধ হইয়া যায়। ভাবিতে বসি, কেন এমন হয়। একটা কারণও আমি মনে মনে বাহির করিয়াছি। Idea of possession—অধিকারের ভাব বা স্বামীত্বের ভাবটবাই পৃথিবীতে মারাত্মক। যে সকল বই আমার নিজের আছে, আজ পর্য্যন্ত সেগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। পরের কাছ হইতে বই ধার করিয়া আনিয়া ভাল করিয়া পড়িয়াছি, মজিয়াছি। এও বুঝি সেই রকম। স্ত্রী মনে করেন স্বামীর কবিতা, ওতো আমারি সম্পত্তি, সেই আনন্দটুকুই যথেষ্ট, পড়িয়া আনন্দ পাইবার প্রয়োজন কি ? স্বামী ভাবেন, স্ত্রীর গান ! সে তো একান্ত আমারই—ইহা অপেক্ষা অন্যের ছবি দেখিলে লাভ আছে। এই স্বামীত্বের ভাবের দরুণ পৃথিবীতে সকল পরিবারের ভয়াবহ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইতেছে। বিবাহের পূর্ব্বে যাহারা একান্ত আত্মীয় ছিল, বিবাহের পরে তাহারা বিচ্ছিন্ন ও অপরিচিত থাকিয়া যাইতেছে।

কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম—বিবাহিত জীবনের অবস্থা বর্ণনা করিতে বসিয়া দর্শনের অবতারণা করিলাম। আসলে বস্তুটা এত delicate যে আমি কিছুতেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না। পৃথিবীতে অধিকাংশ স্বামীস্ত্রীই হয় তো সুখে আছেন, ট্র্যাজেডির ভাবটা জাগিয়াছে আমার মনে। আমি তাঁহাদের জীবনেও তাহা আরোপ করিতেছি।

কিন্তু সত্যই কি তাই ? ট্র্যাজেডিই যদি না থাকিবে তবে এত মিথ্যার প্রয়োজন কেন ? সামান্য স্খলন-ত্রুটিতে এত ক্রোধ কেন ? রামের স্ত্রী আমাকে হয়তো মোহাবিষ্ট করিয়াছে, তাহার স্বর যদি কখনো কর্কশ হইয়া উঠে, কোনো ইতর কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে শুনি, 'আমার রাগ হয় না কেন ? অথচ নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে নেশা কাটিয়া যায় বলিয়াই দোষগুলি চোখে পড়ে। নেশার অভাবটাই মিথ্যা দিয়া ঢাকিতে হয়। যেদিন আমার মনে অধিকারের ভাব অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী স্বামী হইলাম এই ভাব জাগ্রত হয় সেদিন হইতেই বিবাহের মন্ত্রের অবমাননা সুরু হয়।

কিন্তু এমনও শোনা যায় যে স্ত্রীর জন্য দুই সহোদর ভাইয়ে পৃথক হইয়া গেল, ছেলে বাপকে ছাড়িয়া ভিন্ন সংসার পাতিল। সকল স্থলেই যে স্ত্রীরা দোষী এমন না হইতে পারে কিন্তু সত্যই যেখানে স্ত্রীরা দোষী সেখানে তাহারা ভাগ্যবতী। তাহাদের স্বামীদের অক্ষয় শ্রেষ্ঠ—এক আনার ডাকটিকিট পর্য্যন্ত তাহাদের অধঃপতন হয় না।

নিজের কথা বলিতেছিলাম, গল্প বলিতেছিলাম, তথ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। তথ্যাংশের জন্য পাঠক মাপ করিবেন। শ্রদ্ধেয় হিতেন দা' বলিয়াছেন অন্ততঃ একফর্ম্মা লেখা দিতে হবে অথচ আমার গল্প ছোট, প্লটও তেমন দানা বাঁধে নাই। হয় তো বৃদ্ধ হইলে বাঁধিবে কিন্তু ততদিনে কুন্তলীনের পৃষ্ঠপোকষদের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার ছাপাইবার প্রয়োজন না থাকিতেও পারে। তাই ফাঁকি দিয়া কিঞ্চিৎ মনের কথা বলিয়া লইলাম। এমন সুযোগ আর মিলিবে না। কে জানে, কিছুদিন পরে শান্ত প্রেয়সী মুখরা হইবেন, তাঁহার রসনার ভয়েই রসনা সংযত করিয়া চলিতে হইবে।

দ্বিতীয় অবস্থা—বিরহের অবস্থা, এই অবস্থার প্রকার-ভেদ নাই। বেদবর্ণিত পুরুষরা, রামায়ণে বর্ণিত রাম, মেঘদূত বর্ণিত যক্ষ, সকলেই প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত হইয়াছেন, কাঁদিয়াছেন। রাম সীতার স্বামী ছিলেন। উর্ব্বশী পুরুরবার এবং যক্ষপ্রিয়া যক্ষের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন কি না জানা নাই—ইহাদিগকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া ধরিয়া লইলেও একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীনতম বিরহী পুরুরবা ও আধুনিকতম বিরহী ফণীন্দ্রনাথ সকলেই উল্লাসের অন্তরালে গা ঢাকা দিয়া কাজ সারিয়াছেন। মেঘদূতের যক্ষ মেঘকে দূত করিয়া যে কথা বলিতে চাহিয়াছেন, আমা'দের ফণীন্দ্রনাথও এক আনার ডাক টিকিটের সাহায্যে প্রেয়সীকে সেই কথাই বলিতে চাহিতেছেন। বিরহের অবস্থাব ফাঁকি অত্যন্ত systematic এবং গতানুগতিক। যাক্। আরো কিছুকাল অতীত হইয়াছে। তালতলা হইতে বাসা বদলাইয়া মাণিকতলায় আসিয়াছি। এবারের বাড়ীটি গৃহিণীর পছন্দ-মাফিক হইলেও প্রথমদিনই ঘরদুয়ার জিনিসপত্র গুছাইয়া ছাদে গিয়া তিনি ঝুনা সেনা নায়কের মতো চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া লইবেন—কোথায় কতদূরে কি ধবণের শত্রু বিবাজ করিতেছে—সমস্ত নির্দ্ধাবিণ করিয়া আসিয়া তিনি গুম্ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, বাড়ীটা বিশ্রী।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? বাড়ী বদ্‌লানোর হাঙ্গামা কতখানি, সম্প্রতি বুঝিয়াছি।

প্রেয়সী শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, বাড়ীর ছাদটা ভাল ছিল কিন্তু ছাদে দাঁড়াবার জো নেই—

এ-বিষয়ে বেশী ঔৎসুক্য প্রদর্শন ঠিক নহে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলাম। বুঝিলাম, বুদ্ধিমতী প্রেয়সী শীঘ্রই একটা বিহিত করিয়া ফেলিবেন—ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ অশান্তি থাকিবে।

নূতন বাড়ীতে শীঘ্রই পাকাপাকি রকম বাসা বাঁধিলাম। প্রতিবেশীদের সহিত প্রেয়সীর আলাপ জমিয়া গেল, কেউ দিদি, কেউ খুড়ী, কেউ মাসী আমার চাল বিগড়াইবার সুবিধা পাইল না।

যেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অফিস হইতে ফিরিতাম ও গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইবার জন্য ছাদে যাইবাব ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতাম, প্রেয়সী বলিতেন, যাও না, একটু মাঠে বেড়িয়ে এসো। মেয়েরা তো আর তোমাদের মতো হুট ক'রে বাইরে হাওয়া খেতে বের হতে পাবে না, ওই ছাদটুকুই সম্বল। তাও কি কেড়ে নেবে?

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে চাটুর্য্যেদের ছাদের উপব গুম্ফমণ্ডিত একটি যুবকেব প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাঠে বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতাম।

বৈশাখে বাড়ী বদলাইয়াছিলাম, পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। সবমা তাহার মায়ের সহিত কিছুকাল তাঁহার পিত্রালয়-প্রবাসী হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া পুরী যাইবার মতলব করিয়াছিলাম, এ কথা সরমার নিকট প্রকাশ করি নাই। কারণ, তাহাকে জানাইলে সেও সঙ্গী হইতে চাহিত। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে'—এ উক্তি সে মানিত না। সুতরাং একটু অভিমানের ভাব দেখাইয়া, কিছু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে সম্মত হইলাম।

সেদিন রাত্রে হাওড়া ষ্টেশনে প্রেয়সীকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া আসিয়া একটী সুদীর্ঘ আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছাদে ইজিচেয়ারে বসিয়া চুরুট ধরাইলাম। নারিকেল-পল্লবের মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনটা উদাস হইয়া গেল; আকাশে মেঘের আবরণ নাই, সুনীল

আকাশ মুক্তির আনন্দে যেন হাসিতেছে, আমিও একটা অপূর্ব্ব মুক্তির আস্বাদ অনুভব করিলাম। উত্তরের কোনও বাড়ী হইতে নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছিল—

মধুর মধুর রাতি—

অনুভব করিলাম, বিবাহ করা ইস্তক জীবন ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মনের লঘুতা হারাইয়াছি। ইজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া বিবাহের বিরুদ্ধে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়া ফেলিলাম। মনে পড়িল, Isadora Duncan তাঁহার জীবনীতে মেয়েদের তরফ হইতে এ বিষয়ে একটা সূক্ষ্ম এবং গম্ভীর আলোচনা করিয়াছেন। নীচে আসিয়া তাঁহার বইখানা লইয়া পড়িলাম—

No woman has ever told the whole truth of her life. The autobiographies of most famous women are a series of accounts of the outward existence, of petty details and anecdotes which gives no realisation of their real life. For the great moments of joy or agony they remain strangely silent.

তিনি নিজে সর্ব্বপ্রথমে নারীর মর্ম্মকথা বলিতে চাহিয়াছেন—

I enquired into the marriage-laws and was indignant to learn of the slavish condition of women. I began to look enquiringly at the faces of the married woman friends of my mother, and I felt that on each was the mark of the green eyed monster and the stigma of the slave...the ethics of the marriage-code are an impossible proposition for a free-spirited woman to accede to.

পুরুষের তরফ হইতে আমারও সেদিন বলিতে ইচ্ছা হইল যে, নারীকে বিবাহ করিয়া পুরুষও কম দাসত্ববন্ধন স্বীকার করে না। কোনো পুরুষ এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমরা প্রত্যহ প্রত্যেকে অনুভব করি যে পুরুষ যেদিন নারীকে বিবাহ করিয়া তাহার গৃহশোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য আপনার গৃহ আনিয়া হাজির করিয়াছে, সেই দিনই তাহার মুক্তির মৃত্যু হইয়াছে!

প্রবন্ধ খানিকটা লেখা হইতেই ভয়ানক ঘুম পাইতে লাগিল। আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যার আশ্রয় লইতে অকস্মাৎ মনে হইল, ঘরটা ভয়ানক খালি, একেবারে শূন্য যেন! মনে হইল, শয্যা খালি—বুকের খানিকটাও খালি-খালি ঠেকিতে লাগিল। আমি ভাল বিছানায় শুইতে ভালবাসি, প্রেয়সী তাহা জানিতেন। বিছানাটি তিনি অতীব যত্নের সহিত প্রস্তুত করিতেন। আজ মনে হইল, বিছানায় যেন ধূলা কিচ্‌কিচ্‌ করিতেছে—পিপীলিকারা সারবন্দী হইয়া চলাফেরা করিতেছে। ঘুম আসিল না। একটা অতি পরিচিত মধুর স্পর্শের জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়া উঠিল। মনে হইল, মিথ্যা প্রবন্ধ, মিথ্যা Isadora Duncan-এর জীবনী। তারপর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়া প্রেয়সীরই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

পরদিন দল বাঁধিয়া হৈ-হৈ রৈ-রৈ করিতে করিতে পুরী যাত্রা করিলাম। সমুদ্র ও মন্দির দেখার ক্ষুধা মিটিতে একদিনের অধিক দেরী হইল না। সমুদ্র-তীরের হোটেলে সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া কলিকাতার কোটর-বাসী আমরা তাস খেলিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। এবং বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, পাঁচদিনের দিন পুরী ত্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় দর্শন দিলাম। আসিবার সময় নিজের জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্তি হইল না, প্রেয়সীর জন্য কর্পূরের মালা, জগন্নাথের পট ও মহাপ্রসাদ এবং সমুদ্রের কড়ি ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া আনিলাম।

কলিকাতায় ফিরিয়া সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নূতন করিয়া প্রেমে পড়িলাম। এখনও

সেই বাড়ীতে বাস করিতেছি বলিয়া ভরসা করিয়া নাম-ঠিকানা দিতে পারিতেছি না, কিন্তু এবারকার প্রেমটা যেন একটু বেশী গাঢ়, বেশী গভীর মনে হইল।

নূতন নায়িকার হাতের সাজা পান খাইবার লোভে তাহাদের এঁদো ঘরের নোংরা বিছানায় চিৎ হইয়া পড়িয়া আমার মতো স্বপ্নবিলাসী কবি এবং সাহিত্যিক যে কেমন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিত, তাহা ভাবিলে আজিও অবাক হই। সেইবাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আসিয়া নির্ব্বিবাদে কোলে পিঠে চাপিয়া কাপড় নোংরা করিয়া অত্যাচার করিতে লাগিল, অম্লান বদনে তাহাদের সর্দ্দি মুছাইয়া দিয়া আদর দেখাইতে লাগিলাম। বস্তুতঃ বুড়া বয়সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ।

নেশায় এমনি মত্ত হইয়াছিলাম যে, প্রেয়সীকে সপ্তাহে একখানি চিঠি লিখিবার সময় কষ্টে করিয়া উঠিতে পারিতাম। প্রেমচর্চ্চার নিত্যনূতন পন্থা আবিষ্কারের চিন্তায় মশগুল থাকিয়া প্রেয়সীকে লিখিতাম,—

সত্যি সরি আর পারি না। দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা লোকে বোঝে না। তুমি কাছে না থাক্‌লে আমার কি দুর্দ্দশা হয়, তুমি কল্পনাও কর্‌তে পার্‌বে না। একলাইন কিছু লিখতে পার্‌ছি না। বিছানায় চুপচাপ প'ড়ে আছি আর ভাবছি, কবে তুমি এসে আমার এই ছোট্ট ঘরখানি ভ'রে তুল্‌বে। আকাশ আমার শত্রুতা কর্‌ছে, বাতাস অত্যাচার সুরু করেছে, নারকেল গাছের পাতাগুলো পর্য্যন্ত দুষ্টুমি কর্‌তে ছাড়চে না। আর কতদিন তুমি বাইরে থাক্‌বে? এক দিনের ছুটিও পাচ্ছি না যে আমার সরিকে দেখে আস্‌ব। ভাবছি এ ছাই চাক্‌রী ছেড়ে দেব।

তারপর এক আনার একটি ডাক-টিকিট সংগ্রহ করার অপেক্ষা মাত্র। বিবাহিত জীবনের বিরহকালের কর্ত্তব্য শেষ!

এদিকে বেকার আইবুড়ো বন্ধুর দল খালি পাইয়া আমার বাড়ীটার এমন অবস্থা করিল যে ভয় হইতে লাগিল, পাড়ার লোকের নালিশে বাড়ীওলা বুঝি নোটিশই দেয়! চা আর চুরুট, হল্লা গান। আমি থাকি আর নাই থাকি, সমানে আড্ডা চলিতে লাগিল। বিশেষ কারণে পাশের বাড়ীতে গিয়া আমি যখন ছেঁড়া তেল্‌চিট্‌চিটে মাদুরে শুইয়া কড়ি-বরগা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি, শুনিতে পাইতাম, আমার শোবার ঘরে বন্ধুজন সমবেত হইয়া কোনও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে রচিত আমারই একটি ইংরাজি গান তারস্বরে গাহিতেছে—

Oh, had our wives
Known the lives
In separation we are leading,
The wild oats we sow
If they should know,
How'll they love us, when
reading
The letters we write
From love's high hieght—

আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইত। প্রেমের অবস্থা এবং বন্ধুদের অত্যাচার ক্রমশঃ সঙ্গীন হইতে লাগিল। জীবনে কখনো নিজের বাড়ীর বাজার করি নাই, আমার নায়িকার বাড়ীর বাজার করিতে গিয়া নাকাল হইতে লাগিলাম। শেষ কালে যখন এমন অবস্থা হইল যে এক আমার ডাক টিকিটও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন একদা

কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইলাম। কোথায় বন্ধুজন, কোথায় নূতন প্রেমের নায়িকা! চাকরে শিয়রে বসিয়া বাতাস করে, মন পাশের বাড়ী ডিঙাইয়া বহুদূরে ছুটিয়া যায়। মধুর স্নেহের স্পর্শের লোভে ললাট ঘামিয়া উঠে, ম্লানমুখী প্রেয়সীকে পাশে দেখিবার জন্য মন কাঁদিতে থাকে।

প্রেয়সীর চিঠিতে ব্যাকুলতা, আমার কি হইয়াছে, শরীরটা কেমন আছে, এক ছত্র লিখিয়াও কি জানাইতে পারি না! শিশিরার্দ্র শিউলিফুলের কথা তাহাতে নাই, আকাশের নীলিমার কোনো আভাস নাই—তবু ভাল লাগে।

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া থাকিতাম। পাশের বাড়ীর কর্ত্তা আমাকে দেখিতে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং কখন তিনি তাঁহার কন্যাকে দিয়া এক আনার ডাক টিকিটের সাহায্যে আমার গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, জানিতে পারি নাই! তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নিতান্ত অসুখ দেহে অনুভব করিলাম আমার অন্ধকার গৃহ হাসিতেছে। পথক্লান্ত প্রেয়সী আমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছেন। অত্যন্ত আরামে 'আঃ' বলিয়া তাঁহার একটি হাত আমার শীর্ণ হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন প্রথমেই নজরে পড়িল সদ্যস্নাতা আলুলায়িতকুন্তলা প্রেয়সী মেঝেয় বসিয়া অত্যন্ত যত্নে সাবুর সহিত লেবুর রস মিশাইতেছেন। আমার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

সেই দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি, মানুষ দার্শনিক নহে, মানুষ মানুষই।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

হনুমানের স্বপ্ন

পরশুরাম রচিত

যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ্য শান্তি ও স্বাস্থ্যের নিলয় হইল, প্রজার গৃহ ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল। তস্কর বঞ্চক ও পণ্ডিত-মূর্খগণ বৃত্তিনাশহেতু পলায়ন করিল। দেশে আর্ত্ত পীড়িত নাই, ধর্ম্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদী নাই, কারাগার জনশূন্য। ভিষক্‌গণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, বিচারকগণ পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে রত হইয়া অবসরবিনোদন করিতে লাগিলেন।

হনুমান এখন অযোধ্যাতেই বাস করেন। রাম তাঁহার জন্য এক সুরম্য কদলীকাননে সপ্ততল কাষ্ঠভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভক্ত প্রজাবর্গের সমাদরে সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টিলাভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। অযোধ্যাবাসী উদ্বিগ্ন হইয়া দেখিল পবননন্দন দিন দিন কৃশ হইতেছেন, তাঁহার কান্তি ম্লান হইতেছে, তাঁহার আর তেমন স্ফূর্তি নাই। রামের আদেশে রাজ-বৈদ্যগণ হনুমানের চিকিৎসা করিলেন, বিস্তর অরিষ্ট মোদক রসায়নাদির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কোনও উপকার দেখা গেল না। ভিষক্‌গণ হতাশ হইয়া বলিলেন—মহাবীরের যে ব্যাধি, তাহা আধ্যাত্মিক, ঔষধে সারিবার নয়। অগত্যা বশিষ্ঠ ঋষি হনুমানের মঙ্গলকামনায় এক বিরাট যজ্ঞের উদ্যোগ করিলেন।

তখন রাজ্ঞী সীতা হনুমানকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, তোমার কি হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার মাতৃতুল্য, বলিতে সঙ্কোচ করিও না। মহাবীর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাম গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিলেন, তাহার পর দক্ষিণ গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিলেন। তদনন্তর মস্তক নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—মাতঃ, আমার গোপন কথা যদি নিতান্তই শুনিতে চাও তবে না বলিয়া উপায় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি স্বপ্নে পিতৃপুরুষগণকে দেখিয়াছি। তাঁহারা সুমেরুপর্ব্বতে সারি সারি পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন এবং বিষণ্নবদনে নিজ নিজ উদরে হাত বুলাইতেছেন। এই দুঃস্বপ্নের অর্থ আমি বশিষ্ঠপুত্র বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—হে মহাবীর, ও কিছুই নয়, তোমার পিতৃগণ ক্ষুধিত হইয়াছেন, তুমি কদলী দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ কর এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূরি-দক্ষিণা দাও। আমি বামদেবের উপদেশ পালন করিলাম, কিন্তু তাহার পর আবার পিতৃগণ আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল যে তাঁহারা ক্ষণিক ব্যবস্থায় তৃপ্ত হইবেন না। আমার মৃত্যুর পর কে তাঁহাদের পিণ্ড দিবে ? লোকে যে-বয়সে বিবাহ করিয়া

গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করে, আমি সেই বয়সে সুগ্রীবের অনুচর হইয়া বানপ্রস্থে কালহরণ করিয়াছি। এখন প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় সুগ্রীব নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন, রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে, আমারও অবসর মিলিয়াছে। কিন্তু আমি বার্দ্ধক্যের দ্বারদেশে উপস্থিত, এখন যদি গৃহী হইতে চাই তবে লোকে আমাকে ধিক্‌কার দিবে। হা, আমার পিতৃঋণ শোধের কি উপায় হইবে ? হে দেবি, এই দুশ্চিন্তা আমাকে অহরহ দহন করিতেছে, আমি নিরন্তর পিতৃগণের ম্লান মুখ ও শূন্য উদর দেখিতে পাইতেছি, আমার ক্ষুধা নাই নিদ্রা নাই শান্তি নাই—এই বলিয়া হনুমান্ নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

হনুমানের বচন শুনিয়া দেবী জানকী ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন—হে বীরশ্রেষ্ঠ, এজন্য আর চিন্তা কি ? তুমি লোকলজ্জায় অভিভূত হইও না, এই দণ্ডে বিবাহ করিয়া পিতৃগণকে নিশ্চিন্ত কর। তোমার কী এমন বয়স হইয়াছে ? আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় তোমার অপেক্ষাও অধিক বয়সে ভরতজননীকে গৃহে আনিয়াছিলেন। আমি আমার সখীগণকে ডাকিয়া আনিতেছি, তাহারা সকলেই সুরূপা সুশীলা সদ্‌বংশীয়া। তোমার যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে বরণ্ কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি এই অযোধ্যায় এমন কন্যা নাই যে তোমাকে পতিরূপে পাইয়া ধন্য হইবে না। হে কপিপ্রবর, তুমি তোমার জাতির জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। আমি অনুরোধ করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ উপনয়নসংস্কার দ্বারা তোমাকে ক্ষত্রিয় বানাইয়া দিবেন। অথবা যদি মানবীতে তোমার অভিরুচি না থাকে, তবে কিষ্কিন্ধ্যা গমন কর এবং একটি পরমাসুন্দরী বানরীর পাণিগ্রহণ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় ফিরিয়া এস। তোমার পত্নীর নাম যাহাই হউক আমি তাকে হনুমতী বলিব, এবং এই রাজপুরীর বধূগণমধ্যে সাদরে গ্রহণ করিব।

তখন হনুমান প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন—হে জনকনন্দিনি তোমার জয় হউক। আমি কৌলিন্য ভঙ্গ করিব না, বানরীই বিবাহ করিব, এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া অদ্যই কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা করিব।

হনুমান নানা গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ন, সূর্য্যাস্তের বিলম্ব নাই। মহাবীর এক বিশাল শাল্মলীতরুর শাখায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন নিকটে কোথায় রাত্রিবাসের উপযুক্ত আশ্রয় আছে কিনা। সহসা অদূরে একটি সুবৃহৎ পর্ণগৃহ নয়নগোচর হইল। হনুমান বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন তাহার অভ্যন্তর পরিপাটিরূপে সজ্জিত। ভূমিতে কোমল তৃণরাশির উপর মসৃণ মৃগচর্ম্মের আস্তরণ, এক কোণে স্তূপীকৃত সুপক্ক আম্র পনস রম্ভাদি ফল, অন্য কোণে চন্দনকাষ্ঠের মঞ্চের উপর রাজোচিত বসন উত্তরীয় উষ্ণীষ প্রভৃতি পরিচ্ছদ এবং বিবিধ প্রসাধনদ্রব্য, প্রাচীরগাত্রে লম্বিত একটি সুরম্য বীণা। হনুমান্ সমস্ত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন—অহো, নিশ্চয়ই স্বর্গস্থ পিতৃগণ আমার প্রতি স্নেহবশে এই উপহারসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত আমি এখনই এই পরিচ্ছদ ধারণ করিব এবং রাত্রিকালে এই উপাদেয় ভোজ্যসকল আহার করিব।

এই বলিয়া হনুমান্ সেই বিচিত্র বসন-উত্তরীয়াদি পরিধান করিলেন এবং মস্তকে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া অতিশয় শোভমান হইলেন। তাহার পর শয্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিলেন—এখনও বেলা অবসান হয় নাই, ভোজনের বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আমি ঐ

বীণা বাজাইয়া দেখি। মহাবীর সাবধানে বীণাটি পাড়িলেন, কিন্তু বাদ্যের উপক্রম করিতেই সমস্ত তার ছিঁড়িয়া গেল। হনুমান্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এই ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্র বীরের অস্পৃশ্য। তখন তিনি মৃগচর্ম্মে শয়ান হইয়া ভাবী ভার্য্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কান্তা কেমন হইবে ? তন্বী না স্থূলা, পিঙ্গলবর্ণা না রক্তকপিশপ্রভা, ধীরা না চপলা, কলকণ্ঠী না কর্কশনাদিনী ? ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার চিত্তে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। হনুমান্ স্বগত কহিতে লাগিলেন—অহোবত, আমি এ কী ঘোর কর্ম্মে সমুদ্যত হইয়াছি। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছি, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি। সাগরে অম্বরে পর্ব্বতে অরণ্যে আমার অজ্ঞাত কিছু নাই। আমি সমরে অভিজ্ঞ, সঙ্কটে ধীর, দেবচরিত্র কাকচরিত্র আমার নখদর্পণে। কিন্তু স্ত্রীজাতির রহস্য আমি কি-ই বা জানি ! এই অদ্ভুত প্রাণীর গুম্ফ নাই শ্মশ্রু নাই বল নাই সাহস নাই। অথচ দেখ, ইহারা শিশুকে স্তন্যদান করে, কিন্তু আমরা তাহা পারি না। ইহারা অকারণে হাস্য করে, অকারণে ক্রন্দন করে তুচ্ছ মুক্তা প্রবাল ইহাদের প্রিয়, সন্তানপালন ও নিরর্থক বস্তুসংগ্রহই একমাত্র কার্য্য। ঈদৃশী কোমলাঙ্গী মসৃণবদনী পয়স্বিনী শিশুপালিনী ভার্য্যার সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব ? যদি সে আমার প্রিয়কার্য্য করে তবে কি তাহাকে মস্তকে উত্তোলন করিয়া সমাদর করিব ? যদি অবাধ্য হয় তবে কি চপেটাঘাতে নিধন করিব ? বানরধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ শাসনের বিধান আছে বটে, কিন্তু মানবশাস্ত্র কি বলে ?

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সেই পর্ণগৃহের দ্বারদেশে এক সুদর্শন যুবাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার বেশভূষা বহুমূল্য, স্কন্ধ হইতে শরাসন লম্বিত, পৃষ্ঠে তূণীর, এক হস্তে বাণবিদ্ধ দশটি তিত্তিরপক্ষী, অন্য হস্তে একটি সদ্য আহৃত বৃহৎ মধুচক্র। আগন্তুক হনুমান দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন—রে বানরাধম, তুই কোন্ সাহসে আমার রাজবেশ আত্মসাৎ করিয়া আমার শয্যায় শুইয়া আছিস ? দাঁড়া, এখনি তোকে যমালয়ে পাঠাইতেছি।

হনুমান কহিলেন—হে বীরপুঙ্গব, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। হঠকারিতা মূর্খের লক্ষণ, ধীরব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন। আমি রামদাস হনুমান, লোকে আমাকে মহাবীর বলে। ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

তখন আগন্তুক সসম্ভ্রমে ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া কহিলেন—অহো, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে শ্রীহনুমানের দর্শনলাভ করিলাম ! হে মহাবীর, তুমি আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তুম্বদেশের অধিপতি, নাম চঞ্চরীক। তোমার যোগ্য সৎকার করি এমন আয়োজন আমার এই অরণ্যকুটীরে নাই। যদি কোনও দিন আমার রাজপুরীতে পদরেণু দাও তবেই আমার তৃপ্তি হইবে। হে অঞ্জনানন্দন, তুমি ঐ রমণীয় পরিচ্ছদ উষ্ণীষাদি খুলিয়া ফেলিতেছে কেন, উহাতে তোমাকে সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় দেখাইতেছে। আমি এই দর্পণ ধরিতেছি একবার অবলোকন কর। তুমি অনুমতি দাও, আমি এই সুস্বাদু তিত্তিরমাংস দগ্ধ করিয়া দিতেছি। তুমি বুঝি নিরামিষাশী ? তবে ঐ আম্র পনস রম্ভাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। হে মারুতি, তুমি বিমুখ হইও না, একবার মুখব্যাদান কর, আমি এই মধুচক্র তোমার বদনে নিংড়াইয়া দি।—তুমি বোধ হয় সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছিলে, তাই আমার বীণাটির এমন দশা হইয়াছে। হে মহাবীর, তুমি বুঝি কার্ম্মুক ভাবিয়া উহাতে টঙ্কার দিয়াছিলে ?

হনুমান্ কহিলেন—হে চঞ্চরীক, তোমার অভ্যর্থনায় আমি প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তুমি

অধিক বাচালতা করিও না, আমার এই বজ্রমুষ্টি দেখিয়া রাখ, ইহা হঠাৎ ধাবিত হয়। এই পরিচ্ছদে আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তুমিই ইহা পরিধান করিও। আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইও না, যথাকালে তাহা হইবে। তোমার বীণা কোনো কর্ম্মের নয়। দুঃখ করিও না, আমি উহাতে শণের রজ্জু লাগাইয়া দিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কিজন্য বিজন অরণ্যে এই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছ? যদি নরপতি হও, তবে তোমার গজবাজি অনুযাত্র সৈন্যদল দেখিতেছি না কেন? তোমার রথ সারথি কোথায়, বিদূষকই বা কোথায়?

চঞ্চরীক কহিলেন—হে বানরর্ষভ, আমি মনের দুঃখে একাকী অরণ্যবাস করিতেছি, এখন আমিই আমার রক্ষী, আমিই সারথি, আমিই বিদূষক। আমার কাহিনী অতি করুণ, শ্রবণ কর। আমার মহিষী পরমরূপবতী এবং অশেষগুণশালিনী, কিন্তু তাঁহাকে ঠিক পতিব্রতা বলিতে পারি না। একদা আমি তাঁহার এক সুন্দরী সখীর সহিত কিঞ্চিত রসচর্চ্চা করিতেছিলাম, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া ফেলেন। এই তুচ্ছ কারণে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ক্রোধাগারে বসতি করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে এই অরণ্যে বাস [illegible] এবং পশুপক্ষী মারিয়া [illegible]ন্ত্রণা লাঘব করিতেছি। হে পবননন্দন, এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে একা ভার্য্যা অশেষ অনর্থের মূল। শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন—অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ। শুনিয়াছি এই অরণ্যে মহাতপা লোমশ মুনি বাস করেন। নারীজাতিকে বশে রাখিবার উপায় তিনি সম্যক অবগত আছেন, কারণ তাঁহার একশত পত্নী। আমি স্থির করিয়াছি তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিব। আমার কথা সমস্ত বলিলাম, এখন তুমি কিজন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ শুনিতে ইচ্ছা করি। রামচন্দ্র কি পূর্ব্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তোমার অনাদর করিয়াছেন?

হনুমান্ কহিলেন—সাবধান, তুমি রামনিন্দা করিও না। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছি, সেখানে দারপরিগ্রহ করিয়া বধূর সহিত অযোধ্যায় ফিরিব। তোমার উপর আমার প্রীতি জন্মিয়াছে, অতএব মনের কথা খুলিয়া বলি। হে চঞ্চরীক, আমি স্ত্রীতত্ত্ব অবগত নহি, কেবল পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্যই এই দুরূহ সঙ্কল্প করিয়াছি। তোমার দাম্পত্যকাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে।

চঞ্চরীক কহিলেন—হে হনুমান, ভয় নাই। তুমি যখন গন্ধমাদন বহন করিয়াছ তখন ভার্য্যার ভারও বহিতে পারিবে। আমি তোমাকে সমস্তই শিখাইয়া দিব। সম্প্রতি কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর।—পুত্রার্থে ভার্য্যা করা অতি সহজ কর্ম্ম, কিন্তু যদি প্রেমের জন্য ভার্য্যা করিতে হয় তবে স্ত্রীচরিত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। নিজস্ত্রী সলজ্জা হইবে এবং পরস্ত্রী নির্লজ্জা হইবে ইহাই রসজ্ঞজনের কাম্য। তোমার রামরাজ্যের কথা অবগত নহি, কিন্তু, সংসারে এই শুভসমন্বয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব—

হনুমান কহিলেন—ওহে চঞ্চরীক, তুমি ক্ষান্ত হও। আগে নিজ সমস্যার সমাধান কর, তাহার পর আমাকে উপদেশ দিও। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন ভোজনের আয়োজন করিতে পার। কুটীরদ্বার বন্ধ করিয়া দাও, বনভূমির শীতবায়ু আর আমার তেমন সহ্য হয় না।

চঞ্চরীক অর্গল বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন এবং ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা দ্বারে করাঘাত করিয়া কে বলিল—ভো গৃহস্থ, অর্গল মোচন কর, আমি শীতার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত অতিথি।

চঞ্চরীক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে এক শীর্ণকায় তপস্বী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার

মস্তক জটামণ্ডিত, শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, দেহ লোমে সমাকীর্ণ। চঞ্চরীক প্রণাম করিয়া কহিলেন—হে তপোধন, আপনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি যে আপনি স্বনামধন্য লোমশ ঋষি। আপনার দর্শনলাভের জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছিলাম, আপনি বোধ হয় যোগবলে জানিতে পারিয়া কৃপাবশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তুম্বরাজ চঞ্চরীক, আর ইনি আমার পরমবন্ধু জগদ্‌বিখ্যাত মহাবীর হনুমান্‌। এই কপিপ্রবর দারপরিগ্রহের জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছেন, কিন্তু সহসা ইহার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে। আমারও অবস্থা ভাল নয়। আমার একটি ভার্য্যা আছেন বটে, কিন্তু আমি বৈচিত্র্যের পিপাসু, ভূমার আস্বাদ লইতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, শুনিয়াছি দাম্পত্যতত্ত্বে আপনার জ্ঞানের পরিসীমা নাই। আপনার জন্য এই পক্ষিমাংস শূল্যপক্ক করিয়া দিতেছি, আপনি ততক্ষণ কিঞ্চিৎ সৎপরামর্শ দিন।

ইত্যবসরে মহর্ষি লোমশ একটি অতিকায় পনস ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার সুপক্ক কোষ-সকল ক্ষিপ্রহস্তে বদনে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এখন ভোজন সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—হে পবননন্দন, হে তুম্বরাজ, তোমরা চিরজীবী হও। এখন আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেছি। অষ্টাহকাল আমার আহার নিদ্রা নাই, আমি গৃহচ্যুত, কৌপীনমাত্রসম্বল।

শরাসনে ঝটিতি জ্যারোপণ করিয়া চঞ্চরীক কহিলেন—প্রভো, কোন্‌ দুরাচার রাক্ষস আপনার আশ্রম লুণ্ঠন করিয়াছে? অনুমতি দিন, এই দণ্ডে তাহাকে বধ করিব। আপনার সকল পত্নীই কি অপহৃতা হইয়াছেন? হে মহাবীর, গাত্রোত্থান কর, আবার তোমাকে সাগরলঙ্ঘন করিতে হইবে। বিভীষণকে ছাড়িয়া দিয়া ভাল কর নাই।

লোমশ কহিলেন—তোমরা ব্যস্ত হইও না, আমার ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এই দক্ষিণাপথে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারকল্পে শতজন নরপতি আমার শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের রাজ্যের হিতার্থ আমি এক বিরাট্‌ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সুবৃষ্টি আনয়ন করি। কৃতজ্ঞ নরপতিগণ দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদের শতকন্যা আমাকে সম্প্রদান করেন এবং ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থাও করেন। আমি এই রাজনন্দিনীগণের বাসের জন্য আমার তপোবনে একশত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি।

চঞ্চরীক জিজ্ঞাসিলেন—হে মুনিবর, আপনার তপোবনে ক্রোধাগার আছে ত?

লোমশ কহিলেন—প্রত্যেক গৃহই ক্রোধাগার। হতভাগিনীগণ নিরন্তর কলহ করে, তাহাদের গৃহকর্ম্ম নাই, পতিসেবা নাই, ব্রতপূজা নাই। আমি আদর করিয়া তাহাদের প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদিক্রমে নবনবতিতমা শততমা পর্য্যন্ত নাম রাখিয়াছি, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে মূষিকা চর্ম্মচটিকা পেচকী ছুছুন্দরী প্রভৃতি ইতর নামে সম্বোধন করে এবং আমাকে ভল্লুক বলে। আমি উত্ত্যক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছি। হে রাজন্‌, তুমি কি ভূমার আস্বাদ চাও? তবে আমরা আশ্রমে গমন কর। শ্রীমান্‌ হনুমানও তথায় পত্নীনির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। আমি আর সেখানে ফিরিতেছি না।. এখন শান্তি চাই, এবং আর একটি বিবাহ করিয়া এক পত্নীর যে সুখ তাহাই উপলব্ধি করিতে চাই।

লোমশ মুনির বচন শুনিয়া হনুমান কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন—হে তপোধন, প্রণিপাত করি ; হে চঞ্চরীক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। এখন বিদায় দাও, আমি সুগ্রীবের নিকট চলিলাম।

চঞ্চরীক ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—সে কি! এই গভীর রজনীতে অরণ্যপথে কোথায় যাইবে? অন্ততঃ প্রভাত পর্য্যন্ত এখানে বিশ্রাম কর।

হনুমান্ কর্ণপাত করিলেন না।

কিষ্কিন্ধ্যার এক সুরম্য উপবনে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি মিত্রগণের সহিত বসিয়া বানররাজ সুগ্রীব নারিকেল ভক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় হনুমান্ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

সুগ্রীব গম্ভীর হইয়া কহিলেন—মহাবীর কি মনে করিয়া ? আমি এখন রাজকার্য্যে ব্যস্ত আছি, অবসর নাই, অন্য কালে তোমার বক্তব্য শুনিব।

হনুমান্ কহিলেন—হে বানরাধিপ, আমি এক বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।

সুগ্রীব কহিলেন—কিষ্কিন্ধ্যায় তোমার সুবিধা হইবে না। তোমার অরণ্যসম্পত্তি যাহা ছিল সমস্তই অঙ্গদ বাবাজী দখল করিয়াছেন। আমারও এখন অত্যন্ত অভাব চলিতেছে, তোমাকে কিছুই দিতে পারিব না। অযোধ্যা ছাড়িলে কেন ? ফিরিয়া গিয়া রামচন্দ্রকে নিজ প্রার্থনা জানাও, তিনি অবশ্যই একটা বিহিত করিবেন। রাঘব ত মন্দ লোক নহেন।

হনুমান্ কহিলেন—ওহে সুগ্রীব, তোমার চিন্তা নাই। আমি তোমার রাজ্যের ভাগ চাই না, অর্থও চাই না, প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনও অভাব নাই। আমি বিবাহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এই অনভ্যস্ত ব্যাপারে আমি সংশয়ান্বিত হইয়াছি, তুমি সৎপরামর্শ দাও।

সুগ্রীব তখন প্রীত হইয়া কহিলেন—হে সুহৃদ্বর, তোমার সঙ্কল্প অতিশয় সাধু। এতক্ষণ বাজে কথা বলিতেছিলে কেন ? ঐ সুকোমল বৃক্ষশাখায় উপবেশন কর, কিঞ্চিৎ নারিকেলোদক পান করিয়া স্নিগ্ধ হও। হে ভ্রাতঃ, আমি সর্ব্বদাই তোমার হিত কামনা করিয়া থাকি। কেবলই ভাবি—আহা আমাদের হনুমান্ এখনও সংসারী হইল না। তুমি বিবাহের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, উহা অতি সহজ কর্ম্ম। দেখ, আমি অষ্টাধিক-শত ভার্য্যায় পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি। আপাতত তুমি একটিমাত্র পত্নী গ্রহণ কর, পরে ক্রমে ক্রমে সংখ্যাবৃদ্ধি করিও। আমি বলি কি—তুমি অন্যত্র চেষ্টা না করিয়া শ্রীমতী তারাকে বিবাহ কর, আমার আর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই। ইনি প্রবীণা এবং পতিসেবায় পরিপক্কা। ইহাকে লাভ করিয়া তুমি নিশ্চয় সুখী হইবে।

হনুমান্ কহিলেন—তুমি তারাদেবীর নাম উচ্চারণ করিও না, তিনি আমার নমস্যা।

সুগ্রীব কহিলেন—বটে ? অযোধ্যায় থাকিয়া তোমার মতিগতি বিগ্ড়াইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, তুমি আর এক চেষ্টা করিতে পার। এই কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণে কিচ্চট দেশ আছে। তাহার অধিপতি প্লবঙ্গম অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরগমন করিয়াছেন, এখন তাঁহার দুহিতা চিলিম্পা রাজ্যশাসন করিতেছে। এই বানরী অতিশয় লাবণ্যবতী বিদুষী ও চতুরা। আমি বিবাহের প্রস্তাবসহ দূত পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু লাঙ্গুল কর্ত্তন করিয়া চিলিম্পা তাহাকে বিদায় দিয়াছে। নল নীল গয় গবাক্ষ ইঁহারাও প্রেমনিবেদন করিতে তাহার কাছে একে একে গিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই ছিন্নলাঙ্গুল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঐ দুর্ব্বিনীতা বানরীর উপর আমার লোভ ও আক্রোশ উভয়ই আছে, কিন্তু আমার অবসর নাই, নতুবা স্বয়ং অভিযান করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতাম। এখন তুমি যদি তাহাকে জয় কর তবে আমার ক্ষোভ দূর হইবে, তোমারও পত্নীলাভ হইবে।

হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—তাহাই হউক। আমি এখনই কিচ্চট দেশে

যাত্রা করিতেছি।

হনুমান্ কিচ্চটরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল বপু দেখিয়া প্রজাগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল এবং চিলিম্পাকে সংবাদ দিল—হে রাজনন্দিনি, আর রক্ষা নাই, এক পর্ব্বতাকার বীর বানর তোমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। চিলিম্পা কহিলেন—ভয় নাই, অমন অনেক বীর দেখিয়াছি। তাহাকে ডাকিয়া আন।

হনুমান এক মনোরম কুঞ্জবনে আনীত হইলেন। চিলিম্পা তথায় সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার কর্ণে রক্তপ্রবাল, কণ্ঠে স্ফটিকমালা, হস্তে লীলাকদলী। হনুমান মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—অহো, সুগ্রীব যথার্থই বলিয়াছেন। এই তরুণী বানরী পরমাসুন্দরী, ইহাকে দেখিবামাত্র আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সংশয় দূর হইল। ইহাকে যদি লাভ করিতে না পারি তবে জীবনই বৃথা।

ঈষৎ হাস্যে কুন্দদন্ত বিকশিত করিয়া চিলিম্পা কহিলেন—হে বীরবর, তুমি কি-হেতু বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ? তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমাকে অভয় দিলাম।

হনুমান্ কহিলেন—হে প্লবঙ্গম-নন্দিনী, আমি রামদাস হনুমান্, অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি, তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া আবার অযোধ্যায় ফিরিতে চাই। আমিও তোমাকে অভয় দিতেছি।

হনুমানের কথা শুনিয়া সখীগণ কিল্‌কিলা রবে হাসিয়া উঠিল। চিলিম্পা কহিলেন—হে হনুমন্, তোমার ধৃষ্টতা কম নয়। তোমার কী এমন গুণ্ আছে যাহাতে আমার পাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইয়াছ?

হনুমান্ কহিলেন—আমি সেই রামচন্দ্রের সেবক, যিনি পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে যান, যিনি রাবণকে সবংশে নিধন করিয়াছেন, যিনি দুর্ব্বাদলশ্যাম পদ্মপলাশলোচন, যিনি সর্ব্বগুণান্বিত লোকোত্তরচরিত।

চিলিম্পা কহিলেন—হে রামদাস, তুমি কি রামচন্দ্রের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?

হনুমান জিহ্বা দংশন করিয়া কহিলেন—আমার প্রভু একদারনিষ্ঠ। জনকতনয়া সীতা তাঁহার ভার্য্যা, যিনি মূর্ত্তিময়ী কমলা, যাঁহার তুলনা ত্রিজগতে নাই। আমি নিজের জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।

চিলিম্পা কহিলেন—তবে নিজের কথাই বল।

হনুমান্ কহিলেন—নিজের কীর্ত্তি নিজে বলা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি প্রিয়ার নিকট আত্মগৌরব কথনে দোষ নাই। অতএব বলিতেছি শোনো। আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি, ভগবান্ ভানুকে কক্ষপুটে রুদ্ধ করিয়াছি, এই দেখ ফোস্‌কার চিহ্ন। আমি শতলক্ষ রাক্ষস বধ করিয়াছি, রাবণের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়াছি, তাহার রথচূড়া চর্ব্বণ করিয়াছি, এই দেখ একটি দাঁত ভাঙিয়া গিয়াছে।

চিলিম্পা কহিলেন—হে মহাবীর, তোমার বচন শুনিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কেবল বীরত্ব চাহে না। তোমার কান্তগুণ কি কি আছে? তুমি নৃত্যগীত জান?

হনুমান্ কহিলেন—অয়ি চিলিম্পে, রাবণবধের পর আমি আনন্দে অধীর হইয়া একবার

নৃত্যগীতের উপক্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু নল নীল প্রভৃতি বানরগণ আমাকে বিদ্রূপ করে, তাহাতে আমি নিরস্ত হই। সুমিত্রানন্দন তখন আমাকে বলেন—হে মারুতি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি যাহা বল তাহাই সঙ্গীত, যাহা কর তাহাই নৃত্য ; ইতরজনের বুঝিবার শক্তি নাই।

চিলিম্পা তাঁহার করধৃত কদলীগুচ্ছ লীলাসহকারে দংশন করিতে করিতে কহিলেন—হে পবননন্দন, তুমি প্রেমতত্ত্বের কতদূর জান ? তুমি কোন্ জাতীয় নায়ক ? ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, প্রশান্ত, না ললিত ? তুমি কি করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিবে, কি করিয়া মানভঞ্জন করিবে ? আমি যদি গজমুক্তার হার কামনা করি তবে তুমি কোথায় পাইবে ? যদি রাগ করিয়া আহার না করি তবে তুমি কি করিবে ?

হনুমান ভাবিলেন—এই বিদগ্ধা বানরী এইবার আমাকে সঙ্কটে ফেলিল, ইহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব ? যাহা হউক, আমি অপ্রতিভ হইব না। হে সুন্দরি, তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, প্রেমতত্ত্বের ইহাই আমার প্রথম জ্ঞান। তুমি চিন্তা করিও না, তুম্বরাজ চঞ্চরীক আমাকে সমস্ত শিখাইয়া দিবেন। তুমি যদি মুক্তাহার কামনা কর তবে জানকীর নিকট চাহিয়া লইব, যদি আহার না কর তবে এই লৌহকঠোর অঙ্গুলীদ্বারা তোমাকে খাওয়াইব। হে প্রিয়ে, আর বিলম্ব করিও না, আমার সহিত চল। সীতা তোমার হনুমতী নাম দিয়াছেন, তিনি তোমাকে বরণ করিবার জন্য অযোধ্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।

চিলিম্পা তখন হনুমানের চিবুকে তর্জ্জনীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন—ওরে বর্ব্বর, ওরে অবোধ, তুমি প্রেমের কিছুই জান না। যাও, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দাও।

হনুমান্ আকুল হইয়া কহিলেন, অয়ি নিষ্ঠুরে, আমাকে আশা দিয়া নিরাশ করিতেছ কেন ? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এই বলিয়া তিনি চিলিম্পাকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিলেন।

চিলিম্পা করতালি দিয়া বিকট হাস্য করিলেন। সহসা বনান্তরাল হইতে কালান্তক যমের ন্যায় দুই মহাকায় নরবানর নিঃশব্দে আসিয়া হনুমান্‌কে অতর্কিতে পাশবদ্ধ করিল। চিলিম্পা কহিলেন—হে উদ্রঙ্গ-উট্রঙ্গ, এই মর্কটের বড়ই স্পর্দ্ধা হইয়াছে, দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ ছাটিয়া দাও।

তখন প্রত্যুৎপন্নমতি হনুমান প্রভঞ্জনকে স্মরণ করিলেন। নিমেষে তাঁহার দেহ হিমাদ্রিতুল্য হইল, পাশ শতচ্ছিন্ন হইল, নরবানরদ্বয় পদাঘাতে সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রকম্পিত করিয়া মহাবীর উপ্ উপ্ রবে তিনবার সিংহনাদ করিলেন, তাহার পর চিলিম্পার কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক জয়রাম বলিয়া ঊর্দ্ধে লম্ফ দিলেন।

ঝঞ্ঝা-বাহিত মেঘের ন্যায় হনুমান্ শূন্যমার্গে ধাবিত হইতেছেন। আকাশবিহারী সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরগণ বলিতে লাগিল—হে পবনাত্মজ, এতদিনে তোমার কৌমারদশা ঘুচিল, আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও। দিগ্‌বধূগণ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—হে অঞ্জনানন্দন, মুহূর্ত্তের তরে গতি সংবরণ কর, আমরা নববধূর মুখ দেখিব। হনুমান্ হুঙ্কার করিলেন, গগনচারিগণ ভয়ে মেঘান্তরালে পলায়ন করিল, দিগ্‌বধূগণ দিগ্‌বিদিকে বিলীন হইল।

চিলিম্পা কাতরকণ্ঠে কহিলেন—হে মহাবীর, আমার কেশ ছাড়িয়া দাও, বড়ই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে লও, নতুবা বক্ষে ধারণ কর।

হনুমান বলিলেন—চোপ্‌।

চিলিম্পা বলিলেন—হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই। হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পার নাই ? আমি যে তোমা-বই আর কাহাকেই জানি না।

হনুমান্‌ পুনরপি বলিলেন—চোপ্‌।

নিম্নে কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যাইতেছে। সুগ্রীব কাবেরী নদীতে অষ্টাধিক-শত পত্নী সহ জলকেলি করিতেছেন।

হনুমান্‌ মুষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বানরী ঘুরিতে ঘুরিতে সুগ্রীবের স্কন্ধে নিপতিত হইল।

ভারমুক্ত হইয়া হনুমান দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইলেন। দণ্ডকারণ্য—বিন্ধ্যাটবী —প্রয়াগ—অবশেষে অযোধ্যা।

সীতা সবিস্ময়ে বলিলেন—একি বৎস ! সংবাদ দাও নাই কেন ? আমি নগরী সুসজ্জিত করিতাম, বাদ্যভাণ্ড প্রস্তুত রাখিতাম। হনুমতী কই ?

হনুমান অবনতমস্তকে বলিলেন—মাতঃ, হনুমতীকে পাই নাই। আমি এক সামান্যা বানবী হরণ করিয়া সুগ্রীবকে দান করিয়াছি। হে দেবি, বিধাতা আমার এই বিশাল বক্ষে যে ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াছেন, তাহা তুমি ও রামচন্দ্র পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, দারা পুত্রের স্থান নাই। এই বর দাও—যেন অমর হইয়া চিরকাল পিতৃগণের পিণ্ডোদক বিধান করিতে পারি।

সীতা কহিলেন—বৎস, তাহাই হউক।

তখন হনুমান পরিতুষ্ট হইয়া বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া ভুজদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—জয় সীতারাম।

বসন্তের বানপ্রস্থ

শাস্ত্রে আছে—"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ !"

কিন্তু পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে ছেড়ে অর্দ্ধেক হ'তে না হ'তেই বসন্ত স্থির করে ফেল্‌লে যে, এ-অবস্থায় বনবাসই তার পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত গতি !

পুরাকালের ব্যবস্থা ছিল, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সকল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করে তারপর বানপ্রস্থ অবলম্বন করা। বসন্ত কিন্তু গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই বানপ্রস্থের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

যৌবনই মানুষকে প্রলুব্ধ ক'রে সংসারে টেনে নিয়ে যায়, আবার এই যৌবনই তাকে অবস্থা-বিশেষে বৈরাগ্য এনে দেয় ! বসন্তরই তাই হয়েছিল। বি-এস্‌-সি পাশ করে সে ঢুকেছিল শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বি. ই. প'ড়তে। সব-কটা মেডেল ও স্কলার্‌সিপ নিয়ে সে যখন শিবপুর থেকে পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে বেরিয়ে এলো, তখন তার জীবনের পঁচিশটা বছর নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

শিবপুর থেকে সে বেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু, সঙ্গে নিয়ে এলো শিবানীর অনুরাগ-রঙীন স্মৃতিটি।

শিবানী তাদের কলেজের নূতন প্রফেসর গিরীন্দ্রশেখর গুপ্তর মেয়ে ; ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়ছে। চোখে চশমা। রংটা মাজা-মাজা। ভারতীয় চিত্রকলার মতো পাতলা ছিপ-ছিপে গড়ন। সে গান গায়, সেতার বাজায় ; শেলী, কীট্‌স, রবীন্দ্রনাথের কবিতা প'ড়তে ভালোবাসে, আর ভালোবাসে—বসন্তর সঙ্গে বসে বসে সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির চর্চ্চা ক'রতে।

ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা উঠলেই কিন্তু শিবানী চা তৈরি করে এনে বসন্তর মুখ বন্ধ ক'রে দিত।

শিবানীর হাতের চা যেন সাগরসম্ভূতা ইন্দিরার হাতের অমৃত !—বসন্ত তা' পান ক'রতে ক'রতে প্রতি চুমুকে বিশ্বজগৎ বিস্মৃত হতো।

পড়াশুনায় বসন্তর মেধা ও ধী-শক্তি দেখে অধ্যাপক গিরীন্দ্রশেখর তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। গিরীন্দ্রশেখরের গৃহে বসন্তর ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। কলেজের পড়াশুনার পর যেটুকু সময় বসন্তর হাতে উদ্বৃত্ত থাকতো, সে ক্ষণটুকু বসন্ত শিবানীর সঙ্গে যাপন করতে পেলে ধন্য হয়ে যেতো।

দিন যায়। শিবানীর সঙ্গে বসন্তর বন্ধুত্ব ক্রমে প্রগাঢ় হয়ে আসে। বাঁধা-ধরা সময়ের বাইরেও সে যখন তখন শিবানীর কাছে অকস্মাৎ এসে দাঁড়াতে লাগলো। শিবানী তার অর্থ বুঝতো। মনে মনে খুশী হয়ে অধর-প্রান্তে একটা বিজয়-গর্ব্বের উৎফুল্ল হাসি ফুটিয়ে

চোখে মুখে একটা কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাণ করে বলতো—"এ কি ! তুমি ঋতুরাজ, এমন অকালে আজ দেখা দিলে যে ! ব্যাপার কী ?"

বলা বাহুল্য যে শিবানী মাঝে মাঝে বসন্তকে পরিহাসচ্ছলে 'ঋতুরাজ' বলে সম্ভাষণ করতো।

বসন্তর চোখ মুখ রাঙা হ'য়ে উঠতো ! লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে কী সে জবাব দেবে, খুঁজে পেতো না।

শিবানী যেন তার মনের কথা টেনে বলতো—"বাণীর কুঞ্জে যে চিরবসন্তের অধিষ্ঠান এইটেই বুঝি প্রমাণ করতে চাও ?"

বসন্ত শিবানীকে আদর করে শুধু 'বাণী' বলতো। শিবানীর এই অকুণ্ঠ পরিহাসে বসন্ত খুশী হ'য়ে উঠে বলে—"সে কথা তো মিথ্যা নয় বাণী ! দেশ-বিদেশের সমস্ত কবি এ বিষয়ে আমারই পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। চিরবসন্তের দাবী একমাত্র 'বাণী'রই আছে।"

শিবানী হাসতে হাসতে বলতো—"কিন্তু, তাঁরা কেউ বলেন না যে, বসন্ত কলেজের ক্লাস থেকে পালিয়ে আসতো !"

ধরা পড়ে গিয়ে অসহায়ের মতো করুণ দৃষ্টিতে শিবানীর মুখের পানে চেয়ে বসন্ত বলতো—"আজ আর কিচ্ছু ভাল লাগছে না বাণী ! পড়াশুনোয় মন বসছে না কিছুতেই ! তোমার একটি গান শোনবার জন্য বড্ড ইচ্ছে হলো, তাই পালিয়ে এলুম !"

শিবানীর কালো চোখের বাঁকা-কটাক্ষ সহসা বিদ্যুৎনৃত্যে চম্‌কে ওঠে—ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভার মতোই মেঘলাদিনের অন্ধকার সরিয়ে—পলকের জন্য !

সংশয়-তিমিরে পথহারা বসন্ত যেন তারই দীপ্তিতে আঁধারে পথ খুঁজে পায়।

শিবানী বলে—"এই শুধু চাও তুমি অতিথি ?—এসো তবে—স্বাগতম্ !"

তারপর সে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে উঠে বসন্তকে একটি নমস্কার ক'রে ললিত-গতিতে পিয়ানোর ধারে গিয়ে বসে। বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে গায়—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে !"

এমনি করেই যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে বসন্তর প্রবাসের দিনগুলি অধ্যয়ন অধ্যাপনার অবসরেও আনন্দের আবহাওয়ায় অতিবাহিত হচ্ছিল।

কিন্তু, দিন ফুরিয়ে এলো। বসন্তকে এইবার কলেজ ও শিবপুর ছেড়ে আসতে হবে। বিদায়ের আর অল্পদিন মাত্র বাকী।

একদিন বসন্তকে একান্ত বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ দেখে শিবানী জিজ্ঞাসা করলে—"ঋতুরাজ, আজ তোমার মধ্যে এমন নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা দেখছি কেন ? এ যেন কোন্ চৈত্র-শেষের ব্যাকুল বসন্ত রুদ্র বৈশাখের বিষাণ শুনে উদাস ও ম্লান হ'য়ে পড়েছে ! কি হয়েছে বন্ধু ?"

দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় আন্দোলিত মন নিয়ে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে বসন্ত শেষে তার বহুদিনের বলি-বলি-করেও না-বলা কথাটা আজ সাহস ক'রে ব'লে ফেললে। তার সময় যে ফুরিয়ে এসেছে।

বসন্তর কণ্ঠস্বরে আজ একটা নূতন সুর, তার হাবভাবে একটা অভিনব ভঙ্গী দেখে শিবানী চম্‌কে উঠলো।

বসন্ত থেমে থেমে বাধো-বাধো-গলায় বললে—"বাণী, তোমার সেদিনের কথাটাই

আমি আজ ক'দিন ধরে ভাবছি ! আচ্ছা,—তোমার কুঞ্জে যদি যথার্থই চির-বসন্তের অধিষ্ঠান হয়,—তাতে কি তোমার আপত্তি আছে ? আমি আজ সেই প্রস্তাবই করতে এসেছি। শিবপুর ছেড়ে যাবার আগে আমি তোমাকে আমার গৃহলক্ষ্মী করে নিয়ে যেতে চাই।"

শিবানীর মুখখানি একেবারে মৃত্যুর মতো বিবর্ণ হ'য়ে গেলো। বসন্তর কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে সে নীরবে নতমুখে অপরাধিনীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বসন্ত আশান্বিত হ'য়ে বলে উঠলো—"মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্ !"—বাণীর দরবারে বসন্তর আবেদন তবে ব্যর্থ হয়নি ! তোমার ঋতুরাজ আজ ধন্য হলো সখি।"

আহত অঙ্গে আচমকা আঘাত লাগলে মানুষ যেমন ব্যথা-বেদনায় শিউরে ওঠে, তেমনি করেই কেঁপে উঠে শিবানী বললে—"না, না, তুমি ভয়ানক ভুল করছো বন্ধু ! আমায় ক্ষমা করো। হয়তো এ আমারই দোষ। আমি চেয়েছিলাম শুধু তোমার প্রীতি-স্নিগ্ধ বন্ধুত্বটুকু,—তোমার গৃহলক্ষ্মীর আসনখানিও যে তুমি আমারই জন্য একদিন এমন ক'রে বিছিয়ে দেবে, এ আমি ভাবিনি। এমনও যে হ'তে পারে একদিন—এ ধারণা থাকলে আমি কখনই—"

শিবানী থেমে গেলো।

বসন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"কখনই—কী বীণ্ ? এমনও যে হতে পারে, এ ধারণা থাকলে—কী হতো, বলো না ! চুপ করে রইলে কেন ? আমার বুকে যে প্রবল উদ্বেগ আর আশঙ্কা জাগিয়ে তুল্‌ছো তুমি—"

বাণী হঠাৎ মুখ তুলে বসন্তর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি সত্যই কিছু জানোনা ? বাবা কি তোমাকে কিছু বলেন নি ?"

বসন্ত বললে—"তোমার স্পষ্ট অনুমতি আজও নিতে পারিনি ব'লে আমি এখনও তোমার বাবার কাছে এ প্রস্তাব করতে সাহস পাইনি বাণী !"

বাণী সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌লে—"না-না, সে কথা নয়, তুমি কি তাঁর কাছে শোনোনি যে—যে আমি—আমি বিবাহিতা ?"

নিমেষে বসন্তর অবস্থা যেন প্রখর শীতের মতই অসাড় হিম হয়ে গেল !

বসন্তর হাত দুটি ধরে তাকে খোলা আলো-বাতাসের মধ্যে টেনে এনে বাগানের একটি বেঞ্চের উপর বসিয়ে, নিজের হাতে সযত্নে চা তৈরি করে দিয়ে, অসীম গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তার মুখের দিকে চেয়ে, শিবানী বলছিল—"ন' বছরের মেয়ে আমি। আমি কি তখন রাঁধতে পারি ? আমার শাশুড়ী আমাকে খুন্তি পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিত। তাঁরই কথায় আমার স্বামী আমাকে যখন তখন নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করতো। আমি সে সব চুপ করে সহ্য করতুম। কাঁদবারও হুকুম ছিল না, তাহলে প্রহার দ্বিগুণ হ'য়ে উঠবে ! আমার মা তখন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শয্যাশায়িনী ! তাঁরই একান্ত অনুরোধে, তাঁর শেষ-সাধ অন্তিম-ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই বাবা আমার এত অল্প বয়সে তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়েছিলেন। মা তাঁর একমাত্র জামাই—তাঁর সাধের মেয়ে এই শিবানীর একটি 'বর' দেখে যেতে চেয়েছিলেন। বাবা তারই আয়োজন করে তাঁকে সেই চিরবিদায়ের মুহূর্ত্তে সুখী ক'রবার চেষ্টা করেছিলেন।"

আঁচলে চোখের জল মুছে শিবানী ব'লতে লাগলো—"জামাই দেখবার জন্যই যেন

মায়ের প্রাণটুকু তাঁর দেহে অপেক্ষা করছিল ! আমার বিবাহের পর পনেরো দিনও কাটলো না, মা আমার স্বর্গে চলে গেলেন। কাজ-কর্ম্ম চুকে যাবার পর আমাকে আমার শাশুড়ী নিয়ে গেলেন। মায়ের দামী-দামী কাপড়-চোপড় ও গহনাগাঁটি আমি কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে আমার উপর উৎপীড়ন সুরু হলো। আমার বয়স তখন খুব অল্প হ'লেও এটুকু বুঝেছিলুম যে আমার শোকার্ত্ত পিতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে ওরা জোর ক'রে আমাকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল। শাশুড়ী বলে পাঠালেন—'মা নেই যখন, আমি বৌমাকে ওখানে কার কাছে ফেলে রাখবো ?' অথচ সে সময় বাবার সেই নিদারুণ শোকের দিনে আমিই ছিলুম তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা স্থল !...

যাক্ সে কথা। আমার উপর অত্যাচার ক্রমেই বাড়তে লাগলো ! মাতা পুত্র দু'জনে মিলে একটি বালিকার উপর যেন চরম নিষ্ঠুরতার অভিনয় সুরু ক'রে দিলে ! শ্বশুরবাড়ী আসবার দিন বাবার চোখে যে কাতর অশ্রু দেখে এসেছিলুম, আমার দুঃখের কথা তাঁকে জানিয়ে সে সময় তাঁর মনে আরও বেশী কষ্ট দিতে আমার বড় মায়া হচ্ছিল।

কিন্তু, কিছুদিন যেতে না যেতেই বাবা সবই শুনতে পেলেন ? আমার শ্বশুর-বাড়ীর পাশেই আতর্থীরা থাকতেন। তাঁদের দোতলার ঘরের জানালা থেকে আমার শ্বশুর-বাড়ীর উঠোন ও রান্নাঘর দেখা যেতো। আমার উপর যখন মাতা-পুত্রের সম্মিলিত তাড়না ও উৎপীড়ন চলতো, তখন প্রায়ই দেখতুম একটি মমতাময়ী মহিলা সেখান থেকে সস্নেহে আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ চোখ দুটিতে সে কি করুণ সমবেদনার দৃষ্টি। তাকে দেখে আমি যেন অনেকখানি আশ্বস্ত হতুম ! আমার মনে হ'তো যে, আমি এখানে নিতান্ত অসহায় নই, এ-পুরী আমার একেবারে নির্ব্বান্ধব নয়।

হঠাৎ একদিন পুলিশ সঙ্গে ক'রে এসে বাবা আমাকে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর আমার শাশুড়ী আর স্বামীর সঙ্গে মামলা-মর্কদ্দমা হলো। সেদিন জানতে পারলুম সেই পাশের বাড়ীর মহিলাটিই তাঁর স্বামীর সাহায্যে আমার অবস্থা পিতাকে জানিয়েছিলেন ! মর্কদ্দমায় তাঁরা সাক্ষ্য দিলেন, আমাদের জিত হলো। আমার স্বামীর আর তাঁর গর্ভধারিণীর জেল এবং জরিমানা দু'রকম সাজারই হুকুম হলো।

পাছে জেল থেকে বেরিয়ে হিন্দু-আইনের বলে স্বামী আবার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার দাবী করেন, এই ভয়ে বাবা আমাকে নিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যান। মান্দ্রাজে এক মিশনারীর সঙ্গে বাবার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁরই পরামর্শে বাবা আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেন এবং কিছুদিন পরে আমরা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হই।"

এইখানে শিবানী ক্ষণকালের জন্য চুপ ক'রে বসন্তর মুখের পানে একবার তার ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে কী যেন সন্ধান করলে ; তারপর আবার বলতে লাগলো—"দশ বছর পরে বাবা এই শিবপুর কলেজের চাকরী নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। এখানে এসে প্রথমটা আমার বড় একা-একা ঠেকতো। নতুন কলেজ—নতুন জায়গা—নতুন সব। সেখানে মিশনারী মহলে বেশ একরকম জমিয়ে নিয়েছিলুম, এখানে এসে যেন টিকতে পারছিলুম না ! এমন সময় আমাদের বাড়ী তোমার আসা-যাওয়া সুরু হলো। তোমাকে বন্ধু পেয়ে আমার জীবন যে আনন্দময় হয়ে উঠেছিল, এ কথা আজ আর স্বীকার ক'রতে আমার লজ্জা নেই ! তোমার কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো বন্ধু—তোমার আজ এই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে-যাওয়া যে আমার কাছে কতো বড় বেদনার ব্যাপার সে কথা আমি হয়তো তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না...

শিবানীর গলা ভারি হ'য়ে এলো।

"বসন্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার স্বামী কি আর তোমার খোঁজ করেন নি বাণী ?"

বাণী শুধু মাথা নেড়ে জানালে—না।

বসন্ত বললে—"তিনি যদি তোমার সন্ধান পেয়ে তোমাকে আবার তাঁর স্ত্রী বলে দাবী করেন—তোমাকে বোধ হয় যেতে হবে তাঁর কাছে—না—বাণী ?

শিবানী এবার একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—"না। খৃষ্টান-পত্নীর উপর হিন্দু-স্বামীর আর কোনো দাবী-দাওয়া বা অধিকার নেই। তা ছাড়া, বাবা এ খবরও পেয়েছেন যে আমার স্বামী আবার বিবাহ করেছেন !"

বসন্ত একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে—"কিন্তু, তোমার বুঝি আর বিবাহ করবার উপায় নেই বাণী ?"

শিবানী ক্ষণকাল নতমুখে চুপ ক'রে রইলো, তারপর মুখ তুলে বললে—"কী হবে তোমার সে কথা শুনে বন্ধু ?"

বসন্ত একগুঁয়ে ছেলের মতো বাণীর হাত দু'খানা চেপে ধ'রে আব্দারের সুরে বললে—"না, তুমি বলো—তোমায় বল্‌তেই হবে—"

লঘু হাস্যে মুখখানি আলো ক'রে পরিহাস-রহস্যচ্ছলে শিবানী বললে—"যদি বলি—হাঁ, উপায় আছে, তা'হলে কি তুমি আমার ঘটকালী করতে লেগে যাবে ?"

"যাও—তোমার সবেতেই ঠাট্টা !" এই কথা ব'লে শিবানীর হাত দু'খানি তারই কোলের উপর ঠেলে দিয়ে বসন্ত বাগানের বেঞ্চের বিপরীত দিকে মুখ ক'রে বসলো।

শিবানী তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে খুব খানিকটা হাসলে,—তারপর বসন্তর হাত ধ'রে তাকে তার নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—"ওগো শুনছো ?—আমার মতো একজন খৃষ্টান্ মেয়ে—যে স্বামীকে ত্যাগ করে এসেছে—তার সঙ্গে কোনো নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের ছেলের বন্ধুত্ব পর্য্যন্ত করা নিষেধ,—বুঝলে !—সুতরাং, তুমি যা' চাও, তা' হবার যো' নেই বন্ধু !"

বসন্ত রুখে উঠে বলেন—"আমি খৃষ্টান হবো !"

শিবানী সজোরে মাথা নেড়ে বললে—"সে কিছুতেই হবে না ! প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দেবো না ! তোমার বাপ-মা—তোমার আত্মীয় বন্ধু—সবাই তোমাকে ধিক্কার দেবে...ঘৃণার চক্ষে দেখবে—বলবে—একটা খৃষ্টান মেয়ের জন্য তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেছো ! আর আমাকেই সেজন্য তাঁরা সকলে দায়ী ক'রে প্রতিদিন মর্ম্মান্তিক অভিশম্পাত কুড়িয়ে কি আমি তোমাকে বরণ করতে পারি ?"

বসন্ত এবার মিনতি ক'রে বললে—"তবে তুমি আবার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে হিন্দু হবে চলো বাণী। তা হলে আমার যারা আত্মীয়, সকলেই তোমায় আদর ক'রে তুলে নেবেন।"

অতি সকরুণ ম্লান হাসি হেসে শিবানী বললে—তুমি অত কষ্টে যাগ-যজ্ঞ হোম-টোম বসিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে যেই আমাকে পুরোপুরি 'হিন্দু' ক'রে তুলবে, অমনি আমার সেই পূর্ব্ব-স্বামী এসে হিন্দু-আইনের জোরে আমার উপর তাঁর নিব্যূঢ় স্বত্ব আর অধিকার সাব্যস্ত ক'রে—আমার চুলের ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে যাবেন—তখন তুমি কি করবে ?

বসন্তর মুখখানি শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মতো অন্ধকার হয়ে গেল !

দিন কারো জন্য অপেক্ষা করে থাকে না। সংসারে যার যাই ঘটুক না কেন, সকাল ঠিক যথাসময়ে দুপুরে এসে পৌঁছয়, দুপুর গিয়ে সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়ে। রাত্রি আসে, তারপর আবার প্রভাত হয়।

বসন্তর বিদায়ের দিনটিও অতি নিশ্চিতরূপে একদিন এসে পৌঁছালো।

শিবানী পিতার সঙ্গে বসন্তকে টেনে তুলে দিতে এসেছিল। যাবার আগে এক ফাঁকে শিবানীকে একলা পেয়ে বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে—"বন্ধু ! যদি কোনো ভালো খৃষ্টান-ছেলে পাই, তা' হ'লে ঘটকালি করবো কি ?"

শিবানী কৃত্রিম বিরাগের ভাণ করে বললে—"যাও ! তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছো ! যাবার সময় বুঝি বন্ধুকে একটু খোঁচা না দিয়ে যেতে মন উঠছে না ? ভালো খৃষ্টান ছেলের জন্য তোমাকে আর কষ্ট পেতে হবে না। আমিই একটি খুঁজে নিতে পারবো !"

বসন্ত এবার গম্ভীর হ'য়ে বল্লে—"না, সত্যি বলো ; ঠাট্টা নয়। তুমি কি এমনি করেই জীবনটা নষ্ট কববে ? বিবাহ কি আর করবে না ?"

শিবানী হেসে বললে—"যদি করি, তোমাকে তার নিমন্ত্রণ-পত্র সর্ব্বাগ্রে পাঠাবো জেনো। শুভকার্য্যে আমি যে বন্ধুকে বাদ দেবো না—এটা তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি !"

বসন্ত এবার সত্যই রাগ ক'রে বল্লে—"আবার ঠাট্টা শুরু করলে ?—একটা কথা কি তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রে বলতে পারো না ?—তবে কি আমি তোমার শুধু মুখেরই বন্ধু ? অন্তরের কেউ নই ?"

শিবানী ক্ষণকাল চুপ করে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে—"পুরুষ জাতটাই কি এমনি নিষ্ঠুর !—আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নিজের মুঠোর মধ্যে ভরে নিয়ে যাবার সময় ও কথা জিজ্ঞাসা করতে একটু বাধ্‌ছে না তোমার ?—যে পথে আজ তুমি আপনি এসে আড়াল ক'রে দাঁড়ালে—সেই পথে চলতে বলার মতো নির্ম্মম পরিহাস কেমন ক'রে তুমি ঝরতে পারলে ?"

শিবানীর দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো।

বসন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো—"বাণী ! বাণী !—আমাকে ক্ষমা করো ! যাবার আগে তোমার মুখ থেকে এই কথাটি শুনে যাবার লোভ আমি কিছুতে দমন করতে পারছিলুম না।—আর আমার কোনো দুঃখ নেই—কোনো আক্ষেপ নেই ! আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চল্লেম ! জীবনের যাত্রাপথে যে পাথেয় তুমি আজ আমায় অঞ্জলি ভরে দিলে, মরণের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে আমাকে সম্রাটের গৌরবে অভিষিক্ত রাখবে।"

ঢং ঢং ঢং ঢং ক'রে শেষ-ঘণ্টা পড়ে গেলো। গার্ডের বাঁশী বেজে উঠ্‌লো ; নিশানের ইসারা পেয়ে ইঞ্জিন গর্জ্জে উঠে নড়তে সুরু করলে। যতক্ষণ বসন্তকে দেখা গেল, রুমাল নেড়ে নেড়ে শিবানী তার শুভ-ইচ্ছা নিবেদন ক'রে দিলে।

ছেলে এঞ্জিনিয়ার হ'য়ে দেশে ফিরেছে। বসন্তর সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে তার পিতা একটি সুন্দরী কন্যার সন্ধান করতে লাগলেন, তার বিবাহ দেবেন ব'লে। মায়েরও একান্ত ইচ্ছা একটি রাঙা-বউ আনবেন ঘরে ! কিন্তু মুস্কিল বাধলো রূপ আর রূপার দ্বন্দ্ব নিয়ে ! যেখানে ভালো মেয়ে পাওয়া যায়, সেখানে এঞ্জিনিয়ার ছেলের উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না ! যেখানে আশাতিরিক্ত দাম পাওয়ার সম্ভাবনা হ'চ্ছে, সেখানে আবার

মেয়েটি মনে ধরছে না ! এমনি ক'রে দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে যাবার পর এক জায়গায় হঠাৎ একবার মণি-কাঞ্চন সংযোগ হ'য়ে গেল !... যেমন সুন্দরী মেয়ে, তেমনি বিপুল যৌতুকের সম্ভাবনা জেনে বসন্তর পিতা সেইখানেই পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা ক'রে আশীর্ব্বাদের দিন পর্য্যন্ত স্থির ক'রে ফেললেন। বসন্তকে শুধু ব'লে রাখলেন—অমুক দিন সকালে কোথায় বেরিয়ো না। আমার একটি বন্ধু তোমাকে দেখতে আসবেন।

খবরটা কিন্তু বাইরে যতখানি চাপা ছিল, বাড়ীর ভিতরে ততটা ছিল না। বসন্ত সবই বুঝতে পারলে এবং কি উপায়ে এ বিবাহ বন্ধ করা যায়, তারই দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বাণীর প্রেমের স্মৃতি বুকে নিয়ে সে চিরকুমার থাকবে মনে মনে এই সঙ্কল্পই করেছে। কিন্তু, এ কি উৎপাত !

সেইদিনই বসন্ত একখানা চিঠি পেলে শিবানীর কাছ থেকে। ত্রিবাঙ্কুরের "দেবদত্ত আশ্রম" থেকে শিবানী লিখেছে—"বন্ধু ! এখান থেকে আমার চিঠি পেয়ে বোধ হয় খুবই বিস্মিত হবে ! কিন্তু, সংসারে বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে কিছু নেই। এখানে সবই হওয়া সম্ভব। তোমাকে জানাইনি ব্যস্ত হ'য়ে পড়বে ব'লে। হঠাৎ একদিন আমার মায়া কাটিয়ে বাবা মায়ের কাছে চলে গেছেন। তাঁর 'হার্টফেল' করেছিল। আমার জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ রেখে গেছলেন ; কিন্তু, কি হবে সে টাকায় যদি জীবনই ফাঁকা থাকে ?—সমস্ত টাকা-কড়ি এই আশ্রমে দান ক'রে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এটি 'হিন্দু' আশ্রম কিন্তু। ব্যর্থ-জীবন আর নিষ্ফল-জন্ম নিয়ে হিন্দু ঘরের অনেক মেয়েই এখানে এসে শান্তিতে আছে ! তবে ছেলেরাই অবশ্য আমাদের চেয়ে দলে ভারী ! আমি এখানে আসাতে "দেবদত্ত আশ্রমের" এই সব কঠোর ব্রহ্মচারীর দল বেশ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে দেখছি। তুমি কেমন আছো ? কি করেছো ? সব লিখো। তোমার চিঠি না পেলে এখানে টিকতে পারবো না কিন্তু !—প্রীতি আর ভালবাসা নাও। ইতি তোমারই বাণী।"

সেই রাত্রেই কাউকে কিছু না ব'লে বসন্ত ত্রিবাঙ্কুরের টিকিট কিনে বানপ্রস্থে চলে গেলো।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বিদ্যুৎ

ক

ঘরে তালা-বন্ধ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছি, অন্তঃপুর হইতে ফুনু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, চাবিটা দাও।

ফুনু আমার ছোট বোন। পকেটে হাত দিয়া কহিলাম, কেন ?

অল্প একটু হাসিয়া ফুনু বলিল, তোমার ঘরে বন্ধুদের একটু বসাবো। বাবার কোর্ট থেকে ফেরবার সময় হয়ে এসেছে, বৈঠকখানায় আর থাকা চলবে না।

চাবিটা তাহার হাতে ফেলিয়া দিলাম। কহিলাম, তোদের পরামর্শ এখনো শেষ হয় নি ?

মাতব্বরের মত মুখ গম্ভীর করিয়া ফুনু বলিল, কাল্‌কেও মিটিং বস্‌বে। তোমার ঘরটা বেশ নিরিবিলি আছে। এই ফাঁকে সবাই মিলে তা'র শ্রী-ও ফিরিয়ে দেবো'খন। সবাই ওরা তোমার ঘর দেখ্‌বার জন্যে ভারি বায়না ধরেছে। বলিয়া কৌতুকময় স্বচ্ছ হাসিতে ফুনুর চক্ষু দুইটি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলাম, তা হ'লে আমার আর বেরুনো হ'বে না এ-বেলা। (একটু ঠাট্টার সুরে) অতিথিদের যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করা দরকার, কি বল্‌ ?

চৌকাঠে পা রাখিতে যাইব ফুনু আমাকে বাধা দিল। কহিল, আমি একাই সম্বর্দ্ধনা করতে পার্‌ব, মশাই। মেয়েদের ভিড়ে তোমার আর মাথা না গলালেও চল্‌বে। যে কাজে যাচ্ছিলে যাও। ছ'টার মধ্যে ওদের ফের বিড়ন্‌ ষ্ট্রীটে ফিরে যেতে হবে।

প্রশ্ন করিলাম, এই তোরা গান্ধি-যুগের মেয়ে ? সামান্য একটা পুরুষের সান্নিধ্যকে এত ভয় ?

তালা খুলিতে খুলিতে ফুনু ঠোঁট কুঁচকাইয়া কহিল, ভয় না হাতী ! তোমার সঙ্গে তর্ক করবার মতো আমার অঢেল সময় নেই। বিকেল বেলা দোতলা বাস্‌-এ ক'রে হাওয়া খেয়ে এসো গে, যাও।

দরজাটা খুলিতেই বিশৃঙ্খল ঘরের চেহারা দেখিয়া মনে-মনে আঁৎকাইয়া উঠিলাম। বাহির হইয়া গেলে মা অবসরমত এই ঘরে পদার্পণ করেন, তাঁহার সেবাস্নিগ্ধ কর্ম্মকুশল হস্তস্পর্শে ঘরের সমস্ত নিরানন্দতা দূর হইয়া যায়,—শৃঙ্খলায় ও পরিচ্ছন্নতায় ঘরখানি নির্ম্মল সুন্দর হইয়া উঠে,—খুঁটিয়া-খুঁটিয়া একটি ধূলিকণাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাকে ছাড়া আর কাহাকেও বড় একটা এ ঘরে ঢুকিতে দিই না, বন্ধু-বান্ধব আসিলে সাধারণ গৃহস্থের মত রোয়াকে দাঁড় করাইয়া ভদ্রালাপ সারিয়া লই। তাই এতাদৃশ নোংরা অপরিষ্কার ঘরের ওলোট-পালোট অবস্থা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম, সব জিনিষ ভারি অগোছাল বিশ্রী হয়ে আছে। এ-ঘরে কিছুতেই তোর বন্ধুদের আসা হতে পারে না।

ফুনু ফিরিয়া দাঁড়াইল ; কহিল, সাহিত্যিকের ঘর যে বিচ্ছিরি ছত্রাকার হয়ে থাকে—তা ওরা খুব জানে। এ-ঘরের চেহারা দেখে ওরা কক্‌খনো নাক সিঁট্‌কোবে না ; তবে মেঝের উপর এই যে কতকগুলো ময়লা জামাকাপড় টাল্ করে' রেখেছ, এগুলো ধোবার দোকানে দিয়ে এসো দয়া করে'। বলিয়া সে একটা পুরানো খবরের কাগজের উপর সেগুলো ভাঁজ করিয়া রাখিতে লাগিল।

বলিলাম, ঘর-দোর আমি ইচ্ছে করে লোক দেখাবার জন্যে অমন নোংরা করে' রাখি না। বোহিমিয়ান্‌দের মতো অপরিচ্ছন্নতা আমার কাছে আর্ট নয়। পেছনে মা আছেন বলেই ঘর-গুছানো বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীন থাকি। তোর বন্ধুরা আবার ভুল না বোঝে !

শেষের কথাটা না বলিলেও পারিতাম ; তবু যে-ঘরে শুধু বাস করি নয়, রাত্রি জাগিয়া কাব্যরচনা করি, সে ঘরটি কতগুলি অপরিচিত মেয়ের চোখের সম্মুখে এমন করিয়া অনাবৃত রাখিয়া যাইব ভাবিতে কুণ্ঠা হইতেছিল। সামান্য পোষাকেও মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়া এই ঘরটির চারিদিকে তাকাইলেই আমি আর গোপন থাকিব না, ধরা পড়িয়া যাইব ! ফুনু কিন্তু কথাটার অর্থ ভুল বুঝিল ; কহিল, না মশাই, তারা জানে আধুনিক কালের লেখকরা আভিজাত্যকে বরদাস্ত করে না। বড়-বড় চুল, বড়-বড় নোখ আর বড়-বড় কথা। নাও ধরো—এবার সোজা পিট্‌টান দাও দিকি।

কাপড়ের পুঁটলিটা ঠেলিয়া দিয়া কহিলাম, এখন ধোবা-বাড়ি যাবার সময় নেই। তোর বন্ধুরা এ-ঘরে এসে কৃতার্থ হবে বলে' ঘরকে 'চুণকাম করে' তুলতে হবে, তার কোনো মানে নেই। ঘরের জিনিস-পত্রে হাত দিস্‌নে কিন্তু, খবর্দ্দার ! বলিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

বেলেঘাটা যাইবার কথা ছিল, কলেজের এক বন্ধু কয়েকটা টাকা ধার দিবে বলিয়া কথা দিয়াছে। কোথাও টাকা পাওয়া যাইবে, কিম্বা কোথাও প্রেয়সীর সঙ্গে নিভৃতে দেখা পাইবে—এই দুইটার একটা খবর পাইলেই মানুষের পায়ের বাত নিশ্চয় নিমেষে নামিয়া যায়। তবে একই সময়ে যদি দুইটার দাবী সমান হইয়া উঠে, তবে অন্তত আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, প্রেয়সীর সামান্য করস্পর্শের চেয়ে টাকাটাকেই অধিক মূল্যবান মনে করি। এই কথাটা আমার অসাহিত্যিক নেপথ্য-উক্তি। ফুনুর বন্ধুর কাছে এ কথাটা বলিতে নিশ্চয়ই সঙ্কোচ বোধ করিতাম। অবশ্য ফুনুর বন্ধুদিগকে টাকার সঙ্গে উপমেয় করিয়া অনাবশ্যক মর্য্যাদা দিবার কোনো হেতু নাই ; তবু যখন মোড়ের দোকানে ঘড়িতে ছয়টা প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া বেলেঘাটার বন্ধুর দেখা পাওয়ায় নিরাশ হইয়া ফের বাড়ীর মুখে ফিরিলাম, তখন নিজের হলফটা এত সহজে নাকচ হইয়া গেল ভাবিয়া আমার হাসি পাইল। কিন্তু শ্রাবণের সন্ধ্যাটুকু আজ পরিষ্কার বলিয়াই যে সহসা দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিতে পারে না, এ অভয়টুকু দিবার জন্য হাতের কাছে কোনো জ্যোতিষ নাই, তাই ছাতাটা সঙ্গে লইতে হইবে। বেলেঘাটায় বন্ধুর দেখা পাওয়া যায় নাই বলিয়া যে সন্ধ্যাকালেও ঘরে কুনো হইয়া বসিয়া থাকিব, আমি তত বড় সময়নিষ্ঠ বা রুগ্ন সাহিত্যিক নই ! বাহিরে বিপ্লব হউক বা প্রলয় প্রবল হইয়া উঠুক, এই সময়টায় সাহেব পাড়ায় রাস্তায় একটু 'প্রোমিনেড়্' না করিলে আমার চোখে না আসিবে ঘুম, মাথায় না গজাইবে গল্পের প্লট্ ; তবু, ছাতা একটা সঙ্গে থাকা ভাল। মোড়ের দোকানের ঘড়িটা নির্ভুল সময় রাখে বলিয়া তাহার সত্ত্বাধিকারী কানাইবাবুকে মনে-মনে প্রশংসা করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম।

নির্দ্ধারিত দিনে গেলাম না বলিয়া বন্ধুবর হয়তো এমন রাগ করিয়া বসিবেন যে তাঁহাকে আর ইহজন্মে বাগ মানানো যাইবে না ; কানাইবাবুর ঘড়িটা এত নির্ভুল যে, হাতের ফাঁক দিয়া টাকা কয়টা অনায়াসে ফস্‌কাইয়া গেল। তবু কেন যে নিজের এই গেঁতোমির জন্য গ্যাসপোষ্টের উপর কপালটা ঠুকিয়া দিলাম না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই টাকাটার মুখ চাহিয়া দুই সপ্তাহ কাটাইয়াছি এখন কি না কিনারে আসিয়া নৌকা বান্‌চাল হইয়া গেল ! মনে পড়িল পর্শু বন্ধুর মিরাট ফিরিয়া যাইবার কথা আছে। তবু, অনেক রাত করিয়া গেলে বন্ধুবরকে হয়তো বাসায় পাইব এবং কয়েক ঘন্টার এদিক-ওদিকে হয়তো তাঁহার মেজাজ সাহেবি হইয়া উঠিবে না—এই আশ্বাস লইয়া ছাতা আনিতে বাসায় ফিরিলাম।

সত্য কথা বলিতে কি, বাস-ভাড়ার পয়সায় পর্য্যন্ত নিদারুণ অভাব হইয়াছে। বোতলওয়ালার কাছে কতগুলি পুরোনো কাগজ-পত্র বেচিয়া সাড়ে তিন-আনা রোজগার করিয়াছি—এই সম্বলটুকু লইয়াই আজ বাহির হইয়াছিলাম। বেলেঘাটা হইতে ফিরিবার সময় গল্পের প্লট্‌ ভাবিতে ভাবিতে মোটর গাড়ীর ধাক্কা বাঁচাইয়া হাঁটিয়া আসিব বলিয়া আমার মনে ক্ষোভ বা পায়ে বাত ছিল না। তবু টাকাটা পাওয়া আমার উচিত ছিল। ফুনুর বন্ধুরা আসিয়া অকারণে এমন উৎপাত না করিলে আমি এতক্ষণে নিশ্চয়ই মৌলালির মোড় পার হইয়া গেছি ! বি. এ পাশ করিবার পর বাবা তাঁহার মত মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য ল পড়িতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু আইনকে আমি নজরুল ইস্‌লামের "ভীম ভাসমান মাইন্‌"-এর মত একটা উৎকট উপদ্রব মনে করিয়া অ্যাঁৎকাইয়া উঠিলাম। 'না' বলিয়া আমার ঘাড়টা যে একবার বেঁকিল, আর সোজা হইল না। এখান-সেখান হইতে প্রশংসাপত্র কুড়াইয়া যে একটা কেরানীগিরির জোগাড় করিব তাহাতেই আমি আশ্চর্য্যরূপে নিরুৎসাহ রহিলাম। এ লইয়া বাবার সঙ্গে যে একটা বচসা হইযা গেল, তাহার ধাক্কায় আমি দোতলা হইতে ছিট্‌কাইয়া নীচে আসিযা তাঁহার মুহুরির প্রতিবেশী হইলাম। বাবা আঙুল দিয়া রাস্তায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একে আমি মা'র উঠাউঠি পাঁচ মেয়ের পর প্রথম পুত্র, তায় দুইবার শূন্য পকেট ও খালি পা লইয়া রেঙ্গুন ও হরিদ্বার বেড়াইয়া আসিয়াছিলাম, কাজেই আমার উপর মা'র দুর্ব্বলতা চরম হইয়া উঠিয়াছিল। মা সত্যাগ্রহ সুরু করিলেন, তাহারই ফলে একটা রফা হইয়া গেল। ঘর পাইব বটে কিন্তু অন্ন পাইব না ; অর্থাৎ বাবার অন্নের গ্রাস মুখে তুলিতে হইলে আমাকে দস্তুরমত পয়সা গুণিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মানদণ্ড দিয়া বিচার করিয়া বাবার এই নিষ্ঠুর আদেশটা ঠাণ্ডা মেজাজে ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু সামান্য একটা পনেরো টাকার টিউশানি জোগাড় করিতেও হাঁপাইয়া উঠিলাম। ঘর ছাড়িয়া যে আর কোথাও বাহির হইয়া পড়িব, তাহারও উপায় ছিল না ! পাকে-প্রকারে কথাটা মা'র কানে উঠিতেই মা এমন আকুলি-ব্যাকুলি আরম্ভ করিতেন যে মনটা কাদা হইয়া যাইত। অভাবের মধ্যে বসিয়া শুকাইতে শুকাইতে হঠাৎ একদিন সাহিত্যিক হইয়া উঠিলাম এবং একখানা সাপ্তাহিক কাগজ আমার একটি গল্প পাঁচ টাকা মূল্যে গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য করিল। গোড়ায় মেসেই খাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—এখন লুকাইয়া ফুনুর হাত দিয়া মা'র নিজ হাতে তৈরি করা মিষ্টান্ন আসিয়া আমার মুখগহ্বরে পৌঁছিতে লাগিল। এখনও কোনো কাজ যোগাড় করিতে পারিলাম না অথচ দিনে-দিনে বর্দ্ধমান শশিকলাটির মত পরিপুষ্ট হইতেছি দেখিয়া বাবা মা'র প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভবা যে আজকাল খুব টেরি বাগিয়ে চলে, গায়ে সিল্ক দেখলাম—ব্যাপার কি ? পয়সা পাচ্ছে কোথা

থেকে ? মা বলিলেন—, কেন ? আজকাল ও গল্প লিখে টাকা পাচ্ছে। কে একজন ওকে ছেলেদের একটা মানে-বই লিখে দেবার জন্যে আগাম্ টাকা দিয়েছে। নিজেরটা ও নিজেই চালায়। খাচ্ছেও মেসে। বাবাকে নরম করিবার জন্যই হয়তো মা কণ্ঠস্বরটাকে একটু ভিজাইয়া আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন।—গল্প লেখে ? পাজিটাকে আজই আমি ঘাড় ধরে বা'র করে দেব। কোর্টে আজ প্রকাশবাবু ওর একটা গল্পের যে কী নিন্দেই করছিলেন—ছি ছি, ও নাকি সব বস্তির লোক নিয়ে গল্প লিখেছে—লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল ! এই বলিয়া বাবা সাহিত্যিকদের চরিত্র লইয়া এমন সব গুহ্যকথা বাহির করিতে লাগিলেন যে ঘৃণায় ও রাগে আমার মাথাও আর আস্ত রহিল না।

কিন্তু হঠকারিতা করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেলেই যে খুব একটা সুরাহা হইবে, দূর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার কোনই ইঙ্গিত পাইলাম না। বরং আরো দু'তিন দিস্তা কাগজ ও দু-এক বাণ্ডিল্ মোমবাতি আনিয়া কলম শানাইয়া বসিয়া গেলাম। বস্তিতে যাহারা বাস করে তাহারা গরিব মূর্খ ও স্থূলপ্রবৃত্তি বলিয়াই যদি অপরাধ করিয়া থাকে, তবে আমার নাম যে ভবানন্দ তাহার জন্য আমিও কম অপরাধী নই। শুনিয়াছিলাম ঠাকুরদার আমলে মা যখন পুত্রবধূরূপে প্রথম এই বাড়িতে পদার্পণ করেন, তখন তিনি গান জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই, এমন-কি তাহার চরিত্র সম্বন্ধেও সংশয় উঠিয়াছিল। দাদামশায়ের দেওয়া সেতারটিকে উনুনের চেলা-কাঠ বানাইয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন্ নাই, মা'র কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল বলিয়া এই সংসারে তাঁহাকে প্রায় পাঁচ বৎসর মৌনী নির্ব্বাক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সে-সব দিন কবে অতীত হইয়া গেছে, তবু আজ সাহিত্যের প্রতি বাবার এই মর্ম্মান্তিক ক্রোধের পরিচয় পাইয়া নিজেদের বংশ-মর্য্যাদা সম্বন্ধে সংশয়াকুল হইয়া উঠিলাম, --নিজের উপরও সন্দেহ হইল, হয় তো পরবর্ত্তী যুগের কাছে আমিও আবার এমনি রূঢ় ও হাস্যাস্পদ হইয়া দেখা দিব ! যাহা হউক, এত যে রাশি রাশি কাগজ ও সময় ব্যয় করিলাম, তাহা একেবারে ব্যর্থ হইল না। দেখিতে দেখিতে নাম হইল। বেশী লিখিলেই বাঙলা দেশে নাম কেনা যায়। দু' মাস অসুখ হইলেই দেখিবে পাঠকরা তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। পাঠকরা যাহাতে না ভোলে তাহার জন্য বেশী তো লিখিলামই, এবং এমন কিছু লিখিলাম যাহাতে সমালোচকরা চাঁদা করিয়া এক জোট হইয়া পিছনে লাগিয়া চীৎকার সুরু করিল। শক্তির মাদকতায় মত্ত হইয়া কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিলাম না, দেখিলাম নাম হইয়াছে, সম্পাদকরা তাঁহাদের কাগজের কাটতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন এবং বাবা আমার চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা পূর্ণবয়স্কা পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন।

ভাল বাসিয়া বিবাহ করিব সে গর্ব্ব আর আমার নাই। লেখা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া কণ্ঠে বরমাল্য দিবে, বাঙালি মেয়েরা এখনও ততটা aesthetic বা সৌন্দর্য্য-রস-লিপ্সু হয় নাই ; আমার ট্যাকটা যদি সৌভাগ্যক্রমে গড়ের মাঠের মত খাঁ খাঁ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এমন মেয়ে পাইতাম যে বাসর রাত্রে স্বচ্ছন্দে আমাকে বলিতে পারিত—তোমাকে দেখবার কত আগে তোমার লেখার সঙ্গে প্রেমে পড়ে' গিয়েছি। কথাটা তখন তাহার মুখে বেমানান হইত না। এখন যদি এই লেখার দাবিতে কোনো সুরসিকার পাণিপ্রার্থনা করি, সে নিশ্চয়ই মুখ বাঁকাইয়া এমন একটা ভঙ্গী করিবে যাহা আঁকিয়া তুলিতে স্বয়ং গগন ঠাকুরও পেছপাও হইবেন ! অতএব বাবার সন্ধানের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব

রহিলাম।

ছাতা লইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখি আমার ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেলাম। ভিতরে যে একটা কিছু মিটিং হইতেছে এমন মনে হইল না, কিম্বা হয়তো পরনিন্দা না করিলে মেয়েদের মিটিং পূর্ণাঙ্গ হয় না। শ্রুতিশক্তিটাকে ধারালো করিবার চেষ্টায় দুয়ারের উপর কান পাতিলাম ; স্পষ্ট শুনিলাম অবলা মেয়েদের অবরোধমুক্তা স্বাধীনকর্ত্রী করিবার কথা ভুলিয়া গিয়া মেয়েগুলি মন খুলিয়া আমারই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছে। দরজাটা উহাদের মুখের উপর ধাক্কা দিয়া খুলিয়া দিবার কথা মনে হইল, কিন্তু পরের খোলা চিঠি পড়িবার মত এ-ক্ষেত্রেও লুকাইয়া সব কথা শুনিবার একটা দুষ্ট ইচ্ছা এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, রীতিমত কোমরটা নোয়াইয়া দুয়ারের ও-পিঠে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

মুহূর্তে মুখ শুকাইয়া গেল। আমার টেবিলের সামনে ললিতার একটা ফোটো টাঙানো ছিল—ঐ মেয়েটি কে, আমারই সাহিত্য সাধনায় অন্তরতম অনুপ্রেরণা কি না—এই সব ব্যাপার লইয়া মেয়েগুলি এমন সব ভদ্রালোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে যে, লজ্জায় আমার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। আমার টেবিলের উপর যে কেপ্‌লার্-এর একটা কড্‌লিভার আছে তাহাও উহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। ছি ছি, তাড়াতাড়িতে কড-লিভারের বোতলের কথাটা মনে হয় নাই। দাঁত মাজিবার জন্য নিমগাছের কতকগুলি ডাল যে ছুরি দিয়া কাটিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাও উহাদের চোখে পড়িয়াছে! মুখ দেখাইবার আর পথ রহিল না। এইবার ড্রয়ার টানিয়া বাঁধানো দাঁতের পুরোনো পাটিটা দেখিয়া ফেলিলেই হয়।

সত্যই, আমার রুচির তারিফ্ না করিয়া পারিতেছি না। ললিতার ফোটোটা ধরিয়া টান দিতেই তাহার পিছন হইতে পচা শুকনো কতকগুলি বকুল ফুল ও কাঁচের চুড়ির টুকরো মেঝের উপর পড়িয়া গেল। মেয়েগুলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঐ নোংরা জিনিসগুলা ময়লা-টিনে ফেলিয়া না দিলে যেন আমার জাত যাইত! বুড়া হইয়াও ছেলেবেলার বোকামির চিহ্নগুলি এখনও লুকাইয়া রাখিয়াছি! তাহা ছাড়া লুঙ্গি পরিয়া মুসলমান সাজিয়া রাত্রে ঘুমাইবারই বা আমার কী দরকার ছিল! সেই লুঙ্গি আবার শুকাইবার জন্য ঘটা করিয়া জানালায় মেলিয়া দিয়াছি—হাত বাড়াইয়া একটা চোরেও তাহা চুরি করিয়া নিল না! চোরকে তাহা হইলে বক্‌শিস দিতাম। আমি যে প্রতি-সপ্তাহে মার্কেটে গিয়া আনি ফেলিয়া ওজন লইয়া আসি, তাহার কার্ডগুলি টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখিয়া নিজের বর্দ্ধিষ্ণু ভুঁড়িটার বিজ্ঞাপন না দিলে যেন ভারতবর্ষ আর স্বাধীন হইত না! কয় ষ্টোনে এক পাউণ্ড হয়, মেয়েরা তাহার নামতা কসিয়া আমার ওজন বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। কড়লিভারটাই যে আমার ওজন-বৃদ্ধির কারণ, এই অনুমান করিয়া মেয়েগুলি এমন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল যে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, পা দিয়া ঠেলা মারিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলাম।

একটা ক্যামেরা লইয়া আসা উচিত ছিল—মেয়েদের ভ্যাবাচাকা মুখ দেখিয়া মনে হইল এমন করিয়া ঢুকিয়া পড়াটা প্রচলিত রীতির ঠিক অনুকূল হয় নাই। কিন্তু একটা পুরুষের সামান্য শারীরিক নৈকট্যকে এমন সঙ্কোচ করিবারই বা কি হেতু আছে? তবু একটা ওজুহাত দিবার প্রয়োজন ঘটিল। ফুনুকে কহিলাম, ছাতাটা নেব। বলিয়া আলমারির পিছনে হাত দিলাম।

শ্রাবণের সন্ধ্যাকালে হঠাৎ পশ্চিম আকাশে রোদের হাসি হাসিয়া বিধাতা কেন যে আমাকে ঠাট্টা করিলেন, বুঝিলাম না ! একটি মেয়ে মুচকিয়া হাসিতেছে। চাহিয়া দেখি, ইঁদুরগুলির দৌরাত্ম্যে আমার ছত্রটি একেবারে ছত্রখান হইয়া গিয়াছে। —মেয়েদের প্রতি মাতা বসুন্ধরার পক্ষপাতিত্ব বেশি বলিয়া আমাকে সেই অটুট মেঝের উপর নিরেট বোকার মত অটল দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

বাঁচাইল আমাকে ফুনু। মেয়েদের উদ্দেশ করিয়া কহিল,—ইনি আমার দাদা, (নামটা বলিবার দরকার নাই) আর ইনি রমা মিত্র। ছাতাটা তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিয়া নমস্কার করিলাম। এতগুলি মেয়ের মধ্য হইতে একটিকে বিশেষ করিয়া বাছিয়া ফুনু যখন তাহার নামোচ্চারণ করিল, তখন বিস্ময়াভিভূত হইয়া যাহার মুখের দিকে তাকাইলাম তাহাকে আগে কখনো না দেখিলেও অনেক দিনের চেনা বলিয়া মনে হইল। রমা মিত্রের নাম জানে না বাঙলা দেশের সংবাদ পত্র-পাঠক এমন কেহ আছেন বলিয়া জানিতাম না। সেই রমা মিত্র গরিব সাহিত্যিকের ঘরে আসিয়া তাঁহার দাঁতন-কাঠি নিয়া সমালোচনা করিবেন জানিলে আমি পূর্ব্বাহ্নে একটা অভিনন্দন গাথা লিখিয়া রাখিতাম। শাদা গদ্য এখন আমার মুখে জোগাইবে বলিয়া তো ভরসা হইল না।

রমা দেবীই কথা পাড়িলেন এবং পৃথিবীতে আলাপ করিবার এত সব বিষয় থাকিতেও আমার গল্পের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। প্রথমটা মনে করিলাম বুদ্ধি হিসাবে একটু খাটো বলিয়াই হয়তো অতিথিসৎকারের ঋণশোধের ইচ্ছায় ভদ্রতা করিয়া আমাকে একটু তোষামোদ করিতেছেন। রীতিটা অতিমাত্রায় ভদ্র ও বহু-আচরিত বলিয়া রমা দেবীর প্রশংসাকে মনে মনে সন্দেহ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, না : আমার গল্পগুলি লইয়া তিনি দস্তুরমত একটা দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। অন্তঃসারশূন্যতাকে ঢাকিবার জন্য বেশি কথা বলিতে হয় জানিতাম, তবু রমা দেবীকে বিশ্বাস করিতে বড় সাধ হইল। সাহিত্যিকমাত্রেই প্রশংসার কাঙাল হইয়া থাকে, এবং সে-প্রশংসা যদি দীর্ঘ বক্তৃতাকারে রমা মিত্রের মতন ছাত্র-বন্দিতা দেবীর মুখ হইতে বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে যে একটু ঘামিয়া উঠিব তাহা আর বিচিত্র কি।

গরিবদের নিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি—খুব ভাল করিতেছি। ইহাদের ক্ষুধা, পাপ, ও দুঃখ অনাবৃত করিয়া দেখাইতে হইবে। সুনীতি একটা ব্যাধি—এই ব্যাধি হইতে মুক্ত না হইলে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যও নিষ্প্রাণ হইয়া থাকিবে। ঘটনার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইবার ভীরুতা সাহিত্যিককে শোভা পায় না। এক কথায় রমা দেবী সমস্ত 'বুর্জোয়া' সাহিত্যিক ঠেলিয়া ফেলিয়া আমার হইয়া অনুপস্থিত সমালোচকদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইলেন। পেটে যাহাদের অন্ন নাই, নিশ্বাসের জন্য বাতাস যাহাদের ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমার সাহিত্য তাহাদের বাণীই বহন করুক।

নূতন অপ্রকাশিত লেখাটা উহাদের শুনাইয়া দিতে ভারি লোভ হইল, গলা খাঁকরাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রস্তাবটা উত্থাপন করিয়া বসিলাম। "আজকে আর সময় হবে না, অনেক কাজ আছে।" বলিয়া রমা দেবী তাঁহার অনুচারিণীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এটা বলা-ই বাহুল্য হইবে যে, ছাতা লইয়া সেদিন আর 'প্রোমিনেড' করিবার ইচ্ছা হইল না, মেয়েদের রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে আমার প্রতিকূল মতগুলি ঝালাইতে বসিলাম ! কাজে কাজেই রমা দেবীর ললাট তেজোব্যঞ্জক, চক্ষু বুদ্ধিরঞ্জিত, দেহশ্রী বিদ্যুদ্দীপ্ত মনে হইতে লাগিল। নারী-জাগরণ-প্রচেষ্টায় উহার একগুঁয়েমিকে প্রশংসা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলাম

না। ফুনুকে ডাকিয়া নানারূপ প্রশ্নাদি করিয়া বহুপরে একটা মোটা খবর লইলাম—রমা দেবী ইটালির ভুবন মিত্রের মেয়ে যাহার সঙ্গে বাবার কয়েক বছর ধরিয়া একটা মামলা লইয়া ভীষণ মন কষাকষি চলিতেছে। এটা সুখবর নয়।

খ

ইহার কয়েক দিন পরে দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া নিজ মনে আয়নায় মুখ ভেঙচাইতেছি,—হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি রমা মিত্র। মুখের ভাব স্বাভাবিক করিলাম ; এই ব্যাপারটায় যেন বিস্মিত হইবারও কোনো কারণ নাই, কেননা রমা যে একদিন, আসিবেনই তাহা ভারবতর্ষের স্বাধীনতার মতই সুনিশ্চিত, কেননা রমা দেবী আমার Tenth Muse।

দুপুরের রোদে মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চুলগুলি রুক্ষ, পায়ে জুতো-ভরা ধূলো, দেহকান্তি শ্রমমলিন। এত সহানুভূতি বোধ করিলাম যে কি বলিব ! কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে বেশিক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকার চেয়ে একটা চেয়ার টানিয়া তাহাকে বসিতে বলাটাই শিষ্টাচার হইবে।

চেয়ারে বসিয়া রমা দেবী কহিলেন, আপনার কাছে একটা জরুরি কাজে এসেছি। অনুরোধ আমার রাখতেই হবে।

শেষের কথাটা বলিয়াই তিনি আমার ল্যাজ মোটা করিয়া তুলিলেন। তবু প্রশ্ন করিলাম কি কাজ ?

মাথার কাপড়টা দুইবার গুছাইয়া, গলার হারটা বার তিন নাড়িয়া, হাতের চুড়িগুলিতে বার কয়েক আওয়াজ তুলিয়া তিনি কহিলেন, ছাত্রী-জাগরণ সম্বন্ধে আপনাকে একটা খুব গরম বিদ্রোহাত্মক কবিতা লিখে দিতে হবে। এই বলিয়া আমার মুখের দিকে এমন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইলেন যে আমি কলম দিয়া একটু ইসারা করিলেই যেন ছাত্রীরা তাহাদের জুতার ঘুন্টি খুলিয়া কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইবে ! তবু ইতস্তত করিতে লাগিলাম।

মেয়েরা না জাগিলে যে পুরুষের কর্ম্মশক্তিও সুপ্ত থাকিবে, সমস্ত আন্দোলনে পবিত্রতা ও মাধুর্য সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য মেয়েদের যে ভীষণ প্রয়োজন এই বিষয়ে যথারীতি এক বক্তৃতা দিয়া, কি কি দিয়া কবিতাটি লিখিতে হইবে তাহার ভাষা ও ভাবের দুয়েকটি ফরমায়েস করিয়া রমা দেবী আমার মুখের দিকে আরেকবার তাকাইলেন। বাম গুম্ফপ্রান্তটুকু একবার চুমড়াইলাম। বন্ধুদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বৃষ্টির দিনে বসন্ত হাওয়া বহাইয়া ও অমাবস্যা রাত্রে চাঁদ ভাসাইয়া দুয়েকটা বিয়ের কবিতা না যে না লিখিয়াছি এমন নয়। কিন্তু মার কাট্‌ ধর্‌ ছোঁড় বলিয়া একটা স্বদেশী খেউড় ধরিব, আমার না আছে ততখানি স্নায়ুর জোর, না সে শব্দ-সম্পদ ! তাই অতি-বিনয়ে ঘাড়টিকে একটু হেলাইয়া অসম্মতি জানাইলেন।

কিন্তু আমার কথা শোনে কে ? আমাকে দিয়া না লিখাইলে তাঁহার স্বস্তি নাই। তিনি আরেক কিস্তি আমার প্রশংসা সুরু করিলেন। কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে এবার সন্দিহান হইলেও শুনিতে কিন্তু ভারি ভালো লাগিল। "আপনি পারেন না ? নিশ্চয়ই পারবেন, একশো বার পারবেন। সারা বাঙলা দেশে এমন তেজস্বী লেখনী আর কার আছে ?"

বলিয়া তিনি কলমটা আমার হাতের মুঠিতে উপহার দিবার জন্য অলক্ষিতে আমার দুইটি আঙুল স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন।

বলিলাম,—ঐ প্রকার উৎকট স্বদেশপ্রেম আমার আসে না।

কথাটার মধ্যে বোধ হয় একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল, রমা দেবীর মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফের বলিলাম,—স্বদেশপ্রেম নিয়ে পৃথিবীতে কোন দিন বড় সাহিত্য হয়নি। আমরা যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি, সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

আর যায় কোথা ? রমা দেবী এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন জানিলে বাছিয়া বাছিয়া আরো দুয়েকটা কড়া কথা শুনইয়া দিতাম ! রমার রূপে যে এমন দৃপ্ততা ছিল জানিতাম না, দুই চোখে কুলাইয়া উঠিতেছে না। রমা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, চূর্ণকুন্তলগুলি সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, শঙ্খের মত গ্রীবাটি বেষ্টন করিয়া যে বস্ত্রাঞ্চলটুকু বুকের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহার একটি প্রান্ত মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন,—স্বদেশপ্রেম নিয়ে বড় সাহিত্য হয়নি ! নির্জ্জীব ভীরু বাঙালী সাহিত্যিক হ'য়ে তা তো বলবেনই ! ভলটেয়ার, ভিক্টর হিউগো, গ্যয়টে, ডস্টয়ভস্কির নাম শুনেছেন কোনোদিন ? আপনাদের মেরুদণ্ড ঘুণে খেয়েছে, তাই সাহিত্য করতে বসে খালি অলস ভাবুকতা, আর ন্যাকামি করে চলেছেন। স্বদেশপ্রেম নিয়ে সাহিত্য হয় না ! সাহিত্য হয় তা হলে কি বস্তি নিয়ে, ড্রেনের পচা গন্ধ নিয়ে, মরা ইঁদুর নিয়ে ? এ কথা বলতে আপনার লজ্জা হ'ল না ? ছি !

হাসিব না, কাঁদিব বুঝিলাম না। কাঁচুমাচু হইবার ভাণ করিয়া বলিলাম,—সব গুণই কি সকল লোকের থাকে ? কেউ পারে, কেউ পারে না। অন্য 'মেয়ে পেরেছেন বলে' আপনি ইংলিশ চ্যানেল সাঁত্‌রে পার হ'তে পারবেন ? সকল লোকেরই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে !

এত সংযম সহকারে কথা বলিয়াও কোনো সুফল পাইলাম না। বাম করতলে ডান হাতের মুষ্ট্যাঘাত করিয়া রমা দেবী কহিলেন,—কেন পারবেন না আপনি ? আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী না ? যদি না পারেন তো কলম ছেড়ে দিয়ে লাঙল ধরুন গে। দেশের উপকার বেশি হবে।

তবুও কিছু কঠিন কথা বলিতে পারিলাম না। মুগ্ধের মত তাঁহার উজ্জ্বল চোখ দুইটির পানে তাকাইয়া কহিলাম,—বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে-মাতরমের কথা বলছেন ? ওটার মন্ত্রশক্তি যত অমোঘই হোক না কেন, সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে ও গানটা নেহাৎ অসার্থক।

কী সাঙ্ঘাতিক কথাই বলিয়া বসিয়াছি ! যেন তাঁহাকে নিদারুণ দৈহিক অপমান করিয়াছি, এমনি ভাবে সরিয়া গিয়া তিনি আর্ত্ত অথচ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—কী ? ঘৃণায় কুঞ্চিত হইলে নারীর মুখ এত সুন্দর হয়, এই প্রথম দেখিলাম।

নম্রস্বরে কহিলাম,—আপনি চট্‌ছেন, কিন্তু সমালোচনার দিক থেকে কথাটা মিথ্যে নয়। আধা-বাংলা আধা-সংস্কৃত এমন একটা রচনা কবিতার প্রাথমিক নিয়মকেই উপেক্ষা করেছেন। তা ছাড়া কবিতাটা নিতান্ত 'কমুন্যাল,'—মুসলমানরা পড়েছেন বাদ, ব্রাহ্মরা কর্‌ছেন বিবাদ। বলিয়া হাসিব কি, রমার মুখের চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। রমা দেবী টেবিল হইতে সিসের পেপার-ওয়েইট্‌টা তুলিয়া লইয়াছেন !...

—আপনাদের মত ক্ষীণজীবী সাহিত্যিকরা তো এ কথা বলবেই। খালি বিরহ আর হা-হুতাশ নিয়ে শক্তি ক্ষয় করাই আপনাদের বিলাস—দেশকে বিপুলতর গ্লানির মধ্যে

ঠেলে ফেলাটাকেই আপনারা মহত্ত্ব মনে করেন। আপনাদের যে ধিক্কার দেব, সে-ভাষা পর্য্যন্ত আমার নেই। বলিয়া পেপার ওয়েইট্‌টা আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া না ছুড়িয়াই তিনি খোলা দরজা দিয়া সিধা অন্তর্হিত হইলেন।

রমা দেবী যে আবার এমনি করিয়া অন্তর্হিত হইবেন তাহাও যেন জানিতাম! তাই নিশ্চিন্ত হইয়া আয়নার সম্মুখে দাড়ি কামাইতে বসিলাম।

গ

এই রমা দেবীর সঙ্গে কি করিয়া আমার বিবাহ হইল, তাহাই বলিতেছি।

সারা মেয়ে-মহলে রমা তখন একটা উন্মত্ত তুফান তুলিয়া দিয়াছেন! একটা বিদ্রোহাত্মক কবিতা নিজেই লিখিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য তাঁর ছয় মাস জেল হইয়া গেল। ভক্ত মহিলাবৃন্দের ফুলের মালা গলায় পরিয়া তিনি কয়েদির গাড়ীতে উঠিয়া সকলকে বিনয় স্নিগ্ধ নমস্কার করিলেন, এমন একটি পরিতৃপ্তিপূর্ণ পরমসুন্দর মুখ আমি আর দেখি নাই! ভিড়ের মধ্যে আমিও ছিলাম বলিলে আমার প্রেমের কবিতার বইয়ের কাট্‌তি আরো বাড়িয়া যাইবে না, তবু সেই মুক্ত দৃপ্ত মেয়েটিকে না দেখিয়া কি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিব ভাবিয়া পাইলাম না। রমা আমাকে দেখিতে পান নাই।

জেল হইতে ফিরিয়াও রমা সায়েস্তা হইলেন না,—আইনের সঙ্গে আবার খুনসুড়ি সুরু করিয়াছেন। ফের ইহার প্রতিফল মিলিল।

বেলেঘাটায় সেই বন্ধুটির কাছে পুনরায় যাইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এখনও আমাকে ধার করিতে হইতেছে। গিয়া দেখিলাম বন্ধুটি আমার সঙ্গে ঠিকানা লইয়া অত্যন্ত খেলো রসিকতা করিয়াছেন—সদর দরজাটা বিধাতার মতই নিরুত্তর, বধির। প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে একটা গলির সন্ধান পাইলাম, তাহার নাগাল পাইতে হইলে পুবে আরো মাইল খানেক হাঁটিতে হয়। চৈত্রের রৌদ্র দেখিয়া নিরস্ত হইব অর্থসম্বন্ধে আমার অধ্যবসায় তত শিথিল নয়। কতক দূর অগ্রসর হইয়া সেই শূন্য নির্জ্জন রাজপথে একটি একাকিনী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইয়া পা দুইটাকে মন্থর করিয়া আনিলাম। দেখি, অনুমান ঠিক, তিনি শ্রীমতী রমা মিত্র।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি এখানে?

অল্প একটু হাসিয়া রমা সংক্ষেপে যাহা বিবৃত করিলেন, তাহা এই: কোন্ একটা রাস্তায় তিনি আইন-অমান্য আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহার ন্যায্য শাস্তিস্বরূপ পুলিশ তাহাকে যথোচিত সম্মান-সহকারে এইখানে বহন করিয়া আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; এখন একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে।

ট্যাক্সিতে বসিয়া রমা দেবী আমার সঙ্গে জল-বায়ু ও বাজার-দর নিয়া কথা বলিতে সুরু করিলেন দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। ট্যাক্সিটা থামাইয়া তাঁহাকে একটা পানের দোকান হইতে লেমনেড খাওয়াইলাম,—তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন। বলিলেন,—একটা জায়গায় অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে যাবে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো বোধ হয় এত দিন ধরে' এই ষড়যন্ত্রই করছিল। কথাটা আমারও মনে হইয়াছিল, কিন্তু বলিবার সাহস হয় নাই।

ট্যাক্সিটা ইটালীতে তাহাদের বাড়ির দোরগোড়ায় থামিতেই দেখা গেল, ভুবনবাবু ব্যস্ত

হইয়া গেটের বাহিরে পাড়ার অনেকগুলি লোকের সঙ্গে জটলা পাকাইতেছেন। (রমার তিরোধানের সংবাদ তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে।) আমাদের দুইজনকে দেখিয়া ভুবনবাবু ক্রোধে বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন, এমন বকাবকি আরম্ভ করিলেন যে ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা পর্য্যন্ত ভয় পাইয়া দাড়ি চুলকাইতে লাগিল। আমি যে তাঁহার কন্যাকে একটা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি তাহার জন্য একটি বিনয়-বচন তো শুনিলামই না, বরং আমিও স্বদেশোদ্ধার-রূপ একটা কু-মতলবে রমার সঙ্গে লিপ্ত আছি ভাবিয়া তিনি আমাকেও বাক্যপ্রহার সুরু করিলেন। বোধ হয় এইটুকু সময় রমার সান্নিধ্যসম্ভোগহেতু আমিও দেখিতে-দেখিতে নিরুপদ্রব মহাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছি—নহিলে ঐ অতিপ্রগল্‌ভ হীনমনা ভদ্রলোকটিকে যে কি বলিয়া ক্ষমা করা যায়, ভাবিয়া পাইলাম না। ভুবনবাবুর মতে দোষটা মুখ্যত আমারই।—আমিই তাঁহার কন্যাকে ফুসলাইয়া মোটরে দিবাভ্রমণ করিবার জন্যই এমন একটা কাণ্ড পাকাইয়াছি! কদর্থটুকু বাদ দিয়া কথাটা জীবনে সত্য হইয়া উঠুক, এমন-একটা প্রার্থনা আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলি সেদিন কান পাতিয়া শুনিয়াছিল, বোধ হয়।

ড্রাইভারটা অমার কাছে ভাড়া চাহিতেছে। ও হরি, রমা ও তাঁহার বাবা সেই যে বাড়ি ঢুকিয়াছেন আর ফিরিবার নাম নাই! ভাবিয়াছিলাম কৃতজ্ঞতার ঋণের অর্দ্ধেক শোধ করিবার জন্য ভুবনবাবু আমাকে বৈকালিক জলযোগ করিতে তাঁহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিবেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে অবশেষে ট্যাক্সি চাপিয়া ভাড়া না দিবার জোচ্চরিতে যদি জেলে যাই, সেটা ভারি লজ্জাকর হইবে। তাই ড্রাইভারকে হর্ণ বাজাইবার অনুরোধ করিয়া এক ফাঁকে টুক করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

পরদিন দুপুর বেলা রমা দেবী আবার আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত সেই রুদ্র বিজয়িনীর মূর্ত্তিতে। তাঁহার এইবারের বিদ্রোহ শ্লথপ্রাণ দুর্ব্বল সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে নয়, আর কাহারো বিরুদ্ধে নয়; নীচ পচা সমাজের অর্থাৎ তাহার প্রতিনিধি তাঁহার বাবার বিরুদ্ধে। পেপার-ওয়েইটটা সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু কথা শুনিয়া গা ঝাড়িয়া একটা সুদীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম। রমা বলিলেন—আসুন আমার সঙ্গে, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

চুলগুলি আঁচড়াইবার পর্য্যন্ত সময় পাইলাম না। ট্যাক্সিতে উঠিয়া রমা একটু কাতর স্বরে কহিলেন,—একজন পুরুষ-মানুষের সঙ্গে সুহৃদের সম্পর্ক, তা অবধি আমাদের সমাজ বরদাস্ত করবে না। পুরুষ আর নারীকে একটা সমতল জায়গায় সহজ হ'য়ে দাঁড়াতে দেখলে সকলে কু-অভিসন্ধি আরোপ করবে! এই চরিত্রদৌর্ব্বল্যকে আমি শাসন করতে চাই। আমি মানবো না এই ইতর অভিভাবকত্ব। চলুন আমার বাড়ি। দেশের কাজ করতে হ'লে লোক চাই! এই মরা সমাজকে না ভাঙ্‌তে পারলে নতুন লোক পাব কোথায়? সন্দেহের এই অত্যাচার থেকেই পাপের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি কখ্‌খনো তা সইবো না বলে রাখ্‌ছি।

রমাদের বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া চা খাইতেছি, এমন সময় আপিস্ হইতে ভুবনবাবু ফিরিলেন। রমা যেন কায়মনোবাক্যে এই মুহূর্ত্তটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমি যদি সাপ কিম্বা গণ্ডার হইতাম, তাহা হইলেও ভুবনবাবু এতটা চম্‌কাইতেন না! আমার দিকে তির্য্যক গতিতে এমন একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যাহাকে বাঙলা ভাষায় তর্জ্জমা করিলে দাঁড়ায় এই; পাজি হতচ্ছাড়া রাস্কেল!

তুমি আবার এসেছ ? জানো, ঘাড়ে রদ্দা মেরে তোমাকে এই মুহূর্তে বাড়ীর বা'র করে' দিতে পারি ? আমিও দৃষ্টিকে মোলায়েম না করিয়াই তাঁহার দিকে চাহিলাম,—তর্জ্জমা করিলে তার অর্থ হয় ; বা'র তো করে' দেবেন, কিন্তু আপনার মেয়ে যে ছাড়ে না !

ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে রমা দেবীর দেরি হইল না। শীতের বেলা, পা-পর্য্যন্ত লম্বা কোটটা কাঁধের উপরে ফেলিয়া খোঁপাটা একটু জুৎ করিয়া বসাইয়া রমা আমাসে কহিলেন,—চলুন, আমাকে বিডন-স্ট্রীটের হষ্টেলে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বেন।

সত্য কথা বলিতে কি, পিতার প্রতি এই অবিনীত উপেক্ষা আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু আমি কি করিতে পারি ? রমার এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বলিলেও ভুবনবাবুর কাছ হইতে মর‍্যাল্ সার্টিফিকেট পাইতাম না, তাই অগত্যা মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিয়া রমার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। ভুবনবাবু স্তম্ভের মত অটল দাঁড়াইয়া কিরূপ মুখভঙ্গী করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য ঘাড়টা ফিরাইতেও সাহস হইল না।

ট্যাক্সি সোজা হেদুয়ার পারে না গিয়া রমার আদেশ-মত এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল। বুঝিলাম, রমার মন চঞ্চল হইয়াছে। হঠাৎ এক সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন,—আপনার সঙ্গে সামান্য পরিচয় রাখছি বলে' আমায় অযথা বাক্য যন্ত্রণা সইতে হ'বে, অন্যায়কে এতখানি প্রশ্রয় আমি কোনকালে দিতে পারবো না। বাবা এখানে শুধু একটা ব্যক্তি নন্—একটা জলজ্যান্ত দুর্নীতির প্রতিনিধি ! স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমি তাঁকে অগ্রাহ্য করতে চাই। তা ছাড়া আপনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক—আপনি আজ যতই কেননা উদাসীন থাকুন একদিন হয়তো আপনার লেখনীই বিদ্যুৎ-লেখা হ'য়ে বহ্নির অক্ষরে মুক্তিবাণী প্রচার করবে। আমি তা সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করে' সুখ পাই। আপনি নাই বা হ'তেন সাহিত্যিক,—তবু একজন পুরুষের সঙ্গে আমি বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারবো না, এ কি জুলুম !

তখন যদি আমি রমা দেবীর বাম করতলখানি প্রথমে ধীরে ও মিনিট দশের পরে নিবিড়ভাবে ধরিয়া থাকি, তবে আমার সেই সৌহার্দ্দ্যকে অসৌজন্য বলিয়া কেহ মনে করিয়ো না। আর রমা যদি তাঁহার হাতখানি সরাইয়া না নিয়া পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও তোমরা ক্ষমা করিয়ো !

ঘ

ঘুম হইতে উঠিয়াই রোজ ঝাঁটা হস্তে চাকরটার সঙ্গে দেখা হয় ; সেদিন চক্ষু কচলাইয়া প্রত্যূষ বেলায় দ্বারপ্রান্তে রমাকে দেখিলাম। Aurora বাঙালী মেয়ের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে ভবানন্দ বাঁড়ুয্যের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন একটা সঙ্গত উপমা দিতে পরিতাম বটে। কিন্তু রমার মূর্ত্তি দেখিয়া রণ-দেবী চামুণ্ডার কথা মনে পড়িল। নিম-শাখার দাঁতন-কাঠিটা মুখ হইতে খসিয়া গেল। রমা দেবী দৃপ্ত কণ্ঠে কহিলেন,—বাবা আমাকে বাড়ীতে আর স্থান দেবেন না বলেছেন। আমাদের সঙ্ঘের হষ্টেলে এসেই উঠলাম যা হোক। সমস্ত মন দিয়ে এই আমি চাইছিলাম হয়তো। এই আমার বেশ হয়েছে। সংসারে আজ আমার কেউ নেই, এ কথা ভাবতে মুক্তির সঙ্গে আমি একটা বড় রকমের গর্ব্ব বোধ করছি। এবার আমি পরিপূর্ণ ভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবো। তুচ্ছ পরিবারের গণ্ডী আমি মানিনে।

'সংসারে আজ আমার কেউ নেই'—এ কথা বলিতে রমার কণ্ঠস্বর ঈষৎ গদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছিল এবং আমি যে 'কেউ নেই'-র তালিকার অন্তর্ভুক্ত নই তাহা দেখিয়া খুব খুশি হইলাম। পুরুষের সাহচর্য বাতিল করিয়া একটি অহোরাত্র কাটাইবার সঙ্গতিও মেয়েদের নাই, (কথাটা মেয়েদের পক্ষে অসম্মানসূচক নয়) বিশেষতঃ যাঁহারা হস্টেলে থাকেন। তাঁহাদের ফরমায়েস খাটিবার জন্য নানাবিধ কিঙ্করের আবশ্যক। (কথাটা পুরুষদের পক্ষে সম্মানহানিকর নয়) তবে আমি যে ঠিক রমা দেবীর খিদমৎগারের পর্য্যায়ে পড়িলাম না সেটাকে আমার সিংহরাশির কপালগুণ বলিতে হইবে। 'খাদি প্রতিষ্ঠান' হইতে দর করিয়া খদ্দর ও 'দিল্লী-এম্‌ব্রয়ডারি' হইতে অর্ডার-মাফিক চটি কিনিয়া আমি রমা দেবীকে লইয়া চাঁদপালঘাটে ষ্টিমার লইতাম এবং সেই ষ্টিমারেই রাজগঞ্জ হইতে পুনরায় চাঁদপাল ঘাটে ফিরিয়া আসিতাম। সারা সময়টা দেশোদ্ধারের জল্পনা লইয়াই কাটিত না বলিলে তোমরা রাগ করিবে, কিন্তু গঙ্গার হাওয়া যে অধিকতর মিষ্ট এবং সন্ধ্যার আকাশ অধিকতর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিত, তাহা হয়তো অস্বীকার করিবে না!

আমাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য অন্তত মা'র স্নেহব্যাকুল বাহু ছিল রমা তাঁহার মা'র সেই ব্যগ্র বাহুকেও প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন। আমার চেয়ে তাঁহার তেজ দীপ্ততর, এ কথা ভাবিয়া আমিই সর্ব্বাগ্রে বেশী গর্ব্বানুভব করিতেছি। আমরা দুইজনে সমান উৎপীড়িত—একজন সাহিত্যের জন্য, আরেক জন দেশ-প্রেমের জন্য। আমাদের সম্পর্কটা আরও নিকটতর হইয়া উঠিল। দুইটি আদর্শের জন্য পরিবারের কাছে লাঞ্ছনার একটা মিল পাইয়া রমা ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ব্যক্তির চেয়ে একটা ভাবময় আইডিয়াই তাঁহার মনে নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। ঠিক করিলাম আমি করিব সাহিত্য, আর রমা করিবে শিক্ষা-সংস্কার।

সেই সঙ্কল্প লইয়া তিনি নতুন একটা ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। আমাদের জন্য creature comforts নয়; দারিদ্র্য, দুঃখ ও দুরাশা। খুব বড় রকমের একটা সফল জীবনের প্রত্যাশী আমরা নই,—একটি মহান্ আদর্শ হৃদয়ে নিরন্তর লালন করিতেছি সেই আমাদের মহান্ কীর্ত্তি। অর্থ ও সম্মান অনেকেই লাভ করে, আমাদের অকৃতকার্যতাই আমাদের জীবনকে একটা মর্য্যাদা দান করিবে।

ইতিমধ্যে হষ্টেলের অপরাপর মেয়েরা আমাদের সম্পর্ক লইয়া কানাঘুষা করিতে সুরু করিয়াছে। নেপথ্য হইতে মেয়েগুলি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের যত চেষ্টা করে, রমা দেবী ততই প্রকাশ্যে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরেন। ফলে, হষ্টেলে রমা দেবীকে আর স্থান দেওয়া ছাত্রীদের নীতি-শিক্ষা দিবার অনুকূল হইবে কি না এ বিষয়ে সসমারোহে প্রশ্ন উঠিল। রমা সে লজ্জা আর সহিতে পারিলেন না।

সেই দিন ষ্টিমারে করিয়া রাজগঞ্জ ঘুরিয়া আসিবার ধৈর্য্য ছিল না, ইডেন-গার্ডেনের বেঞ্চে দুইজনে বসিলাম। কি-কি কথা হইয়াছিল ঠিক মনে নাই; তবে এটুকু বেশ মনে করিতে পারি, প্রথমত রাগিয়া সমস্ত বাঙলা দেশটাকে রসাতলে পাঠাইয়া পরে কখন্ নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভুলিয়া গিয়া পত্রান্তরালে চন্দ্রোদয় দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছি। রাত বাড়িতেছে, ভ্রমণকারীরা আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কেহ বাড়ি ফিরিতেছে, কেহ বা আড়ালে অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের কাহারও মুখে কথা নাই, আকাশের তারাগুলি নির্নিমেষ চোখে আমাদের দেখিতেছিল। এই প্রকাণ্ড শূন্যময় স্তব্ধতায় দুইজনে আরো কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ট্রাম ছিল না ; ড্যালহৌসি স্কোয়ারের কাছাকাছি আসিয়া একটা ট্যাক্সি পাইলাম। কোথায় যাইব, কি ঠিকানা দিব ভাবিয়া পাইলাম না ; ট্যাক্সিটা এখানে ওখানে ঘুরিতে লাগল। এক সময় লক্ষ্য করিলাম, রমা দেবীর এই অধঃপতন কল্পনা করিলেও আমার বুক ফাটিয়া যাইত, তবু জোয়ান অফ্ আর্কের মৃত্যুর পর করুণ-দৃশ্যের কথা ভাবিতে পারি নাই বলিয়া তাঁহার মাথাটা কাঁধের উপরে ধীরে ধীরে টানিয়া আনিলাম। তিনি কহিলেন,—কোথায় যাচ্ছি ? বলিলাম,—কোথাও না।

যাইবার ঠিকানা নাই অথচ যাইতেছি, এমন একটা রূপক লইয়া খুব বড় সাহিত্য-রচনা কোনো দেশে হইয়াছে কি না ভাবিতে লাগিলাম।

৬

পরিচ্ছেদগুলি ছোট হইয়া আসিতেছে।

ছিদাম মুদির লেনে ছোট একটি একতলা বাড়ির একাংশে আমি আর রমা দুইখানি ঘর লইয়াছি। আমি একটা আফিসে সাড়ে তেত্রিশ টাকার একটা চাকরি লইয়াছি, রমা তাঁহার ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সদ্যপ্রসূত মেয়েটিকে লালন করিতেছেন। রমার শরীর অসুস্থ বলিয়া যে একটা ঠাকুর রাখিব সে সঙ্গতি নাই। বাসন মাজা পোষাইবে না বলিয়া আজ প্রায় চার মাস ধরিয়া কলাপাতায় ভাত খাইতেছি। উনুন আমিই ধরাই, বাজারও আমি করি, মেথর না আসিলে আমাকেই আমাদের অংশের নর্দ্দমাটুকু পরিষ্কার করিতে হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল কি না সংসারভারগ্রস্তা রমার তাহা জানিবারও অবকাশ হয় না ! সপ্তাহান্তে এক পয়সা দিয়া যে একখানা সাহিত্যপত্র কিনিব তাহাও আমার কাছে বাজে-খরচ মনে হয়। তিনটি পয়সা হইলে একবার দাড়ি কামানো যাইবে।

এটা আমাদের পরজন্ম বলিয়া মনে হয়। রমাকে যেন কোনোদিন পাই—কোনোদিন অসতর্ক মুহূর্ত্তে শ্রীভগব'নের কাছে এমনি প্রার্থনা করিবার ফল মিলিয়াছে ! শ্রীভগবান মানুষের প্রার্থনা রাখেন, তাহার এমন জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাইয়া বাধিত হইলাম।

কাল রাত্রে আমাদের বাড়ির অপরাংশের গৃহস্বামীটি কোন্ এক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় গলায় দড়ি দিয়াছেন,—শেষ রাত্রি তুমুল কান্না সুরু হইয়াছে। ঐ দুঃখব্যাধিজর্জ্জর মৃত ভদ্রলোকটিকে লইয়া একখানা বিরাট মহাকাব্য লেখা যায় না এমন নয় ! কিন্তু আমাদের এই নিরর্থক অকৃতকার্য্য জীবন লইয়া কোনো জীবনচরিত-কার মাথা ঘামাইবে না বলিয়া মনে হওয়াতে নিজেই গায়ে পড়িয়া লিখিয়া ফেলিলাম।

পরিবারকে পরিত্যাগ করিয়া এই বাড়ীতে আসিবার সময় লতিকার ফোটোটি আর আনা হয় নাই—সেই নীচের ঘরের দেওয়ালে সেটি মলিন মুখে এখনও বিরাজ করিতেছে কি না, কে জানে। লতিকা তাহার বিবাহের পরে আমার বৌদিকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন : ওঁকে আমার ফোটোটি সরিয়ে ফেলতে বলবেন। যথাসময়ে ললিতার সেই ভীরু অনুরোধটি আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কিন্তু লতিকার দুর্ব্বলচিত্ততার কথা মনে করিয়াই ফোটোটি সরাই নাই। আমার চোখের উপর সেই ফোটোটি ধীরে-ধীরে দিনের পর দিন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। আমি যে তাহার দিকে কোনোদিন নিবিষ্ট চক্ষে তাকাইয়াছি এমন কথাও মনে হচ্ছে না। তবু তাহার সেই ফোটোটি আজ একবার দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভূমিকম্প

ভাদ্রের জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রি। শরতের শান্ত নিশীথ। স্নিগ্ধ বাতাস গাছের পাতা কাঁপাইয়া বহিতেছে। নীলানন্তমণির পেয়ালার মত স্বচ্ছ নীলাচল হইতে চাঁদের আলো মদিরা-ধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে, চক্ষু দিয়া আলো পান করিলে দেহের রক্ত ঝিলমিল করে, যেন কোন্ আতপ্ত অঙ্গের স্বর্ণের শিহরণ লাগে, অন্তরে কোন্ অজানা তৃষ্ণা, গোপন বেদনা জাগে। মাঝে মাঝে শুভ্র খণ্ডমেঘে চাঁদ ঢাকা পড়িতেছে, অন্ধকার হইয়া আসে, পৃথিবী পরম রহস্যময় মনে হয় ; মেঘ উড়িয়া যায় যেন অবগুণ্ঠন খুলিয়া কোন্ নীলনয়না তাহার সুগভীর নীল নয়নের চাহনিতে আহ্বান করে, অনিমেষে চাহিয়া থাকে। ঘরের সামনে কদমগাছের সবুজ বিস্তারের উপর চাঁদের আলো ও মেঘের ছায়া মিলিয়া লুকোচুরি খেলা চলিতেছে ; অদূরে নারিকেল গাছের কম্পিত দীর্ঘ বাহুগুলি ঝিকমিক করিতেছে।

এমন সুন্দর শরৎরাত্রিতে নির্জ্জনে আপন প্রিয়াকে লইয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতে ইচ্ছা করে, হাস্যে-গুঞ্জনে নিশীথরাত্রি মধুরতর মিলনপূর্ণ হইবে।

কিন্তু ইলা তাহা বোঝে না। সোফাটা বারান্দায় বাহির করিয়া এলাইয়া বসিয়া রণেশ এই কথাই ভাবিতেছিল, তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের সমস্যার সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যৌবনে সে কবিতা লিখিত। এখনও তার এক কবিতার বহির কতকগুলি ফর্ম্মা দপ্তরীর বাড়ীতে পোকায় কাটিতেছে। এই মায়াময় শরৎ-নিশীথে তার অন্তরের কবিটি জাগিয়া উঠিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। চাঁদের আলো বড় করুণ, যেন অশ্রুজলে ভেজা। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা সে মনে মনে আবৃত্তি করিল—

"বহুদিন মনে ছিলো আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তা'র শেষ সুধা ;
ধন নয় মান নয় কিছু ভালবাসা
ক'রেছিনু আশা।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা ,
তা'হারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা।

ধন নয় মান নয় কিছু ভালবাসা
ক'রেছিনু আশা ॥

ভালবাসা হয়তো সে পাইয়াছে, হয়তো পায় নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, ইলা তাহাকে সত্যই ভালবাসে! তাহার গভীর প্রণয়ের পরিচয় পাইল বলিয়া মনে হইয়াছে, আবার মনে হইয়াছে প্রেম অলীক, শুধু ছলনা। ইলা যদি কোন পল্লী নদীর মত হইত,—শীতল জলধারা, শান্ত সৌন্দর্য্য, কল্যাণদায়িনী লক্ষ্মী! এ যেন কোন্ পার্ব্বত্য নদী, কখনো দু'কূল ভরা, তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বাসে আবেগে বন্যা নামে ; কখনো জলহীন, শুষ্ক, তলায় বড় কালো কালো পাথরগুলি বাস্তবতার অট্টহাসি হাসে।

এ সব কথা ভাবিতে রণেশের ভাল লাগিতেছিল না। সেখান হইতে উঠিল, বারান্দাটা ঘুরিল, ইলার ঘরে উঁকি মারিল, দেখিল, ইলা সেখানে নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া ইলার ড্রেসিং টেবিলের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইল, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিছানা হইতে একটি বালিশ লইয়া আবার সোফায় আসিয়া হেলান দিয়া বসিল।

ইলা নিশ্চয় ছাদে গিয়াছে, ডাকিয়া কোন লাভ নাই, কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না।

ইলা কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। আজ সারাদিন সে কিছু খায় নাই ; লুকাইয়া লুচি রসগোল্লা খাইয়া থাকিতে পারে, তবে কাহারও সাক্ষাতে কিছু খায় নাই। অন্ততঃ বাড়ীর ঝি-চাকরদের রিপোর্ট, ইলা কিছু খায় নাই। কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া রণেশ দেখে, ইলা তাহার বাক্স গুছাইয়া বিছানা বাঁধিতেছে ; কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বাড়ীর পুরাতন ঝি আসিয়া জানাইল যে বৌদিদি বাপের বাড়ী যাইতে চান ; তাঁকে সেখানে রাখিয়া আসিতে হইবে দাদাবাবুর। ইলা নিজে আসিয়া কোন কথা বলিল না ; কারণ রণেশের সহিত তাহার দুইদিন হইল বাক্যালাপ বন্ধ। ঝগড়া করিয়া সে পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে চায় কিন্তু নিজে একা যাইতে সাহস হইতেছে না ; যদিও সে পিতার আদরিণী কন্যা তবু মনোমালিন্য করিয়া স্বামীত্যাগ করিয়া আসিয়াছে জানিলে পিতা মোটেই ক্ষমা করিবেন না ; নিজেই তাহাকে দিয়া যাইবেন। সেজন্য বণেশকে পিত্রালয়ে দিয়া আসিতে হইবে। আবদার মন্দ নয়!

রণেশ ঝিকে জানাইয়াছিল, সে এখন ইলাকে রাখিয়া আসিতে পারিবে না ; ইলার ইচ্ছা হইলে ঝিকে লইয়া নিজে যাইতে পারে। কিন্তু ঝি বলিল যে বৌদিদি এ-বাড়ীর অন্নজল স্পর্শ করিবেন না। রণেশ উত্তর দিল, যে কাল সকালে সে ইলাকে বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পারে, আজ রাত্রে খাইতে বল। কিন্তু রাত্রেও ইলা কিছু খায় নাই।

রণেশ ভাবিতেছিল পিতার একমাত্র কন্যা আদরিণী spoilt child বিবাহ করায় হাঙ্গাম আছে ; পিতা উইলে কিছু মোটা টাকা দিয়া যাইতে পারেন সত্য, কিন্তু এই মেজাজ আর আবদার সহ্য করা পোষায় না।

জিনিষ কেনায় একটা গভীর সুখ আছে জানি, বিশেষতঃ যদি পরের পয়সায় অর্থাৎ নিজে না খাটিয়া, জিনিষ কেনা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারও একটা মাত্রা আছে। যখন জিনিষ কেনার সুখ প্রতিদিনের ব্যবহারের অত্যাবশ্যক জিনিষগুলি পাওয়ার আনন্দ না হইয়া, জিনিষ জমানোর সুখ হয়, possesion-এর আনন্দ হয়, তখনই হয় মুস্কিল। এই possesion, এই পাওয়া, আরও পাওয়া চাই, আরও চাই—এই অতি অধিকারের তৃষ্ণাতেই তো পৃথিবীর দ্বন্দ্ব-কলহ, রক্তারক্তি, যুদ্ধ-সংগ্রাম। স্ত্রীর shopping-এর বন্যায় কত ইংরাজ-দম্পতী-সুখ-সংসার-তরী ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, এ গল্প সে কত শুনিয়াছে!

একদিকে কৃপণের অর্থ-সঞ্চয়ের স্বার্থপূর্ণ সুখ, অপর দিকে বে-হিসাবীর টাকা খরচ করিয়া অর্থকে নানা সুখকর সুন্দর বস্তুর রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দখল করিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ জমাইবার আনন্দ ! কিন্তু এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু পাইবার তৃষ্ণাই নাকি সভ্যতা-সৃষ্টির প্রেরণা, পূর্ব্ব বংশের যা ছিল প্রাচুর্য্যের সৌখীনতার—পরের বংশের তাই হয় অতি-প্রয়োজনীয় ।

কিন্তু স্ত্রীর বে-হিসাবী খরচের প্রখর স্রোতের সঙ্গে স্বামীর রোজগারের নৌকা সব সময়ে সমান তালে আনন্দে দুলিয়া ভাসিয়া যাইতে পারে না, মাঝে মাঝে দাঁড় ভাঙিয়া ভরাডুবির আকাঙ্ক্ষা জাগে । ইলার এই বেহিসাবী স্বভাব রোজ কিছু-না-কিছু না কিনিলে একবার মার্কেট ঘুরিয়া না আসিলে তাহার যেন মন ভাল থাকে না । তারপর নিজের জন্য যাহা কেনে, তাহা কিছু শস্তার হইলেও চলে কিন্তু অপরকে দিবার উপহার-দ্রব্য মূল্যবান হওয়া চাই-ই । আর এই উপহার দিবার পাত্রপাত্রী অশেষ-সংখ্যক । আজ তার কোন্ বন্ধুর ভগ্নীর বিবাহ, কাল তার কোন্ বন্ধুর বৌভাত, পরশু তার কোন্ মাসতুতো বোনের মেয়ের কন্যা হইয়াছে ।

ইলা যখনই টাকা চাহিয়াছে, রণেশ স্বচ্ছন্দ চিত্তে দিয়াছে । তাহার বে-হিসাবী খরচের জন্য রণেশ মাঝে মাঝে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে বটে কিন্তু রাগারাগি করে নাই । বস্তুতঃ টাকা খরচের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য হয় না, হয় অকারণে ; রণেশ কোন্‌দিন কি বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলে, ইলা রাগ করিয়া ওঠে, তারপর হয়তো এক বেলা খায় না, এক সন্ধ্যা কথা বলে না, রণেশকে মানভঞ্জন করিতে হয় । তাহার বিবাহিত জীবন সত্যই প্রেমের লীলা হইয়া উঠিয়াছে ।

কিন্তু ভাল লাগে না । রণেশ বালিশটা মাথায় ভাল করিয়া দিয়া হেলান দিয়া শুইল । শরতের রাত্রি মেঘাবগুণ্ঠিতা । ভাদ্রের জ্যোৎস্না কোথায় লুকাইয়াছে । কাহার অভিশাপ যেন আকাশে কালো মূর্ত্তিতে চাপিয়া বসিয়া, বাতাস থামিয়া গিয়াছে, পাতাগুলি যেন কিসের প্রতীক্ষায় স্থির ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদটা যেন বিচ্ছেদের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে । মন তিতা হইয়া উঠিয়াছে । কদমগাছের স্তব্ধ ঘন অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রণেশ মনে মনে স্থির করিল, কাল প্রাতেই ইলাকে পিত্রালয়ে দিয়া আসিবে, শ্বশুরকে বলিয়া আসিবে, ইলার ইচ্ছা যে পিতার কাছে কিছুদিন থাকে । আর ইলা পত্র লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে সে আর ইলাকে লইয়া আসিবে না । বহুদিন স্ত্রী-প্রপীড়িত হইয়া বাস করিয়াছে, তাহাতে মাঝে মাঝে আনন্দ পাইলেও, মানসিক বেদনা কিছু কম হয় নাই । এবার কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে পুরাতন bachelor life নির্ব্বিবাদে যাপন করিবে । স্বামী-নির্য্যাতিতা স্ত্রীর কথাই গল্পে উপন্যাসে সবাই লেখে, কিন্তু স্ত্রী-নির্য্যাতিতা স্বামীর কথা কেহ ভাবে না । সঙ্কল্পটা করিয়া রণেশের মন কিছু হাল্কা হইল । ইচ্ছা হইল, ইলা কোথায় কি ভাবে শুইয়া আছে দেখিয়া আসে ।

কালো মেঘের ফাঁক দিয়া একটু জ্যোৎস্না ঝর্ণার মত ঝরিয়া পড়িতেছে, নারিকেল গাছটি ঝিলমিল করিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে ।

মন শান্ত হইতে রণেশের অন্তর ইলার প্রতি সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল । ইলা আগে অভিমান করিত বটে, কিন্তু খুকীর মৃত্যুর পর হইতেই তাহার মেজাজ এমন হইয়াছে, মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক নাই । খুকী ছিল যেন ননীর পুতুল, কি তুলতুলে হাত-পা, 'মা' 'বা'

বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখ দুটি মুক্তার মত জ্বলজ্বল করিত, কি মিষ্ট হাসি ! ছোট্ট ঠোঁটদুটি বাঁকাইয়া ছোট্ট গালটুকু ফুলাইয়া যখন কাঁদিত, তাহাও কি সুন্দর দেখিতে লাগিত। কচি আঙুল দিয়া গাল খিম্‌চাইয়া দিত, কাহারও আঙুল ধরিতে পারিলে আর ছাড়িতে চাহিত না। দশ দিনের অসুখে কুসুমের মত শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল ! প্রায় দশ মাস হইল, খুকী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার কথা মনে হইলেই রণেশের কান্না পায়। ইলা যে তাহার প্রথম কন্যার শোক ভুলিতে পারে নাই, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ! রণেশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে ইলাকে মনে মনে ক্ষমা করিল। ইলাকে কাছে পাইবার জন্য তার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রণেশ ধীরে সেখান হইতে উঠিল ; সিঁড়িতে একটু শব্দ করিয়া ছাদে গেল। ছাদের দক্ষিণপ্রান্তে একটা ইজিচেয়ারে ইলা এলাইয়া শুইয়া, রণেশের পদশব্দে একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, তারপর আবার চোখ বুজিল।

রণেশ ধীরে ইজিচেয়ারের পাশে দাঁড়াইল। এক ঝাঁক পায়রার মত ছিন্ন খণ্ড মেঘের দল আকাশে ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, চাঁদ একবার মেঘের অন্তরালে হারাইয়া যাইতেছে, আবার রজত-চক্রের মত ঘুরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই আলো-ছায়ার লীলায় ইলাকে বড় সুন্দর দেখাইল। পিত্রালয়ে যাইবার জন্য সন্ধ্যাবেলায় ইলা যে সাজ করিয়াছিল সেই সাজই রহিয়াছে, খয়ের রং-এর শাড়ীর মৃণাল-আঁকা সবুজ পাড়ের অংশ ছাদে লুটাইয়া পড়িয়াছে, আর তার পাশে ইলার ঘন কালো কোঁকড়া চুল ধূমাবগুণ্ঠিত বাসনার শিখার মত বাতাসে কাঁপিতেছে। মোহিনী ইলা ! রণেশ মৃদুস্বরে ডাকিল—ওগো ! ওগো !

ইলা একটু উস্‌খুস্ করিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

ইলা যে জাগিয়া আছে তাহা বেশ বোঝা গেল। রণেশ আবার বলিল,—ওগো শোনো, ঘরে গিয়ে শোও, লক্ষ্মীটি, ছাদে সারা রাত থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে, অসুখ করবে। একবার সেই রাগ করে ছাদে শুয়েছিলে তারপর সর্দ্দি-জ্বর হয়ে কি রকম ভুগ্‌লে, মনে নেই ?

কোন উত্তর নাই। কিন্তু এই নীরব নারী-প্রহেলিকা। Sphinx-এর মতই শুধু রহস্যময়ী নয়, মাধুর্য্যময়ী, মন ভোলায়। মুগ্ধ নয়নে রণেশ চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, রণেশের বোধ রহিল না, হয়তো কয়েক মুহূর্ত্ত, বোধ হয় এক কল্প। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে ; তাহার মাথা গুলাইয়া গেল, পা টলিতে লাগিল, সম্মুখে ইজিচেয়ার-শায়িতা ইলা যেন দুলিতেছে ! সহসা চমকিত ভাবে ইলা চাহিল, চকিতে দাঁড়াইয়া উঠিল, দীপ্তস্বরে তাহাকে আহ্বান করিতেছে—ওগো ! ওগো ! ওগো ! ইলার মুখ কি অস্বাভাবিক দীপ্ত, একটি চুম্বন দিতে ইচ্ছা করে ! চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করিতেছে ; খয়ের রং-এর শাড়ীটি আগুনের আভা, কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশরাশি কামনার নাগিনীর দল, যেন বতিচেল্লীর ভেনাস মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল !

কিন্তু ইলা কাঁদিতেছে, টলিতেছে, স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তা হইলে আজ সত্যই খায় নাই। সে তাড়াতাড়ি ইলার হাত ধরিল, বুঝি সে পড়িয়া যায়। ইলা দীপ্তস্বরে বলিল,—ওগো, শীগগির, শীগগির চলো।

শীগগির চলো ! রণেশ হাসিয়া উঠিল—কোথায় ! এখন তোমায় বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে হবে নাকি ?

কম্পিত স্বরে ইলা বলিয়া উঠিল—না গো, না, বুঝতে পাচ্ছো না, ভূমিকম্প হচ্ছে !

শীগগির চলো মাঠে।

ভূমিকম্প! সারাদিন না খাইয়া ইলা বুঝি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে; তাহার মাথা ঘুরিতেছে! কিন্তু রণেশের নিজের মাথাও ঘুরিয়া উঠিল, ছাদটা যেন দুলিতেছে, রেলিংগুলি হেলিয়া ঝনঝন শব্দ হইতেছে। সত্যই তো ভূমিকম্প!

ইলু! ভাল করিয়া স্বর বাহির হইল না। রণেশ ইলার হাত ধরিয়া টানিয়া সিঁড়ির দিকে ছুটিল, কিন্তু পা এত দুলিতেছে, বুঝি ইলার ঘাড়ে গিয়া পড়ে! সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া ইলা রণেশের বুকের উপর পড়িল, তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ইলা ভয় পাইয়াছে! সামনে সিঁড়িটা হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন এক অতিকায় জন্তু হাঁ করিয়া মুখ নাড়িতেছে! সিঁড়ির মাঝের চওড়া ধাপের কোণে খুকীর দোলনাটা ছিল, সেটি নড়িয়া খস্‌খস্ শব্দ হইতেছে।

ইলা ভীত দৃষ্টিতে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু সেই খস্‌খস্ শব্দ কানে যাওয়াতেই তাহার ত্রস্তভাব চকিতে চলিয়া গেল, তাহার মুখ পরিবর্ত্তিত হইয়া করুণ-কঠোর হইয়া উঠিল, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিল!

ওগো! খুকী! খুকী আমার!—বলিয়া সে চঞ্চল পদে অর্দ্ধেক সিঁড়ি নামিয়া দোলনাটার সম্মুখে দাঁড়াইল। জোয়ারের ঢেউ-এর উপর নৌকার মত সমস্ত সিঁড়ি দুলিতেছে। ইলার কিন্তু সে বোধ রহিল না। সে দোল্‌নার ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দোলনা হাতড়াইয়া ভগ্নস্বরে বলিয়া উঠিল,—খুকী কৈ?

রণেশ ইলার পিছনে ছুটিয়া আসিয়াছিল; সে ইলাকে কাছে টানিয়া কম্পিত ব্যথিত স্বরে বলিল—ইলা! পাগল হলে! খুকী তো বহুদিন আমাদের ফাঁকি দিয়ে— চলো— এখানে সিঁড়ি চাপা—

ইলা যেন অবাক হইয়া রণেশের দিকে চাহিল, তারপর দোলনা ও সিঁড়ির দেওয়ালের দিকে দেখিয়া তাহার মুখে কথা ফুটিল না, শুধু একটা বুক-ফাটা 'অঃ' হতাশ্বাসের মত বুক দিয়া বাহির হইয়া আসিল, তারপর সে মূর্চ্ছিত হইয়া রণেশের বুকের উপর পড়িল। রণেশ মুহূর্ত্তের জন্য সেই মূর্চ্ছিতা নারীর প্রতি দৃঢ় দৃষ্টিতে দেখিল তারপর তাহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, একতোলার সিঁড়ি পার হইয়া বারান্দা ছাড়াইয়া টেনিসখেলার মাঠের সবুজ ঘাসের উপর ইলাকে শোয়াইয়া নিজে মাতালের মত টলিতে ও হাঁপাইতে লাগিল; তারপর ইলার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার হাতদুটি নিজের হাতে টানিয়া লইল, মকরমুখী অমৃতিপাক সোনার বালা ছোট-চুড়িগুলির সঙ্গে রিণঝিন বাজিয়া উঠিল। সামনের বাড়ীটা দুলিয়া স্থির হইল, চারিদিকে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ রাত্রি জনকোলাহলে মুখরিত, শঙ্খধ্বনিতে শিহরিয়া উঠিল। রণেশ ইলার বিপর্য্যস্ত কেশমণ্ডিত সুন্দর মাথা নিজের কোলে টানিয়া ডাকিল—ইলু!

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত্ত, বোধ হয় এক কল্প! রণেশ আবার ডাকিল—ইলু।

ইলা ধীরে চোখ মেলিল, মুখটি বড় লজ্জিত, বড় বেদনাময়! চোখ বুজিয়া করুণ সুরে বলিল,—ওগো!

—ভয় কি ইলু? ভূমিকম্প থেমেছে।

—থেমেছে! ওগো!

সহসা ইলা উঠিয়া বসিল, রণেশের দুই হাত জড়াইয়া ধরিল তারপর রণেশের বুকে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এ রকম কান্না রণেশের বহু-পরিচিত।

অনেক দিনের মনোমালিন্য শেষে এরূপ অশ্রুজলের ধারায় ঝরিয়া পড়িয়া আবার স্বামী-স্ত্রীতে গভীর মিলন হইয়াছে। কিন্তু এই ভূমিকম্পের রাতে ক্ষুদ্র আকাশের তলে সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া সহসা ইলার এরূপ ক্রন্দনবেগ দেখিয়া রণেশ যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিল ! সে দীপ্ত স্বরে বলিল—ওগো, এখন কান্নাকাটি করো না ! দেখ চারিদিকে বাগানে লোকজন—

কিন্তু ইলার ক্রন্দনবেগ বাড়িয়া চলিল। রণেশ ক্ষুব্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—আঃ, কি হয়েছে ! চুপ করো !

—ওগো, আমায় ক্ষমা করো। আমি আর কখনও—

ক্ষমার নাম শুনিয়া রণেশের মন যেন স্নিগ্ধ হইল। সে মৃদু স্বরে বলিল—চুপ করো ইলু, লক্ষ্মীটি, তোমায় আমি কোন্ দিন ক্ষমা করিনি ?

ঝি-চাকরের দল তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে দেখিয়া রণেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ইলা যেন তার পা জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত, সে তাড়াতাড়ি তাকে টানিয়া তুলিল।

—হুজুর, ভূমিকম্প থেমে গেছে।

—আচ্ছা, যা তোরা শুগে যা।

কদম গাছের ছায়াখানি পড়িয়াছে মায়ের স্নিগ্ধ কোলের মত ! তাহার তলে আসিয়া ইলা থামিয়া বলিল,—ওগো, এখানে একটু বসি এসো।

—দেখ, সারাদিন কিছু খাও নি, কিছু খাবে চলো। দুর্ব্বল হয়েছো—লক্ষ্মিটি—

—না, আমি বেশ ভাল বোধ করছি। দেখ, গাছটির কালো মূর্ত্তি কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

গাছের তলায় রণেশকে বসিতে হইল। এখন যদি ইলার অনুরোধ না রাখে, কথার প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে প্রমাণিত হইবে, সে ইলাকে ক্ষমা করে নাই ! আবার অশ্রুর বন্যা নামিতে পারে। ইলা তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পা ছড়াইয়া হেলিয়া বসিল।

—ওগো, আমার এখন ঘরে ফিরে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না, এইখানে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যাক। তুমি একটা গল্প বলো—

—কেন, ভয় হচ্ছে, আবার ভূমিকম্প হয় যদি ?

—তা হতেও তো পারে।

—তাহলে তোমার ইজিচেয়ার আর একটা গায়ের চাদর আনাই।

—না, তুমি উঠতে পারবে না। আমি বেশ আরামে আছি।

রণেশের কোলে মাথা রাখিয়া ইলা ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। রণেশ তাহার হাতের আঙুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। ভূমিকম্প দুঃস্বপ্নের মত শেষ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শরৎ-জ্যোৎস্না রাত্রির আলো-ছায়ার মায়ালোক ! মাটি হইতে এক অপূর্ব্ব গন্ধ আফিমের মত দেহ-মনকে অভিভূত করিতেছে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রণেশের মন অতীতের কোন্ স্মৃতিলোকে চলিয়া গেল।

তরুণ যুবক, কলেজে পড়ে, কবিতা লেখে, জ্যোৎস্নারাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ; স্বপ্নময় চোখ, আশা-ভরা মন, জীবন একটা লীলা, সংগ্রাম নয় !

কোন্ মাসতুতো বোনের বিবাহ-উপলক্ষে যুবকটি বাংলার একটি ছোট সহরে গিয়াছে। কবি বলিয়া তরুণ-তরুণী সমাজে তাহার খ্যাতি আছে, মাসিকে মানসীর সহিত বিরহ-মিলনের কবিতা বাহির হয়। লম্বা কোঁকড়ানো চুল, ভাব-ভরা প্রদীপ্ত মুখ, তাহার

কবিমূর্ত্তির প্রতি সকলে তাকাইয়া দেখে। বিবাহ-বাড়ীতে যুবকটি মুস্কিলে পড়িয়াছে; সুন্দরী তরুণীদের শাড়ীর ঝলমলানি, চকিত চাহনি, উজ্জ্বল হাসি, ললিত গতি! এই বাস্তব সৌন্দর্য্যলোকে তাহার অন্তর আবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে! লুকাইয়া সে কবিতা লিখিতে বসে কিন্তু মানসিক উচ্ছ্বাসের ভাষা খুঁজিয়া পায় না।

বিকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সানাই-এর করুণ সাহানা-সুরে বরকন্যার বিদায় হইয়াছে। বাড়ীখানি নিঝুম, মূকলোকের মত।

গ্রীষ্মের রাত্রি, ঘরে গরম, কিন্তু বাহিরে জ্যোৎস্নালোক দক্ষিণ বাতাসে মধুর। যুবকটি ঘরে থাকিতে পারিল না, বাহিরে নদীর ধারে বাগানে বেড়াইতে বাহির হইল। চাঁপা ফুলের রং-এর শাড়ী-পরা একটি মেয়ের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিয়াছে, সেটি পাঞ্জাবীর পকেটে লইল, আর খাতা-পেন্সিলও লইল; ইচ্ছা, নদীর ঘাটে বসিয়া কবিতা লেখে। মেয়েটির সহিত অনেক বার তার চোখাচোখি হইয়াছে, কিন্তু তাহার কালো নয়নের রহস্য-ঘন দৃষ্টিপাতে বিদ্রূপ, না প্রেম, না বিরহ, কি আছে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিশোরীটির প্রতি সে যে কবিতা লিখিয়াছে, তাহা যদি তাহাকে শোনাইতে পারিত, বেশ হইত।

নদীর ঘাটের কাছে আসিতে পিছনে খস্‌খস্‌ শব্দে যুবকটি ফিরিয়া তাকাইয়া দেখে, সেই কিশোরী! তাহার দিকেই আসিতেছে। এ কি স্বপ্ন!

মুগ্ধ নয়নে যুবকটি তাকাইয়া রহিল, হাঁ, তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। হয়তো তাহারও কিছু বলিবার আছে। পকেট হইতে নীল কাগজে লেখা কবিতাটি বাহির করিয়া অর্ঘ্যের মত হাতে ধরিয়া কিশোরীর প্রতীক্ষায় সে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েটি তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিল। দীপ্ত মুখ, চাঁপা রং-এর শাড়ীটি বদ্‌লাইয়া একটি খয়েরী রং-এর শাড়ী পরিয়াছে; জ্যোৎস্নার আলোয় স্বপ্নের মত দেখাইতেছে!

মেয়েটি স্নিগ্ধ সুরে বলিল—সুন্দর রাত!

বস্তুতঃ মেয়েটি বলিতে আসিয়াছিল—আপনি আমাদের দিকে ও-রকম হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন কেন? আমরা কি অদ্ভুত জীব? কখনও মেয়েমানুষ দেখেননি ইত্যাদি! কিন্তু যুবকটির মুগ্ধ ভাব দেখিয়া যুবকটিকে লাঞ্ছনা করিবে, সে-ভাষা তাহার মুখে ফুটিল না।

যুবকটি কবিতা-লেখা নীল কাগজখানি সম্মুখে ধরিয়া বলিল—দেবী, এটি যদি আপনি গ্রহণ করেন, আমি কৃতার্থ হবো।

দেবী! তাহাকে দেবী বলিতেছে! ছেলেটির মাথা খারাপ আছে। শুধু কবি নয়, পাগলও বোধ হয়। আর উপহার কি? না, একখানি কাগজ! তা যদি একশ টাকার নোট বা এইরূপ কিছু হইত! বোধ হয়, প্রণয়-নিবেদন!

হাসির সুরে কিশোরী বলিল—ওটি কি?

—কবিতা। আপনাকে দেখে, আপনার উদ্দেশে লেখা।

—আমাকে লেখা! বেশ তো, পড়ুন। আসুন, এই ঘাটে বসা যাক।

জ্যোৎস্না-রাতে নির্জ্জনে জলের ঝিকিমিকি। তরুমর্ম্মরে মার্ব্বেল-বাঁধা নদীর ঘাটে বসিয়া মানসী কিশোরীকে নিজের লেখা কবিতা শোনাইবার সৌভাগ্য জীবনে কয়বার আসে! যুবকটি দ্বিধা করিল না।

—আপনি বসুন। আমি পড়ছি—বলিয়া যুবকটি পড়িবার ভঙ্গীতে ঘাটের উপর

দাঁড়াইল।

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে প্রথম লাইনটি পড়িতে সুরু করিয়াছে, কয়েকটি কিশোরী-কণ্ঠের কলহাস্যধ্বনিতে নদীতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। যুবকটি বিস্মিতভাবে চাহিতেই দেখিল, তাহার চারিদিকে কয়েকটি কিশোরী। তাহারা উচ্ছ্বসিত হাসিতে রাত্রির স্তব্ধতা চিরিয়া বলিয়া উঠিল—কৈ, আমার কবিতা কৈ? বা, আমি বুঝি বাদ গেলুম! আমি তো আর সোনালী শাড়ী পরি না!

যুবকটি হতভম্ব হইয়া ঘামিতে লাগিল, দেখিল, তাহারা হাসিয়া পরিহাসের দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু তাহার প্রিয়া কিশোরীর চক্ষে করুণা মমতা। সে বলিয়া উঠিল—কি রসভঙ্গ করলি বল্ দেখি! যা সব এখন। একটা কবিতা শুন্‌ছি, তোদের বুঝি সইলো না! আপনি কিছু মনে করবেন না, দিন আমায় কবিতাটা—

যুবক মেয়েটির হাতে কবিতা দিয়া কোন মতে মুখ গুঁজিয়া পলাইল! মেয়েরা যে তাহাকে লইয়া এরূপ পরিহাস করিবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

বস্তুতঃ বিবাহ শেষ হওয়াতে কোন কাজ হাতে না থাকায়, কিশোরীর দল এই কবি-যুবকটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সে হাঁ করিয়া যে তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকে, বিবাহ-বাড়ীতে কোন কাজ করে না, তাহার পরিশোধ লইতে হইবে।

পরদিন ভোরের ট্রেনেই যুবক চলিয়া গেল। ব্যাপারটা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু ইলা তাহাকে ভুলিল না, রণেশের কবিতা তাহার কিশোরী-চিত্ত জয় করিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া সে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া রণেশকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র দিল। রণেশ কবিতা লিখিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে বরাবর বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে, তারপর এম. এ. পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়াতে রণেশকে বার বার চায়ে নিমন্ত্রণ করা সম্বন্ধে ইলার পিতার কোন আপত্তি রহিল না।

এই সেই ইলা! প্রথম যৌবনে বিবাহ-বাড়ীর সেই বাগানে জ্যোৎস্না-রাতে ইলার সহিত প্রথম আলাপ রণেশের মনে পড়িল।

—ইলু!

ইলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার ঘুমন্ত মুখে সে একটি চুম্বন দিল। তাহাকে জাগাইতে চাহিল না। তারপর তাহাকে যেরূপ করিয়া সিঁড়ি হইতে নামাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, সেইরূপে আবার বহিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বাহিরে জ্যোৎস্না-রাত থম্‌থম্ করিতে লাগিল।

ইহার পর ইলা রাগারাগি করিলে রণেশ হাসিয়া বলিত,—দেখ, মন ভারী করো না। তুমি রাগ করলে ধরিত্রী চঞ্চলা হয়ে ওঠেন। আবার একটা ভূমিকম্প হোক, চাও কি?

ইলার আর বেশীক্ষণ মান-অভিমান করা হইয়া উঠিত না।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

শ্যাক্

একটি বারান্দা দুটি ঘর, একটুখানি বাগান আর কয়েকটা ফুলের গাছ।

দরজাটি পার হয়ে সরু একটি লাল সুরকির পথ এঁকে বেঁকে উঠে এসেছে বারান্দার কোলে। দুটি ঘরেব দরজায় চিক্ টাঙানো। ভেতরের দেয়ালে একজিবিশন থেকে কেনা কয়েকখানি ভারতীয় চিত্র। মেঝেতে গুটিকয়েক মেহগণি কাঠের আসবাব,—খান তিনেক চেয়ার, একটি ড্রেসিং টেব্‌ল্, দুটি টিপয়, একটি বেড্-ষ্টোর, আর দু'দিকে দুটি বইয়ের র‍্যাক! আধুনিক সংস্করণের অনেকগুলি বই আছে বটে!

পাশে একটি বিছানা, পাশাপাশি দুটি বালিশ সাজানো! মাঝামাঝি একটি পাশ-এর বালিশ বিছানাটিকে আধাআধি ভাগ ক'রে রয়েছে। কড়িকাঠে একটি ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান ঘুরছে, 'রেগুলেটরে' গতি একটুখানি কমানো।

জানলার ধারে একখানি ইজি চেয়ারে বসে একটি মেয়ে নিবিষ্ট মনে কি একখানা মাসিক পত্র পড়ছে।

বর্ষাব শেষ। মেঘ্‌লা আকাশ া একটা জলো ঘোলাটে আবহাওয়া চারিদিক ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে কয়েক দিন থেকে শরৎ কালটা প্রবেশ-পত্রের অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করছে। আজ সকালে ঘরের মধ্যে শিউলির গন্ধ ঢুকেছিল।

বেলা চারটে!

বাইরে যে পায়ের শব্দ স্পষ্ট হয়ে আসছিল, মেয়েটির হুঁশ্ ছিল না। বাইরের দরজাটা ঠেলে সনৎ এসে ঘরে ঢুক্‌ল। কাঁধে একটি বছর দুয়েকের ছোট ছেলে।

মহারাণী ?

মেয়েটি একটু হেসে সোজা হয়ে উঠে বসল। বল্‌ল—কিবা নিবেদন কহ বীরবর!

বীরবর বল্‌ল—সন্তান তব ধূলি-ধূসরিত।—আরে গাধা, কান কাম্‌ড়াচ্ছিস কেন ? নাম্ তবে। কি দুষ্টু রে বাবা. পিতার সম্মান রক্ষা ক'রে চলে না।

মেয়েটি উঠে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। তারপর চুম্বন ক'রে বল্‌ল—ত্যজ্যপুত্র হবার ভয় রাখো না ?

নেক্‌টাইটা খুলে সনৎ আন্‌লায় তুলে রাখ্‌ল। ট্রাউজারের ভেতর থেকে সার্টটা টেনে উঠিয়ে তার ওপর টাঙিয়ে দিল। তারপর কাপড় বদ্‌লে সে যখন কাছে এসে হঠাৎ হেসে দাঁড়াল, ছেলেটি তখন আবার তার কোলে আসবার জন্য হাত বাড়িয়েছে।

কোলে তুলে নিয়ে সনৎ তাকে জিজ্ঞেস করল—তোমার মা'র নাম কি বলত টুটু ?

টুটু তার মা'র দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—মোয়ালানি!

না, না, আর-একটা।

টুটু বল্‌ল—তমচা।

সনৎ বল্‌ল—তমচা নয় তমসা। গাধা কোথাকার, জিবের এখনও আড় ভাঙে নি। আচ্ছা, তা হোক,—টুটু তোমার মাকে বলত আমার এ বেলার প্রাপ্যটি দিয়ে দিতে!

মাসিক পত্রখানা থেকে মুখ তুলে এবার হেসে ফেলে তমসা বল্‌ল—নিজে ডাকাতি ক'রে এতদিন পরে বুঝি লজ্জা হচ্ছে? যাও, ও-সব এখন হবে না!—ঠোট দুটি তার কেঁপে আবার স্থির হয়ে গেল।

একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে সনৎ হেসে বল্‌ল—না, তা নয়, চুমু খাওয়া ছাড়া কি আর আমার অন্য কাজ নেই? তা বল্‌ছিনে,—ওটা কি পড়া হচ্ছে? গল্প? কার?

তমসা ততক্ষণে দস্তুরমত কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠেছে। বল্‌ল—বাজে লেখা। দেখ না, 'মেয়েটাকে' কি নাস্তানাবুদ করছে।

কি রকম?

বেশ ছিল...স্বামী আর স্ত্রী! ঘর-দোর, সাজানো গোছানো, জিনিষপত্র...সুখের সংসার!

তার পর?

এল এক উড়নচুড়ে দেওর অতিথি-নারায়ণ হয়ে...হতভাগা! জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করতে সুরু ক'রে দিল, ভেঙ্গে চুরে একেবারে তচ্‌নচ্‌! বউটা ত একেই একটু কৃপণ, স্বামীটাও আবার বোকা, ভাইকে ভালবাসে!...ছি ছি, শেষের দিকে একেবারে যাচ্ছেতাই!

কি শুনি?

বলতে লজ্জা ক'রে। শোনো তবে বলি চুপি চুপি।

কানে কানে তমসা কি বলতেই সনৎ হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

রাগ ক'রে উত্তেজিত হয়ে আরক্ত মুখে তমসা বল্‌ল—এম্‌নি জঘন্য লোক। এ গল্প যে লিখেছে, আমি তাকে দেখতে পেলে কান মলে' দি!

সনৎ বল্‌ল—আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে।

অ্যাঁ?—তমসা অবাক হয়ে বল্‌ল—এই দুর্নীতি তোমার ভাল লাগে?

সনৎ বল্‌ল—নীতি আমি মানিইনে!

মানো না? আর ধর্ম্ম?

সনৎ একটু হেসে বল্‌ল—আমরা বিংশ শতাব্দীর সন্তান।

তমসা হিন্দুর মেয়ে। যে বাড়ীতে সে মানুষ হয়েছে, সেখানে আচার-বিচার, পাল-পার্ব্বণ, ঠাকুর-দেবতার পূজা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সেবা—এ সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক। একদিকে যেমন সাত্ত্বিকতার আবহাওয়া, অন্যদিকে তেমনি সৎশিক্ষার স্নিগ্ধ আলোয় সে বড় হয়ে উঠেছে।

বিবাহ হয়েছে তার উপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে। রাজপুত্রের মত রূপ, উচ্চ আধুনিক শিক্ষায় সুপণ্ডিত, অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। বিনয়ী, ভদ্র, বুদ্ধিমান, আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত!

ভালবাসা? সমস্ত জীবন তমসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আনন্দে, প্রেমে, তৃপ্তিতে, স্বস্তিতে ও গর্ব্বে! ভালবাসায় স্বামী তাকে আবৃত করেছিল, আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল।

কাগজখানা ফেলে রেখে সে উঠে দাঁড়াল, পরে কাছে এসে বাঁ হাতটা সনতের কোমরে জড়িয়ে মুখের ওপর মুখ তুলে বল্‌ল—মাঝে মাঝে তুমি এমন কথা বলো যে ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। এমন কথা কি বলে কখনো?

হা-হা-হা ক'রে সনৎ হেসে উঠ্‌ল। বল্‌ল—পাগল আর কি! যেটা আমার নেই, সেটা আছে বলে' চালিয়ে দিয়ে লাভ কি?—বলে' দুটি আঙুল দিয়ে সে তমসার চিবুকটি নেড়ে দিল।

বিকাল বেলা এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে 'আয়া'টা চলে গিয়েছিল, এবার সে ফিরে এসে টুটুকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রান্নাঘরে ঠাকুর এসে রাতের রান্না চড়িয়েছে। ঝি এবার চায়ের জল বসালো।

সুইচ্ টিপ্‌তেই সমস্ত ঘর আলোয় হেসে উঠলো। ফ্যান্-এর বেগটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে তমসা খাটের ওপর আধ-ভাঙা অবস্থায় উঠে বস্‌লো।

হাসচো যে?

সনৎ বল্‌ল—ভাবছি, আমি যখন থাকিনে, তোমার সময় তখন কেমন ক'রে কাটে!

তমসা হেসে বল্‌ল—দয়ার শরীর! কিন্তু তোমার হাসি দেখে মনে হয় এ কথা তুমি ভাবছিলে না। তুমি আড় চোখে তাকাচ্ছিলে আমারই দিকে!

আল্‌তা-পরা দুখানি ফর্সা পায়ের ওপর সাড়ীটা তমসা নামিয়ে দিল। মাথার চুলের রাশ আল্‌গা খোঁপায় বাঁধা ছিল, নাড়াচাড়া পেতেই খোঁপার খিল্ খুলে চুল এলিয়ে পড়ল।

প্রেমের একটি মন্থরতা, একটি গাম্ভীর্য্য এসেছে তাদের জীবনে। দীঘির জল যেখানে গভীর, যেখানে অস্থির-চঞ্চল নয়, হাওয়া লেগে শুধু একটু একটু কাঁপে; মাতালের উন্মত্ততায় ওলোট-পালোট করে না, সন্ন্যাসীর তপস্যার মত শান্ত!

তমসা বল্‌ল—আমার ঠাকুর-ঘর কেমন করে সাজাচ্ছি, দেখেছ?—বা রে, শুনতে না শুনতেই যে গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লে!

সনৎ বল্‌ল—তুমি আবার এই ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দিচ্ছ তমসা!

তমসা চুপ ক'রে রইল। খানিকক্ষণ পরে বল্‌ল—বারে-বারে তুমি এটাকে তাচ্ছিল্য কর কেন বল্ ত? ব্রাহ্মণের ঘর থেকে ঠাকুরের সেবা উঠিয়ে দিলে কি থাকে, শুনি?

সম্পূর্ণ অর্থহীন! নিজেদের মনের উন্নতি যেখানে হল না, বাইরে শিবের মন্দির বসিয়ে সেখানে লাভ কি?—সনৎ একটা সিগারেট ধরালো।

ঝি এসে সুমুখের টিপয়ের ওপর দু' পেয়ালা চা ও রেকাবীতে কিছু জলখাবার রেখে বেরিয়ে গেল।

তমসা বল্‌ল—মনে করো না, এ আমার গোঁড়ামি। এ হচ্ছে গৃহস্থালীরই একটা অঙ্গ। নৈলে ধর, সবই ত হল...স্বামী, সন্তান, ঐশ্বর্য্য, প্রেম, ভদ্রতা, সামাজিকতা—সব! তারপর কি, বল দেখি? কি নিয়ে থাকা চলে? আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি না হয় সবই পেলাম একে একে, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে শুভদৃষ্টি না হলে এর সবই যে প্রাণহীন! চুপ করলে যে?

সনৎ শুধু বল্‌ল—পাগলামি করো না, ধরো—চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে তমসা বল্‌ল—তুমি দেখছি নিতান্তই নাস্তিক। মনে করো না যে—

কি শুনি?

হিঁদুয়ানী ত্যাগ ক'রে বাহাদুরী নিচ্ছ?

তাই নাকি?—এই গরম খাস্তার কচুরিটা খেয়ে ফেল দেখি!—আরে, থাক্ থাক্, আমার মুখে আর দিতে হবে না!

দাঁত দিয়ে একটু ভেঙে নাও।

প্রসাদ ক'রে না দিলে খাওয়া হবে না, বুঝি ? তমসা আগেকার কথার জের টেনে বল্‌ল—বাড়ীতে ঠাকুরদেবতার পাট থাকলে সমস্তই সেখানে গিয়ে মেলে। রাশি রাশি ফুল থাকলেও মালা গাঁথা যায় না, সুতো যদি না থাকে।

সনৎ বল্‌ল—আবার ?

তমসা হেসে বল্‌ল—এ বিশ্বাস আমার কিছুতেই যাবে না। ধর্ম্মবিশ্বাসই হচ্ছে মানুষের পরম আশ্রয়।

তমসা কোনো কথাই শুনলো না, বিশ্বাসটা তার রইলই। বাড়ীর পাশে যাদের বাড়ী, তাদের মেয়ের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। টুটুর পাতানো মাসি। ছাদের পাঁচিলে উঠে একদিন তমসা ডাক পাড়লো—সরলা ? শোন্ ত ভাই একবার !

সরলা এল। বল্‌ল—অসময়ে যে ? তমসা বল্‌ল—ভালবাসার কি আর সময়-অসময় আছে ?—শোন্ বলি, তোদের পুরুৎ ঠাকুর আসবেন কখন্ ?

এসে ত চলে' গেছেন। তোর ঠাকুর বসবে কবে ? নেমন্তন্ন ?

হ্যাঁ লো হ্যাঁ, পরের বাড়ী বিষ পর্য্যন্ত পেলে তুই ছাড়িসনে !—যাই হোক, কাল পুরুত ঠাকুর এলেই কিন্তু আমায় বলিস্ ভাই।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ হল।

সকল খবর রাখবার মত সময় সনতের হতো না। তাকে স্ত্রৈণ বলা যেতে পারে, কিন্তু কুনো বলা চলে না ! স্ত্রীই থাকতো তার চোখে সকল সময় জেগে, কিন্তু স্ত্রীকে পার হয়ে যে নিত্য দিনের সংসার, যেটা দম্ দিলে যন্ত্রের মত চলে—সেটার সম্বন্ধে তার চেতনাও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। যা করে তমসা !

এই বাড়ীটা কেনার পর থেকে সিঁড়ির মাথায় যে ঘরটা এতকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল, সেইটিই হল ঠাকুর ঘর। বাড়ীতে শিবের প্রতিষ্ঠা তমসা কর্‌বেই।

ঠাকুরের জন্য সোনার সিংহাসনের ফরমাস গেল স্যাক্‌রা-বাড়ী, শয্যা প্রস্তুত হলো, পুষ্পপাত্র প্রমুখ তামার বাসন-কোসন এলো, ধুপধুনো কেনা হল, শাঁখঘণ্টা জমা হল,—তমসা পেলো মনের মত একটি কাজ।

দিনের যে সময়টা সনৎ নিয়মিত বাড়ীতে থাকে না, সেই অবসরেই হয় এই সকল ব্যবস্থা। স্বামীকে একটু চমক দেবার ইচ্ছায় তমসা অতি কষ্টে এমন ব্যাপারটা মুখ টিপে চেপে রইল।

সরলাদের পুরোহিত একদিন এলেন। রাঙা পাড় তসরের সাড়ী পরে' গলায় আঁচল দিয়ে তমসা তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করল।

ভট্‌চায্যি মশায় বললেন—শিবটি এনেছি মা, কৈ তোমার ঠাকুর-ঘর ?

তাড়াতাড়ি উঠে তমসা ঠাকুর-ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল ! বাণেশ্বর শিবটি সিংহাসনের ওপর বসিয়ে ভট্‌চায্যি মশায় প্রথম পূজা সেদিন নিজের হাতেই সারলেন।

দিন যায় ; তমসা পূজা করে। ঠাকুরের ভোগ দেয়।

সেদিন কি একটা ছুটির বার। তমসা তার স্বামীকে বল্‌ল—এসো, দেখবে এসো।

সনৎ বল্‌ল—কি ?

তমসা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌ল,—প্রিয়তমার পাগলামি !

ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সনৎ পরম বিস্ময়ে হেসে উঠল—অদ্ভুত মেয়ে ত

তুমি, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে এত কাণ্ড করেছে ? আত্মপ্রসাদে তমসার বুক ভরে' উঠল।

সনৎ শুধু হাসতেই লাগল। দেবতা বলে' তার কোনো শ্রদ্ধাও নেই, ধারণাও নেই,—কোনো গ্রাহ্যই সে করল না। নিতান্তই ছেলেমানুষি চপলতা মনে ক'রে সে হাস্‌তে হাস্‌তেই শুধু বল্‌ল—ঘর সাজানোটা খুব আর্টিষ্টিক্ হয়েছে।

তমসাও হেসে উত্তর দিল—থ্যাঙ্ক ইউ !—আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও এখানে একটুখানি, যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে যেও। আমি সরলাকে খবর দিয়ে আসি, আজ সন্ধ্যেবেলা ভট্টচায্যি মশাই আরতি করবেন।

তমসা তাড়াতাড়ি ছুট্‌লো ছাদে।

পায়ে যে চটিজুতো ছিল তা সনতের মনেই ছিল না। হাসিমুখে সে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে গেল। শিবলিঙ্গটির আকার-প্রকার দেখবার লোভ সে আর সম্বরণ করতে পারল না। কাছে গিয়ে বসে সিংহাসন থেকে সেটি তুলে নিয়ে সে বাইরে এল। তমসা যে রাগ করতে পারে, এ কথা তার মাথাতেই ঢুক্‌লো না।

ইতিমধ্যে ঝি-চাকরের কি একটা কলহ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সনৎ এল তাড়াতাড়ি তাদের থামাতে। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই থাম্‌ল কিন্তু সনৎ গেল শিবের কথা ভুলে।

গোলমাল থামিয়ে সে ইজি চেয়ারের ওপর এসে বসলো একখানা বই হাতে নিয়ে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তমসাকে ঘরে ঢুকতে দেখে শিবের কথা তার মনে পড়ল। পকেট থেকে পাথরের নুড়িটি বার ক'রে সে বল্‌ল—সংস্কারটাই তোমাদের কাছে বড়, আইডিয়াটা নয়। নৈলে এর মধ্যে কী আছে বল; ত ?

দেয়ালের ধারে হতভম্বের মত তমসা বসে পড়ে বল্‌ল—কি ওটা তোমার হাতে ?

সনৎ বল্‌ল—শিব গো, তোমার সেই নুড়িটি।

দেখতে দেখতে তমসার মুখখানা কঠিন, তীব্র, রুক্ষ হয়ে এল। চোখদুটো উঠলো ফুলে, মুখখানা হয়ে উঠলো রক্তের মত। উত্তেজনায় সে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠলো—তোমার কি ভয় নেই ? কি করলে তুমি ? ওর যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে !

সনৎ সামান্য একটু অপ্রস্তুত হয়ে—ছেলেরা যেমন ক'রে গুলি খেলে তেমনি ক'রে—বাঁ হাতের মাঝের আঙুলের ওপর নুড়িটা রেখে ডান হাত দিয়ে একবার টেনে ছেড়ে দিতেই সেটা জোরে গিয়ে লাগল দেয়ালের গায়।

অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় তমসা শিউরে উঠে ভয়ার্ত্ত হরিণীর মত ঘর ছেড়ে চলে' গেল।

দেবতার এত বড় অপমান !

মাস খানেক কেটে গেছে।

নদীতে আর স্রোত নেই। ক্ষীণ ধারাটি বয় মৃদু গতিতে। একটা ক্লান্তি এসেছে।

বহুদূর পার হবার আগে শ্রান্ত পথিক যেমন সেই দিকে তাকিয়ে থাকে তমসাও তেমনি ক'রে ভাবে। সমস্ত জীবনটাকে পার হয়ে যাবার পরিশ্রম যে অনেকখানি ! তমসার দীর্ঘনিশ্বাস হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।

আফিস্ থেকে ফিরে সনৎ ঘরে ঢুকে নিজেই আলো জ্বালে।

—এ কি, তুমি অন্ধকারে বসেছিলে এতক্ষণ ? তমসা প্রথমে উত্তর দিল না। পরে বল্‌ল—একটু একটু ক'রে কেমন অন্ধকার জমছিল দেখছিলাম।

কাছে এসে সনৎ বল্‌ল—কি হল তোমার, বল ত ? এসো, আমার কাছে বসবে এসো। দিন রাত আজকাল তোমার সাড়াশব্দ শোনাই যায় না। কেন, বল ত ?

তুলে ধরে সনৎ তাকে কাছে এনে বসালো। বল্‌ল—শুধু ত রোগা হওনি, শ্রীহীন হয়ে গেছ। চুলগুলো হয়েছে ঠিক খড়ের আঁটি, গায়ের চাম্‌ড়া খস্ খস্ কচ্ছে, চোখ বসে যাচ্ছে—তোমার সেই অদ্ভুত লাবণ্য গেল কোথায় ? কাল ত আবার ডাক্তারের কাছে গেছলাম, তিনি বললেন, রোগের কোনো চিহ্নই নেই ! এ-সব তবে কি, তমসা ? বলি, শুন্‌চ ?

উঁ !—তমসা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। চোখদুটি তার গভীর কিন্তু অর্থহীন। একটা শূন্য দৃষ্টি স্বামীর মুখের ওপর বুলিয়ে সে আলোর দিকে তাকালো। কথা বলবার যে একটা প্রাণবেগ, সেটা যেন তার ফুরিয়ে গেছে !

সনৎ বল্‌ল—কি ভাবচো তমসা ?

ভাবচি ? কই না !—তারপরই সে তাড়াতাড়ি বল্‌ল—আলোটা নিবিয়ে দিলেই ত হয়, মিথ্যে জ্বল্‌ছে।

অন্ধকারে থাকবো ? আগে ত কই তুমি আমাকে অন্ধকারে থাকতে দিতে না !

দিতাম না ? ও।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তমসা সবে বসলো। খাবার দেওয়া হয়েছিল, ঝি এসে খবর দিতেই সনৎ উঠে বাইরে গেল !

নিজের হাত ও পায়ের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তমসা কি যেন দেখ্‌ছিল। হাড়ের কাঠির মত আঙুলগুলো যেমন শক্ত, বিশ্রী, তেমনি শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, তার বিবশ আড়ষ্ট দেহটা দিন দিন একটু একটু ক'রে যেন পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

রাতে আলো নিবিয়ে নিঃশব্দে স্বামী-স্ত্রীর বিছানার ওপর পড়ে থাকে। টুটু থাকে আয়ার কাছে, পাশের ঘরে। সনতের চোখে ঘুম আসে না, কোনো প্রশ্ন করতে গিয়ে তার যেন জিব আট্‌কে যায়। ভারি জমাট অন্ধকার তার বুকের ওপর চেপে বসে।

অনেক রাতে গায়ের ওপর হাত রেখে সে বলে—আমি কি কোনো অপরাধ করেছি তমসা ? কৈ, কিছু ত মনে পড়ছে না !

উদাস কণ্ঠে তমসা বল্‌ল—আমারো না !

তবে—তবে তুমি এমন হয়ে গেলে কেন ? তবে এমন ক'রে আমার কাছ্ থেকে আল্‌গা হয়ে তুমি মিলিয়ে যাচ্ছ কেন ?

তাইত ! এ কথা কই তমসার মনে হয় নি ত !

চঞ্চল হয়ে উঠে সনৎ তার মুখের ওপর চুম্বন করতে লাগল। তমসা কোনো সাড়া দিল না, বাধা দিল না, নিঃশব্দে স্থির হয়ে পড়ে রইল।

সনতের মনে হলো, ওষ্ঠ তার শীতল, আবেগ-হীন, চুম্বন বিস্বাদ, তমসার সমস্ত দেহটাই অনাসক্ত, উদাসীন। আনন্দের কোনো কম্পন তার মধ্যে নেই।

তমসা ?

উঁ ?

রোজ এম্‌নি ক'রে সমস্ত রাত তুমি জেগে থাকো ?

হুঁ। ঘুম আসে না যে !

আবার খানিকক্ষণ চুপ-চাপ। নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে কোথায় যেন তমসা তলিয়ে যায়! ছায়াচিত্রের গতিতে নানা রকম অদ্ভুত চিন্তা তার মাথায় আসে। সে ভাবে, তার এই সাজানো সংসার যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে! স্বামীর উপার্জ্জন আর নেই, দেনার দায়ে মহাজনেরা ক্ষেপে উঠেছে। ঘর গেল, আসবাব গেল, স্ত্রী গেল,—ঝড়ে যেন চারিদিক ওলোট-পালোট হয়ে চলেছে।

ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ উঠে বসে। ঘর অন্ধকার, ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে! শব্দটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হয়—মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘা মেরে যেন ক্ষতবিক্ষত করছে!

সনৎ ঘুমিয়েছে! আবার সে তার পার পাশে গিয়ে শোয়! এইটুকু পরিশ্রমেই সে হাঁফাতে থাকে।

...উঃ, এ কি—টুটু যে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে! ডাক্তার এলেন, হ্যাঁ—কি বললেন, ডাক্তার বাবু? ও কি, মুখ ফিরিয়ে চলে' যাচ্ছেন কেন?

তমসা বড় বড় চোখে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

...মাথার ওপর অশ্রুজলে আকাশটা টল্ টল্ করছে! টুটুকে কাঁধে নিয়ে সে চলেছে রিক্ত, রুক্ষ, তৃষ্ণার্ত্ত, মরুভূমি পার হয়ে। টুটু মরে গেছে, কেউ তাকে বাঁচাতে পারেনি। কাঁধ পেরিয়ে পিঠের দিকে টুটুর মাথাটা দুল্‌ছে! চোখে তার চির-নিদ্রা, চির-অন্ধকার!... শ্মশানে এল, নির্জ্জন সাগরের কূলে শ্মশান।...চিতার আগুন জ্বল্‌লো, কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠলো ওপর দিকে, তারপর সাগর-তরঙ্গ এসে টুটুকে লেহন ক'রে নিয়ে গেল!

তমসা কাঁপছে! চীৎকার কর্‌বে? আওয়াজ কই? প্রাণপণে সে একবার নড়বার চেষ্টা করল, পারল না। বিছানায় বিছা ঢুকেছে কি, এমন ক'রে কামড়াচ্ছে কেন?

ঘড়িটা টিক্ টিক্ ক'রে রাত্রির অন্ধকারকে বিদ্ধ কর্‌ছে। দুল্‌ছে; নিদ্রিত গোলাকার এই পৃথিবীটা তার চোখের উপর দুল্‌ছে!

...ও কি, আগুন লাগল কেমন ক'রে? দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল চারিদিক। বাড়ী পুড়লো, ঘর পুড়লো, ইট-কাঠে আগুন লেগে পটাপট শব্দ হতে লাগল। যাঃ, সব যে গেল! স্বামী গেল টুটুকে বাঁচাতে,—কৈ, আর ত বেরোল না! ওগো শুন্‌চ, উত্তর দাও—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বেরিয়ে এসো।

সনৎ আচম্‌কা উঠে বসল। তমসার গায়ে হাত দিয়ে দেখল, সে থর-থর ক'রে কাঁপছে,—এক গা ঘাম! হাত-পাগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তমসা, এখনো ঘুমোওনি তুমি?

কম্পিত কণ্ঠে তমসা বল্‌ল—ঘুমোইনি? সকাল হল যে!

জান্‌লা দিয়ে সনৎ বাইরে তাকাল। পরে বল্‌ল—সকাল নয়, শেষ রাতের চাঁদের আলো, কাকগুলো ডাক্‌ছে, আবার এখুনি থেমে যাবে!

ও, থেমে যাবে এখুনি? আচ্ছা—অসমাপ্ত কথা তার মুখের মধ্যেই রয়ে গেল।

সকাল বেলা সনৎ খবরের কাগজ পড়ছে, আর জানলার গরাদে মাথা কাৎ করে বাসি-মুখে তমসা বসে রয়েছে। একটু আগে টুটু এসে মায়ের কাছে কি একটা আব্দার ধরেছিল, তমসা তাকে ধমক দিয়ে আয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। টুটুকে আজ কাল তার কেমন যেন ভাল লাগে না।

কাগজের ওপর থেকে এক সময় মুখ তুলে স্নিগ্ধ কণ্ঠে সনৎ বলতে গেল—কাল থেকে প্রায় উপবাস চল্‌ছে, মুখ হাত-পা ধুয়ে এবার কিছু—

বারুদের মত তমসা হঠাৎ ফেটে উঠল—আমার খুসী, না খেয়ে থাকবো, তোমার কথা বলবার কি দরকার ? খবরদার বলে দিচ্ছি, কোন কথা কইবে না আমার সম্বন্ধে।

রুক্ষ কর্কশ হিংস্র মুখের চেহারা ! দেখলে সত্যই ভয় ক'রে।

থতমত খেয়ে সনৎ বল্‌ল—তবে শুধু মুখ ধোওগে ?

না, বেশ করবো, খুব করবো—আমি এখানে বসে থাকবো। চুপ ক'রে বসে থাকবো এটুকু অধিকার আমার নেই, কেন বল ত ? আমায় কি কিনে এনেছ ?

একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে সনৎ বল্‌ল—তুমি নিজেই রাগ করছ, আমি ত তা বলিনি তমসা।

থাক্, আর সাফাই গাইতে হবে না, আর ভালমানুষীতে কাজ নেই ! ঢের হয়েছে, অনেক হয়েছে—এবার ছুটি দাও।

হু-হু ক'রে সে কেঁদে ফেল্‌লো।

এমনি ক'রে আজকাল সে কথায় কথায় বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

আফিস যাওয়া সনৎ বন্ধ করল।

ঝি-চাকর বামুন-আয়া পর্য্যন্ত তটস্থ হয়ে রইল। সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত সংসারটির মধ্যে প্রতিক্ষণেই ছন্দপতন হতে লাগল।

বেলায় ভাত বেড়ে দিয়েছে, অনেক কষ্টে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সনৎ তাকে এনে খেতে বসালে। খেতে বসেও কেলেঙ্কারী ! ভাত-তরকারী ছড়িয়ে জল ফেলে একাকার করল। সনৎ বল্‌ল—সবই ত ফেলে দিলে ! দুটি খাও। আর নয়ত আমি খাইয়ে দেবো ?

খাইয়ে দেবে ? কেন, আমি কি, খুকী ? আমি কি কিছু জানিনে ? এম্‌নি করে আমায় অপমান করা ?

থালাটা তুলে সে ছুড়ে ফেলে দিল ; পা দিয়ে ঠেলে দিল জলের পাত্রটা।

হাত ধুয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে সনৎ ডাক্তার আনতে ছুট্‌লো। ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে সে দেখা পেল না, সেখান থেকে ছুট্‌লো কবিরাজের বাড়ী। বৃদ্ধ কবিরাজকে নিয়ে সে যখন ফিরে এল, দেখল, ভেতরে হৈ-চৈ কাণ্ড বেধে গেছে।

ঘরের জিনিষপত্র তচ্‌নচ্ করা, বিছানা, বাক্স, দেরাজ, সমস্ত গৃহ-আসবাব একেবারে লণ্ডভণ্ড।

ঝি এসে কাঁদতে কাঁদতে তার একটা হাত দেখিয়ে বল্‌ল—ধরতে গেছলাম দাদাবাবু...আয়না ছুড়ে মার্‌ল... একেবারে রক্তারক্তি। কাঁচে কেটে গিয়ে বুড়ো মানুষ...

সনৎ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বল্‌ল—টুটু কই ?

ঝি বল্‌ল,—লোহার সাঁড়াশি নিয়ে ছেলেকে মারতে গেছল, আয়া নিয়ে পালিয়েছে !

বৃদ্ধ কবিরাজ মশাইয়ের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। দরজার কাছে এসে দেখলেন, আলুথালু অবস্থায় উপুড় হয়ে তমসা পড়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে বল্‌লেন—কি হল মা তোমার ?

তমসা এবার উঠে বসলো। দুটি চোখে তখন তার অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে। ব্যাকুল হয়ে সে বলে উঠল—বড় কষ্ট পাচ্ছি, অসহ্য হয়ে উঠেছে !

কবিরাজ 'মধ্যম-নারায়ণ' তেলের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন।

তেলের শিশি হাতে ক'রে এনে সনৎ যখন তার মাথায় মাখাতে বসলো, তমসা এক সুযোগে শিশিটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আছাড় মেরে চুরমার ক'রে দিল।

কিন্তু সে রাত আর কাট্‌লো না। সময় নিকট হয়ে এসেছিল।

আলোটা জ্বালাই ছিল। নিশুতি রাত। সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তৃতীয় প্রহরের চাঁদ নিমগাছের মাথায় জ্যোৎস্না মাখিয়েছে।

ছ্যাঁৎ করে এক সময় সনতের ঘুম ভেঙে গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটু আগে তার তন্দ্রা এসেছিল। উঠে বসে সে দেখল, পায়া-ভাঙা আল্‌মারির মাথার ওপর একটা টুল, তার ওপর অসম্বৃত অবস্থায় তমসা দাঁড়িয়ে, হাতে একটা কাঁসার গেলাস। গেলাস দিয়ে ঘড়িটাকে শাসিয়ে চোখ লাল ক'রে সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—অনাচারি! নাস্তিক! তোমার ভালবাসা? তোমার ভালবাসায় ধর্ম্ম আছে?—বলতে বলতে বড় ঘড়িটার কাঁচের ওপর সে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত কর্‌ল।

ঘড়িটা তৎক্ষণাৎ চুরমার হয়ে দেয়াল থেকে মেঝের ওপর সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু নিজে সে আর টাল সামলাতে পারল না। টুল শুদ্ধ উল্‌টে হুড়মুড় করে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল।

জিনিষপত্র সরিয়ে তার ভেতর থেকে সনৎ যখন তাকে টেনে তুল্‌লো, তমসার সর্ব্বাঙ্গ তখন রক্তারক্তি! কপালের রক্ত চোখ বয়ে ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। তমসা খিল্ খিল্ ক'রে হাসছিল।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

ভয়ঙ্কর

যে-গল্পটি আজ আমি আপনাদের বলিব, তাহা সুন্দর সিং-এর নয়,—সে গল্প দীননাথ জেলের। কিন্তু বুড়া সুন্দর সিং-এর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট, কাজেই সে বৃদ্ধের জীবনের ইতিহাস আপনাদের একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে হইবে।

বুড়া সুন্দর সিং আজ আর ইহলোকে নাই। বুড়া মরিয়াছে।

আহা, বেচারা!

বুড়ার গায়ের রং ছিল ঠিক পাকা আমের মত, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত, মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, পাৎলা ছিপ্‌ছিপে মানুষটি, কিন্তু এমন ভালমানুষ—আশপাশের গাঁয়ের লোকে বলে, তাহারা নাকি জীবনে কখনও দেখে নাই।

মাধবপুর ষ্টেশন হইতে মাইল-খানেক দূরে পাকা একটা লাল কাঁকড়ের শড়ক্ রেল-লাইনের উপর দিয়া পার হইয়া গেছে। কিম্বা লাইনটা পার হইয়াছে শড়কের উপর দিয়া,—একই কথা।

লাইনের উপর ট্রেণ চলে, রাস্তার উপর চলে গরুর গাড়ী, হাওয়া-গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, লোকজন ;—চলাচলের বিরাম একরকম নাই বলিলেই হয়। অথচ, ট্রেণ চলিবার নির্দ্দিষ্ট একটা সময় থাকিলেও গাড়ী-ঘোড়া লোকজন চলাচলের ধরা-বাঁধা সময় কিছু নাই, কাজেই রেল-কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া এই দুই রাস্তার কাটাকাটির মাথায় লোহার একটি প্রকাণ্ড ফটক তৈরী করিতে হইয়াছে। না করিলে বিপদের সম্ভাবনা। এবং শুধু ফটক তৈরী করিলে চলে না, ফটক আগলাইবার লোক চাই, লোকের জন্য একখানি ঘর চাই!

ঘরও তৈরী হইয়াছে।

শড়কের দু'পাশে বড় বড় বাঁশের ঝোপ, চারিদিকে পলাশ, ঘেঁটু, বন-তুলসী, স্যাওড়া আর সিঁয়া-ফুলের জঙ্গল, আর তাহারই মাঝখানে রেল-লাইনের ধারেই—টালির একখানি ছোট ঘর।

ফটক-ওয়ালা সুন্দর সিং।

থাকে ওই ঘরে। ওইখানেই খায়, ওইখানেই শোয়, ট্রেণের সময় ফটক বন্ধ করে, আবার ট্রেণ চলিয়া গেলে খুলিয়া রাখে। সারা দিবারাত্রির মধ্যে শুধু ওই তাহার কাজ। পরিশ্রম বিশেষ-কিছু নয়, তবে দায়িত্ব বড় বেশি। এক দণ্ডের জন্যও তাহার এই ফটক ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই।

তা সে যায়ও না।

প্রথম যখন সে এখানে এই ফটক-রক্ষীর কাজ লইয়া আসে, তখন তাহার যৌবন। আসিয়াছিল তিরিশ বছর আগে ; এবং এই তিরিশ বছরের মধ্যে কেহ তাহাকে কোথাও যাইতে দেখে নাই।

আত্মীয়-স্বজন কেহ কোথাও তাহার ছিল কি না, কে জানে! ছিল নিশ্চয়। না থাকা সম্ভব নয়। মানুষ কখনও আকাশ হইতে পড়ে না। রক্তের ধারা নর-নারীর দেহে দেহে সঞ্চারিত হইয়া হয়ত বহু দূর-দূরান্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। সুন্দর হয়ত তাহাদের সন্ধান রাখে না, কিম্বা রাখিলেও কাহারও কাছে প্রকাশ করে না! লোকটা বড় চাপা।

তবে এই পর্য্যন্ত লোকে জানিয়েছে যে, সুদূর পশ্চিমের এলাহাবাদ জেলায় তাহার বাড়ী। মাসের শেষে নিজের খাওয়া-পরার খরচ বাদে, বাকি দশটি করিয়া টাকা সে মণি-অর্ডার করিয়া দেশে পাঠায়।

পাঠায় রুক্‌মিণী দেবীর নামে।

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত।

রুক্‌মিণী দেবীটি যে কে, সুন্দর সিং-এর সঙ্গে কি তাহার সম্বন্ধ, সে কথা ওই এক দীননাথ ছাড়া আর-কেহ জানে না।

মাধবপুরের ফটকে কাজ লইয়া সুন্দর সিং তখন নূতন আসিয়াছে।

বৈকালে সেদিন সে তাহার ফটকের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কি যেন

ভাবিতেছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেণ পার হইবার সময়। সিগ্‌ন্যাল্‌ পড়িয়াছে। ফটকে তালা বন্ধ। হঠাৎ শুনিল, পশ্চাতে কে যেন বলিতেছে, 'কখন খুলবে সিংজি ?' পিছন ফিরিয়া সুন্দর সিং দেখিল, কালো রঙের পাৎলা ছিপ্‌ছিপে নিতান্ত রোগা এক ছোকরা খালি-পায়ে খালি-গায়ে ফটক ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সিংজি বলিল, 'গাড়ীটা পেরোলেই খুলব। একটু দাঁড়াও ভাই।'

ছোক্‌রাটি বলিল, 'না, আমি যাব না কোথাও, এইখানেই এসেছি।'

সুন্দর সিংহ তাহার মুখের পানে তাকাইলেন। মনে হইল, কি যেন সে বলিতে চায়।

ছোক্‌রাটি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, অবশেষে মরীয়া হইয়া সে তাহার বামহস্তের তালুর উপর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘসিতে ঘসিতে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বুঝাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আছে ?' বলিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া নিতান্ত করুণ কণ্ঠে কহিল, 'আমার আজ ফুরিয়ে গেছে সিংজি।'

তাহার মুখ দেখিয়া সুন্দর সিং-এর দয়া হইল। বলিল, 'আছে।'

আর কিছু বলিবার অবসর তাহার হইল না, হুস্‌ হুস্‌ করিয়া ট্রেণ আসিয়া পৌঁছাইল। সবুজ রঙের ঝাণ্ডা হাতে লইয়া সুন্দর সিং উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ী ষ্টেশনে গিয়া থামিলে ফটকের তালা খুলিয়া ছোক্‌রাটিকে ডাকিয়া সুন্দর সিং তাহার সেই ছোট্ট ঘরখানির ভিতর লইয়া গেল, কাঠের একটি পিঁড়ি টানিয়া দিয়া বলিল, 'বোসো'।

ছোক্‌রাটি বলিল, 'না আমি এই মেঝেয় বসি। আমি কৈবর্ত্ত—জেলে।'

এই দীননাথ।

গাঁজা খাইতে খাইতে সেই তাহাদের প্রথম পরিচয়।

পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল।

দীননাথ জেলে। মাধবপুর গ্রামে তাহার মাত্র একখানি কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর কিছুই নাই। আঁকা-বাঁকা প্রায় মাইল-খানেক মেঠো রাস্তা ভাঙ্গিয়া তাহাকে এখানে আসিতে হয়। তবু সে রোজ দু'বেলাই আসে।

বাড়ীতে তাহার স্ত্রী এবং একটিমাত্র কন্যা। স্ত্রী তাহার রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তিন-কোণা কাঠের জালি কাঁধে লইয়া বাহির হয়। পুকুরে পুকুরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চুনো-পুঁটি যাহা পায়, দুপুরবেলা ঘরে ঘরে তাহাই বিক্রী করিয়া চাল-ডাল কিনিয়া আনে।

দীননাথ তাহার চোখ দুইটি রাঙা করিয়া ঠিক সময়েই ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসে। স্ত্রী তাহার গালাগালি দেয়। দীননাথ সে সব শুনিতে পায় না। দিব্য নির্ব্বিকার চিত্তে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া বলে, 'মর্‌ মাগী, চেঁচাস্‌ কেন ?'

টগর বলে, 'চেঁচাই সাধে ? একবেলা যেতে যেতে এখন ত দু'বেলাই ধরলে। তোমার সিংজি যদি আজ চলে যায়, কাল কি করবে ?'

'যদি চলে যায়'...বলিয়া দীননাথ তাহার স্ত্রীর কাছে সরিয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'রায়ের পুকুরে এই এত বড় বড় মাছ। অন্ধকার রাত্রে একদিন জাল নিয়ে গিয়ে...'

টগর হাসিতে হাসিতে দীননাথের মুখের কাছে হাত লইয়া গিয়া বলে, 'থামো, তুমি ধরবে মাছ ! তার ওপর অন্ধকার রাতে। তবেই হয়েছে। ওলো ও বগলা, শোন্‌ !'

বগলা তাহার মেয়ের নাম। কালো মেয়ে। দিব্যি টানা-টানা চোখ, নিটোল স্বাস্থ্য, গড়ন বড় চমৎকার। দেখিতে অনেকটা ঠিক মায়ের মত। এই সবে সেদিন শ্বশুরবাড়ী

হইতে আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্‌ছিলি মা?'

টগর বড় চালাক মেয়ে। বগলার কাছে বলিলে পাছে স্বামীর লজ্জা হয় ভাবিয়া বলিল, 'না, কিছু বলিনি। তোকে আসতে হবে না। যা।'

বলিয়া দীননাথের মুখের পানে তাকাইয়া সে আবার হাসিতে লাগিল।—'আচ্ছা, অন্ধকারকে তোমার এত ভয় কেন বল ত? আমি ত রাত-দুপুরে শ্মশানে যেতে পারি।'

দীননাথ সে কথা বিশ্বাস করে না। বলিল, 'তা'হলে তুই সব পারিস। তোকে নিয়ে ঘর করা আর হলো না, দেখছি।'

টগর জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে নিয়ে করবে? কে তোমায় বসিয়ে বসিয়ে খেতে দেবে দু'বেলা, শুনি?'

দীননাথ ভাবনায় পড়িল। তাও বটে! হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বগলার মা না করে তোকেই বগলার বাপ করা উচিত ছিল, বুঝলি টগর, ভগবানের ভুল হয়ে গেছে।'

দু'জনেই হাসিতে লাগিল।

টগর বলিল, 'আচ্ছা, তোমার ঐ সিংজিকে বলে'কয়ে দিনের বেলা রেলে কোথাও কাজ হয় না?'

দীননাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হবে। আর কিছুদিন সবুর কর্।'

কিছুদিন দূরের কথা, টগর সবুর করিল পাঁচ বৎসর।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে দীননাথ রোজগার করিয়াছে মাত্র এক টাকা দশ আনা।

বারোদুয়ারীর বাবুদের বাড়ী মেয়ের ছিল বিয়ে। প্রচুর মাছের প্রয়োজন। প্রকাণ্ড একটা সায়রে মাছ ধরিতে হইবে। দশ-বারোখানা গ্রামে যেখানে যত জেলে ছিল, সকলেরই ডাক পড়িল। মাধবপুরের জেলেদের সঙ্গে দীননাথও গিয়াছিল। জলে নামিয়া মাছ সে ধরিতে পারিয়াছিল কি না কে জানে, তবে মজুরী পাইয়াছিল এক টাকা, আর চুরি-করা মাছ বিক্রীর ভাগ—দশ আনা।

খাওয়া-দাওয়াও নাকি হইয়াছিল বেশ, কিন্তু দীননাথ গ্রামে ফিরিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে আর তাহাদের গ্রামের লোকের সঙ্গে কোথাও যাইবে না।

না যাওয়াই উচিত।

কারণ, নিষ্ঠুরতার একটা সীমা আছে।

অন্ধকার রাত্রি! ময়নাদীঘির শ্মশানের পাশ দিয়া তাহারা গ্রামে ফিরিতেছিল। আশে-পাশে আগাছায় ভর্ত্তি ঝোপ-জঙ্গলের মাঝখান দিয়া সরু একফালি পায়ে-চলা পথ। জায়গাটা দিনের বেলা খাঁ-খাঁ করে, রাত্রে ত' সেখানে মানুষের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ক্ষণে ক্ষণে দীননাথের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এম্‌নি নিষ্ঠুর এই ভগা আর চণ্ডে যে, যত বার সে লোকজনের মাঝখানে একটু নিরাপদ স্থানে গিয়া ঢুকিতেছিল, ততবার তাহারা হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে একেবারে সকলের পিছনে ঠেলিয়া দিয়া নিজেরা আগাইয়া গিয়া মজা দেখিতেছিল। সমস্ত রাস্তা দীননাথের লাঞ্ছনার তাহারা আর কিছু বাকি রাখে নাই। আর একটু হইলেই সেদিন সে ওই পথের মাঝখানেই মারা পড়িত। কোন রকমে চোখ বুজিয়া মরি-বাঁচি করিয়া রাম-রাম বলিতে বলিতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাই রক্ষা।

ব্যাপার শুনিয়া সুন্দর সিং হাসিতে লাগিল।

কারণ—তাহার পরিচয় সে ইহার পূর্ব্বেই পাইয়াছে।

গাঁজা খাইয়া নেশার ঝোঁকে গল্প করিতে করিতে একদিন তাহাদের সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। অন্যদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দীননাথ উঠিত। সেদিন কখন সন্ধ্যা হইয়াছে, বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ শেয়ালের ডাকে চমক্ ভাঙ্গিতে দীননাথ বাহিরে তাকাইয়া দেখে, অন্ধকার। আকাশে তারা উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার কথার ধারা বদ্‌লাইয়া গেল। কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, 'ন'টার গাড়ী আসবার দেরি আছে, না ?'

সিংজি গল্প বলিতেছিল কাশীধামের। সেইখানেই তাহার বাল্যকাল এবং কৈশোর কাটিয়াছে। প্রচুর পরিমাণে দুধ-ঘি খাইয়া, গঙ্গার উপর নৌকায় চড়িয়া কি আনন্দে দিন কাটাইয়াছে, তাহারই গল্প। দুই হাতে দাঁড় টানার ভঙ্গী করিয়া বলিতেছিল, 'মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে কেদারজির ঘাট পর্য্যন্ত পাল্লা লাগিয়ে আমরা দাঁড় টানতাম। আমার মত দাঁড় টানতে কেউ পারতো না।'

শ্রোতার মুখে হঠাৎ ন'টার গাড়ীর কথা শুনিয়া সুন্দর সিং-এর দাঁড় টানা বন্ধ হইয়া গেল।

'হাঁ, দেরি আছে।' বলিয়া সে আবার আরম্ভ করিল, 'তারপর গড়েন্ ঘাটে নৌকো বেঁধে আমরা কেদারনাথজির মন্দির প্রণাম করতে যেতাম। এইখানে প্রণাম করতে গিয়েই একদিন রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা।'

দীননাথের তখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সবে রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা! ইহার পর পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, ভালবাসা, বিবাহ, তাহার পর সন্দেহ, ঝগড়া, ছুরি-মারামারি, বিচ্ছেদ... ! রাত্রি তখন যে কত হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

দীননাথ বলিল, 'কাল শুনব সিংজি, আজ উঠি।'

রুক্মিণীর কথা সহজে সে কাহাকেও বলিতে চায় না, আজ যখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দীননাথ শুনিতে চাহিল না দেখিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াই সুন্দর সিং বলিল, 'আচ্ছা।'

বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে তাহার লোহার তোলা উনানটা ধরিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য নিজেও উঠিল।

বাহিরে আসিয়া দীননাথ একবার ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইল। পথের দু'পাশে বাঁশের ঝোপে ঝোপে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়াছে। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই।

দীননাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'দুধ কি তোমার দিয়ে গেছে সিংজি ?'

সুন্দর বলিল, 'বা, দেখলে না, তোমার সামনেই দিয়ে গেল যে !'

'ও।' বলিয়া দীননাথ এক-পা এক-পা করিয়া আবার সুন্দর সিং-এর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, 'গেলে না যে ?'

'যাই।'

বলিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া সে ইতস্তত করিতে লাগিল।

'আমার সঙ্গে তুমি যদি আসতে পার সিংজি, ত তোমায় আজ আমি ক্ষীর খাওয়াতে পারি।'

গাঁজা-খোর মানুষ, সিংজি যে ক্ষীরের পক্ষপাতী, দীননাথ তাহা জানিত। ক্ষীরের নাম

শুনিয়া সুন্দর বলিয়া উঠিল, 'ক্ষীর ! কোথায় ?'

দীননাথ বলিল, 'আমার সঙ্গে আসতে হবে তা'হলে। সারদা গয়লার বাড়ীতে আজকাল চার-পাঁচটা ইয়া বড় বড় গাই। দশ-বারো সের দুধ হয়। ব্যাটা আজকাল ক্ষীর বেচ্ছে। এসো, মাইরি বলছি।'

ন'টার গাড়ীর তখনও অনেক দেরী। সুন্দর বলিল, 'লোটাটা নি তাহ'লে ?'

দীননাথ বলিল, 'লোটা ! আচ্ছা, নেবে ত' নাও। তার চেয়ে বরং আঁধার রাত...লণ্ঠনটা...' লোটা এবং লণ্ঠন হাতে লইয়া ফটক দুইটা টানিয়া বন্ধ করিয়া সুন্দর সিংহ দীননাথের সঙ্গে ক্ষীর আনিতে চলিল।

সারাটা পথ দীননাথের মুখে কথা যেন আর ফুরাইতে চায় না !

কি যে বলে, মাথা নাই মুণ্ডু নাই, খালি খালি চেঁচাইতে চেঁচাইতে চলে। সুন্দর সিং আগাইয়া যায় ত' তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়ায়। পথের পাশে গাছে-পাতায় কোথাও একটু খুড়ুক করিয়া শব্দ হইলেই অম্‌নি চম্‌কিয়া উঠিয়া দীননাথ জিজ্ঞাসা ক'রে, 'কিসের শব্দ ?'

সুন্দর বলে, 'কিছু না।'

এম্‌নি করিয়া যখন তাহারা গ্রামে গিয়া পৌঁছিল—পল্লীগ্রাম তখন নিস্তব্ধ বলিলেই হয়।

বেচু ময়রার বাড়ীর কাছাকাছি আসিতেই গ্রামের কয়েকটা হ্যাংলা কুকুর তাহাদের দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বেচুর দোকানের চালায় বসিয়া তখনও জনকতক লোক গল্প করিতেছিল। বেচু জিজ্ঞাসা করিল, 'কে ?'

জবাবের অপেক্ষা করিতে হইল না। সুন্দর সিং তাহাতে হাতের লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিতেই সকলে তাহাদের চিনিতে পারিল।

জিতু বলিল, 'সিংজি এমন অসময়ে যে ?'

বেচু হাসিল। বলিল, 'বুঝতে পারছ না ? দীননাথ সঙ্গে। আঁধার রাত। একা আসতে পারে ? দাঁড়িয়ে দিতে এসেছে।'

দীননাথ যে অত্যন্ত ভীতু, সে কথা গ্রামের কাহারও জানিতে বাকি নাই।

দীননাথ বলিয়া উঠিল, 'মাইরি আর কি ! তোমাদের যেমন কুথা ! ও এসেছে সারদার বাড়ী ক্ষীর নিতে।'

কিন্তু হায়, যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয় !

রতু স্যাক্‌রা সেই সময়ে বেচুর দোকানে আসিল এক পয়সার পান কিনিতে। সারদার বাড়ী আর রতুর বাড়ী একেবারে গায়ে গায়ে। বেচু বলিল, 'পান তুই ভাই এসে নিস। তুই একবার চট্ করে সারদাকে ডেকে তোর সঙ্গে নিয়ে আয়। বল্—জরুরী দরকার।'

দীননাথ বলিল, 'চলে এসো সিংজি, ওদের কথা তুমি শুনছ কেন ?'

কিন্তু বেচু জিতু নগেন ইত্যাদি সকলে মিলিয়া হাসিতে হাসিতে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'না, তুমি যেতে পাবে না, দাঁড়াও।'

সারদা আসিতেই বেচু জিজ্ঞাসা করিল, 'ক্ষীর আছে তোমার বাড়ীতে সারদা ?'

সারদা বুড়া মানুষ। জাতিতে গোয়ালা। দুধ ঘি সে বিক্রী করে বটে, ক্ষীরও মাঝে মাঝে তৈরী যে সে করে না এমন নয়। সারদা বলিল, 'হা আমার কপাল ! আজ একমাস হলো, আমার ঘরে এক ফোঁটা দুধ নেই। গরুর বাছুরটি মরে' গেছে যে ! কেন, তুমি জান

না বেচু ? এই যে আমাদের দীনুও ত' জানে।' বলিয়া সারদা দীননাথের মুখের পানে তাকাইল।

দীননাথের মুখ তখন শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে। একটা ঢোঁক্ গিলিয়া বলিল, 'আমায় আবার কখন বললে ?'

সারদা বলিল, 'সেই যে, দিন পাঁচ-ছয় আগে—সরকারী ইন্দারা-তলায় রাসু ভট্‌চাজ্ যেদিন দুধের রোজ চাইতে এলেন,—তুমি বললে, বাছুর মরে' গেছে ?·আহা, তাই না কি, তা ত' জানতাম না সারদা...'

দীননাথ কিছুতেই স্বীকার করিবে না, অথচ সারদা বলিয়াছে ইহা সত্য কথা।

দু'জনে বচসা হইবার উপক্রম।

সুন্দর সিং বলিল, 'থাক্, তুমি চল দীননাথ, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আবার গাড়ীর সময়...'

বেচু বলিল, 'না না, ওকে আবার পৌঁছে দেবে কেন ? তোমায় ক্ষীর খাওয়ালে, এবার ও একা যাক্, এই তো বাড়ী !'

সুন্দর সিং হাসিয়া একটুখানি আগাইয়া গেল। দীননাথ তখন তাহারও আগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিয়দ্দূর গিয়া, রাস্তায় যখন আর লোকজন কেহ নাই, সুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, তোমার এত ভয় কেন লাগে বল ত' দীননাথ ?'

দীননাথ বলিল, 'বেটাদের ষড়যন্ত্র বুঝলে না ?'

কিন্তু সেটুকু বুঝিবার ক্ষমতা সুন্দব সিং-এর আছে। বলিল, 'ভয় তাহ'লে তোমার পায় না, বলছ ?'

দীননাথ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'ভয় আবার কার পায়না সিংজি ! ও-ব্যাটারা কি একেবারে ইয়ে হয়ে গেছে না কী ! ওদের ভয় পায় না ?'

সুন্দর সিং আর একটি কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না।

দীননাথের ভয়ের পরিচয় সেইদিন সে প্রথম পাইল।

এবং সেইদিন হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সুন্দর সিং বলিত, 'এবার ওঠো দীননাথ !'

কিন্তু তাহাতে দীননাথ বিশেষ খুশী হইত না। আত্মসম্মানে তাহার আঘাত লাগিত। বলিত, 'উঠছি। কিন্তু দ্যাখ সিংজি, তোমরা আমাকে যতটা ভাবো, অতটা নয়।'

সিংজি হাসিয়া বলিত, 'তা বলছি না দীননাথ, তবে কিনা অন্ধকার পথ, অতটা যেতে হয়, সাপ-খোপ ত' আছে !'

দীননাথ বলিত, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ সিংজি, এইবার তুমি ঠিক বলেছ। ওই সাপ জিনিসটাকে আমি বড় ভয় করি। অন্ধকারে ফোঁস্ করে' যদি ওঠে একবার ত বাস্... ! সেদিন আমাদের গাঁয়ের সেই সুধন মুচি যাচ্ছিল তার মেয়ের শ্বশুর বাড়ী...'

বলিয়া সুধন মুচিকে একবার তাহার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে কেমন করিয়া একটা গোখরো সাপে আগলাইয়াছিল, দীননাথ তাহারই গল্প আরম্ভ করিত।

তাহার পর অনেক দিন পার হইয়াছে।

বৃদ্ধ সুন্দর সিং—চোখে ভাল দেখিতে পায় না, লাঠি ধরিয়া চলিতে হয়।

তবে ফটক আজকাল শুধু এই ট্রেণ চলিবার সময়টুকু ছাড়া অধিকাংশ সময় খোলাই

গাঁজা খাইতে গিয়া নূতন ফটকওয়ালা রামধনীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল।

গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

রামধনী বলিল, 'একটু বসো ভাই দীনু, আমি চট্ করে' আসি ষ্টেশন থেকে।'

আগে সে এ প্রস্তাবে রাজি কিছুতেই হইত না, কিন্তু সেদিন তাহার কি মনে হইল, কে জানে! বলিল, 'এসো।'

কিন্তু রামধনী আর আসে না।

অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকে। মোটর বাসগুলা হইবার পর এ-পথে পায়ে-চলা লোকের সংখ্যা একরকম নাই বলিলেই হয়। সশব্দে একটা 'বাস্' পার হইবার পরেই চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হইয়া ওঠে। আগাছার জঙ্গলে-ভরা রাস্তার দুপাশে বাঁশের ঝাড়। শব্দের মধ্যে শুধু একবার জোরে বাতাস বহিলে লম্বা বাঁশগুলা দুলিয়া দুলিয়া কট্ কট্ করিতে থাকে। কদাচিৎ দু' একটা শেয়াল হয় তো শুকনো বাঁশপাতার উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়।

দীননাথ একাকী সেই ফটকের পাশে অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সুন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করে।

সুন্দর আসিবে!...তাহার সেই বহুকালের বন্ধু সুন্দর।

অনেক কথা তাহাকে বলিবার আছে। তাহার রুক্মিণী কাছে সে গিয়াছিল। স্বচক্ষে তাহাকে সে দেখিয়া আসিয়াছে। টাকা সে তাহাকে দেয় নাই। না দিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে। ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে। এখন সে সুন্দরের টাকা সুন্দরের হাতেই ফিরাইয়া দিতে চায়...

দীননাথ গাঁজা বাহির করিয়া হাতের তালুতে রাখিয়া তৈরি করিতে লাগিল। কতদিন একসঙ্গে বসিয়া গাঁজা তাহারা খায় নাই! ঠিক এই জায়গাটিতে বসিয়া সুন্দর কবে তাহার সহিত কি রকম ভাবে কি কথা বলিতে বলিতে শেষ গাঁজা টানিয়াছে দীননাথের তাহা মনে পড়িল।

বাতাসে একটা শব্দ হইতেই দীননাথ অন্ধকারে সেইদিকে তাকাইয়া ডাকিল, 'সুন্দর!'

কোন জবাব নাই।

নিজের কথাটাই তাহার নিজের কাছে কেমন যেন অপরিচিত বলিয়া মনে হইল।

ভাল করিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিল, সুন্দর নয়, ছোট একটা চাম্‌চিকে বাতাসে ডানার ঝাপটা মারিয়া উড়িয়া উড়িয়া মশা ধরিতেছে।

বহুক্ষণ পরে রামধনী ফিরিয়া আসিল। সুন্দর আসিল না।

দীননাথ আজকাল যেন একটু পাগলের মত হইয়া গেছে। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, অযথা বাড়িয়া চলিয়াছে, পাকা পাকা চারটিখানি দাড়ি গজাইয়াছে। চব্বিশ ঘণ্টা বিড় বিড় করিয়া আপন-মনে কাহার সঙ্গে কি কথা কয়, কে জানে! ডাকিলে জবাব দেয় না, অনেক কষ্টে যদি-বা সাড়া পাওয়া যায় ত' এক কথা বলিলে আর এক কথা বলিয়া বসে।

প্ল্যাট্‌ফর্মে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইলে দীননাথও জানালার কাছে গিয়া দাঁড়ায়। জানালায় জানালায় হাত পাতিয়া যা পায়, তাহাতেই তাহার দিন চলে।

রান্না সে কোনোদিনই করে না। দয়া করিয়া কেহ যদি কদাচিৎ তাহাকে ডাকিয়া চারটি রাঁধা ভাত খাইতে দেয় ত' খায়, তাহা না পাইলে অধিকাংশ দিন তাহার মুড়ি খাইয়াই

কাটে।

রাত্রে সে প্রায়ই রামধনী ফটক-ওয়ালার কাছে পড়িয়া থাকে।

এক...একদিন বলে, 'রামধনী, তুমি ঘুমোও।'

বলিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া লাইনের ধারে বসিয়া ক্রমাগত গাঁজা টানে আর রাত্রি জাগে।

ট্রেণ আসিবার সময় সুন্দর যেমন করিয়া ঠিক যে জায়গাটিতে গিয়া দাঁড়াইত, সেও ঠিক তেমনি করিয়া এক হাতে ঝাণ্ডা একহাতে বাতি লইয়া গিয়া দাঁড়ায়।

সব চেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, যে-দীননাথ অন্ধকার হইলে বাড়ীর বাহির হইত না, সেই দীননাথের ভয় যেন আর একেবারেই নাই।

মানুষের ভয় যেখানে সব-চেয়ে বেশী হইবার কথা, দীননাথ তাহার গাঁজার কলিকাটিতে আগুন চড়াইয়া সেই খানে গিয়া চুপ করিয়া বসে। অন্ধকারে কোথাও খুড়ুক করিয়া শব্দ হইলে অম্‌নি সেইখানে ছুটিয়া যায়। চুপিচুপি ডাকে, 'সুন্দর!'

তাহার পর বৃথাই প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া দেখা যখন মিলে না, তখন চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'হয় তুমি এসো সুন্দর, নয় তোমার কাছে আমায় নিয়ে যাও।'

আজকাল অমাবস্যার গভীর রাত্রে সে শ্মশানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেইখানেই বসিয়া সে গাঁজা খায় আর সুন্দরের প্রতীক্ষা করে।

তাহার বিশ্বাস, সুন্দর আসিবেই!

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পুরুষস্য ভাগ্যম্

বিরাজলাল বি.এ. পাশ করিয়া পল্লীগ্রামের একটা স্কুলে মাষ্টারী করিতেছিল। ল' পড়িবার বাসনা ছিল না। আইনের পথ যে শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর ছেলের ধ্রুব পথ, তা সে জানে ; সেই সঙ্গে সে আরো জানে, ধ্রুব-পথে ভবিষ্যৎ একান্ত অধ্রুব ; কাজেই ধ্রুব পথে অধ্রুব ভবিষ্যতের সন্ধানে বাহির হওয়া সে সমীচীন বুঝিল না। সে কাজটা ঠিক adventureও নয়, বরং rash ও negligent act হইবে।

এ্যাড্‌ভেঞ্চারের দিকে বিরাজলালের একটা ঝোঁক আছে ছেলেবেলা হইতে। যখন ছোট ছিল, পিসির কাছে পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প, তালপত্রের খাঁড়ার গল্প, পাতালপুরীর রাজকন্যার গল্প শুনিয়াছে ; তরুণ বয়সে কলিকাতার কলেজে পড়িতে দু চারি খানা মাসিক-পত্রে হালের বিচিত্র গল্পও পড়িয়াছে। কাজেই...। কিন্তু এগ্‌জামিনের তাড়া, দারিদ্র্য আর মুরুব্বিহীন সংসারের ধান্দা—এমনি কারণে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের সন্ধানে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার সুযোগ কখনো ঘটে নাই।

আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়—এতদিন পড়ার আড়ালে সে অস্বচ্ছলতা কোনো বিভীষিকা জাগাইতে পারে নাই। আজ বি.এ. পাশ করিবার পর সে আড়াল ঘুচিলে বিরাজলাল স্পষ্ট দেখিল, সামনে জীবনের পথ শাহারা মরুর মত ধূ-ধূ করিতেছে! যতদূর লক্ষ্য হয়, ওয়েসিশের শ্যামল ছায়ার চিহ্নও নাই!

দাঁড়াইয়া থাকিলেও চলে না ; কাজেই মাষ্টারি লইতে হইল। কলেজে সেক্সপীয়ার শেলি পড়িবার সময় জীবনের বহু ছবি মনে জাগিত। সে ছবি প্রেম-স্নেহ-আরাম-বিরামের বিচিত্র বর্ণে রঙীন্। আশ-পাশের দু-চারিটা ঘরও যে নজরে পড়ে নাই, এমন নয়! কাজেই তার চিত্ত ঐ রঙের পিপাসায় ক্ষণে-ক্ষণে আকুল হইত!

আকুল হইলেও কূলের কোনো হদিশ্ পাইতেছিল না। বন্যা-রিলিফ, সেবা-মিশন, খাদি-বিক্রয় প্রভৃতি পুণ্য ব্রত গ্রহণের কথাও মনে উদয় হইত। কিন্তু সে কাজে উত্তেজনা কৈ ? তাছাড়া রঙীন্ ভবিষ্যতের পথ ওদিকে মোড় ফিরিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

মা বলিতেন—বি-এ পাশ করলি তো, এবার বিয়ে করে একটি টুকটুকে বৌ আন্।

বিরাজ জবাব দিত,—নিজের চিন্তাতেই আকুল হয়ে আছি, এর উপর বৌ! অমন সাধ মনের কোণেও এনো না মা!

মা কহিলেন—কি যে তোর গোঁ, কিছু বুঝি না। সবাই বিয়ে করচে...

বিরাজ কহিল—বিয়ে করলে দুঃখ বাড়বে বৈ ছাড়বে না।

মা কহিলেন—আমাদের শাস্তরে বলে, বৌ লক্ষ্মী...বিয়ে করলে বৌয়ের পয়ে, দেখিস্ রে তোর ভাগ্য ফিরবে।

বিরাজ কহিল—বৌ অপয় নিয়েও আসতে পারে। তোমরাই তো বলো,—বিশুমামার সব গেল তাঁর বৌয়ের পয় নেই বলে !...

মা সে কথা কানে না তুলিয়া কহিলেন—তোর যত সৃষ্টিছাড়া কথা ! ভালো কথা তো কইতে শিখ্‌লি না। আমি মেয়ে দেখে ঠিক করেছিলুম। হেলুর এক শালী আছে...হেলুর শ্বশুর কোন্ আপিসে চাকরি করে...

বিরাজ কহিল—বিয়ে আমি করবো না, মা। একা বেশ আছি ! আমার মনের বাসনা হচ্ছে, পৃথিবী ঘুরবো—চীন, জাপান, মায় উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু অবধি। ঘুরে জগতে একটা কীর্ত্তি রাখবো যে কীর্ত্তি কোনো বাঙালী কোনো দিন অর্জন করতে পারেনি। রোজগার করে পয়সা আমি জমাতে চাই। সেই পয়সায় ভূ-প্রদক্ষিণ হবে।

মা কহিলেন—বড় ভালো কথা ! বাড়ী ঘর ছেড়ে টো-টো করে ঘোরা। শেষে সেদেশ থেকে একটা ম্যাথরাণী কি ঝাড়ুদার্নী বিয়ে করে ফিরে এসো আর কি !

হাসিয়া বিরাজ কহিল তুমি পাগল হয়েচো মা ! বিয়ে আমি করবোই না। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলবো বিয়ে করে, এমন নিরেট আমি নই !...

সন্ধ্যায় লাইব্রেরীতে গিয়া নিত্যকার মত খবরের কাগজ টানিয়া বিরাজ চাকরি-খালির বিজ্ঞাপনের পাতায় চক্ষু বুলাইতে বসিল। দেশের নানা খবর জানার পূর্ব্বে এ খবরেই তার বেশী অনুরাগ। কত বিজ্ঞাপনই যে নিত্য পড়ে ! বিজ্ঞাপনের ধাঁচ্ তার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। ধারা একই !

—বি-এ পাশ শিক্ষক চাই। ওলকচুয়া হাই ইংলিশ স্কুল। বেতন মাসে পঁচিশ টাকা। টুইশন দু-একটি মিলিতে পার।

—ল-এজেন্ট চাই। বেতন মাসে পনেরো টাকা। দু'হাজার টাকা নগদ জামিন। রায় হরবল্লভ এষ্টেট্ ; দশাননপুর।

—পাঁচটি ছেলের জন্য প্রাইভেট টিউটর চাই। বেতন মাসে পাঁচ টাকা—এক বেলার আহার অমনি মিলিবে। শিক্ষকের শরীর বলিষ্ঠ—হওয়া দরকার। নিত্য সকালে বিকালে ছেলেদের শরীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন—শ্রীপতিরাম বক্সী, উকিল, হাতীমারা, জিলা ফরিদপুর।—

বিরাজ ভাবিল, পাঁচ টাকায় টিউটর চায় ! পড়ানো, তার উপর আবার শরীর-চর্চ্চা ! একবেলা আহা ! ওঃ, বাসন মাজতে হবে না ? ইচ্ছা হয়, মুষ্ট্যাঘাতে গার্জ্জেন পতিরামের অবধি শরীর দুরমুস্ করে দিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া তার বুক একেবারে অন্ধকারে ভরিয়া গেল। দেশের লোকের কাছে দেশের লোকের এই তো দাম ! আর বিদেশী যদি সে কথা তোলে, পিত্ত অমনি জ্বলিয়া ওঠে। রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে সে আর একটা কাগজ উল্টাইল। এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। বিজ্ঞাপনটি ইংরাজ ভাষায়। অর্থ এই—একটি তীক্ষ্ণধী চতুর যুবার প্রয়োজন। হৃদয়-বৃত্তি-সমস্যার সমাধানে তৎপর সাহিত্য-রসিকের আবেদনই শুধু গ্রাহ্য হইবে। বেতন যথোপযুক্ত দিতে রাজী। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। 'কথাশিল্পী' কেয়ার-অব্ এডিটর 'থাণ্ডার'।

বিজ্ঞাপনটি বিরাজ পাঁচ-সাতবার পড়িল। পড়িয়া, আর যারা বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল, তাদের পানে চাহিল। তারা তখন নোয়াখালির কোন্ পুলিশ-দারোগার গোরু চুরির বিবরণ লইয়া তর্ক-যুদ্ধে মাতিয়াছে। শাণিত বচন-শরে পরস্পরকে জর্জ্জরিত

করিবার প্রয়াসে সব মরিয়া ! চমৎকার সুযোগ ! বিরাজ এ-সুযোগ উপেক্ষা করিল না ; তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনটুকু ছিঁড়িয়া পকেটস্থ করিয়া সরিয়া পড়িল।

সরিয়া সে আসিয়া বসিল নদীর ধারে। ও-পারে গাছপালার মাথায় নিবিড় অন্ধকার। কালো জলে ছলছল রাগিণী ! বিরাজ বসিয়া ভাবিতেছিল,—কি কাজ ? কেরাণীগিরি ? বোধ হয়, না। হৃদয় বৃত্তির তাহাতে কি দরকার ? তা ছাড়া ঐ সাহিত্য-রসিক বিশেষণ ! নিশ্চয় কোন কাগজের সাব-এডিটর ! নয়তো কোনো পাকা পাবলিশার বিলাতী নভেলের তর্জ্জমার কাজে লোক চায় ! বাড়ী ফিরিয়া কাগজ-কলম লইয়া 'খাণ্ডার' সম্পাদকের কেয়ারে 'কথাশিল্পী'র নামে সে দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল। পরের দিন সে দরখাস্ত ডাকে দিল।

এক সপ্তাহ পরে উত্তর আসিল।

—মহাশয়, এই পত্র-সমেত যত শীঘ্র সম্ভব আমার সহিত ১৭২ ফুলতলা রোড বহুবাজারে দেখা করিবেন। সাক্ষাতে সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে। আপনার গাড়ী-ভাড়া বাবদ স্বতন্ত্র মণি-অর্ডার যোগে-পাঁচটি টাকা পাঠাইলাম। শ্রীজয়গোপাল হালদার।

আনন্দের আতিশয্যে বিরাজের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জয়গোপাল। জয় গোপালই বটে ! এই গোপালকে অবলম্বন করিয়া জীবনের পথে তার জয়-যাত্রাও সুরু হোক !...

বিরাজ ডাকিল—মা—

মা রান্নাঘরে ঝোল সাঁতলাইতেছিলেন, কহিলেন,—কেন রে ?

বিরাজ কহিল, আমি চান করতে চললুম। তোমার রান্না যা হয়েচে, চট্ করে তাই ধরে দাও। এই ট্রেণে এখনি আমায় কলকাতায় যেতে হবে।

মা বিরক্তি-ভরা স্বরে কহিলেন—তুই জ্বালাস্ নে, বাপু !...

বিরাজ শিশি হইতে হাতে তেল ঢালিয়া কহিল,—চাকরি মা, চাকরি ! বুঝি, প্রভু জয়-গোপালজী দয়া করলেন। দেরী নয়। এই দশটা বারোর ট্রেণেই যাবো।...

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া ন'টা বাজিল।...

কাঁধে গামছা ফেলিয়া বিরাজ চলিল পুকুরে স্নান করিতে।

২

বহুবাজার ১৭নং ফুলতলা রোড খুঁজিয়া পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। চাঁপাতলার একটু দক্ষিণে এক সরু গলি। রোড হইল কি করিয়া—তা লইয়া ঐতিহাসিক রীতিমত গবেষণা করিতে পারেন। ১৭ নম্বরে মেশ। এখানে জয়গোপাল হালদারের সন্ধানও মিলিল। দোতলার ঘরে একখানা রং-চটা চেয়ারে বসিয়া আছে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর। সামনে ক্যাম্প-টেবিলের উপর এক তাড়া কাগজ। জয়গোপাল নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছিল। ঘরের একধারে একখানা তক্তাপোষ, তার ও-পাশে একটা বেতের শেল্ফ্। শেল্ফে রাজ্যের পুরানো ম্যাগাজিন, আর বাঙলা মাসিকপত্র—একেবারে আণ্ডিল জমিয়া আছে।

বিরাজলাল সবিনয়ে কহিল—জয়গোপাল বাবু কোন্ ঘরে থাকেন ?

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া কহিল—আমার নাম জয়গোপাল।

বিরাজ খুশী-মনে কহিল,—আমি শ্রীবিরাজলাল গঙ্গোপাধ্যায়। আপনি আসবার জন্য লিখেছিলেন...

জয়গোপাল কহিল,—ও...হ্যাঁ। বসুন ঐ তক্তাপোষে।

বিরাজ বসিল। জয়গোপাল তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘড়িওয়ালা যেমন করিয়া ঘড়ির কলকব্জা দেখে, তেমনি ভাবে! বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবার পর কহিল,—এখানকার পথ-ঘাট জানা আছে?

বিরাজ কহিল,—বউবাজারের তো?

জয়গোপাল কহিল—না। কলকাতার।

বিরাজ কহিল—মোটামুটি রাস্তাগুলো জানি।

—লেকের দিকটা?

—জানি। আমি বি.এ পাশ করেচি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে। লেকের দিকে প্রায় বেড়াতে যেতুম। তখনো সব রাস্তা তৈরী হয়নি।

—গড়িয়া-হাটের পথ জানা আছে?

—গড়িয়া-হাট জানি।

জয়গোপাল কিছুক্ষণ কি ভাবি, পরে কহিল,—কাজ যা করতে হবে, তাতে বুদ্ধির দরকার। আর সে কাজ খুব গোপনীয়।

বিরাজ কহিল,—বুদ্ধির গর্ব্ব করা শোভন হবে না। তবু বলতে পারি, আমি নির্ব্বোধ নই। আর কথা গোপন রাখা? যখন চাকরি করতে এসেচি, তখন ও আদেশ পালন করতেই হবে!

—বেশ। বলিয়া জয়গোপাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর কহিল,—বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন?

বিরাজ কহিল,—কিছু কিছু করি। মানে, পড়ি।

কহিল—প্রলয়কুমার হালদারের লেখা পড়েচেন?

বিরাজ কহিল—আজ্ঞে, না। তবে নাম শুনেচি। লেখা পড়া হয়নি। তার কারণ, বি-এতে স্যান্‌স্‌কৃট ছিল, তার ব্যাকরণ-সন্ধি-সমাস নিয়ে বিব্রত ছিলুম। পাশ করে দেশেই আছি। সেখানে লাইব্রেরী আছে; তবে তাতে হালে লেখকদের বই পাওয়া যায় না। বাঙলা সাহিত্যে আমার অনুরাগ আছে।

বিরাজকে আর একবার লক্ষ্য করিয়া জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা, বই দেবো, পড়ে নেবেন। মানে, আমিই লেখক প্রলয়কুমার। ছোট গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি। তবে জয়গোপাল-নামে লেখা ছাপ্‌লে পাঠক পাঠিকার চিত্ত পাছে বিরূপ হয়, এই ভেবেই প্রলয়কুমারের নামে ছাপাই।

কথাটা বলিতে বলিতে জয়গোপাল উঠিয়া এক তাড়া মাসিক-পত্র আনিয়া বিরাজের সামনে রাখিয়া কহিল—পড়ে দেখবেন। অর্থাৎ কাজ করুন। হাত-খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা পাবেন। তার পর কাজটি করে দিতে পারলে নগদ এক হাজার টাকা মিলবে। লেখাপড়া করাতে চান, ষ্ট্যাম্প-কাগজে? করাতে পারেন। উকিল-খরচ আমি দেবো।

বিরাজের বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। এই তো গলির মোড়ে জীর্ণ ঘর, আর ঐ আসবাব! একখানা তক্তাপোষ, একটা টেবিল, আর ঐ পুরোনো ম্যাগাজিনের বস্তা! অথচ

টাকার লম্বা বহর ! ব্যাপার কি ? উইল জাল ? না এমনি কোনো রকম গভীর ফন্দি আছে ? ধরা পড়ার ভয়ে তাকে দিয়া সারিতে চায় ?

জয়গোপাল কহিল, কাজটা কি, বলি। কিন্তু তার আগে ভালো কথা, চাকরি নিতে রাজী আছেন তো ?

বিরাজ কহিল—কাজটাকে, না শুনলে—

জয়গোপাল হাসিল, হাসিয়া কহিল—ভয় নেই। জালজুচ্চুরি নয়। কাজ ভালো। তবে বুদ্ধি সাফ হওয়া চাই, মায় বাঙলা সাহিত্যে একটু জ্ঞানও সেই সঙ্গে। আপনার যখন বি.এ-তে সান্‌স্‌কৃট্‌ ছিল, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে চলে যাবে। আমার বই পড়লেই up to-date হবেন। তবে কাজের কথার আগে কিছু খান। বেলা চারটে বেজেছে। বলিয়া সে হাঁকিল—সুখন—

সুখন ভৃত্য আসিল। জয়গোপাল কহিল,—এক পো লুচি, আধ-পো আলুর দম, আর চার আনার রসগোল্লা চট্‌ করে নিয়ে আয় দিকিনি। মাংস ? আপনি মাংস খান, নিশ্চয় ?...আচ্ছা, একটু কোর্ম্মাও অমনি আনবি। যা, চট্‌ করে। যাবি আর আসবি।

সুখন চলিয়া গেল।

জয়গোপাল কহিল—হ্যাঁ, এবার কাজের কথা বলি। আমাদের একখানা মাসিক পত্র আছে,—"চাঁদোয়া"। সেই কাগজে আমি লিখি গল্প আর উপন্যাস। সম্পাদক আমিই।

এই অবধি বলিয়া জয়গোপাল চুপ করিল। তারপর একবার চকিতের জন্য বাহিরের মুক্ত আকাশে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল,—যা বলবো, খুব গোপনীয় কথা। কখনো প্রকাশ না হয়।

বিরাজের কৌতুহল জাগিয়াছিল অপরিসীম। সে কহিল না, প্রকাশ হবে না।

জয়গোপাল কহিল—'চাঁদোয়া' কাগজে কবিতা লিখতেন এক মহিলা। তাঁর নাম শ্রীমতী নীলিমা দেবী। চমৎকার কবিতা—নিরাশ প্রাণের নিশ্বাসে ভরপূর। আর সব কবিতায় এক সুর।...তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো বলে পত্রাঘাত করেছিলুম...তাঁর কবিতার স্তুতি-গান করে—অবশ্য বেনামীতে। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। সন্ধান নিয়ে জেনেচি, তিনি কুমারী, শিক্ষিতা এবং বয়সে তরুণী।...

বিরাজের দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। লভ্‌ ?

জয়গোপাল কহিল—আমার নিজের উপর বিশ্বাস আছে প্রচুর। সাহিত্যে আমার শক্তি সামান্য নয়। এ বিশ্বাসও রাখি, আবার একদিন নোবেল প্রাইজ যদি এদেশে কেউ আনতে পারে তো সে আমিই আনবো—এই লেখার মারফৎ। বাঙলার কথা-সাহিত্যে যদি কেউ জীবন জাগিয়ে থাকে তো সে আমি, শ্রীমান প্রলয়কুমার। কথাসাহিত্যের যজ্ঞশালায় আমার এক একটি রচনা বেরিয়ে ছোটে যেন অশ্বমেধের অশ্ব ! কার সাধ্য, তাকে পরাজয় করে ? তাই আমি অপরাজেয় কথা শিল্পী...

উত্তেজনায় জয়গোপালের চোখে আগুনের হল্কা ফুটিয়া উঠিতেছিল ! কথাশিল্পী, নীলিমা দেবী...এ দুয়ে যোগ কোথায়, বিরাজ তাই ভাবিতেছিল।

জয়গোপাল কহিল—এ আমার কথা নয়। সুবিখ্যাত ক্রিটিক শ্রীযুক্ত ব্রীড়াময় বাবু ছাপার অক্ষরে লিখে দেছেন, এ কথা ! কিন্তু যাক্‌ ও কথা...আমি এই কথাশিল্পে নীলিমা দেবীর চিত্ত জয় করতে চাই। তাঁর ঠিকানা দেবো। নিজের মুখে নিজেকে প্রচার পুরুষ-সমাজে করতে পারি, কিন্তু মহিলা-সমাজে ?—ওঁদের মনের বাস্তব পরিচয় জানি

না। তাই আপনাকে আমার সাহিত্য প্রচার করতে হবে। সমাজে নয় ; নীলিমা দেবীর কাছে। উপায়ও আমি বলে দেবো...

বিরাজ জয়গোপালের পানে কুতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জয়গোপাল কহিল,—আমার লেখা তাঁকে শুনিয়ে পড়িয়ে—যেমন করে হোক, তাঁর চিত্তকে আমার প্রতি জাগ্রত উন্মুখ করে তুলতে হবে। তা হলে বিবাহে বাধা থাকবে না। এদেশে এখনো romanticism দেখা দেয়নি। নীলিমা দেবীর বাবা সারদা লাহিড়ী পয়সাওয়ালা জমিদার। ভারী একরোখা, কিন্তু কন্যাস্নেহে বিভোর। সম্প্রতি এই অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচেন—মেয়ের সঙ্গে। তাই বোধ হয়, নীলিমা দেবীর কবিতা আর পাই না। কাজেই...

সুখন খাবার লইয়া আসিল জয়গোপাল কহিল—খেয়ে নিন্। খেতে খেতে শুনবেন...

তাই হইল। জয়গোপাল কহিল—বুদ্ধিমান যুবা চেয়েছিলুম। ঐ স্বদেশী মন্ত্রে আপনিও দীক্ষা নিন্—এবং ওদের সঙ্গে সহকর্ম্মিতাসূত্রে মিশে আমার রচনার প্রতি...বুঝচেন ? আপাততঃ হাত-খরচার জন্য পঞ্চাশ টাকা নিন। যদি আমাদের বিবাহ ঘটাতে পারেন, তা হলে হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন।

বিরাজ দেখিল, মন্দ নয়। চাকরি মজার বটে ! রোমান্স আছে, এ্যাডভেঞ্চারও যে নাই, এমন নয় ! কিন্তু ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের মত বিশ্রী রহস্যে ভরা। ধনী গৃহস্বামী খুন হইয়া পড়িয়া আছে—কোথাও এমন কিছু কাগজপত্র বা প্রমাণের চিহ্ন নাই, যা ধরিয়া সমস্যার সমাধান হয়।

পরক্ষণে মনে হইল, তবু সে উপন্যাস পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের জের টানিয়া ঘনীভূত রহস্যের অন্ধকার ভেদ করিয়া বিরাট কলেবরে ফুলিয়া ফাঁপিয়া অতিকায় হইয়া ওঠে তো ! এবং শেষের পরিচ্ছেদে ঘরের পাশেই হত্যাকারী ধরা পড়িয়া যায় ! এও তেমনি... !

জয়গোপাল কহিল,—বড়বাজারে পিকেটিংয়ের ব্যাপারে সেদিন অনেকগুলি মেয়ে ধরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে নীলিমা দেবীও ছিলেন। শুনে আমি কোর্টে গেছলুম, কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলুম না, পুলিশ বললে, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েচে সেই মানিকতলার ওধারে এক মাঠের ধারে।...

বিরাজ জয়গোপালের পানে চাহিয়া রহিল, কোনো কথা বলিল না।

জয়গোপাল কহিল,—আজই মাথা খাটিয়ে উপায় ঠিক করে ফেলবো। আপাতত আমার বইগুলো পড়ে দেখুন।

৩

নীলিমা দেবীর ঠিকানা লইয়া, পরের দিন সকালে বিরাজ তাঁর বাড়ী দেখিয়া আসিল। প্রকাণ্ড বাড়ী...পুরানো, সামনে একটু বাগান। দোতালায় তরুণী-কণ্ঠে গান চলিয়াছিল,—

ভোরের পাখী জেগে কহে
আজ কি আশার বাণী !
ওই বাণীর সুরে ভরে নে তোর
জীর্ণ পরাণখানি !

থাকে। গাড়ী-ঘোড়ার সংখ্যা আগের চেয়ে এখন বাড়িয়াছে। আর 'মহালক্ষ্মী বাস্ সার্ভিসে'র যাত্রী-বোঝাই বড় বড় মোটর গাড়ীগুলোর যাতায়াতের বিরাম নাই। বারোখানা গাড়ী তাহাদের প্রভাতের পূর্ব্ব হইতে রাত্রি এগারটা বারোটা পর্য্যন্ত এই রাস্তার উপর দিয়া ক্রমাগত যাওয়া-আসা করে।

দীননাথের বয়সও পঞ্চাশের উপরে উঠিয়াছে। তবু তাহার যাওয়া-আসা এখনও ঠিক তেম্‌নি। হাট রামপুরের বাজারে আজ যাত্রা-গান হইবে, মহালক্ষ্মীর সব বাসগুলা বোঝাই হইয়া আজ শুধু সাজের বাক্স গেল। পানিহাটির হাটে নাকি আজ গঙ্গার টাট্‌কা ইলিশের দাম—বারো আনা জোড়া। 'মহালক্ষ্মী' ছাড়াও নাকি আর একটা নূতন কোম্পানীর 'বাস' কাল হইতে এই লাইনে চলিবে। তাহাদের বাস্‌গুলো নাকি মহালক্ষ্মীর চেয়েও ভালো,—দেখিতে ঠিক রূপার মত ঝক ঝক করে।

ইহা ছাড়া কলিকাতা সহরটা আগে ছিল অত্যন্ত দূর। এখন এই 'বাসের' কল্যাণে সেখানকার খবরও রোজ দুবেলা পাওয়া যায় সেখানে নাকি বিদেশী কাপড় কেনা-বেচা একদম বন্ধ হইয়া গেছে। মেয়েরাও নাকি দলে দলে জেলে যাইতেছে। স্বরাজ পাইতে আর দেরি নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুন্দর সিং হাসিয়া বলে, 'স্বরাজ যখন হবে, তখন আমরা মরে যাব। কি বল দীননাথ। ছেলেমেয়েও একটা যদি থাক্‌তো ত' দেখতে পেতো।'

বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে 'ডিসট্যান্ট সিগন্যাল্‌টার পানে তাকাইয়া বোধ করি সে ছেলে-মেয়ের কথাই ভাবিতে লাগিল।

দীননাথও বলিল, 'তোমারও যা, আমারও তাই। একটা মেয়ে তারও একটা ছেলে হলো না! মেয়ে একটা হয়েছে বছর তিনেকের, তাও সেটা মরে কি বাঁচে, ঠিক নেই।'

স্বরাজ দেখিবার জন্য তাহার মেয়ের মেয়ে বাঁচুক আর মরুক তাহাতে কিছু আসে যায় না, যাহার জন্য আসে যায়, তাহারই হইল একদিন জ্বর।

বর্ষাকাল। পুকুর-ডোবা সব কানায় কানায় ভর্ত্তি। এখন আর জালি টানিয়া মাছ ধরিবার উপায় নাই। ধানের ক্ষেতে, নালার মুখে, ছোট ছোট ভাঙ্গনের আড়ায় 'আড়ি' পাতিয়া টগর মাছ ধরিতেছিল প্রচুর। গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্ন গ্রামেও মাছ বেছিয়া পয়সা আনিতে ছিল। পয়সার লোভে দিনে দু' তিনবার করিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতেও সে কসুর করিত না।

দীননাথ বলিত, 'অত ভিজিস্‌নে টগর, অসুখে পড়বি।' টগর হাসিয়া বলিত, 'তুই চুপ কর্ মিনষে, কেয়টের মেয়ে, জলে ভিজলে কিছু হয় না আমাদের।'

কিন্তু শেষে দীননাথের কথাই সত্য হইল। কেয়টের মেয়ে বলিয়া সে রক্ষা পাইল না। দিন কতক পরেই জ্বরে পড়িল।

জ্বরে, তাহার না হইল চিকিৎসা, না হইল সেবা যত্ন! সঞ্চিত যে-কয়টী টাকা তাহার ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া দীননাথ চাল-ডাল আনিয়া নিজেই দু'বেলা রাঁধিয়া খাইতে লাগিল। অবশেষে দিন চার-পাঁচ পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় টগরের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখ দিয়া কথা সরিল না, শুধু সেই স্তিমিত প্রদীপের আলোয় জরাজীর্ণ তাহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে আয়ত দুইটি সজল চক্ষের সকরুণ দৃষ্টি মেলিয়া দীননাথের মুখের পানে তাকাইয়া বারে বারে কি যেন সে বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বলিতে না পারিয়া বার কতক জোরে জোরে নিশ্বাস টানিল, বারকতক খাপচি খাইল ; তাহার পর ধীরে ধীরে

সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল।

রাত্রি তখন কত হইবে, কে জানে। বাহিরে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বাদল নামিয়াছে। চোখের জলে দীননাথ ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না, দেখিবার চেষ্টাও করিল না, ভয় পাইয়া সে বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল না, টগরের মৃতদেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে এমন ভাবে কাঁদিতে সুরু করিল যে, চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিল যখন,—দেখিল, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, গাছে গাছে পাখী ডাকিতেছে।

বাড়ীতে না আছে কাঠ, না আছে কয়লা, মৃতদেহ সৎকারের কি ব্যবস্থা যে করিবে, কাহার দ্বারস্থ হইবে ভাবিতে ভাবিতে দীননাথ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ছাতাটি বগলে চাপিয়া লাঠি লইয়া সুন্দর সিং আসিতেছে।

দু'দিন সে তাহার কাছে যাইতে পারে নাই। আসিতেছে বোধ করি তাহারই সন্ধান লইতে।

কিন্তু এমন বিপদে যেন শত্রুও না পড়ে।

টগর যে এমন করিয়া মারিয়া তাহাকে একেবারে পথে বসাইয়া যাইবে, দীননাথ তাহা একটি দিনের জন্যও ভাবিতে পারে নাই। স্ত্রী মরিল, একটি মাত্র মেয়ে তাহার, তাহাকেও সে মরিবার সময় একটিবার চোখের দেখা দেখিতে পাইল না। ষ্টেশনের একটা খালাসীকে দিয়া সুন্দর সিং মেয়ের কাছে সংবাদ পাঠাইল। বলিতে দীননাথের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, তবু সে খালাসীটাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, খবর পেয়ে বগলা যেন এখানে আর না আসে। বলিয়া সে হো হো করিয়া কাঁদিতে লাগিল। —'এসে কি করবি মা!'

তাহার নিজেই এখানে না আছে আহারের সংস্থান, না সংগ্রহের সঙ্গতি!

দীননাথের জ্ঞাতি-কুটুম্ব, গ্রামের লোক এই বিপদের দিনে কেহ তাহার কিছু করিল না। সকলেই বলিতে লাগিল—'গাঁজাখোর হতভাগার ঠিক হয়েছে।'

গাঁজাখোর বলিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য চুকাইল, কিন্তু আশ্রয় দিল তাহাকে আর-এক গাঁজাখোর।—বিদেশী হিন্দুস্থানী—সামান্য এক রেলওয়ে ষ্টেশনের ফটক-রক্ষী, ব্রাহ্মণ সুন্দর সিং।

গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক দীননাথের একরকম উঠিয়াই গেল। সুন্দর সিং-এর কাছেই থাকে, তাহারই কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়, সেইখানেই খায়, সেইখানেই শোয়, সুখ-দুঃখের গল্প করে।

গ্রামে তাহার সামান্য যে কুঁড়েখানি ছিল, সেখানি এখন রাজ্যের যত কুকুরের আড্ডা।

দীননাথ বলে, 'হোক্। ও-বাড়ীতে আমি আর ঢুকতে পারব না সিংজি। আমার এবার মরণ হলেই বাঁচি।'

কিন্তু মৃত্যু যে চায়, তাহার মৃত্যু বোধ করি সহজে হয় না।

সেই বৎসরেরই শেষে একদিন সংবাদ পাইল—বগলা মরিয়াছে। ভালই হইয়াছে।

দীননাথের চোখ দিয়া এক ফোঁটা জলও পড়িল না।

বলিল, 'দ্যাখ মজা! আমি রইলাম বেঁচে।'

সুন্দর সিং-এর শরীরটাও কিছুদিন হইতে ভাল চলিতে ছিল না, বলিল, 'আমিও আর বেশীদিন বাঁচব না ভাই, আমারও কেমন যেন মনে হচ্ছে।'

কথাটা দীননাথের বুকে গিয়া ধ্বক্ করিয়া বাজিল।

বলিল, 'হ্যাঁ, তুমিও চলে যাও, আমি একাই বেঁচে থাকি।'

সেদিন রাত্রে দীননাথের কি মনে হইল, হঠাৎ সুন্দরের কাছে রুক্মিণীর কথাটা নিজে হইতেই পাড়িয়া বসিল। বলিল, 'আহা, আসুক একবার। শেষ বয়সটা কাছে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করুক। নিয়ে এসো। আনতে হবে না। চিঠি লিখলেই হয়ত চালে আসবে।'

সুন্দর হাসিল। সে বড় করুণ হাসি। মুখে কিছুই বলিতে বোধ হয় পারিল না।

দীননাথ আবার বলিল, 'আনবে না সিংজি ? কি ভাবছ ?'

সুন্দর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

ইহার উত্তরে দীননাথ কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে। সাড়ে-বারোটার পর আর ট্রেণ নাই। 'বাস' চলাচলও থামিয়াছে। আবার সেই শেষ রাত্রে সাড়ে-তিনটেই ট্রেণ। এই সময়টুকু তাহাদের ঘুমাইবার সময়।

দীননাথ ঘুমাইয়াছিল কিন্তু সুন্দরের চোখে সেদিন আর ঘুম আসিল না। রাস্তার ধারে গাছগুলোর উপর জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সুন্দর তাহার সেই ছোট্ট ঘরখানির একপাশে বিছানায় শুইয়া শুইয়া জানালার পথে সুদূর আকাশের সেই শুভ্র জ্যোৎস্নার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া বোধ করি তাহার রুক্মিণীর কথাই ভাবিতেছিল।

সাড়ে-তিনটা বাজিতে আর দেরি নাই। ষ্টেশনে টিকিটের ঘন্টা পড়িল। ডিসটেন্ট সিগনাল ফেলিবার তারের শব্দ ঝন্ ঝন্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারই জানালার পাশ দিয়া পার হইয়া গেল। সুন্দরের আর শুইয়া থাকিবার উপায় নাই। উঠিয়া বসিয়া সে তাহার সবুজ বাতি জ্বালিল।

ট্রেণ পার করিয়া ফিরিয়া আসিতেই দেখিল, গাড়ীর শব্দে দীননাথের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

সুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, 'জাগলে নাকি ?'

দীননাথ বলিল, 'হুঁ।'

সাড়ে-তিনটার গাড়ীর শব্দে জাগা তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে। এই সময়ে জাগিয়া আর তাহারা ঘুমায় না।

বাতিটি নিবাইয়া দিয়া সুন্দর তাহার বিছানায় গিয়া বসিতেই দীননাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাই তাকে না আনাই ঠিক করলে সিংজি, না ?'

সুন্দর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ভোলোনি এখনও ?'

দীননাথ জবাব দিল না।

সুন্দর বলিল, 'বৌ-এর ভালবাসা পেয়েছ দীননাথ, আমার দুঃখ তুমি বুঝবে না। ধর, তোমার স্ত্রীকে তুমি খুব ভালবাসতে ; এত ভালবাসতে যে, একদণ্ড চোখের আড়াল হ'লে মরে' যেতে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলে তোমার সেই স্ত্রী আর একজনকে ভালবাসে। স্বচক্ষে দেখলে। ভুলতে পার সে কথা ?'

বলিয়া কিয়ৎক্ষণ সে চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তাকে ভালবেসেই যদি সে সুখে থাকে তা থাকুক ভেবে তার কাছ থেকে আমি পালিয়ে গেলাম। দূরে গেলে ভেবে ছিলাম তাকে ভুলে যাব, কিন্তু ভুলতে তাকে আজও পারিনি। আজও তাকে আমি তেম্‌নি ভালবাসি। শুনে ছিলাম তার কষ্ট হয়েছে, তাই টাকা পাঠাই। সে টাকা সে নেয়, কিন্তু চিঠিপত্রও লেখে না আসতেও চায় না।—যাক্, সে সব অনেক কথা দীননাথ, বলতে গেলে সারাটা জীবনেও ফুরোবে না। আর ক'টা দিনই বা বাঁচব ! স্ত্রীর সেবা ভালবাসা না পেয়ে এতদিন যখন কাটিয়েছি, তখন আর বাকি ক'টা দিন কোন কষ্টই হবে না। তার কথা আমার কাছে

মুখে আর বোলো না ভাই।

বলিয়া সুন্দর সিং তাহার বুকের বোঝা অনেকখানি হালকা করিয়া দিয়া আবার জ্যোৎস্নালোকিত ধরিত্রীর পানে একাগ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিবশতই বোধ করি হঠাৎ এক সময় চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সুন্দর সিং বলিয়াছিল, 'ক'টা দিনই বা বাঁচব!'

সত্যই যে বাঁচিবে না, দীননাথ তখন বিশ্বাস করে নাই।

কিন্তু তাহার পরের মাসেই তিনটি দিন মাত্র জ্বরে ভুগিয়া 'রাম' নাম করিতে করিতে দিব্য সজ্ঞানে দীননাথকে কাছে ডাকিয়া কোমর হইতে তাহার সঞ্চিত দু'শ দশ টাকার তোড়াটি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটু হাসি হাসিয়া সুন্দর সিং বলিল, 'চললাম। রুক্মিণীকে একটা খবর দিও। আর ওই টাকা—' বলিয়া হাতড়াইয়া দীননাথের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে কি চমৎকার মৃত্যু!

এমনটি বোধ করি কেহ কখনও দেখে নাই।

কিন্তু টাকা সে কাহাকে দিয়া গেল? সুন্দর! সুন্দর! হায়, হায়, কে জবাব দিবে? সুন্দরের মৃতদেহ নিসাড়, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্?

দু'শ দশ টাকা নগদ!

এত টাকা একসঙ্গে দীননাথের তাহার জীবনে এই প্রথম পাইল। পাওয়া দূরের কথা, দেখিল এই প্রথম।

সে যাই হোক, এ-টাকা সুন্দর হয়ত রাখিয়াছিল তাহার রুক্মিণীর জন্য। সে যদি তাহার কাছে না থাকিত, হয়ত এ-টাকা সে মারিবার আগে তাহাকেই পাঠাইয়া দিত। সুন্দর হয়ত ভাবিয়াছে—সে মরিয়া গেলে এ থাকিবে কোথায়, করিবে কি, খাইবেই বা কেমন করিয়া, তাই সে তাহার সারাজীবনের যাহা কিছু সঞ্চয় মৃত্যুর মুহূর্ত্তে দয়া করিয়া তাহারই হাতে তুলিয়া দিয়া গেল। সত্যই কি সে তাহাকে দিয়া গেল? না, রুক্মিণীকে?

আসলে কিন্তু এ দু'শ টাকা রুক্মিণীরই পাওয়া উচিত। স্বামীর টাকার ভরসা স্ত্রী করিবে না ত করিবে কে?

আহা, বেচারী হয়ত কত কষ্টেই না দিন যাপন করিতেছে। মাসের শেষে হয়ত সে সুন্দর সিং-এর মণি-অর্ডারের জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। পাঠাইতে দু'দিন দেরি হইলে হয়ত তাহাকে উপবাস করিতে হয়।

দীননাথ ভাবিল, জীবনে তাহার যত কষ্টই হোক, সুন্দর সিং-এর টাকার সদ্ব্যবহার সে করিবে। তাহার মৃত্যুর এই নিদারুণ সংবাদটুকু শুধু নয়, সেই সঙ্গে এই টাকার তোড়াটিও সে নিজে গিয়া রুক্মিণীর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

নিজে তার জায়গায় চার-ছ' পয়সা গাঁজার খরচ, সে খরচ না হয় আনা-তিনকে,—এই সামান্য চার পাঁচ আনা পয়সা ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা করিয়া অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিবে না! না পারে উপবাস দিয়া পড়িয়া থাকিবে সেও ভালো, তবু এ-টাকা সে নিজে লইতে পারিবে না।

ষ্টেশনের দালানে লোহার যে ওজন করিবার যন্ত্রটা পড়িয়াছিল দীননাথ সারাদিন সেইখানে পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। কিছু খাইল না। কোথাও গেল না, কি যে করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

সঙ্গে যে গাঁজাটুকু ছিল, তাহাই খাইবার জন্য বৈকালে দীননাথ সেখান হইতে উঠিয়া

টলিতে টলিতে ফটকের দিকে চলিতে লাগিল।

ফটকের কাজ বন্ধ থাকিলে চলে না। ষ্টেশনের একজন খালাশী সেখানে কাজ করিতেছিল।

তাহাদের সে-ঘরখানি সেদিন খাঁ-খাঁ করিতেছে।

সুন্দর নাই। সুন্দর নাই। তাহারই সেই বন্ধু সুন্দর। তাহারই সেই সুখ-দুঃখের সহচর সুন্দর!...গত ত্রিশ বছর ধরিয়া যে এই ঘরখানি দখল করিয়া ছিল, একটি দিনের জন্যও যাহার সঙ্গছাড়া হয় নাই, একদিন যাহাকে না দেখিলে তাহার চলিত না, আজ তাহারই মৃতদেহ তাহারা শ্মশানে পুড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পরপারে আজ সে কোথায়! কোথায় সে সুন্দর! কোথায় সে সুন্দর!

দীননাথের বুকের ভিতরটা হু-হু করিয়া উঠিল। গাঁজার কলিকা আনিতে গিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সে আর নিজেকে কোনোপ্রকারে সামলাইতে পারিল না, টস্ টস্ করিয়া চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল এবং উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ আর রোধ করিতে না পারিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ছেলেমানুষের মত হো হো করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

তাহার কান্না শুনিয়া বিশু খালাসী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কেঁদো না দিনু, চুপ কর।'

বলিয়া সে তাহার গায়ে হাত দিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কান্নার বেগ একটু কমিয়া আসিলে দীননাথ নিজেই উঠিল, উঠিয়া ঘরের এককোণে সুন্দর সিং-এর কাঠের বাক্স হইতে রুক্মিণীর একখানি বেয়ারিং চিঠি আনিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, 'বিশু, তুমি হিন্দী লেখা পড়তে জানো, না? ঠিকানাটি পড় দেখি?'

চিঠিখানি খুলিয়া বিশু অতিকষ্টে বানান করিয়া করিয়া রুক্মিণীর ঠিকানা পড়িল। দোবারি গাঁও, ডাকঘর সাসারাম।

দীননাথ মাধবপুরের বাহিরে কোনোদিন কোথাও যায় নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'মোগলসরাই-এর কাছে সাসারাম ইষ্টিশন্ আছে, দোবারি ওইখানেই কাছাকাছি কোথাও হবে। কেন দীননাথ, তুমি যাবে নাকি সেখানে?'

দীননাথ সে কথার কোনো জবাব না দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গাঁজা টিপিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ একসময় মুখ তুলিয়া বলিল, 'দোবারি গাঁও। ইষ্টিশনের নাম কি বল্‌লে?'

'সাসারাম।'

দীনদয়াল দিয়াশলাই জ্বালিয়া টিকে ধরাইতে ধরাইতে 'সাসারাম' কথাটা বোধকরি মনে-মনে মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সাসারাম ষ্টেশনে নামিয়া দীননাথ অতি কষ্টে ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া সেই অপরিচিত বিদেশে বারে বারে পথ ভুলিয়া ভুলিয়া দোবারি গ্রামে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় বারোটা। মাথার উপর রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করিতেছে। পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। পুরা দুটি দিন এক রকম অনাহারে বলিলেই হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হিন্দুস্থানী গ্রাম। মাঝখানে সাদা ধূলার পথ। দু'পাশে খোলার খাপ্‌রায় বস্তি।

পথে যাহাকে দেখিতে পায়, দীননাথ তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে। কেহ-বা তাহার কথা বুঝিতে পারে না, কেহ বলে, রুক্মিণী বলিয়া কোনো মেয়ের সন্ধান তাহারা জানে না। সে হয়ত এ-গ্রামে নয়, হয়ত অন্য কোথাও।

কিন্তু গ্রামখানি ছোট। দেখিতে দেখিতে অদ্ভুত এই বিদেশী বাঙ্গালীকে দেখিবার জন্য দীননাথের আশেপাশে লোক জড়ো হইয়া গেল। পথের ধারে একজায়গায় কয়েকটি মেয়ে একটা ইন্দারা হইতে জল তুলিতেছিল। দীননাথ হাত পাতিয়া তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই দয়া করিয়া একটি মেয়ে তাহাকে জল খাওয়াইল।

জল খাইয়া একটু শান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া দীননাথ তাহাদেরই মধ্যে এক বৃদ্ধাকে কাছে ডাকিয়া এখানে তাহার আসিবার কারণ জানাইল। জানাইল সে আসিয়াছে—সুন্দর সিং-এর স্ত্রী রুক্মিণী দেবীর সহিত দেখা করিতে। দেখা তাহার না করিলেই নয়।

সুন্দর সিং-এর নাম করিতেই বৃদ্ধা চিনিল। হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিল, 'এসো।'

'এসো!' বলিয়া তাহার আগে আগে গ্রামের প্রান্তে ছোট একটি ঘরে গিয়া ঢুকিল। বলিল, 'তুমি হিঁয়াই ঠাহ্‌রো। এবং আরও বলিল, যে, সে নিজেও এককালে বাংলা-মুলুকে ছিল এবং সেইজন্যই বাঙ্গালা-ভাষা সে বুঝিতে পারে, বাঙ্গালীদের বড় ভালবাসে।

বুড়ী ঘরে ঢুকিয়া আর বাহির হয় না।

দীননাথ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না, দেওয়ালের গায়ে যে ছায়াটুকু পড়িয়াছিল, সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে লালরঙের ছাপা একখানা শাড়ী পরিয়া হিন্দুস্থানী স্বাস্থ্যবতী পরমাসুন্দরী এক যুবতী হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিল। পশ্চাতে সেই বৃদ্ধা।

দীননাথ দেখিল—এই রুক্মিণী! চমৎকার!

ইহাকেই সুন্দর সিং যদি কষ্ট দিয়া থাকে ত' অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। সুন্দরের মৃত্যু-সংবাদটা যে ইহার কাছে সে কেমন করিয়া বলিবে, কে জানে। হাঁ করিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দীননাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমিই রুক্মিণী?'

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

বুড়ী বলিল, 'নেহি।'

এ রুক্মিণী নয়, রুক্মিণীর মেয়ে।

দীননাথ অবাক্! মেয়ে কি রকম? সুন্দরের ছেলে-মেয়ে ত' কিছু হয় নাই!

তাহা হইলে সে ভুল করিয়াছে। এ-রুক্মিণী নয়। এ হয়ত অন্য কেউ।

এমন সময় তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া লোলচর্ম্ম এক বৃদ্ধা বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'মাধবপুর হইতে কে আসিয়াছে?'

বৃদ্ধার মুখে মাধবপুরের নাম শুনিয়া দীননাথ একটুখানি আশ্বস্ত হইল। বলিল, 'আমি এসেছি।'

যে বৃদ্ধা তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সে বলিল, 'রুক্মিণী এরই নাম।'

কিন্তু হায় হায়, তাহার মনের মধ্যে যে সুন্দরী রুক্মিণী ছিল, সত্যকারের রুক্মিণীকে দেখিয়া সে ধারণা তাহার নিমেষে টুটিয়া গেল।

রুক্মিণী চোখে ভাল দেখিতে পায় না। দীননাথের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রথমেই সে রীতিমত কটুকণ্ঠে নানা প্রশ্ন করিল, 'মিন্‌ষে টাকা পাঠায় নাই কেন? সেই গাঁজাখোর, লক্ষ্মীছাড়া?'

দীননাথ স্তব্ধ, নির্ব্বাক !

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রুক্মিণী দেবী ক্রমশঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সুন্দর সিং-এর চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া দিয়া সেই মৃত ব্রাহ্মণের উদ্দেশে, যে সব ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা হিন্দুস্থানী না হইলেও দীননাথ বুঝিতে পারিল।

ছি, ছি, ইহারাই জন্য সুন্দর এত কষ্ট করিয়াছে! ইহারই জন্য সে নিজে অনাহারে অনিদ্রায় এই বিদেশে-বিভূঁয়ে আসিয়া এত নির্য্যাতন সহ্য করিল!

দীননাথ হাতের ইসারা করিয়া বলিল, 'থাক্, আর না।'

'কেয়া?' বলিয়া রুক্মিণী হাততালি দিয়া রুখিয়া তাহাকে যেন মারিতে উঠিল। এবং তাহার নিজের ভাষায় যাহা বলিল তাহার ভাবর্থে এই যে, স্ত্রী তাহার ভালভাবে আছে কি না, গোপনে তাহাই দেখিবার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছে! লোকের মুখে মারি সাত ঝাঁটা! তার মুখে ত' মারিই! আহা, কি আমার গুণের সোয়ামী গো! তাকে বলিস্ গিয়ে, যে নাতির নাৎনী লইয়া সে বেশ সুখেই ঘরকন্না করিতেছে, গাঁজাখোর নচ্ছার সে পাজি বদমায়েসের তোয়াক্কা সে করে না। তাহাতে টাকা যদি সে না পাঠায় ত' না পাঠাইবে, তাহার টাকায় আমি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এক বৃদ্ধা এই বৃদ্ধার কাছে আগাইয়া আসিয়া কানে-কানে কি যেন বলিল, এবং বলিবামাত্র যাদুমন্ত্রের মত রুক্মিণী একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ চুপ করিল।

রুক্মিণী চুপ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বুড়ী দীননাথের কাছে আসিয়া মুখের কাছে হাত নাড়িয়া ধরিয়া ধরিয়া একটি একটি করিয়া বুঝাইয়া বলিল যে, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, রুক্মিণী তোমার যাওয়া-আসার গাড়ী ভাড়া দিবে, কিন্তু বাবা একটি কাজ তোমার না করিলেই নয়। ও বুড়ী হইয়াছে কিন্তু এখনও উহার বুদ্ধি হয় নাই। উহার ছেলেমেয়ে নাতি নাতনীর কথা কিছুই তুমি সুন্দরকে বলিতে পাইবে না। বলিবে, সে এক্‌লাই আছে, বড় দুঃখে আছে, এবং মাসে মাসে যেমন পাঠাইতেছে তেম্‌নি করিয়া টাকা যেন সে পাঠায়।

কথাটা তাহার তখনও শেষ নাই। রুক্মিণী অনেক চীৎকার করিয়া মাটিতে বসিয়া ছোট একটি ঢিল্ লইয়া ধূলার উপর আঁচড় কাটিতেছিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, 'নেহি। দশো রোপিয়ামে হোগা নেহি, পন্দরো রোপিয়া ভেজনে বোলো।'

কথাটা শুনিয়া দীননাথের সর্ব্বাঙ্গ রী রী করিয়া উঠিল। কাজ নাই আর সুন্দরের প্রণয়িণীকে দেখিয়া!

টাকা?

টাকার কথা মনে হইতেই দীননাথ হাসিল। ইহাকে টাকা দিয়া সুন্দর সিং-এর অপমান করিতে সে পারিবে না। টাকা সে যেখান হইতে আনিয়াছে, সেইখানেই ফিরাইয়া লইয়া যাইবে!

সুন্দরের মৃত্যু-সংবাদটি পর্য্যন্ত ইহাদের কাছে বলিতে তাহার ঘৃণাবোধ হইল।

না, সে মরে নাই।

এই সব অনাত্মীয় শত্রুর কাছে তাহার না মরাই ভালো। থাক, সে বাঁচিয়াই থাক!

ষ্টেশনে যাইবার জন্য দীননাথ উঠিল। কিন্তু বুড়ী মাগী তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। তাহাদের বিশ্বাস, সুন্দর সিং এতদিন পরে ইহাকে এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে

পাঠাইয়াছে। তাই সে গ্রামের বাহির পর্য্যন্ত দীননাথকে শুধু এই কথাই বলিতে বলিতে গেল, যে, সে যেন সুন্দর সিংকে রুক্মিণীর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীর সম্বন্ধে কিছু না বলে, এবং গিয়াই যেন টাকা পাঠাইয়া দেয়।

দীননাথ আবার মাধবপুর ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু সুন্দর সিংকে যে তাহার একান্ত প্রয়োজন।

তাহার দেওয়া টাকাগুলি যে কি করিবে, কোথায় রাখিবে, কাহাকে দিবে—সুন্দর আজ যদি তাহাকে না বলিয়া দেয়, সে নিরুপায়!

ওই টাকাই হইল তাহার কাল। ওই টাকাই হইল তাহার বোঝা।

দীননাথ আবার সেই ষ্টেশনের ওজন-যন্ত্রটার উপর শুইয়াছিল, ষ্টেশনমাষ্টার দয়া করিয়া বলিলেন, ফিরে এসেছ দীননাথ সারাদিন কিছু খাওনি বুঝি ?

দীননাথ বলিল, 'আজ্ঞে না।'

'কি করবে ভাবছ ?'

'আজ্ঞে, ও ফটকের কাজটি আমায় দিন।'

কিন্তু ফটকে তখন লোক বাহাল হইয়াছে। মাষ্টার মশাই বলিলেন, 'তা ত হয় না দীননাথ, লোক যে আমি রেখেছি। আচ্ছা, থাকো তুমি এইখানে ; তারপর দেখা যাবে।'

বলিয়া তিনি তাহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া তাঁহার বাসায় যাইতে বলিলেন।

চিঠিখানি মাষ্টার-মশাই-এর স্ত্রীর হাতে দিতেই তিনি অত্যন্ত যত্ন করিয়া দীননাথকে খাওয়াইতে বসাইলেন।

ভাত সে আজ চারদিন খায় নাই, চিঁড়া-মুড়ি খাইয়া দিন কাটাইয়াছে। ভাবিয়াছিল, ভাল করিয়া খাইবে। কিন্তু খাইতে বসাইয়া মাষ্টার মশাইয়ের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি করছ দীননাথ ?'

'কিছুই করছি না, মা'।

'কি করে' খাবে, ভেবেছ ?'

'ফটকের চাকরিটি ত' চাইলাম বাবুর কাছে। যদি পাই ত, ভালই, নইলে ট্রেণে-ট্রেণে ভিক্ষে করব মা। একটা পেট—তাতেই চলে যাবে।'

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, 'শুনলাম, তুমি সুন্দর সিং-এর বাড়ী গিয়েছিলে দীননাথ ?'

'হ্যাঁ মা, গিয়েছিলাম।'

'বৌ আছে শুনলাম। ছেলেমেয়ে ক'টি ?'

দীননাথ ভাতের গ্রাসটা গিলিয়া একটু থামিয়া বলিল, 'তা ঠিক জানি না মা, গেলাম আর চলে' এলাম।

'খবরটা শুনে বৌ খুব কাঁদছিল, না ? কাঁদবেই ত। কাঁদবে না।—ও কি দীননাথ! খাওয়া তোমার হয়ে গেল এরই মধ্যে ? কিছুই যে খেলে না।'

দীননাথের খাওয়া সত্যই হইল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জায়গাটা গোবর দিয়া পরিষ্কার করিল। সেখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

দীননাথের বিশ্বাস—মানুষ মরিলে ভূত হয় এবং ভূত হইয়া যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই ভূতের ভয়ে অন্ধকার দেখিলেই সে আঁৎকিয়া ওঠে। সেদিন সে ফটকের কাছে

খাশা গলা ! কে গাহিতেছে ? নীলিমা দেবী ? কে জানে ...

বিরাজ ভাবিল, প্রলয়ের এ কি বিচিত্র প্রণয়-সাধনা ! কাব্যে কি উপন্যাসেও এমন দেখা যায় না ! উপন্যাসের প্লটের অস্ত্রে নারীর চিত্ত জয় করিবে ! এমন কথা তার কল্পনার অগোচর ছিল। আর রাত্রে জয়গোপালের লেখা 'প্রণয়-টীকা' গল্পে অমনি অদ্ভুত কাণ্ড একটা দেখিয়াছে বটে ! কিন্তু সে গল্প। আর এ...

ফুলতলা রোডের মেশে ফিরিয়া রিপোর্ট সারিবার পর বিরাজ কহিল,—এ আমি ঠিক বুঝতে পারচি না ! তার চেয়ে আপনি ঘটক পাঠিয়ে প্রস্তাব করুন না !

জয়গোপাল কহিল,—ঘটক পাঠিয়েছিলুম। মেয়ে বিবাহ করতে চায় না। বলে, দেশে স্বরাজ আসার পূর্ব্বে ছোট সুখ, ছোট বিলাস আরামের চিন্তাও সে মনে স্থান দেবে না। তা ছাড়া বাপ পয়সাওয়ালা—হয়তো ব্যাঙ্কার পাত্র খোঁজে। কিন্তু পয়সার চেয়ে বড়-ধনে ধনী আমি তো বোঝে না !

বিরাজের চোখের সম্মুখ হইতে চরাচর লুপ্ত হইয়া গেল। ঐ পাশের বাড়ীর ছাদ, গলির ওধারকার ফুলুরির দোকান,—সব মস্ত একটা সাদা কাগজে সারা দুনিয়া যেন কে মুড়িয়া দিল ! সেই মোড়কের উপর বড় লাল হরফে শুধু লেখা আছে...স্বরাজ।

জয়গোপালের কথায় তার চেতনা ফিরিল। জয়গোপাল কহিল,—নীলিমা দেবীর কবিতা দেখবেন ?

একখানা পুরানো 'চাঁদোয়া' খুলিয়া জয়গোপাল কহিল,—পড়ুন...

বিরাজ পড়িল,—আমার মনের আঙিনাতে, পূর্ণিমার চমক্-রাতে আসতে বলি...

জয়গোপাল কহিল...দুটো গল্প চাঁদোয়ায় ছেপেচি। দুটোতেই নায়িকার নাম দিয়েচি, নীলিমা। সে-গল্পে ওই কবিতার বেমালুম পুরে দিয়েচি !

বিরাজের কাছে এ যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ! গল্প-উপন্যাস সে পড়ে—নিছক তার রস উপভোগের জন্য। কিন্তু তা বলিয়া এত বড় উদ্দেশ্য থাকে গল্পের পিছনে ! তার কেমন তাক লাগিয়া ছিল !

বিরাজ কহিল,—কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারচি না, দুম্ করে আপনার লেখার তারিফ সুরু করি কি-ভাবে ! গিয়ে নয় সামনে দাঁড়ালুম ! আলাপও না হয় কোনো মতে হলো...

জয়গোপাল কহিল,—সেইটি ভেবে স্থির করতে হবে ! অর্থাৎ এমন একট situation...যে, আমার গল্প ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা উঠতে পারে না !

বিরাজ ভাবিল, বই লইয়াই নীলিমার কাছে উপস্থিত হইবে। বলিবে, এই প্রলয়কুমারের লেখার ভারী তারিফ চলিয়াছে ! এ কথা বলিয়া বইও নয় গছাইয়া দিবে ?...কিন্তু তার পর ? কোন্ কথার ছলে আবার গিয়া ও-বাড়ীতে ঢুকিবে, সেই না মুস্কিল ! বিশেষ এ-যুগে সাহিত্যে প্রেম যখন অচল হইতে বসিয়াছে !

বৈকালে বিরাজ আবার গমনোদ্যত হইল। জয়গোপাল কহিল,—চললেন ?

—হ্যাঁ। একটা প্ল্যান স্থির করেচি।

—কি প্ল্যান ?

—ঐ মাসিকে গল্প পড়ছিলুম। বাসের ভাড়া ভোলা। তেমনি। ওঁদের বাড়ী গিয়ে বলবো, বাসের আনা-চারেক চাই। ধার ! আবার তো শোধ দিতে যাবো। বিরাজের দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল !

জয়গোপাল কহিল,—মন্দ হবে না। কিন্তু অভিনয়ে খুঁত না থাকে...

বিরাজ কহিল,—পকেটটা ছিঁড়ে তবে যাবো। ছেঁড়া পকেট দেখলে...

জয়গোপাল কহিল,—চেষ্টা করে দেখুন। কিন্তু তার চেয়ে...আচ্ছা, আমিও ভেবে দেখি।..

বিরাজ বাহিরে গেল।

একদালিয়া রোডে সেই বাড়ী।...সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর কোনো ঘরে আলো নাই। সব কোথায় চলিয়া গেছে নাকি ?...জেলে ? গা কাঁপিল।

কেহ নাই ? বিরাজ দাঁড়াইল। হাতে জয়গোপালের লেখা একগাদা বই। দৃষ্টি কিন্তু বাড়ীর পানে। বহুক্ষণ এমনি-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মন অধীর হয়, দেরী কিসের ? পা কিন্তু সরিতে চায় না। বুকও কাঁপিয়া ওঠে ! হঠাৎ পিছন ভোঁ-ও ! মোটরের হর্ণ। বিরাজ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু রক্ষা পাইল না, মাডগার্ডের ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল।...সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে একটা আর্ত্ত রব, রোখো, রোখো...

দুনিয়া আঁধারে ভরিয়া গেল। বিরাজ চক্ষু মুদিল। নিবিড় কালো অন্ধকার। তারপর যখন আবার চোখ চাহিল, তখন দেখে, ঘরের মধ্যে কোমল শয্যায় শুইয়া আছে। সামনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি কহিলেন,—এই যে, চোখ চেয়েছে। ডাক্তার এলো, নীল ?

মৃদু মধুর সুরে বীণা বাজিল—না, বাবা।

বিরাজ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

প্রৌঢ় বলিলেন,—বসো না। শুয়ে থাকো।

বিরাজ আবার চক্ষু মুদিল। কেমন আরাম বোধ হইতেছিল। স্বপ্নে ? বুঝি তাই।

ডাক্তার আসিলেন ; হাত-পা নাড়িয়া মুচড়াইয়া মহাধুম বাধাইয়া দিলেন। ব্যাণ্ডেজও বাঁধা হইল ; সঙ্গে সঙ্গে আদেশ,—নড়া হবে না।...

সকলে ডাক্তারের সঙ্গে বাহিরে গেলেন। বিরাজ আবার একা। ভাবিল, স্বপ্ন দেখাই চলিয়াছে ! কিন্তু মধুর স্বপ্ন ! চোখ চাহিতে ইচ্ছা হয় না ! চক্ষু মুদিয়া মনকে কল্পনার পাখায় চড়াইয়া দিল ! এমনি ভাসিয়া চলা, ভারী আরামের ! সারা জীবন যদি...আঃ। আবার সেই বীণার সুর কানের পাশে,—একটু দুধ খান্। বিরাজ চোখ চাহিল, সামনে দেবী-মূর্ত্তি। দেবী তরুণী, পরণে খদ্দর, ফিরোজা রঙের শাড়ী, ফুলদার—গায়ে সেই রঙের ব্লাউশ।

বিরাজ কহিল,—দিন..

দুধ নয় স্বর্গের সুধা ! নহিলে শরীরের সব গ্লানি এমন নিমেষে অদৃশ্য হয় !

দেবী বলিলেন, এমন ভয় হয়েছিল ! উঃ। ডাক্তারবাবু বললেন, চোট্ খুব সামান্য—শুনে তবে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। নতুন ড্রাইভার—যেন অন্ধ !

বিরাজের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। চোট্ সামান্য। তবে এখনি বিদায় লইতে হইবে ! আবার সেই নোংরা আবহাওয়ায় ? এ বেশ লাগিতেছিল।

তরুণী কহিল—আমাদের গাড়ীর আলোটাও খারাপ হয়েছিল। আর ফটকের ধারে বড় বটগাছ থাকায় গ্যাসের আলো আসে না তো। মোদ্দা, কি করছিলেন আপনি অন্ধকারে ফটকে দাঁড়িয়ে ?

বিরাজ ফ্যাল-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। এই উচ্ছ্বসিত রূপের সামনে মনিব

জয়গোপালের ঐ রচনার কথা তুলিতেও লজ্জা হইতেছিল। ভারী তো লেখা!

বিরাজ কোনো কথা কহিল না।

তরুণী কহিল—শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। ভালো কথা, আপনার বাড়ীর ঠিকানা? একটা খপর দি...তাঁরা কত ভাবচেন। আপনার আজ ফেরা হতে পারে না কিনা...

বিরাজ একটা নিশ্বাস ফেলিল—নিরুপায়ের বেদনার্ত্ত নিশ্বাস! যাইতে কি সে-ই চায়!

বিরাজ কহিল,—এখানে আমার কেউ নেই। খবর কাকে দেবেন!

কথাটা বলিয়া বিরাজ তরুণীর পানে চাহিল। তরুণী তারি পানে চাহিয়াছিল—রাজ্যের করুণা মাখানো দৃষ্টি! সে দৃষ্টির স্পর্শে বিরাজ একেবারে গলিয়া গেল।

প্রৌঢ় আসিলেন, কহিলেন—গায়ে খুব বেদনা? ও মা নীল, দে তুই এক ডোজ আর্ণিকা। হোমিওপ্যাথি ওষুধের শক্তি অসাধারণ।

তরুণী হাসিল, কহিল,—এই ব্যথায় এক ফোটা আর্ণিকা কি করবে, বাবা?

প্রৌঢ় কহিলেন,—তুই তো জানিস্ না মা, ওষুধের গুণ। ঐ এক ফোঁটায় বিশল্যকরণীর ফল পাওয়া যায়।

বিরাজ কহিল—না। আমি যেতে পারবো। দুই চোখ কপালে তুলিয়া প্রৌঢ় কহিলেন—পাগল! দু-চার দিন নড়া হবে না বাপু।

৪

সকালের হাওয়ায় হাসির বাণ ডাকিয়া ছিল। বিরাজের ঘরেই তরুণী বসিয়া ছিলেন।

বিরাজ কহিল—আপনার নাম নীলিমা দেবী! আপনার কবিতা চাঁদোয়ায় ছাপা হয়?

তরুণী তাচ্ছিল্যের ভাবে কহিল,—রাবিশ কবিতা। লেখা ছেড়ে দিয়েচি। দেশের এই দুর্দ্দিনে ও-সব মিথ্যা হা-হুতাশ কবিতার ছন্দে বাঁধা পাগলামি।

বিরাজ কহিল—কবিত্ব পাগলামি নয়।

নীলিমা কহিল—তা নয়। কিন্তু আমরা কাগজে যা ছাপি, তা পাগলামি। শুধু চাঁদ, তারা, ফুল, পাখী, চিত্তগগন, মন-বন এ-সব ছাড়া দুনিয়ায় আসল বস্তু আছে—যা জানা উচিত। মানুষের মনকে রূপ-যৌবনের পূজায় সঁপে দিলে মনকে দুর্ব্বল করা হয়। মনকে গড়া দরকার। দেশ, দরিদ্র, আর্ত্ত, আতুরদের সেবায় মনকে মহীয়ান করতে করতে হবে।

কথা শুনিয়া বিরাজের তাক্ লাগিয়া গেল! এ যেন স্বদেশীর অগ্নিতে প্রোজ্জ্বল যজ্ঞশালা!

তবু নিমকের কথা মনে জাগিতে ছিল। .মনিব জয়গোপালের নিমক! কি ফাঁকে সে কথা তোলা যায়?

কথায় কথায় নীলিমা কহিল,—আপনার সঙ্গে একটা বইয়ের প্যাকেট ছিল না? আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি প্যাকেট খুলে বইগুলো দেখেছি। প্রলয় হালদারের লেখা—ঐ চাঁদোয়ার সম্পাদক!

আশার আলোয় বিরাজের মন ঝলমল করিয়া উঠিল।

তরুণী কহিল—স্বভাব মানুষ ছাড়তে পারে না। পড়েচি তাই! ওঁর লেখা ভালো লাগে না। নারীকে শুধু আয়ত্ত করার কথা...যেন নারী পথের ধূলায় পড়ে আছে! পুরুষের পক্ষ ছাড়া তার আর কোথাও আশ্রয় নেই যেন! ছি...! নারীকে এ-ভাবে অপমান করার কল্পনা যারা করে, তাদের আমি অভদ্র, ইতর মনে করি! তাদের সঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত।

বিরাজের বুক ধ্বক করিয়া উঠিল। মনিবের লেখা, পড়িয়া সে কেমন হতভম্ব হইয়া ছিল...যত নায়িকা—পথে, ঘাটে নায়ক দেখিবামাত্র একেবারে পায়ের উপর লুটাইতে চায়। বাস্তবের সঙ্গে মিল কোথায়?—এমন ব্যাপার জীবনে সে কখনো দেখে নাই! মেশে সে-ও থাকিত...পাশের বাড়ীর মহিলারা গানও গাহিত। সে গান সে শুনিয়াছে—কিন্তু ঐ গল্পের মত...মেশের পানে মহিলা চাহিয়া থাকে, চোখে অধীর তৃষা বা গানের সুরে প্রাণের সাধ ভাসাইয়া দেওয়া—এ সব বাজে! নীলিমার মুখে এ-কথা শুনিয়া তার সে ভাবগুলা আবার শক্তি পাইয়া কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়াইতেছিল।

বিরাজ কহিল—গল্প তো লেখা চাই। কি নিয়ে সব লেখে, বলুন?

নীলিমা কহিল,—প্লটের ভাবনা কি! বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে আছে। মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি...নারীকে মানুষ বলে, বন্ধু বলে লেখা যায় না! প্রিয়া ছাড়া সংসারে মা-বোন-মেয়ে তো আছে।

বিরাজ তর্কের স্রোতে ভাসিয়া চলিল। মাথা তুলিবার তার সামর্থ্য রহিল না। অল্পপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে জীবনে সে কখনো মেশে নাই—বিশেষ এ তরুণী আবার বুদ্ধির স্ফুলিঙ্গ! তা ছাড়া সাহিত্য লইয়া আলোচনার অবসরও তার এমন করিয়া কোনো দিন মেলে নাই।

নীলিমা কি ভাবিল, তারপর কহিল—ছুটোছুটি করচি বটে, কিন্তু একটা কথা থেকে থেকে মনে জাগচে।

—কি?

নীলিমা কহিল,—দেশের সব দিক দৃষ্টি দেওয়া দরকার হয়েচে। যারা অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘুচোবার জন্য যুদ্ধ করচে, তাদের কাছে আশা রাখি না। ঐ যুদ্ধে তারা এমন ডুবে আছে যে দেশ বলে কোনো পদার্থ আছে, এ তাদের বোধ নেই, খেয়ালও নেই। কিন্তু যারা ধনী, অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রের যাদের সংস্থান আছে, কিম্বা যাদের মাথায় সংসার পাহাড়ের বোঝা তুলে ধরেনি, তাদের কথা বলচি।

বিরাজ নীলিমার পানে চাহিল! কি কথা?

—অশিক্ষা আর কুশিক্ষা—এ দুটো দূর করা চাই। এ-কাজের ভার নিন ধনী আর সংসার-নির্লিপ্তের দল। আরাম-বিলাসে ফতুর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মনকে এই সব বিষয়ে সচেতন করে তোলা চাই। এ কাজগুলোর ভার যদি আমরা হাতে নিতে পারি...বাবা এ আইডিয়ায় একেবারে মেতে উঠেচেন! বলেন,—ঠিক বলেচিস্ মা। ...এ কাজগুলো আমরা হাতে নি। মানুষের মনকে তৈরী করা যাক। মন যদি একবার তৈরী হয়ে যায়, তা হলে সব কর্ত্তব্যও স্থির করে ফেলবে সকলে। বাদানুবাদ বা বক্তৃতার দরকারও থাকবে না।...

পরের দিন সকালে বিরাজ কহিল,—আমি বাড়ী যাবো। আপনাদের দয়া কখনো ভুলবো না।

নীলিমা কহিল—গরু মেরে জুতো দান বলে' কথা আছে না ? মোটরের ধাক্কায় আপনাকে আহত করে—এই সেবা বা আশ্রয় এও তেমনি নয় কি ? নীলিমা হাসিল।

সে হাসি নয়, বিদ্যুৎ ! বিরাজ সে বিদ্যুতের শিখায় কাঁপিয়া উঠিল।

বিরাজ কহিল, তা নয়। ভাগ্যে ধাক্কা খেয়েছিলাম। মনকে তাই মস্ত শিক্ষা দেবার সুযোগ পেয়েচি। সে শিক্ষার দাম মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝচি।

নীলিমা কহিল,—আপনার সে বইগুলো ?

বিরাজ কহিল,—হ্যাঁ, ও কাজটা শেষ করা চাই...

নীলিমা কহিল—ওগুলো আপনার খুব প্রিয় সামগ্রী...না ?

বিরাজ থমকিয়া দাঁড়াইল, পরে কহিল,—তা নয়। চাকরি নিয়েচি কি না ! প্রলয়কুমারের লেখা প্রচার করবো বলে...কি করি ? পেটের দায় ! অবস্থাব উন্নতি করতে কে-না চায়, বলুন ?

নীলিমা কহিল,—আর কোনো কাজ পেলেন না ?

বিরাজ কোনো কথা বলিল না।

নীলিমা কহিল,—আপনার অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয় ?

স্বরে করুণার আভাস ! বিরাজের চিত্ত টলিল ; কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। দারিদ্র্যের এই যে কি লজ্জা...!

এ নীরবতার অর্থ নীলিমা বুঝিল। সে কহিল—বলুন না আপনার পরিচয়। এতে লজ্জা কি ! মনের দারিদ্র্যই লজ্জার বিষয়। অর্থ-দারিদ্র্যে লজ্জা থাকতে পারে না। সামর্থ্যই তো স্বচ্ছলতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। Tact, নয় accident—অর্থ-স্বচ্ছলতার এই দুটোই মূল হেতু বলে আমি মনে করি।

বিরাজ কহিল,—আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার !

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

নীলিমা কহিল—দেশেরও তাই। অন্ধকার দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে না।

কথায় হেঁয়ালি ! মর্ম্ম বিরাজ ঠিক বুঝিল না। মুখ নত করিল।

নীলিমা কহিল—লজ্জার কথা নয়। আপনি অভাব অস্বচ্ছলতা ঘুচোবার জন্য পরের দ্বারে করুণাপ্রার্থী না হয়ে যে বই ফিরি করে বেড়াচ্ছেন, এতে আপনার মনুষ্যত্বেরই পরিচয় পরিচয় পাই। বেশ, ও বই আমি কিনবো...কত দাম, বলুন ?

বিরাজ কুণ্ঠা বোধ করিল, কহিল—বিক্রী ঠিক নয়। তবে...

নীলিমার দৃষ্টিতে যেন একরাশ শাণিত তীর...বিরাজের অন্তর বিদ্ধ করিবে বুঝি ?

বিরাজ কহিল—চাকরি নিয়েচি একজনের—এই প্রলয়কুমারের লেখা প্রচারের...

বিরাজ চাকরির সর্ত্ত বলিয়া ফেলিল। তবে একটু ঘুরাইয়া বলিল। স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারিল না, যে, এই নীলিমার চিত্তকে জয়গোপালের দিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই তার সাধনা ! কি করিবে ? নহিলে অর্থ মিলিবে না। এই অর্থে দারিদ্র্য ঘুচিবে, ভূ-পর্য্যটনের ব্যয় সংগ্রহও ! শুধু অর্থের প্রেরণা নয়, এ্যাডভেঞ্চারের সখ আছে, এ-কথাও সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না।

মানুষ তা পারে না। বিশেষ বয়স যদি তরুণ এবং শ্রোতা যদি রূপসী তরুণী হয় ! কাজেই...

নীলিমা হাসিল, হাসিয়া কহিল—এ কি পণ্ডশ্রম করচেন। সাহিত্য ছেলেখেলার বস্তু নয়। পাঠক-পাঠিকাও শিশু নয়...

বিরাজ অপ্রতিভ ভাবে কহিল—আমি তাহলে আসি।

নীলিমা কহিল—ও চাকরি ছেড়ে দিন্। এতে মনের ঐশ্বর্য্য বাড়ে না। দোরে দোরে মন জোগাবার চেষ্টা এ বিশ্রী। যাক্,—দয়া করে বইগুলি দিন আমায়। দাম এনে দি।

৫

গভীর রাত্রে। বিরাজের চোখে ঘুমের দেখা নাই। একরাশ চিন্তা ক্ষিপ্ত সৈন্যের মত মস্তিষ্ক-ক্ষেত্র চষিয়া কুচকাওয়াজ সুরু করিয়া দিয়াছে, ভীষণ বিক্রমে।

একটা কথা উঁচু মাথায় সবার উর্দ্ধে উঠিয়াছিল—সে এই নীলিমা দেবীর কথা। ইনি দেবীই। জয়গোপালের মত একটা আত্মসর্ব্বস্ব লোকের হাতে চিত্ত সমর্পণ করিবেন! এ চিন্তা কাঁটার মত বুকে ফুটিতেছিল!

যদিও ও লেখা পড়িয়া সত্যই নীলিমা দেবীর চিত্ত বিচলিত হয়? বইগুলা সরানো চাই...পড়িতে দেওয়া ঠিক নয়! কিন্তু কি বলিয়া চাহিবে? সত্য কথা বলিবে?

না। তাহা হইলে লজ্জার কালিতে দুনিয়া মিষ্ কালো হইয়া যাইবে। সে কালি হইতে নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না!

নিঃশব্দে ফেরত লওয়া যায় না?...চাকরি? নিমক? জয়গোপালের চাকরি না হয় করিবে না। তার দেওয়া টাকা কয়টা ফেরত দিবে। পয়সা-রোজগারের ক্ষেত্র বিশাল। না হয়, মাথায় মোট বহিয়া খাইবে। তা বলিয়া এমন নিলর্জ্জভাবে...

ঘড়িতে দুটা বাজিল। তার মাথার মধ্যে আগুনের স্রোত বহিতেছিল। বিরাজ জ্বলিয়া খাক্ হয়, বুঝি!

দোতলার ঘরে বইগুলা আছে...সেই টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন! সেগুলা লইয়া এই রাত্রির অন্ধকারেই নিঃশব্দে সরিয়া পড়া! মাথায় রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল। টেবিলের উপর হইতে কাগজ লইয়া সে লিখিল,—

দেবী ক্ষমা করিবেন। বই ফেরত লইয়া চলিলাম। দাম রাখিয়া গেলাম। বারো টাকা ছ'আনা। কাগজে মোড়া রহিল।

আমি অমানুষ। যদি কখনো মানুষ হইতে পারি তো শ্রীচরণে এ কালিমা-কাহিনী নিবেদন করিব। কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছি। মোট বহিব। দারিদ্র্যে লজ্জা নাই—বুঝিয়াছি।

অনুগত
বিরাজলাল

চিঠিখানা সে পড়িল। বাহিরে চাহিল। চারিদিকে সুগভীর স্তব্ধতা। কানন-তরুপুঞ্জে ঝিল্লীর রাগিণী...এ রাগিণীর কি মোহ!

বিরাজ উঠিল এবং সন্তর্পিত ধীর পায়ে দোতলায় আসিল। চারিদিকে অন্ধকারে ভরা, নীলিমার দুটি চোখ শুধু এ-অন্ধকারে বাতি জ্বলিয়া রাখিয়াছে! সেই বাতির আলোয় তার

প্রাণ আলো হইয়া গিয়াছে ! আলো জ্বালার দরকার নাই !

সেই বসিবার ঘর । ওধারে টেবিলের উপর বই আছে । আলো ? না, জ্বলিবে না । ...

টেবিলটার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে চলিল...এই টেবিল, এই বই ! হাতড়াইয়া বই লইল । কাগজে মোড়া দাম বারো টাকা ছ'আনা টেবিলের উপর রাখিল । তারপর বইয়ের গোছা লইয়া ফিরিল । এবার আরো সাবধান ! হাতে জিনিষ রহিয়াছে...হয়তো এ চুরি !

একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা সেই গ্রামোফোনের টেবিল, নিশ্চয় । ওঃ ! পায়ে চোট লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোনটা গিয়া পড়িল মেঝের উপর কি শব্দ ! যেন দুনিয়া ফাটিয়া গেল ! সঙ্গে সঙ্গে কলরব জাগিল,—কে ? কে ? রামদীন্...গঙ্গাসিং...জলদি আও...

রাত্রির নিবিড় অন্ধকার যেন অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল ! পৃথিবী দুলিয়া কোথায় সরিয়া গেল ! বিরাজ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া । বাহিরে ঐ আলো, চীৎকার । চীৎকার এই দিকেই আগাইয়া আসে ! বিরাজ চেতনা পাইয়া বইয়ের বড় আলমারির পিছনে লুকাইল । ...পরক্ষণেই ঘরে লোকজনের প্রবেশ এবং কোলাহল, কলরব প্রভৃতি ।

নীলিমা কহিল,—ঐ যে কাপড় দেখা যাচ্ছে...ঐ আলমারির পিছনে...

সারদা লাহিড়ী হাকিলেন !...রামদীন্...

প্রচণ্ড মূর্ত্তি একেবারে বিরাজের চোখের সামনে । কি বিভীষিকা ! ভয়ে বিরাজ চক্ষু মুদিল । কিন্তু একটা ঝড়ের বেগ সবলে তাকে টানিয়া আনিল...চেয়ারে ধাক্কা খাইয়া সে ভূতলশায়ী হইল । বিরাজ আবার চক্ষু মুদিল ।

নীলিমা কহিল—আপনি... ।

সারদা লাহিড়ী কহিলেন—বিরাজ এর মানে ?

ছল-ছল দৃষ্টি বিরাজ তাঁদের পানে চাহিল । মুখে স্বর ফুটিল না । শুধু করুণ দীন তার চোখের দৃষ্টি ।

নীলিমা নারী, তরুণী ! সে দৃষ্টির ভাষা নীলিমা বুঝিল । তার বুকে মমতার নির্ঝর বহিল !

অগ্নিমন্ত্রে পুড়িয়া বুক তার ছাই হয় নাই !

রামদীন্ কহিল—পুলিশ বোলায়েঙ্গে, দিদিমণি ?

নীলিমা কঠিন স্বরে কহিল,—না ! তোরা যা...

ভৃত্যের দল বিদায় লইল । লাহিড়ীর কেমন দ্বিধা ভরা দৃষ্টি...রাজ্যের প্রশ্ন সে দৃষ্টিতে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে !

নীলিমা তা লক্ষ্য করিল । লক্ষ্য করিয়া বিরাজের পানে চাহিল, তার হাত ধরিয়া কহিল,—উঠুন...

মন্ত্রচালিতের মত বিরাজ উঠিল । নীলিমা কহিল—কৌচে বসুন । কি হয়েছিল, বলুন তো...

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিয়া কহিল—আমি চোর । আমায় পুলিশের হাতে দিন...

নীলিমা স্থির দৃষ্টিতে চকিতের জন্য চাহিল, তারপর কহিল,—কি হয়েচে, বলুন শুনি । তারপর...

বিরাজ কম্পিত স্খলিত স্বরে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল, কহিল,—ঐ টাকা কটা...আর এই সে বইগুলো...

লাহিড়ীর দৃষ্টি তখনো পলকহীন !

নীলিমা কহিল—বই ফেরত নিন, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু এ কষ্ট কেন করলেন? অসুখ শরীর, এখনো সুস্থ হন্‌নি...

বিরাজ ভাবিল, এই দেবীর সহিত ছলনা করিতে আসিয়াছিল তুচ্ছ দুটো পয়সার লোভে...

বিরাজ কহিল—চিঠিতে লিখেছিলুম সব কথা।

নীলিমা চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িল, পড়িয়া বিরাজের পানে চাহিল, কহিল—ওঃ! আচ্ছা, কথা দিন, আমার অনুমতি ছাড়া যাবেন না!...

বিরাজ মাথা তুলিয়া চাহিল। নীলিমার চোখে সেই দীপ্তি! সে দীপ্তিতে তার অন্তরখানা দেখা যায় না?

বিরাজ কহিল—আপনার অনুমতি ছাড়া যাবো না।

নীলিমা লাহিড়ীকে কহিল,—তোমায় সব কথা বল্‌চি।

লাহিড়ী কহিলেন—আমি অবাক হয়ে গেছি।

নীলিমা কহিল—বিরাজ বাবুর মন বড় উঁচু। কিন্তু গরীব—ভবিষ্যৎ রচনা করতে চান—পথ নির্দ্দেশ করতে পাচ্ছেন না...

লাহিড়ী অবাক্! নীলিমা কহিল—আপনি শুতে যান। কথা দিয়েচেন, আমার অনুমতি না পেলে যাবেন না! সে কথা রক্ষা করবেন।

ঘাড় নাড়িয়া বিরাজ জানাইল, তাই হবে।

৬

সকালে বিরাজ গুম্ হইয়া বসিয়াছিল বিছানার উপর। বাদাম গাছের ডালে বসিয়া একটা পাখী ডাকিতেছিল। ঘরের বাহিরে যাইতে পা ওঠে না! ভৃত্যগুলা হয়তো সত্যই ভাবিয়াছে, সে চোর...কাল রাত্রে চুরি করিতেই উপরে উঠিয়াছিল!

লাহিড়ী আসিয়া কহিলেন...তুমি রাঢ়ীশ্রেণী না?

বিরাজ লাহিড়ীর পানে চাহিল। লাহিড়ী কহিলেন,—আমরা বারেন্দ্র...তোমার কে আছেন?

বিরাজ কহিল—মা, আর একটি ছোট বোন্।

লাহিড়ী বাঙ্‌লার সামাজিক ইতিবৃত্ত বিবৃত করিয়া চলিলেন, এ রাঢ় আর বরেন্দ্রভূমি...দুটো প্রদেশের মধ্যে এমন ব্যবধান গড়িয়া উঠিল কি করিয়া! সে ব্যবধান আজ ভাইকে ভাইয়ের পাশ হইতে কতদূরে সরাইয়া দিয়াছে!

নীলিমা কহিল—আমাদের কাজে বিরাজ বাবুকে নিন্, বাবা। উনি শিক্ষকতাই করছিলেন তো! গ্রাজুয়েট...

লাহিড়ী কহিলেন—আমি এ কথা নিত্য ভাবি। সেই কথাই বলছিলুম,—এই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই, কিন্তু রাঢ়ী-বারেন্দ্রে ব্যবধান দূর করবার কথা তো কারো মুখে শুনি না। অথচ, এতে যাজযজ্ঞের কোনো প্রয়োজন নেই।

নীলিমা বাপের কথার অর্থ না বুঝিয়া বাপের পানে চাহিয়া রহিল।

লাহিড়ী তা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন—এই অহিংসা মন্ত্রের মর্ম্মটুকু দেশের লোককে বুঝোতে আজ নারী আর পুরুষ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। অথচ...এই এমনি বহু কথা তিনি বকিয়া

চলিলেন।

উপসংহারে লাহিড়ী কহিলেন—বিরাজকে দেখে আমার ভারী ভালো লেগেচে। আমাদের এই কাজে ওকে যদি সঙ্গে নিতে পারি!...কিন্তু কি করে...সেই কথাই ভাবচি।...তা, বিরাজ...

বিরাজ তাঁর পানে চাহিল।

লাহিড়ী কহিলেন—দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে নীলিমার ভবিষ্যৎও আমায় অস্থির করে রেখেচে। কলরব-সভার মধ্য থেকে কাকে এনে তার হাতে ওর ভার দেবো, ভেবে পাচ্ছি না। কলরবের মধ্যে মানুষের আসল পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই...

নীলিমা ডাকিল—বাবা...

বাবার কথায় কিসের যেন আভাস। লজ্জায় তার স্বর বাধিয়া গেল।

লাহিড়ী কহিলেন—আমার কেবল মনে হয়, হিন্দু মোসলেম এক করতে চাই, অথচ তার আগে রাঢ়ী-বারেন্দ্র মেলানোর কথা কেন ওঠে না? সারা রাত ঐ চিন্তা যে কোথা থেকে আমার মাথায় প্রবল হয়ে উঠলো...সে ব্যবধান যাতে ঘুচোতে পারি, সে চেষ্টা করা উচিত, খুব উচিত। তোমাদের বুঝিয়ে দেবো...

বিরাজ অদূরে বাগানের বাতাবি গাছটার পানে চাহিয়া ছিল...বেশ বড় বড় ফল। তা ছাড়া মালতীর ঝাড়ে একরাশ ফুল বর্ণে-গন্ধে কি বিচিত্র সাজিয়া উঠিয়াছে! হাওয়ার দোলায় ফুলের ঐ প্রমোদ-নৃত্য তার মনের বনেও যেন স্তবকে স্তবকে ফুলের রাশি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

লাহিড়ী কহিলেন—তোমার মা আছেন, না? চলো, তাঁর কাছে আমরা যাই তিন জনে। এ ভবিতব্য...নিশ্চয়। না হলে তুচ্ছ কখানা বই নিয়ে আমার বাড়ী তুমি আসবে কেন? এসে ঐ গাড়ীর ধাক্কায়...

নীলিমার দিকে দেখাইয়া বিরাজ কহিল—জীবনের কোনো ধারণা আমার ছিল না! কোন্ পথ ঠিক পথ, তাও বুঝিনি। এঁর কথায় বুঝেচি। নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যতের পানেও চাওয়া চাই—ঠিক। না হলে মানুষে আর ইতর পশুতে কোনো প্রভেদ থাকে না!

লাহিড়ী কহিলেন—তাহলে নীলিমাকেই চিরদিনের জন্য তোমার পথের সঙ্গী করে নাও না। অনেকেই এখানে আসে দেশের কাজে, নীলও তাদের সঙ্গে মেশে; কিন্তু এত দরদ ওর কারো প্রতি দেখিনি...

তিনি নীলিমার হাত ধরিলেন। নীলিমা লজ্জায় বাঁকিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কহিল—যাও :...

হাসিয়া লাহিড়ী কহিলেন—আমার যাবার সময় এগিয়েই এসেচে, মা। তাই যাবার আগে সংসারে তোমায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে চাই! আমি আসচি...একখানা চিঠি আছে কর্ম্মীসমিতির। পড়লুম না তো! এমন ভুল হচ্ছে আজ...দ্যাখো দিকিনি!...

লাহিড়ী চলিয়া গেলেন। নীলিমা ও বিরাজ দুজনেই চুপ।

অনেকক্ষণ পরে নীলিমা কথা কহিল, বলিল,—কি ভাবচেন?

বিরাজ কহিল—জয়গোপাল বাবুর কথা। তিনি কি ভেবে আমায় চাকরি দিলেন...আর...

নীলিমা কহিল—এই! তা তাঁর বই আর টাকা যা এ্যাডভান্স নিয়েচেন, ফিরিয়ে দিয়ে

আসুন না।

বিরাজ কহিল—কিন্তু...

হাসিয়া নীলিমা কহিল—তাঁকে বলবেন, কাব্য লিখে নারীর চিত্ত মুগ্ধ করবেন, এমন রচনা-শক্তি তাঁর নেই। তার উপর ঐ-সব লেখায় ? যাতে নারীর অপমানের সুর বাজে ? এ জ্ঞানটুকু তাঁকে দিয়ে আসবেন অন্তত :...আমাদের কাজের একটা প্ল্যান আজই ঠিক করে ফেলতে চাই,...আসতে ভুলবেন না !

বিরাজ নীলিমার পানে চাহিল—নীলিমার চোখে হাসির দীপ্তি !

নীলিমা কহিল,—বাবার এত ঘড়ি ঘড়ি মত বদলায় ! কোনদিন বলেন, খদ্দরেই দেশের মুক্তি ; কোন দিন বলেন, না রে, সকলে চাষের মাঠে চ ! আজ নতুন সুর দেখচি, রাঢ়ী-বারেন্দ্র... !

সে হাসিল। বিরাজ ভাবিল, সর্ব্বনাশ ! এ মতও যদি বদলায় !

লাহিড়ী চিঠি হাতে ঘরে ঢুকিলেন, কহিলেন,—কামাখ্যা চৌধুরীর সে বইখানা খুঁজে দে তো, মা...সেই "অখণ্ড বঙ্গের অখণ্ড জাতি"—তাতে ভারী প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক বুঝিয়েচেন, রাঢ়ী-বারেন্দ্র একই শ্রেণীর, একই পর্যায়ের। শুধু যাতায়াতে অসুবিধা ছিল বলেই...বুঝলে, বিরাজ ! কিন্তু আজ সে বাধা তো নেই—তবে ? রাঢ়ীকে কাছে পেয়ে সে-সুযোগ আমি...

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যুতের মত নীলিমা সে ঘর হইতে সরিয়া পড়িল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

কুন্তলীন তৈল ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন : কুন্তলীন পুরস্কারের পরিশিষ্টে মুদ্রিত

কুন্তলীন তৈল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত, এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লালা লাজপত রায় :—

"আমি এইচ বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি এবং ঐগুলি অতি উত্তম জিনিষ মনে করি। বিলাতী জিনিষ অপেক্ষা কোনও অংশে হীন মনে করি না।"

ভারতবর্ষে প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি-দ্রব্যের মধ্যে এইচ্ বসুর সুগন্ধিগুলি নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলন্ডের ও ফরাসী দেশের উৎকৃষ্টতম সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।...

৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৯ স্বাঃ মতিলাল নেহেরু

ভূমিকা

আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, অডিকোলন প্রভৃতি যে সমস্ত পারফিউমেরী অথবা সুগন্ধি দ্রব্য বিলাত হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে, সেই সমস্ত এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য আমরা প্রস্তুত করিতে

আরম্ভ করিয়াছি। এই সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য বিলাতে যে সমস্ত উপাদানে এবং যেরূপ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে, আমরাও ঠিক সেই প্রক্রিয়ায় এবং সেই উপাদানে এদেশে প্রস্তুত করিতেছি। সমান মূল্যের বিলাতী সুগন্ধী দ্রব্যাদি অপেক্ষা আমাদের প্রস্তুত জিনিসগুলি কোন অংশেই হীন প্রতীয়মান হইবে না, বরং সুগন্ধের উৎকর্ষতা এবং স্থায়ীগুণে বিলাতের অনেক সুগন্ধি দ্রব্যাদি অপেক্ষা আমাদের সুগন্ধি দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে। আমরা আশা করি স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ আমাদের প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্যগুলি বিলাতীর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত কি না তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে আমাদের সুগন্ধি দ্রব্যাদি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কেহই বিলাতি সুগন্ধি ব্যবহার করিতে আর ইচ্ছুক হইবেন না।

এইচ, বসু.—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার
৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কুন্তলীন

কুন্তলীন সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ ; বাজারের সুবাসিত কেশ তৈলাদির অনুকরণে প্রস্তুত হয় নাই। তৈলের শোধন, দুর্গন্ধবিমোচন, এবং দেশীয় ও বিদেশীয় কেশপোষক দ্রব্যাদির দোষগুণ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা ও এবং পর্য্যালোচনার পর ভদ্র সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া এই মনোহর গন্ধ কেশ তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। কুন্তলীন যে মহিলা ও ভদ্রলোকদিগের ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল, তাহা একবার ব্যবহার করিয়া দেখিলেই প্রতীযমান হইবে।

কেশের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত অতি বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে কুন্তলীন প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, নূতন আবিষ্কৃত রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে তৈলকে বিশেষরূপে পরিষ্কৃত এবং তাহার স্বাভাবিক দুর্গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া তাহাতে স্ফূর্ত্তিজনক মনোহর সৌরভ ও পরীক্ষিত কেশবর্দ্ধক কয়েকটী উপাদান মিশ্রিত করা হইয়াছে। মিষ্ট এবং মনোহর গন্ধে কুন্তলীন ল্যাভেণ্ডার, ইউডিকলোন, পমেটম প্রভৃতি যাবতীয় বিলাতী সুগন্ধি দ্রব্যের সমতুল্য। তৈল কি পর্য্যন্ত মনোহর এবং সুগন্ধ প্রদায়ী হইতে পারে কুন্তলীন তাহার দৃষ্টান্তস্থল, ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। প্রচলিত যাবতীয় তীব্র ও অপ্রীতিকর গন্ধযুক্ত তৈলের তুলনায় ইহাকে একমাত্র সুগন্ধি কেশ-তৈল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

কুন্তলীন নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে কেশ উঠিয়া যাওয়া নিবারণ হইয়া নূতন কেশোদ্গম হয়, কেশ পুষ্ট কোমল ও শোভাযুক্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং মস্তক স্নিগ্ধ ও চর্ম্মরোগশূন্য হয়। অন্যান্য তৈলের ন্যায় কুন্তলীন ব্যবহারে কেশ চট্‌চটে হয় না, বেশ পাতলা থাকে, এবং কাপড়ে কোন প্রকার দাগ পড়ে না। ইহা বালক বালিকা এবং শিশুদিগের জন্যও নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সম্পূর্ণরূপে দুর্গন্ধবর্জ্জিত তৈল হইতে প্রস্তুত হওয়ায়, অন্যান্য তৈলের ন্যায় ব্যবহারের

পর মস্তকে, উপাধানে বা তোয়ালেতে কখনও কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। একমাত্র কুন্তলীন ব্যতীত অন্য কোন তৈলের এই গুণ নাই।

ব্যবহারের নিয়ম—কুন্তলীন ইচ্ছামত স্নানের পূর্ব্বে, স্নানান্তে ও কেশ বিন্যাসের সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেখানে চুল উঠিয়া যাইতেছে, সেখানে ব্যবহার কালে চুলের গোড়ায় তৈল উত্তমরূপ মর্দ্দন করা আবশ্যক।

এইচ, বসু,—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার
৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কুন্তলীন বিশুদ্ধ তৈল

এ পর্য্যন্ত যত কেশ-তৈল হইয়াছে তাহার একটীও বিশুদ্ধ তৈল হইতে প্রস্তুত হয় নাই। এই সমস্ত তৈলেতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে ময়লা অথবা অবান্তর বস্তু মিশ্রিত রহিয়াছে এবং সেই কারণে এই সমস্ত তৈল সুদৃশ্য করিবার জন্য রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে। যদি কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে বোতলটী না নাড়িয়া কিছুদিন একস্থানে রাখিয়া দিলেই তলাতে ময়লা অথবা গাদ জমিয়াছে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমরা বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া নির্দ্দোষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈলকে বিশেষরূপে পরিষ্কৃত এবং সম্পূর্ণরূপে ময়লাশূন্য করিয়া কুন্তলীন প্রস্তুত করিয়া থাকি। তৈলকে উত্তমরূপ পরিষ্কার করিতে পারিলে কত তরল এবং সুদৃশ্য হয় কুন্তলীন তাহার পরিচায়ক, অথচ সুদৃশ্য করিবার জন্য ইহাতে কিছুমাত্র রং সংযোগ করা হয় না। কুন্তলীন যে এক মাত্র বিশুদ্ধ কেশ-তৈল, তাহা প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রাধ্যাপক ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহাতেই নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হইবে। কুন্তলীনে হেনা, লেবু, চন্দন ইত্যাদি কোন উগ্র-গন্ধ আতর, অথবা স্পিরিট টিংচার ইত্যাদি অন্য কোন প্রকার অনিষ্টকর পদার্থ নাই।

এইচ. বসু,—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার
৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কুন্তলীন সুগন্ধ তৈল

প্রচলিত সুবাসিত কেশ-তৈলাদি প্রায়ই নারিকেল তৈলের সহিত উগ্রগন্ধ আতর এবং বেনের মশলা ইত্যাদি সংযোগে প্রস্তুত হইযা থাকে। যদিও তৈলের স্বাভাবিক দুর্গন্ধ সুগন্ধ-সংযোগে অনেক পরিমাণে চাপা পড়িয়া থাকে, তথাপি ইহাতে সুগন্ধের সৌগন্ধ অনেক নষ্ট হইয়া যায় এবং দুর্গন্ধ ও সুগন্ধের সংমিশ্রণে এক প্রকার অদ্ভুত অপ্রীতিকর গন্ধ-উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং ব্যবহারের অল্পক্ষণ পরেই সুগন্ধটুকু উড়িয়া গিয়া তৈলের স্বাভাবিক দুর্গন্ধ বাহির হইয়া পড়ে। সুবাসিত তৈলাদি ব্যবহারে যে অনেকেই পরিশেষে মস্তকে, উপাধানে এবং তোয়ালেতে অশুদ্ধ তৈলের দুর্গন্ধ বিশেষরূপে অনুভব করিয়া

থাকেন ইহাই তাহার কারণ। কিন্তু আমরা আমাদিগের আবিষ্কৃত রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে তৈলকে সম্পূর্ণরূপে দুর্গন্ধ বর্জ্জিত করিয়া তাহার সহিত সুমিষ্ট সৌরভ সংযোগে কুন্তলীন প্রস্তুত করিয়াছি। কুন্তলীনের বিশেষ গুণ এই যে, অন্যান্য তৈলের ন্যায় ইহার সুগন্ধ কখনও বিকৃত হয় না এবং ব্যবহারের পর মস্তকে কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না।

এইচ বসু,—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার
৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

অপরিষ্কার এবং দুর্গন্ধ তৈলের সহিত উগ্রগন্ধ আতর ইত্যাদি সংযোগে যে সমস্ত তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে সেই সমস্ত তৈল ব্যবহারে যে কেশের অনিষ্ট হইবে তাহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ অনেক সময় উগ্রগতি আতর ইত্যাদি ব্যবহারে শিরঃপীড়া জন্মাইয়া থাকে। কুন্তলীন সম্পূর্ণরূপে দুর্গন্ধ বর্জ্জিত তৈলের সহিত নির্দ্দোষ মৃদু এবং মনোহর সৌরভ সংযোগে প্রস্তুত হইয়ায় ইহা যে কেশে এবং মস্তকে ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য। কুন্তলীন নিয়মিত ব্যবহারে কেশ উঠিয়া যাওয়া নিবারণ হইয়া নূতন কেশোদ্গম হয়, এবং কেশ সুন্দর ও শোভাযুক্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কুন্তলীনের এই গুণের আমরা অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণ কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া, কেশ উৎপাদন ও বর্দ্ধনে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা অন্যত্র পাঠ করুন। কুন্তলের শ্রীবৃদ্ধি করিবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ কুন্তলীন, এবং সৌখিন ও সুন্দর কেশাভিলাষিণী মহিলামাত্রেই ইহা ব্যবহার করা উচিত। বিশেষতঃ ব্যারাম অথবা অন্য কোন কারণে যাহাদের কেশ উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে এক বোতল কুন্তলীন নিয়মমত ব্যবহার করিয়া ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করি।

এইচ, বসু,—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার
৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল

উৎকৃষ্ট কেশ তৈলে যে কয়টী গুণ থাকা আবশ্যক---বিশুদ্ধতা, মনোহর সৌরভ, এবং কেশ পোষণ ও বর্দ্ধন কারীতা—এই সমস্ত গুণ কুন্তলীনে বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকাতে, কুন্তলীন যে অত্যল্প কালের মধ্যেই সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কাল হইল আমরা কুন্তলীন বাহির করিয়াছি কিন্তু ইহার মধ্যেই কুন্তলীন অন্যান্য কেশ-তৈলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে, এবং মহিলা মণ্ডলীর বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়াছে। বহু সংখ্যক মহারাজা, রাজা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ অন্যান্য কেশ-তৈল পরিত্যাগ করিয়া এখন কুন্তলীন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; এমন কি অনেক বিলাতী মহিলা পর্য্যন্ত ম্যাকেসার ইত্যাদি

বিলাতী কেশ তৈল ফেলিয়া কুন্তলীন ব্যবহার করিতেছেন—ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। কেশের জন্য কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল, ইহা যাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনি একবার ব্যবহার কবিয়া দেখিলে আপনিও স্বীকার করিবেন ; কুন্তলীন সুন্দর, সুমিষ্ট এবং সখের জিনিষ, একবার ব্যবহার করিলে আর অন্য কোন তৈল পছন্দ হইবে না।

এইচ, বসু,—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার
৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা